কিশোর ক্লাসিক

সেবা প্রকাশনী

হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড- এর

হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড

সায়েম সোলায়মান

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড

রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

ডন ইগনাশিয়ো—শেষ অ্যাযটেক সম্রাটের বংশধর, দখলদার স্প্যানিয়ার্ডদের কবল থেকে মেক্সিকোকে উদ্ধারে বদ্ধপরিকর।
জেমস স্ট্রিকল্যাণ্ড—চাকরি-হারানো সুদর্শন অকুতোভয় ইংরেজ।
মায়া—রহস্যময়ী এক অপূর্বসুন্দরী মেক্সিকান-ইণ্ডিয়ান যুবতী।
যিব্যালবে—স্বার্থপর আর পাগলাটে এক সর্দার।
কিংবদন্তির স্বর্ণশহরেই কি এদের পরিণতি লিখে রেখেছে নিয়তি? সেজন্যই কি জান বাজি রেখে যিব্যালবে আর মায়াকে বাঁচাতে গেলেন ইগনাশিয়ো আর স্ট্রিকল্যাণ্ড? সেজন্যই কি স্বর্ণশহর অভিমুখে শুরু হলো অভিযান, ঘটতে লাগল একের পর এক ঘটনা? এবং সেজন্যই কি সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড শপথ করলেন, 'আমার কাছ থেকে মায়াকে আলাদা করতে পারবে না কেউ?'
প্রিয় পাঠক, ডন ইগনাশিয়োর লেখনীতে পুরো ঘটনার বর্ণনা স্যর হ্যাগার্ডের কাছে পাঠিয়েছেন তাঁর জনৈক বন্ধু জোন্স (ছদ্মনাম)। বিশাল সে-কাহিনিরই রূপান্তর এখন আপনার হাতে। সত্যি করে বলুন তো, সুপ্রাচীন মায়া সভ্যতার উপর ভিত্তি করে লেখা বন্ধুত্ব, অ্যাডভেঞ্চার, প্রেম, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আর প্রতিহিংসার এই অসাধারণ গল্পের পুরোটা না-পড়ে থাকতে পারবেন আপনি?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড

রূপান্তর ■ সায়েম সোলায়মান

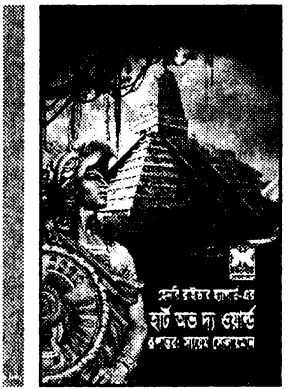

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-3238-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১২

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
mail. alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

HEART OF THE WORLD
By: Sir Henry Rider Haggard
Trans. By: Sayem Solaiman

সেবা প্রকাশনী

এক শ' চল্লিশ টাকা

হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

প্রজাপতি প্রকাশন

ও

সেবা প্রকাশনীর

ক'টি কিশোর ক্লাসিক/অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
সলোমনের গুপ্তধন/রকিব হাসান
শী/নিয়াজ মোরশেদ
রিটার্ন অভ শী/নিয়াজ মোরশেদ
মর্নিং স্টার/নিয়াজ মোরশেদ
নেশা/খসরু চৌধুরী
অ্যালান কোয়াটারমেইন/খসরু চৌধুরী
স্টেলা/খসরু চৌধুরী
এরিক ব্রাইটিজ/খসরু চৌধুরী
চাইল্ড অভ স্টর্ম/কাজী মায়মুর হোসেন
এলিসা/কাজী মায়মুর হোসেন
অ্যালান অ্যাণ্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার/কাজী মায়মুর হোসেন
ব্ল্যাক হার্ট অ্যাণ্ড হোয়াইট হার্ট/আসাদুজ্জামান
মুন অভ ইজরাইল/বুলবুল সরওয়ার
বেনিটা/সায়েম সোলায়মান
ক্লিওপেট্রা/সায়েম সোলায়মান
জেস/সায়েম সোলায়মান
রানী শেবার আংটি/সায়েম সোলায়মান
দ্য ভার্জিন অভ দ্য সান/সায়েম সোলায়মান
দ্য লেডি অভ ব্লসহোম/সায়েম সোলায়মান
হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড/সায়েম সোলায়মান
মন্টেজুমার মেয়ে/কাজী আনোয়ার হোসেন
পার্ল মেইডেন/ইসমাইল আরমান
দ্য পিপল অভ দ্য মিস্ট/ইসমাইল আরমান
মিস্টার মিসন'স উইল/ইসমাইল আরমান
দ্য ব্রেদরেন/ইসমাইল আরমান
মাইওয়ার প্রতিশোধ/ইসমাইল আরমান
শী অ্যাণ্ড অ্যালান/কাজী মায়মুর হোসেন

সারভান্তেস/নিয়াজ মোরশেদ
ডন কুইক্সোট

ভিক্টর হুগো/শেখ আবদুল হাকিম
দ্য ম্যান হু লাফস

চার্লস ডিকেন্স
অলিভার টুইস্ট/নিয়াজ মোরশেদ
আ টেল অভ টু সিটিজ/নিয়াজ মোরশেদ
গ্রেট এক্সপেকটেশানস/নিয়াজ মোরশেদ
ডেভিড কপারফিল্ড/এ.টি.এম শামসুদ্দীন

এমিলি ব্রনটি/নিয়াজ মোরশেদ
ওয়াদারিং হাইটস

মার্ক টোয়েন
পুডনহেড উইলসন/শেখ আবদুল হাকিম
হাকলবেরি ফিন/রওশন জামিল

সার ওয়াল্টার স্কট
রব রয়/কাজী মায়মুর হোসেন
আইভানহো/নিয়াজ মোরশেদ

রাফায়েল সাবাতিনি
দ্য ব্ল্যাক সোয়ান/কাজী আনোয়ার হোসেন
লাভ অ্যাট আর্মস/কাজী আনোয়ার হোসেন
রূপসী বন্দিনী/কাজী আনোয়ার হোসেন
দ্য সি-হক/ ইসমাইল আরমান

ব্রাম স্টোকার
ড্রাকুলা/রকিব হাসান
দ্য জুয়েল অভ সেভেন স্টারস/ইসমাইল আরমান
লেয়ার অভ দ্য হোয়াইট ওঅর্ম/ইসমাইল আরমান

টমাস হার্ডি/কাজী শাহনূর হোসেন
টেস অভ দ্য ডার্বারভিল
ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড
জুড দ্য অবসকিওর
দ্য মেয়র অভ ক্যাস্টারব্রিজ

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে/নিয়াজ মোরশেদ
আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস

রবার্ট লুই স্টিভেনসন/নিয়াজ মোরশেদ
কিডন্যাপড
ক্যাপ্টেন ম্যারিয়াট/নিয়াজ মোরশেদ
চিলড্রেন অভ দ্য নিউ ফরেস্ট

রাডইয়ার্ড কিপলিং/খসরু চৌধুরী
দ্য জাঙ্গল বুক

লর্ড লিটন/নিয়াজ মোরশেদ
দ্য লাস্ট ডেজ অভ পম্পেই

আলেকজান্দার দ্যুমা/নিয়াজ মোরশেদ
তিন মাস্কেটিয়ার
ম্যান ইন দ্য আয়রন মাস্ক
কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টো

এইচ. জি. ওয়েলস/সায়েম সোলায়মান
ডক্টর মরোর দ্বীপ

ভূমিকা (ডন ইগনাশিয়ো)

রিপাবলিক অভ গুয়াতেমালা থেকে মেক্সিকান অঙ্গরাজ্য চিয়াপাসকে আলাদা করেছে উসুমাসিন্টো নদী। কয়েক বছর আগে জোন্স (ছদ্মনাম) নামের আমার এক বন্ধু ওই নদী থেকে অনতিদূরের এক খনিতে ম্যানেজারের চাকরি পায়। এ-রকম জায়গায় চাকরি করা কতটা কষ্টকর তা যে না-করেছে তাকে বোঝানো মুশকিল। প্রথম কথা, ইউরোপিয়ানরা ফুর্তিপ্রিয়, অথচ খনিতে রাতদিন কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। পাহাড়ি জলবায়ু স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, কিন্তু এমনও উপত্যকা আছে যেখানে জ্বরে ভুগে মরাটা বিচিত্র কিছু না। মনোরঞ্জনের জন্য শিকার করারও উপায় নেই—জঙ্গল খুবই ঘন, স্বস্তিতে হাঁটাচলা করাও সম্ভব না। তার উপর আছে বিভিন্ন জাতের বিষাক্ত পতঙ্গের ঝাঁক। সুতরাং ওই এলাকায় আরামে থাকা এককথায় অসম্ভব।

সমাজ বলতে আমরা যা বুঝি সে-রকম কিছু নেই সেখানে। অসম সাহসী কোনো লোক তার স্ত্রীকে নিয়ে ওই জায়গায় যেতে পারবে কি না সন্দেহ। যেদিকে চোখ যায় শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। মাঝেমধ্যে বয়ে গেছে একটা-দুটো নদী। কোথাও মাথা উঁচু করে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে পর্বত। এসবের মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে আপনি এগোবেন কীভাবে আর যাবেনই বা কোথায়? বলা বাহুল্য, দুঃসাহসী অভিযাত্রীরও বুক কাঁপবে।

ফিরে যাই জোন্সের কথায়। তখন প্রায় এক বছর হয়ে গেছে খনিতে কাজ করছে সে। খনির নামটাও বলে ফেলি এই ফাঁকে: লা কন্সেপসন্স। একাকিত্বে ভুগছে জোন্স। লোকজনের সঙ্গে

পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা আছে, চেষ্টাও আছে। কিন্তু তা এককথায় ব্যর্থ হচ্ছে। চাকরির প্রথম কয়েক মাসে প্রতিবেশী কিছু ফার্মের মালিকদের সঙ্গে খাতির গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছিল সে। কিন্তু অচিরেই বিরক্ত হয়ে পিছিয়ে আসতে হয়েছে ওকে। টাকাপয়সা কমবেশি যা-ই থাকুক না কেন, এই লোকগুলো একেবারে নিচুশ্রেণীর সঙ্কর জাতের। একেকজনের একেকরকমের কুঅভ্যাস। আশপাশের মানুষগুলোর ভিতরে রুচিবোধের এই নিদারুণ অভাব দেখে রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠল জোন্স।

তবে সে বুদ্ধিমান লোক। একঘেয়েমিটাকে বড় করে না-দেখে কী করলে এই একঘেয়েমি দূর হয় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে লাগল। এবং চমৎকার একটা উপায়ও বের করে ফেলল।

কাজের ফাঁকে যতটুকু সময় পায়, ক্লান্তি বাধা হয়ে না-দাঁড়ালে যোগাড় করে দুষ্প্রাপ্য সব অ্যান্টিক। হাতের নাগালেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বেশ কিছু প্রি-অ্যাযটেক শহর আর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, পড়াশোনা করে সেগুলো নিয়ে। যত গবেষণা করে, ওর আগ্রহ তত বাড়ে।

কিছুদিনের মধ্যেই ঘটনাক্রমে খবর পেল, পর্বতের ওপারে সান্টা ক্রুয নামের এক জমিদারি আছে। মালিক ইণ্ডিয়ান। নাম ডন ইগনাশিয়ো। লোকে বলে, আদিবাসীদের জীবনযাত্রা, ইতিহাস কিংবা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্বন্ধে মেক্সিকোর এই অঞ্চলের অন্য যে-কারোর চেয়ে অনেক বেশি জানেন ডন ইগনাশিয়ো। সুতরাং জোন্স সিদ্ধান্ত নিল, প্রথম সুযোগেই দেখা করবে লোকটার সঙ্গে।

সমস্যা একটাই—সান্টা ক্রুযে যাওয়ার পথ দেখাবে কে? সমাধানও হয়ে গেল। গাইডের ভূমিকা পালন করতে রাজি হলো এক ইণ্ডিয়ান। যে-পথ দিয়ে লোকে লা কন্সেপসন্স থেকে সান্টা ক্রুযে যাতায়াত করে সে-পথে গেলে পৌঁছতে দশ ঘণ্টা লাগে।

কিন্তু ওই ইণ্ডিয়ান গাইড বলল, এক পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে খচ্চরের পিঠে চেপে মাত্র তিন ঘণ্টায় নাকি যেতে পারবে সেখানে।

সবকিছু মোটামুটি ঠিকঠাক, তারপরও কাজের চাপে সুযোগ করতে পারছিল না জোন্স। শুকনো মৌসুমের এক শনিবারে সে-সুযোগ পেয়ে গেল সে। পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ায় সেদিন ক্রাশিংমিল ঘুরছে না, তাই খনিতে কাজ বন্ধ। আগের সপ্তাহের সোমবারে ডন ইগনাশিয়োর কাছে লোক পাঠিয়েছিল জোন্স। জানিয়ে দিয়েছে দেখা করতে চায়। জবাবে যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে চমৎকার এক চিঠি লিখেছেন ডন। বলেছেন তাঁর জমিদারিতে যে-কোনো ইংরেজ ভদ্রলোক যে-কোনো সময়ে সাদরে আমন্ত্রিত। রোববার দিনটা তাঁর সঙ্গে অতিবাহিত করার অনুরোধও করেছেন তিনি জোন্সকে।

রওয়ানা হয়ে গেল জোন্স। সাণ্টা ক্রুযে পৌঁছে ওর চোখ ছানাবড়া হওয়ার মতো অবস্থা। চারদিকে সাদাপাথরে-বানানো বড় বড় অট্টালিকা, নির্মাণকৌশলের বিচারে সেমি-মুরিশ। প্রায় প্রতিটা ভবনের সঙ্গেই সুদৃশ্য টাওয়ার। দরজাগুলো কারুকার্যখচিত। কোনো কোনো দালানের ছাদে বড় গম্বুজ। যে-পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে জোন্স তার দু'পাশে শস্যক্ষেত। জায়গায় জায়গায় জটলা পাকিয়ে আছে কোকো আর কফি গাছ। সারি সারি উঁচু ভবনের চারপাশে একরের পর একর বিস্তৃত এসব শস্যক্ষেত দেখলে বোঝা যায় এই অঞ্চলের অধিবাসীরা মূলত কৃষিকাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করে।

উঠানের মতো দেখতে বেশ বড় একটা জায়গার দরজার কাছে হাজির হলো জোন্স। এখানে বিশালাকৃতির কিছু সিবা গাছ জন্মে আছে। একটা কুয়ার উপরে ছায়া ফেলেছে গাছগুলো। ওখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল এক ইণ্ডিয়ান, জোন্সকে দেখে এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল। জানাল, কাছের এক গির্জায় প্রার্থনা করছেন সিনর ইগনাশিয়ো, শেষ হতে বেশি সময় লাগবে

না।

ওই ইণ্ডিয়ানের কাছে নিজের ঘোড়াটা বুঝিয়ে দিল জোন্স। হেঁটে এগোল গির্জার দিকে। দরজা খোলাই আছে। ভিতরে ঢুকল সে, একদিকের বেঞ্চে বসে পড়ল। উজ্জ্বল সূর্যালোক থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন গির্জায় ঢুকে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আস্তে আস্তে অন্ধকার সয়ে এল চোখে। বুঝতে পারছে গির্জার ভিতরটা বেশ সুন্দর। আকারের দিক দিয়ে যেমন সুসমন্বিত, সাজসজ্জার দিক দিয়েও তেমন চমৎকার।

তিনশ'র মতো লোক বসে আছে ভিতরে। বোঝা যাচ্ছে এরা সবাই জমিদারের অধীনে চাকরি করে। একমনে প্রার্থনা করছে সবাই, তাই জোন্সের আগমন টের পায়নি কেউ। সে তখন একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বেদিসংলগ্ন দেয়ালের দিকে। সেখানে ঠেস দিয়ে রাখা আছে সাদা-মার্বেলের একটা স্ল্যাব। ওটার গায়ে স্প্যানিশ ভাষায় খোদাই করে লেখা আছে কিছু কথা। অক্ষরগুলো এত বড় বড় যে, এতদূর থেকেও পড়তে অসুবিধা হচ্ছে না জোন্সের:

"সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ও ইংরেজ ভদ্রলোক জেমস স্ট্রিকল্যাণ্ড এবং তাঁর স্ত্রী, হার্টের রাজকন্যা মায়ার স্মরণে ইণ্ডিয়ান ইগনাশিয়োর পক্ষ থেকে উৎসর্গীকৃত। দর্শনার্থীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে তাঁরা যেন দয়াপরবশ হয়ে ওই মহৎপ্রাণ মানুষ দুটোর আত্মার শান্তি কামনা করেন।"

জোন্স ভাবছে, কে এই জেমস স্ট্রিকল্যাণ্ড? আর হার্টের রাজকন্যা মায়াই বা কে? ডন ইগনাশিয়োই বা এ-রকম একটা জায়গায় ও-রকম একটা লিপিফলক বসাতে গেলেন কেন?

এমন সময় প্রার্থনা শেষ হলো, আশীর্বাদ করলেন যাজক। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল উপাসকেরা। গির্জা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই।

একেবারে সামনের দিকে আছেন এক ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক।

আস্তে আস্তে হাঁটছেন তিনি। একনজর দেখেই জোন্স বুঝতে পারলেন এই লোকই ডন ইগনাশিয়ো। বয়স ষাটের মতো। কিন্তু দেখে আরও বেশি মনে হয়। জীবনের দুঃখ, দুর্ভোগ আর কষ্টগুলো তাঁর উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় চিহ্ন রেখে গেছে। লোকটা এমনিতে লম্বা, রোগাটে। চলাফেরায় একরকম প্রশান্ত গাম্ভীর্য আছে। পরনের পোশাক খুবই সাধারণ। জামায় রূপার বোতাম ব্যবহার করতে পছন্দ করে মেক্সিকানরা; কিন্তু ডন ইগনাশিয়োর কাপড়ে সে-রকম কিছু দেখা যাচ্ছে না। মাথায় পানামা স্ট্র'র সম্‌ব্রেরো, তাতে সচরাচর গিল্টকর্ডের বদলে কালো ফিতা। গায়ে সাদা শার্ট, সাদা জ্যাকেট। গলায় কালো বো-টাই। মেটে রঙের ট্রাউজার। পায়ে ইউরোপিয়ান বাদামি বুট।

সবই খুব সাধারণ, কিন্তু ডন ইগনাশিয়োর চেহারাটা অসাধারণ। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জোন্স, ভাবছে এত সুন্দর ও প্রসন্ন মুখশ্রী আগে কখনও দেখেছে কি না। দেখলেই মনে হয় ওই চেহারার মালিকের অন্তরটা খাঁটি আর পবিত্র, তিনি উচ্চবংশীয়। এক ছটাক অতিরিক্ত চর্বি নেই সেখানে, নিখুঁত ছাঁট। ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক। উন্নত গাল, কপাল। বিশ্বাস আর দয়ায় ভরা বড় বড় কোমল কালো চোখ।

গির্জার দরজার পাশে একটা লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ডুবন্ত সূর্যের আলো এসে পড়েছে তাঁর উপর। ইণ্ডিয়ানরা একে একে তাঁকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে গির্জা থেকে। যাওয়ার আগে সবাই সম্মান প্রদর্শন করছে তাঁকে। শিশুরা চুমু খাচ্ছে তাঁর হাতে, গুডনাইট জানাচ্ছে। কেউ কেউ বলছে ঈশ্বর যেন ইগনাশিয়োকে নিরাপদে রাখেন।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে জোন্স। ভাবছে, ইণ্ডিয়ানদের এই ভক্তি-সম্মান আসলেই আন্তরিক নাকি কয়েক-শতাব্দী-ধরে-চলা সাদাচামড়ার মানুষদের শাসনের ফলে লোকগুলোর মধ্যে

দাস্যবৃত্তি চলে এসেছে? ঠিক সে-সময়ই ঘুরে তাকালেন ডন ইগনাশিয়ো, দেখতে পেলেন জোন্সকে।

'হাজারবার ক্ষমা চাচ্ছি আপনার কাছে, সিনর,' স্প্যানিশ ভাষায় বললেন ডন, লাজুক হেসে জোন্সের সম্মানে সম্ব্রেরোটা তুললেন মাথা থেকে, দেখা গেল লম্বা লম্বা ধূসর চুল, 'হয়তো আমার ব্যবহারে কষ্ট পেয়েছেন আপনি। আমাকে অভদ্র মনে করছেন। আসলে এতক্ষণ আপনার দিকে তাকানোর মতো অবকাশও পাইনি। কিন্তু কী করবো বলুন? এটা আমার রুটিন বলতে পারেন। সপ্তাহের শেষদিনটাতে প্রার্থনার আয়োজন করি। আমার কর্মচারীদের নিয়ে, বলা ভালো আমার সন্তান আর নাতিপুতিদের নিয়ে একসঙ্গে বসি এখানে। ...আপনি নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ আগে আসেননি?'

'ক্ষমা চাচ্ছেন কেন বুঝলাম না,' মৃদু হাসল জোন্সও। 'আপনাকে আর আপনার ভৃত্যদেরকে যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে দেখছিলাম এতক্ষণ। তা ছাড়া এই গির্জাটাও সুন্দর। আজকের মতো দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে ঘুরেফিরে দেখতে পারি?'

'অবশ্যই, সিনর। এই এলাকার অন্য বাড়িগুলোর মতো এই গির্জাটাও চমৎকার। দু'শ' বছর আগে নকশা করা হয়েছিল এটার। তখন এখানে অনেক বড় একটা আশ্রম ছিল। সন্ন্যাসীরা জানত কীভাবে গির্জা বানাতে হয়। স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করেছে ওরা, তাই খরচ অনেক কমে গেছে। অবশ্য পরে মেরামতের জন্য আমাকে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করতে হয়েছে। আমার আগে যারা ছিল এখানে তারা এসব নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামায়নি।'

মাথা ঝাঁকাল জোন্স। ডনের কথা শুনছে আর এদিকে-সেদিকে তাকাচ্ছে।

ডন বলে চললেন, 'ভাবতে পারেন সিনর, বিশ বছর আগেও এই জায়গাটা ছিল রাহাজান, চোরাকারবারি আর খুনিদের

আখড়া? আজ যাদেরকে আমার সঙ্গে দেখলেন গির্জার ভিতরে তারা, অথবা তাদের বাপ-দাদারা ক্রীতদাসের চেয়ে ভালো ব্যবহার পেত না ওই লোকগুলোর কাছ থেকে। এই এলাকা দিয়ে চলতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে কত মানুষ! আমি নিজে একবার আরেকটু হলেই খুন হয়ে যেতাম।'

বেদিসংলগ্ন দেয়ালে ঠেস-দিয়ে-রাখা সাদা-মার্বেলের স্ল্যাবটার দিকে ইঙ্গিত করল জোন্স। 'ওটা কী? মানে, জেমস স্ট্রিকল্যাণ্ড আর মায়া কে?'

গভীর দুঃখের ছাপ পড়ল ডন ইগনাশিয়োর চেহারায়। ভাঙা গলায় বললেন, 'এ-জীবনে যত বন্ধু পেয়েছি, তাদের মধ্যে জেমস স্ট্রিকল্যাণ্ড সেরা। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমার জীবন বাঁচিয়েছে সে। বন্ধু হিসেবে আমাকে ভালোবেসেছে। ভালোবেসেছে এক ইণ্ডিয়ান নারীকেও, আমার চেয়েও বেশি। সেটাই উচিত অবশ্য।'

'ওই মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন আপনার বন্ধু?' জানতে চাইল জোন্স, ওর আগ্রহ বাড়ছে।

'হ্যাঁ। কিন্তু ওদের বিয়েটা হয়েছিল অদ্ভুত একটা জায়গায়, অদ্ভুত পদ্ধতিতে। গল্পটা বেশ পুরনো, সিনর। কিছু মনে করবেন না, আমি সেটা বলতে চাই না। অনেক দুঃখের-স্মৃতি জেগে উঠবে। মনে পড়ে যাবে মৃত্যু, ক্ষতি আর হতাশার কথা। অনেক আশা করে ছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত পূরণ হয়নি এমন কিছু চাওয়া ক্ষতবিক্ষত করে দেবে মনকে। শেষপর্যন্ত হয়তো ভেঙে পড়বো আমি। তারচেয়ে, যদি সাহসে কুলায়, যদি বেঁচে থাকি, ওই কাহিনি হয়তো লিখে রেখে যাবো। কয়েক বছর আগে শুরুও করেছিলাম, কিন্তু কী লিখছি কেন লিখছি ভাবতে গিয়ে সবই আজগুবি মনে হয় আমার কাছে। শেষপর্যন্ত বাদ দিয়ে দিই।'

কিছু বলল না জোন্স। ডনের দিকে তাকিয়ে আছে স্থির

দৃষ্টিতে।

'আমার জীবনটা খুব সুখকর না, সিনর,' বলছেন ডন, 'বেশিরভাগ সময়ই উথালপাথাল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে আমাকে। প্রয়োজনের তাগিদে অনেক অ্যাডভেঞ্চার করতে হয়েছে। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শেষবয়সে এসে কিছুটা হলেও শান্তির সন্ধান পেয়েছি। আমি জানি আমার সময় ফুরিয়ে আসছে। ইদানীং শুধু একটাই দুশ্চিন্তা হয়—আমি মরে গেলে আমার প্রজাদের না খারাপ কিছু হয়ে যায়! কেউ না এসে দখল করে নেয় সবকিছু। আবার আগের মতো না হয়ে যায় সব!'

জোন্স কিছু বলছে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডন, কাঁধ ঝাঁকালেন। 'চলুন সিনর, নিশ্চয়ই ক্ষুধা লেগেছে আপনার। গির্জার ফাদারকে বলে রেখেছি আজ রাতে আমাদের সঙ্গে খেতে। তিনি আবার একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিন লিগ দূরের এক গ্রামে যাবেন আগামীকাল। তাই আজ একটু তাড়াতাড়িই খাবার পরিবেশন করতে বলেছি। না-দেখলেও জানি আপনার মালপত্র ঠিকমতোই নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছে আপনার ঘরে—আজ রাতে যেখানে থাকবেন আপনি। চলুন, আপনাকে নিয়ে যাই সেখানে।'

একদিকের দেয়ালের কাছে এগিয়ে গেলেন ডন। ছোট একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। তালা খুললেন দরজাটার, ঠেলে সরালেন পাল্লা। এক ধাপ সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। শেষমাথায় একটা ল্যাণ্ডিংপ্লেস, একটা জানালাও আছে। গ্রিলের বেষ্টনী আছে ওই জায়গায়; এমনভাবে বানানো হয়েছে যে, কেউ যদি গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে তা হলে গির্জার ভিতরে কী হচ্ছে না-হচ্ছে অনায়াসে শুনতে পাবে, অথচ নীচ থেকে তার উপস্থিতি টের পাবে না কেউ।

'এখানে দাঁড়িয়ে আগেরদিনের অধ্যক্ষরা নজর রাখতেন সন্ন্যাসীদের উপর,' বললেন ডন ইগনাশিয়ো, 'এবং এখানে

দাঁড়িয়েই একবার এমন এক দৃশ্য দেখেছিলাম আমি, যা কখনও ভুলতে পারবো না।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন তিনি। হাজির হলেন পুরনো অথচ সুদৃশ্য স্প্যানিশ আসবাবে ঠাসা একটা সিটিংরুমে। ওই ঘরসংলগ্ন আরেকটা দরজা খুললেন। চোখে পড়ছে বেশ বড় কিন্তু কেমন গুমোট আরেকটা ঘর। মোটা গরাদযুক্ত একটা জানালা আছে, সেখান দিয়ে অল্পবিস্তর আলো আসছে। মাটি থেকে আনুমানিক দশ ফুট উপরে হবে ঘরটা।

'আজ রাতে এখানেই থাকবেন আপনি, সিনর,' জোন্সকে বললেন ডন।

ঘরের দরজায় পা দিল জোন্স।

একদিকের দেয়ালে আঁকা আছে শেষবিচারের কল্পিত ছবি। আরেকদিকের দেয়ালে রক্তক্ষয়ী কোনো যুদ্ধের দৃশ্য। আর্দ্র পরিবেশের কারণে দুটো ছবিই কেমন স্যাঁতস্যাঁতে; দেখলে আপনাথেকে ভারী হয়ে আসে মন। তবে যে-লোক এঁকেছে তার হাত আছে স্বীকার করতে হবে। লোকটার কল্পনাশক্তিরও প্রশংসা করতে হয়, ভাবল জোন্স।

সেন্টার-উইণ্ডোর নীচে, মেঝে থেকে তিন ফুট উপরে ঝুলছে আশ্রমের কোনো এক সন্ন্যাসীর প্রমাণাকারের পুরনো পোর্ট্রেট। তেলরঙে আঁকা হয়েছে ছবিটা। চেহারার দিকে খেয়াল করে তাকালে কেমন যেন নিষ্ঠুর আর অশুভ মনে হয় লোকটাকে। তাঁর ন্যাড়ামাথার উপরে পবিত্র আত্মার প্রতীক হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে একটা কবুতর, ওই সন্ন্যাসীকে শান্তির পথ দেখাচ্ছে হয়তো।

ঘরের বাকিটা, এককথায় বললে সাজানোগোছানো। সুদৃশ্য আসবাবের কথা তো আগেই বলা হয়েছে; সেগুলো এমনভাবে রাখা যে, দেখলে মনে হয় যেটা যেখানে রাখা দরকার ছিল সেটা ঠিক সেখানে রাখা আছে। শক্ত ইটের মেঝেতে হাঁটলে বুটের খট খট শব্দ হয়।

'দেখে হয়তো সুবিধার মনে হচ্ছে না এই অ্যাপার্টমেন্ট, সিনর,' বললেন ডন ইগনাশিয়ো, 'কিন্তু কোনো অতিথি এলে এখানেই থাকতে দিই আমরা। তা ছাড়া সঙ্গে আরেকটা ঘর আছে, ভেবেছিলাম আপনার লেখাপড়ার জন্য কাজে লাগতে পারে ঘরটা—যদি সে-রকম কিছু করতে চান। এখানকার লোকে বলে এই ঘর নাকি ভূতুড়ে। কিন্তু আমি জানি ইংরেজরা এসব ব্যাপারে তেমন মাথা ঘামায় না। এককালে ডন পেদ্রো মোরেনো নামে এক জমিদার ছিল এই এলাকায়, ওর আমলে এই ঘরে এক লোক খুন হয়েছিল। সেই থেকে সবার ধারণা, এখনও এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিহত লোকটার আত্মা। মজার ব্যাপার কী জানেন? ওই জমিদার কিন্তু একবার আমাকে আর সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকে এখানে খুন করার পরিকল্পনা এঁটেছিল। বুঝতেই পারছেন, সফল হয়নি সে। অবশ্য বেশ কয়েক বছর পরে এখানে, বলা ভালো খাটটা এখন যে-জায়গায় আছে সেখানে দুটো নরকঙ্কাল খুঁজে পাই আমি। যথাযোগ্য মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে ওগুলোকে।'

জোন্স বলল, 'দেখুন, ধর্ম নিয়ে তেমন বাড়াবাড়ি নেই আমার মধ্যে। আপনি যে-জমিদারের কথা বলছেন তাঁকে যেহেতু চিনি না তাই তাঁর প্রতিও কোনো সহানুভূতি আসছে না মনে। কে বা কারা খুন হয়েছে এখানে, কাদের কঙ্কাল পাওয়া গেছে সে-সব নিয়েও খুব একটা আগ্রহ বোধ করছি না। আর ভূতের কথা যদি বলেন তা হলে বলবো, যারা ভূত বিশ্বাস করে তারা বোকা। ...কোথায় রাত কাটাতে হবে তা তো জেনেই গেলাম, চলুন সাপারটা সেরে নিই এবার।'

সাপার শেষে সিগার আর ব্ল্যাক কফি নিয়ে বসলেন তাঁরা। তামাক আর কফি দুটোই প্রচুর পরিমাণে জন্মায় এখানে। এত ভালো সিগার আগে কখনও খায়নি জোন্স। গির্জার ফাদার বিদায় নিলেন কিছুক্ষণ পর। জোন্স তখন অ্যাণ্টিক নিয়ে কথা বলতে

শুরু করল ডন ইগনাশিয়োর সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরই বুঝতে পারল, এই ব্যাপারে তাঁর মেজবানের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল তা মোটেও অতিরঞ্জিত না। আর শুধু অ্যান্টিকই না, হায়ারোগ্লিফিক বা চিত্রলিপির ব্যাপারেও অনেক কিছু জানেন ডন। জানেন এই জমিদারির প্রায় সব মন্দির আর দালান সম্পর্কে। কারা কবে কেন বানিয়েছে ওগুলো তা-ও জানেন। দক্ষিণ-পূর্ব মেক্সিকোর প্যালেঙ্ক জেলার কাছাকাছি এই অঞ্চলে এসব প্রাচীন নিদর্শনের সংখ্যা নেহাৎ কম না।

কথাপ্রসঙ্গে জোন্স বলল, 'ভাবতেই খারাপ লাগে, এই এলাকার প্রাচীন নিদর্শনের অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। স্বর্ণশহরের কথাই ধরুন না। মধ্য-আমেরিকার ওই অনাবিষ্কৃত শহরটা আজও এক লৌকিক-উপাখ্যান হয়ে আছে। ওটা খুঁজে বের করতে দরকার হলে দশ বছর কাটিয়ে দিতেও রাজি আছি আমি। আমার খুব ইচ্ছা অন্তত একবারের জন্য হলেও দেখবো। অতীতকে খুঁজে বের করে তার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ায় যে কী আনন্দ আছে তা, যে না-করেছে তাকে বোঝানো যাবে না। এককালে একদল লোক বিচরণ করত পৃথিবীর এই অঞ্চলে, আজ তারা নেই। কেন নেই? কী হয়েছিল তাদের? কী করত তারা? কী খেত? কীভাবে চলত? কত কিছু যে জানার আছে! মানুষ যত গরিবই হোক না কেন কোনো-না-কোনো সঞ্চয় থাকে তার। একইভাবে কোনো জনপদ যত অস্বচ্ছলই হোক না কেন কিছু-না-কিছু জমায়। যারা হারিয়ে গেছে এই অঞ্চল থেকে তাদেরও নিশ্চয়ই সে-রকম সঞ্চিত সম্পদ আছে। কোথায় সে-সম্পদ? আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে কোন্‌টা জানেন? আপনি, ডন ইগনাশিয়ো, কখনও দেখেননি ওই লোকগুলোকে, অথচ এমনভাবে কথা বলছেন যেন চোখের সামনে দেখেছেন সবকিছু। শুনলে মনে হয় যা বলছেন তার প্রত্যেকটা শব্দ সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত।'

'যদি না-দেখতাম তা হলেই ভালো হতো, সিনর,' মৃদু গলায় বললেন ডন।

'মানে?'

'মানে ওই স্বর্ণশহর দেখেছি আমি।'

'কী!'

করুণ হাসি হাসলেন ডন। 'আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি ওই শহর আর তার সভ্যতা সম্পর্কে যেসব গল্প চালু আছে আসল ঘটনা তারচেয়েও রোমাঞ্চকর আর আকর্ষণীয়। বিশেষ করে স্প্যানিশরা যেসব কাহিনি বানিয়েছে, আসল ঘটনা তারচেয়ে অনেক বেশি...কী বলবো...মনোমুগ্ধকর।'

'বলেন কী!' উত্তেজনায় দম আটকে আসছে জোন্সের। 'মদ বেশি খেয়ে ফেললাম নাকি? নাকি ঘুমিয়ে আছি আসলে? স্বপ্ন দেখছি না তো? আপনি বলছেন ইণ্ডিয়ানদের ওই গোপন শহরটা নিজের চোখে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, সিনর। যদিও জানি কথাটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আপনার। আমি আশাও করি না বিশ্বাস করবেন আপনি। কেউ বিশ্বাস করবে না, হেসে উড়িয়ে দেবে—এই আশঙ্কা করে এতদিন কারও কাছে বলিওনি কথাটা। কিন্তু যা বলেছি, বলেছি; তার বেশি আর একটা শব্দও বলবো না এমনকী আপনাকেও। কারণ একদিন হয়তো আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে আমার; আমি চাই না আমারই কোনো কথার কারণে আপনার অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হই।'

'না, না, সে-রকম ভাবছেন কেন...'

'আমি দুঃখিত,' জোন্সকে থামিয়ে দিলেন ডন ইগনাশিয়ো। 'এই মধ্য-আমেরিকায় বড় বড় জঙ্গল আছে, আছে ঊষর জনহীন প্রান্তর আর খাড়া ঢালের দীর্ঘ পবর্তমালা। এসবের আড়ালেই লুকিয়ে আছে অনেক প্রাচীন শহর। আজ পর্যন্ত কোনো সাদাচামড়ার মানুষের পা পড়েনি সে-সব জায়গায়। এককালে

যেমন সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠেছিল সে-সব শহরে, আবার সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে ওই জনপদগুলো বিলীনও হয়ে গেছে। এখন ওই শহরগুলো, এককথায় যদি বলি, কবরস্থান। আজ এই মুহূর্তে যেখানে বসে আছি আমরা, এই জায়গা থেকে কমবেশি দু'শ' মাইল দূরেই আছে ল্যাকাণ্ডোন্সদের এক বসতি। জানেন নিশ্চয়ই, খ্রিস্টান বানানো হয়নি এ-রকম ইণ্ডিয়ানদেরকে ল্যাকাণ্ডোন্স বলা হয়। এরা, যতদূর জানি, আজ পর্যন্ত কোনো সাদাচামড়ার মানুষ, মানে ইউরোপিয়ান দেখেনি। আজও এরা তাদের বাপ-দাদার ধর্ম অনুসরণ করে যাচ্ছে।' মাথা নাড়লেন ডন। 'না, সিনর, আমার গল্পটা বলা যাবে না। বলা উচিত হবে না। অন্তত আমার জীবদ্দশায় তো না-ই।'

'কিন্তু কেন?' ধৈর্য রাখতে পারছে না জোন্স। 'অসুবিধাটা কী?'

'অসুবিধা আছে। কেউ বিশ্বাস করবে না। প্রমাণ চাইবে। তখন কোত্থেকে দেবো আমি সেই প্রমাণ? নাকি পথ চিনিয়ে দেবো যাতে দলে দলে লোক গিয়ে যা অবশিষ্ট আছে তা-ও লুটে নেয়? সেটা কি উচিত হবে? তবে...'

'তবে?' অতি-আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এসেছে জোন্স।

জবাব না-দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ডন ইগনাশিয়ো। ফিরে এলেন কিছুক্ষণ পরই। হাতে একটা ছোট চামড়ার-ব্যাগ। সেটার ভিতর থেকে বের করলেন খুবই সুন্দর একটা রত্নপাথর। ওটার দিকে ভালোমতো তাকাল জোন্স।

জিনিসটা আসলে চমৎকারভাবে পলিশ-করা বেশ বড় একটা পান্না। এত বড় পান্না আগে কখনও দেখেনি জোন্স। খাঁটি সোনা দিয়ে বানানো একটা বেল্টের মধ্যে বসানো আছে পান্নাটা। সিলমোহর হিসেবে ব্যবহার করা যায়, বলা ভালো ব্যবহার করা হতো জিনিসটা; কারণ পান্নার গায়ে গভীরভাবে খোদাই করা আছে একজন মানুষের মৃত্যুশীতল গম্ভীর চেহারা, চারপাশে

হায়ারোগ্লিফিক শব্দাবলী। উল্টোপিঠে আরও কিছু হায়ারোগ্লিফিক শব্দ।

'লেখাগুলো পড়তে পারেন?' জিজ্ঞেস করল জোন্স, এখনও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে গহনাটা।

'হ্যাঁ, পারি। পান্নার উপরের পিঠে খোদাই-করা লেখাগুলোর মানে হচ্ছে: "হে চোখ আর মুখ, আমাকে দেখো, আমার জন্য প্রার্থনা করো।" উল্টোপিঠে লেখা আছে: "স্বর্গ, তুমি আমার আবাস হও!"'

'চমৎকার!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে পান্নাটা ফেরত দিল জোন্স, ভাবছে এই গহনাটা পাওয়ার জন্য দরকার হলে ওর সবকিছু বিলিয়ে দেবে। 'এবার কি দয়া করে গল্পটা বলবেন আমাকে?'

মাথা নাড়লেন ডন ইগনাশিয়ো। 'আমার পক্ষে সম্ভব না।'

'কিন্তু...' জোন্সের চোখেমুখে বিরক্তি, 'এতকিছু বলার পরে আসল ঘটনা চেপে যাওয়া কি অন্যায় না? নিষ্ঠুরের মতো কাজ না?'

'সিনর, আপনি কি আরেকটু কফি খাবেন?'

মাথা নাড়ল জোন্স।

'তা হলে চলুন ছাদে যাই, একটু হাঁটাহাঁটি করি। নিরেট পাথরে বানানো ছাদগুলো চাঁদের আলোয় দেখতে সুন্দর লাগে। আগেরদিনের সন্ন্যাসীরা গ্রীষ্মকালে রাতের বেলায় ছাদে বসে খাবার খেত। ...আগামীকাল আপনাকে নিয়ে ঘুরতে বের হবো; বিশ বছর ধরে চাষবাস করছি আমি, আমার ক্ষেতখামার দেখাবো। আফসোস, এই মেক্সিকোতে সবাই শুধু খনির পিছনে ছোটে। কেউ বোঝে না, এখানকার অতি-উর্বর জমিই আসল খনি। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম বলেই আমার কাছে আরও যে-ক'টা পান্না ছিল সেগুলো বিক্রি করে দিয়ে এখানে এত জায়গা কিনে নিই। বিশ বছর আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এত ভালো ছিল না, আগেও বলেছি বোধহয়, তবে আস্তে আস্তে সব

ঠিক হয়ে গেছে। আমার জমিদারিও বড় হয়েছে, জমির জন্য যে-পরিশ্রম করেছি আর যে-সময় খরচ করেছি তার উপযুক্ত প্রতিদানও পেয়েছি। ইদানীং নতুন করে কোকো চাষ শুরু করেছি, আশা করছি বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই ভালো ফলন পেয়ে যাবো।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠে ছাদে হাজির হয়ে গেছেন দু'জনে, এমন সময় লম্বা করে দম টেনে বললেন ডন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সিঁড়ি শেষ হয়েছে। আজকাল আর বেশি পরিশ্রম করতে পারি না। যে যা-ই বলুক বয়স তো আর কম হয়নি। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গেলেই কোমর ব্যথা করতে থাকে। ...বাতাসটা বেশ চমৎকার, তা-ই না সিনর? দূরের ওই নদীটার দিকে দেখুন। রূপার মতো চকচক করছে। আহ্, ঈশ্বরের পৃথিবী কতই না সুন্দর! ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায় একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু যখন ভাবি, দুনিয়াতে ভালো কাজ করতে পারলে দুনিয়ার চেয়েও হাজার গুণে সুন্দর আর ভালো জায়গা তৈরি করে রেখেছেন ঈশ্বর আমাদের জন্য, তখন ভালো লাগে। ওই জায়গায় পাপ প্রবেশ করতে পারে না, দুঃখ প্রবেশ করতে পারে না। সেখানে সবার জন্য এত জমি বরাদ্দ যে, মারামারি-কাটাকাটির প্রশ্নই আসে না,' কথা শেষ করে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

এভাবে ডন ইগনাশিয়োর আতিথেয়তায় সাণ্টা ক্রুযে প্রায়ই থাকতে শুরু করল জোন্স। কেটে গেল বেশ কয়েক মাস। ডনের সঙ্গে ওর সম্পর্ক আরও গাঢ় হলো। ওই রাশভারী কিন্তু মিষ্টি-স্বভাবের ইণ্ডিয়ানের দয়ালু মনোভাব দেখে তাঁর প্রতি আরও অনুরক্ত হয়ে পড়ল জোন্স। ডনের মনে কোনো কুচিন্তা নেই; বরং সবসময় তিনি ভাবেন তাঁর জমিদারি আর প্রজাদের নিয়ে—কীভাবে চাষবাসে উন্নতি করা যায়, কীভাবে গরিব লোকগুলোর উপকার করা যায়।

ডন ইগনাশিয়োর সঙ্গে জোন্সের সম্পর্ক যত গভীর হচ্ছে দু'জনে তত বেশি করে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কখনও দেখছেন আশপাশের প্রাচীন কিছু ধ্বংসাবশেষ। কখনও পথশ্রম স্বীকার করে ডন নিজেই হাজির হয়ে যাচ্ছেন লা কন্সেপসন্সে। তাঁদের এই বন্ধুত্বের ফলে খনির মালিকও উপকৃত হলেন। শ্রমিকের অভাবে ধীর গতিতে কাজ চলছিল খনিতে। ডন ইগনাশিয়োর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই অভাব ঘুচে গেল। নিকটবর্তী এক পর্বতে বসবাসকারী এক ইণ্ডিয়ান গোত্রের সর্দারের কাছে লোক পাঠালেন তিনি। এক সপ্তাহের মধ্যে পঞ্চাশজন শক্তসমর্থ ইণ্ডিয়ান হাজির হয়ে গেল খনিতে।

এ-রকম আরও অনেক ঘটনায় ডন ইগনাশিয়োর সঙ্গে জোন্সের বন্ধুত্ব আরও বাড়তে লাগল।

দিন যায়। সপ্তাহ পেরিয়ে মাস হয়, মাস ঘুরে আসে বছর। ডন ইগনাশিয়োর সঙ্গে জোন্সের পরিচয় হওয়ার পর দু'বছর কেটে গেছে। আগের চেয়ে অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছেন ডন ইগনাশিয়ো। ঠিকমতো হাঁটাচলাও করতে পারেন না এখন আর। তাই তাঁর জমিদারির বাইরে আসা একরকম ছেড়েই দিয়েছেন। সারাদিন নিজের বাড়িতে একঘরে শুয়েবসে কাটিয়ে দেন আজকাল।

একদিন সকালে ডন ইগনাশিয়োর পক্ষ থেকে একজন দূত এসে হাজির হলো লা কন্সেপসন্সে। বলল, ওর মনিব পাঠিয়েছেন ওকে। সিনর জোন্সকে বলতে বলেছেন, তিনি মৃত্যুশয্যায়। শেষবারের মতো দেখা করতে চান বন্ধুর সঙ্গে। আরও বলেছেন, জোন্সের যদি কোনোরকম অসুবিধা থাকে তা হলে এত সামান্য একটা ব্যাপারে এতদূর যাওয়ার মতো কষ্ট যেন না-করে। জোন্সের জন্য একটা চিঠিও লিখে দিয়েছেন ডন, তবে শর্ত আছে চিঠিটা শুধু তাঁর মৃত্যুর পরই দিতে হবে জোন্সের হাতে।

বলাই বাহুল্য, কাজ ফেলে ছুট লাগাল জোন্স। সান্টা ক্রুয়ে

পৌঁছে ডন ইগনাশিয়োর বাড়িতে গিয়ে দেখল, ওর বন্ধু সত্যিই শুয়ে আছেন মৃত্যুশয্যায়। পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো অচল হয়ে গেছে ডনের শরীর, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছেন না। খুবই কাহিল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু জ্ঞান আছে। জোন্সকে দেখে ফ্যাকাসে দু'চোখে খুশির দ্যুতি দেখা দিল।

'হয়তো আর কিছুক্ষণ পরই,' খুবই ক্লান্ত গলায় বলতে লাগলেন ডন, 'জীবনের শেষ যাত্রাটা শুরু করতে হবে আমাকে। তবে আমি খুশি। কেন জানেন? অনেকদিন আগে পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছিলাম, সেই ব্যথা প্রায়ই ভোগাত আমাকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো ওই অসহ্য ব্যথা থেকে চিরমুক্তি পাবো। তা ছাড়া আমি মরলে আমার জায়গায় অন্য কেউ এই জমিদারির দায়িত্ব নেবে; জ্ঞানবুদ্ধি, বিবেক-বিবেচনা অথবা চরিত্রের দিক দিয়ে ওই লোক কতখানি উপযুক্ত হবে জানি না, তবে শারীরিক সক্ষমতার দিক দিয়ে যে আমাকে ছাড়িয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই,' নির্নিমেষ দু'চোখে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন জোন্সের দিকে, দুর্বল হাসি হাসছেন।

তাঁর দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে আছে জোন্স, চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারছে না। শেষপর্যন্ত যখন সিদ্ধান্ত নিল কিছু বলবে তখন হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আবারও বলতে লাগলেন ডন, 'সময় নষ্ট করবেন না, বন্ধু। আমাকে বলতে দিন, আর আপনি শুধু শুনে যান। ...পরিচয় হওয়ার প্রথমদিন থেকেই আমার ওই গল্পটা জানার জন্য অনেকবার চেষ্টা করেছেন আপনি। কীভাবে গেলাম ওই স্বর্ণশহরে, কীভাবে দেখা মিলল "হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড"-এর, জেমস স্ট্রিকল্যাণ্ড আর লেডি মায়ার কী হলো সেখানে ইত্যাদি ইত্যাদি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এমন এক দেশে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে যেখানে গেলে হয়তো আবারও দেখা পাবো আমার প্রিয় বন্ধুর।

'আমার এই গল্পটা কখনোই বলতাম না আপনাকে। কিন্তু

আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর কেন যেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের কথা মনে পড়ে গেল, মুখ ফস্কে বলে ফেললাম স্বর্ণশহরের কথা। আপনি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, আমি তখন মুখে তালা দিলাম। আমার ব্যবহারে কষ্ট পেলেন আপনি, হয়তো মনে করলেন আমি স্বার্থপর। কিন্তু কাজটা না-করে আমার কোনো উপায় ছিল না। আসলে একটা শঙ্কা কাজ করছিল মনে। ভেবেছিলাম যদি সব বলে দিই তা হলে হয়তো কাজ উদ্ধার হয়ে গেছে ভেবে আমাকে ভুলে যাবেন আপনি। আপনার কাছে তখন গুরুত্বহীন হয়ে যেতাম আমি। আমরা যখন খোসা ছিঁড়ে কমলা খাই তখন ফেলে-দেয়া খোসার কথা কি মনে রাখি?

'আরও কারণ আছে। কথাগুলো যদি আপনাকে বলতাম তা হলে আমি নিশ্চিত বলার সময় আবেগতাড়িত হয়ে পড়তাম। আমার কথা বিশ্বাস করতেন কি না তাতে তো সন্দেহ আছেই, তার উপর আমাকে ও-রকম আবেগাক্রান্ত অবস্থায় দেখলে হয়তো উপহাস করতেন—ইউয়োপিয়ান, বিশেষ করে ইংরেজদের কাছে এসব আবেগের তেমন কোনো মূল্য নেই। সবচেয়ে বড় কথা, যেদিন সিদ্ধান্ত নিই আপনাকে সব জানাবো সেদিন চিন্তা করে বুঝতে পারি মুখে বললে আসলে তেমন কিছু বলা হবে না। কারণ অনেক ঘটনা হয়তো বাদ যাবে। আবার কোন্ ঘটনা আগে ঘটেছে আর কোন্‌টা পরে, বলতে গেলে তালগোল পাকিয়ে যেতে পারে। আমি আসলে সব কথা বিস্তারিতভাবে যত্নসহকারে জানাতে চেয়েছি। তাই মুখে না-বলে কথাগুলো লিখে ফেলেছি আপনার জন্য। মাত্র দশদিন আগে শেষ করেছি কঠিন কাজটা। শেষ করেছি না-বলে বলা ভালো শেষ করতে বাধ্য হয়েছি। টের পাচ্ছিলাম ক্রমেই দুর্বল থেকে আরও দুর্বল হচ্ছে আমার শরীর। শেষপর্যন্ত পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো হয়ে গেছি। এখন হাত-পা বলতে গেলে নাড়তেও পারি না।

'লিখতে গিয়ে বার বার মনে হয়েছে কেন করছি কাজটা। আমি এমন কেউ না যে, আমার জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, তা যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, বিস্তারিতভাবে জানাতে হবে। তখন মনে পড়েছে আপনার কথা। ভেবেছি কেউ একজন কৌতূহল নিয়ে কিছু একটা জানতে চেয়েছিল আমার কাছে, জানা থাকার পরও বলতে পারিনি। মনে হয়েছে, জ্ঞান অর্জনের খাতিরে কেউ যদি কিছু জানতে চায় তা হলে তাকে না-জানানোটা অন্যায়, বড় রকমের অপরাধ। সে-জন্যই আমি লিখেছি, বন্ধু। জানি আমি নগণ্য এক মানুষ, তারপরও লিখেছি। আমার ঘটনা, পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত ঘটে-যাওয়া হাজার হাজার ঘটনার তুলনায় তেমন কিছু না জানার পরও লিখেছি। এবং লিখতে লিখতেই ঢলে পড়ছি মৃত্যুর কোলে।

'আমার বিছানার পাশে যে-কাবার্ডটা আছে দয়া করে সেটার কাছে যান। খুলুন সেটা। ভিতরে দেখবেন একগাদা কাগজ। ...হ্যাঁ, নিয়ে আসুন আমার কাছে। ...অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। ...হ্যাঁ, সিনর, এই হচ্ছে আমার সেই গল্প। যদি কষ্ট করে পড়তে পারেন তা হলে জানতে পারবেন আমি আর আমার সেই ইংরেজ বন্ধু কীভাবে হাজির হয়েছিলাম সেই স্বর্ণশহরে। কী দেখেছিলাম সেখানে। কত দুঃখদুর্দশা সহ্য করতে হয়েছিল আমাদেরকে। আমার কোনো কোনো বর্ণনা হয়তো অতিরঞ্জিত মনে হবে আপনার। আবার কোনো কোনো বর্ণনা পড়লে মনে করতে পারেন অকারণে লিখেছি। কিন্তু আমার কাছে যা দরকার মনে হয়েছে তা-ই উল্লেখ করেছি। আরেকটা কথা, আমি কিন্তু লেখালেখিতে সিদ্ধহস্ত না; কাজেই আমার ভুলত্রুটি হতেই পারে। তবে যা বলতে চেয়েছি তা মোটামুটি গুছিয়ে লিখতে পেরেছি মনে হয়। আপনার তো কাহিনিটা জানা দরকার, ব্যাকরণ শেখার দরকার নেই, তা-ই না?

'এবার দয়া করে আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে

ফেলুন কাগজগুলো। দেখলেই অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছে, আরও দুর্বল হয়ে পড়ছি আমি। মনে পড়ে যাচ্ছে সেই দিনগুলোর কথা যখন পিঠে ব্যথা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে একভাবে বসে থেকে শুধু লিখেছি আর লিখেছি। তা ছাড়া আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে আপনাকে।'

ডন ইগনাশিয়োর পাণ্ডুলিপিটা একপাশে সরিয়ে রাখল জোন্স। মুমূর্ষু লোকটার কথা শুনতে শুনতে কখন যেন ভুলে গেছে মনের দুঃখ। আবার কী বলতে চান ডন জানার জন্য উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

ডন জিজ্ঞেস করলেন, 'একটা কথা বলুন তো। আপনি কি এই দেশেই থাকবেন, না ফিরে যাবেন ইংল্যাণ্ডে?'

'ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাবো!' যেন আকাশ থেকে পড়ল জোন্স। 'গিয়ে করবো কী? না-খেয়ে মরবো নাকি? আমি একে তো গরিব মানুষ, তার উপর আমাকে দেখভাল করার মতো তেমন কোনো আত্মীয়স্বজনও নেই। সুতরাং ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়ার চেয়ে এখানে থাকাটা আমার জন্য অনেক ভালো।'

'আচ্ছা যদি এমন হয়,' উদাসী গলায় বলছেন ডন, 'অনেক টাকাপয়সার মালিক হয়ে গেলেন আপনি। তখন নিশ্চয়ই ফিরে যাবেন?'

'জানি না। ব্যাপারটা আসলে নির্ভর করছে অনেক কিছুর উপর। কিন্তু অনেক টাকাপয়সার মালিক হতে অনেক বছর সময় লাগবে আমার। ততদিন এখানেই থাকার ইচ্ছা আছে। হয়তো দেখা যাবে শেষবয়সে ফিরে যাবো স্বদেশে। জীবনের শেষ সময়টা সেখানে কাটানোর ইচ্ছা আছে আমার।'

'শুনে ভালো লাগল, বন্ধু। হয়তো একটা কথা শুনে আপনারও ভালো লাগবে। আপনাকে আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছি আমি। আমার মৃত্যুর পর ইচ্ছা করলে খনির চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারেন। কারণ অনেক

টাকাপয়সা আর সহায়সম্পত্তির মালিক হতে যাচ্ছেন আপনি।'

'আমাকে আপনার সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন!' আশ্চর্য হয়ে গেছে জোন্স।

'কেন, অসুবিধা আছে? আমার বউ-বাচ্চা নেই। এত সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়ার মতো উপযুক্ত কোনো লোকও নেই। আপনাকে আমি পছন্দ করি। জানি আপনি ভালো মানুষ, সৎ লোক। সবচেয়ে বড় কথা, আমার বিশ্বাস আমার লোকদের সঙ্গে ন্যায্য আর নরম আচরণ করবেন আপনি। খনিতে যারা আপনার অধীনে কাজ করে তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেন তা দেখেছি। তা ছাড়া উইলে উল্লেখ করিনি এমন কিছু শর্ত আছে আমার। যেমন, যতদিন সম্ভব এখানে থাকতে হবে আপনাকে। যে-কাজ আমি শুরু করেছিলাম কিন্তু শেষ করে যেতে পারিনি তা চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যদি কোনো কারণে এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন তা হলে শুধু একজন পূর্বপরিচিত ইংরেজের কাছে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নেবেন। বলুন, রাজি?'

'রাজি। আপনাকে ধন্যবাদ দেয়ার ভাষা আমার নেই।'

'ধন্যবাদ দেয়ার দরকারও নেই। ধন্যবাদ যদি দিতে হয় তা হলে ঈশ্বরকে দিন। তিনি আপনাকে সৎ ও সুন্দর চরিত্র দিয়েছেন যা দেখে আমার মনে বিশ্বাস জন্মেছে আপনার কাছে সব দিয়ে গেলে ভুল করবো না। এবার যান, খুবই ক্লান্ত বোধ করছি। আগামীকাল সকালে যাজক চলে যাওয়ার পর আবার আসবেন।'

এই ঘটনার তিন দিন পর মারা গেলেন ডন ইগনাশিয়ো। গির্জার পাশে সমাহিত করা হলো তাঁকে।

তারপর একদিন, সবকিছু মোটামুটি গুছিয়ে নিয়ে ডন ইগনাশিয়োর সেই আত্মকথা "হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড" নিয়ে বসল জোন্স।

ওর সঙ্গে একরকম বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে আমার। সে জানে আমি একজন লেখক। এ-ও জানে, দক্ষিণ-আমেরিকার কিছু ভাষা অল্পবিস্তর জানি আমি। ডন ইগনাশিয়োর পাণ্ডুলিপিটা পড়া শেষ করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে সে মাস দু'-এক আগে।

প্রিয় পাঠকদের জন্য সে-কাহিনিরই অনুবাদ উপস্থাপন করছি।

এক

ব্যর্থ অভ্যুত্থান

আমি ডন ইগনাশিয়ো, এই ইতিহাসের লেখক। আমার বয়স বাষট্টি। মেক্সিকোর পিচাওক্যালকো আর টিয়াপা শহরের মাঝখানে যে-পর্বতগুলো আছে সেগুলোর পাদদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গ্রামগুলোর একটাতে জন্মেছি আমি। আমার বাবা ছিলেন ওই এলাকার সর্দার। ইণ্ডিয়ানরা খুব পছন্দ করত তাঁকে।

আমি তখন নেহাৎ এক বালক, বয়স বেশি হলে নয় কি দশ; বেশ বড় একটা সমস্যা দেখা দিল আমাদের দেশে। আমি কখনোই ঠিকমতো বুঝতে পারিনি সমস্যাটা কী, অথবা হয়তো ঠিকমতো মনে নেই আমার। কারণ এ-রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটত ওসব জায়গায়। তবে যতদূর মনে পড়ে, সরকার অন্যায়ভাবে কোনো কর বসাতে চেয়েছিলেন আমাদের উপর, সেই থেকে ঝামেলার শুরু। বাবা ছিলেন লম্বা, বলিষ্ঠদেহী, চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি; তিনি কর দিতে অস্বীকার করলেন। সুতরাং কিছুদিন পর হাজির হলো একদল সৈন্য। গুলি করে অনেক লোক মারল ওরা। ধরে নিয়ে গেল বেশকিছু নারী আর শিশুকে।

বন্দি হলেন বাবা। পরদিন তাঁকে সবার সামনে অপদস্থ করা হলো, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে বাধ্য করা হলো আমার মা আর আমাকে। তাঁর জন্য একটা গর্ত খুঁড়েছিল সৈন্যরা, গর্তটার কিনারায় নিয়ে গিয়ে জোর করে বসিয়ে দেয়া হলো তাঁকে। মাথায় বন্দুক ধরে শুরু হলো জিজ্ঞাসাবাদ। সৈন্যরা হুমকি দিতে লাগল, গোপন যে-

খবরটা জানার জন্য উদ্‌গ্রীব তারা তা না-জানালে গুলি করে মারবে বাবাকে।

এখনও মনে আছে, বাবাকে দেখে মনে হচ্ছিল না মৃত্যুভয় বলে কিছু আছে তাঁর। শান্ত গলায় বললেন, 'চালাও গুলি, দেরি করছ কেন? মশার ঝাঁক ছেঁকে ধরেছে আমাকে, এই যন্ত্রণা আর ভালো লাগছে না।'

কিন্তু বাবাকে মারল না সৈন্যরা। বরং সে-রাতে বন্দি করে রাখা হলো তাঁকে। তাঁর এক চাচাতো ভাই ছিলেন পাদ্রি, তিনি আবার আমার ধর্মপিতা; আমাকে বাবার কাছে নিয়ে গেলেন তিনি।

গিয়ে দেখি নোংরা একটা জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে বাবাকে। এত গরম যে, দম নেয়াও কষ্টকর। অস্থায়ী "জেলখানার" দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মাতলামি করছে কয়েকজন মেক্সিকান সৈন্য।

আমাকে দেখে বলল একজন, 'তোদের দিন শেষ, ইণ্ডিয়ান কুত্তার দল! গুলি করে শেষ করবো তোদের সব ক'টাকে।'

কয়েদখানার ভিতরে ঢুকতে দেয়া হলো বাবার সেই ভাইকে। বাবাকে নিয়ে এককোনায় সরে গেলেন তিনি। তাঁর কাছে পাপ স্বীকার করলেন বাবা। তারপর কী যেন দিলেন তাঁর হাতে। এরপর কাছে ডাকলেন আমাকে, চুমু খেলেন কপালে। আমার ধর্মপিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার হেফাজতে দিয়ে গেলাম জিনিসটা। যত্নসহকারে সংরক্ষণ করবেন আশা করি। উপযুক্ত বয়সে আমার ছেলেই যেন পায় সেটা সে-ব্যবস্থা করবেন। আর কাহিনিটাও যেন জানতে পারে সে।'

কথা শেষ করে আবারও আমাকে চুমু খেলেন বাবা, ঈশ্বরের নামে আশীর্বাদ করলেন। টপ টপ করে অশ্রু পড়তে লাগল তাঁর গাল বেয়ে। এমন সময় আমার ধর্মপিতা আমাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন বাবার সামনে থেকে।

এরপর আর কখনও বাবার দেখা পাইনি আমি। শুনেছি, পরদিন সকালে সৈন্যরা গুলি করে মারে তাঁকে। তাঁর জন্য যে-কবর

খুঁড়েছিল ওরা তার ভিতরে তাঁর লাশ ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এরপর আমাকে আর আমার মাকে ছোট্ট শহর টিয়াপায় নিয়ে যান আমার ধর্মপিতা। সেখানকার গির্জায় যাজকের কাজ করতেন এই ভদ্রলোক। কিন্তু বাবাকে হারিয়ে মা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন; তাঁর স্বাস্থ্যও টিকল না বেশিদিন। কিছুদিনের মধ্যে মারা গেলেন তিনিও।

টিয়াপায় যে-বাড়িতে থাকতাম আমরা সেটা মনে হয় শহরের সবচেয়ে চমৎকার বাড়ি। পাথর দিয়ে বানানো হয়েছিল বাড়িটা, অনতিদূরে সুন্দর একটা খরস্রোতা নদী। নদীর পানি কাচের মতো স্বচ্ছ। বাড়ির জানালায় দাঁড়ালে চোখে পড়ত বড়জোর একশ' ফুট দূরের ওই স্রোতস্বিনী।

টিয়াপা'র ব্যাপারে তেমন কিছু বলার নেই। অধিবাসীদের বেশিরভাগই চোর-বাটপার। কেউ কেউ এত বেশি কুকর্ম করেছে যে, আমার ধর্মপিতা তাদের মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হয়ে পাপস্বীকারের কথা শুনতেও নারাজ। একটা গির্জা ছিল, আগেও বলেছি, সেটার ছাদে চাষ করা হতো নানা জাতের রঙবেরঙের সুন্দর সুন্দর অর্কিড। পথঘাট খুব খারাপ, শুকনো মৌসুম ছাড়া যাতায়াত করা কঠিন।

এই শহরেই বেড়ে উঠছিলাম আমি। ধর্মপিতার কাছে লেখাপড়া শিখছিলাম। তিনি বিদ্বান মানুষ। অনেক কিছু জানেন, অনেক কিছু অনুমান করতে পারেন। যাদের শেখার ইচ্ছা আছে তাদেরকে শেখাতে চান। সুতরাং আমি পরিণত হলাম তাঁর একনিষ্ঠ ভক্তে, প্রথমসারির একজন ছাত্রে। শহরের দুর্বৃত্তদের কবল থেকে আমাকে দূরে দূরে রাখার চেষ্টা করতেন তিনি সবসময়।

ছ'টা বছর কেটে গেল এভাবেই। আমার বয়স তখন পনেরোর মতো হঠাৎ কী খেয়াল জাগল জানি না, যাজক হওয়ার ঝোঁক চেপে বসল মনে। আসলে হয়েছিল কী, এক রোববার বিকেলে বসে আছি টিয়াপা'র গির্জায়। জানালার বাইরে মৃদুমন্দ বাতাসে তখন দোল খাচ্ছে অসংখ্য অর্কিড, তাকিয়ে আছি সেদিকে। কেউ মানত

করেছিল ঈশ্বরের কাছে, সেই মানত পূর্ণ হওয়ায় নিজ খরচে ধর্মীয় ছবি এঁকে দিয়ে গেছে গির্জার দেয়ালে; কখনও কখনও তাকাচ্ছি সেদিকেও। অলসভাবে বসে আছি, এমন সময় আমার সেই ধর্মপিতা নসিহৎ করতে শুরু করলেন।

দু'রাত আগে নৃশংস এক হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে শহরে। তিনজন লোক যাচ্ছিল শহরের মধ্য দিয়ে, সঙ্গে একজনের অল্পবয়সী ছেলে। স্যান ক্রিস্টোবেল থেকে উপকূলের দিকে যাওয়ার পথে টিয়াপায় ঢুকে পড়েছিল ওরা আসলে। আমাদের বাড়ির নিকটবর্তী এক বাড়িতে রাত কাটানোর জন্য যাত্রাবিরতি করে। সঙ্গে ছিল বস্তাভর্তি ডলার—স্যান ক্রিস্টোবেলে মাল বেচে কামাই করেছিল। শহরের কিছু সঙ্করজাতের দুর্বৃত্ত টাকার গন্ধ পেয়ে ডাকাতির মতলব আঁটল।

যে-বাড়িতে ছিল লোকগুলো, রাতের অন্ধকারে দশজন দুর্বৃত্ত ঢুকে পড়ে সে-বাড়িতে। তিন অভিযাত্রী মিলে প্রাণপণে ঠেকানোর চেষ্টা করে ডাকাতদের। কিন্তু এরা নিরস্ত্র, তার উপর সংখ্যায় কম। এদেরকে ভোজালি দিয়ে জবাই করে ফেলে ডাকাতরা। তারপর লুট করে নেয় সব টাকা। ডাকাতি সেরে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় একজনের নজরে পড়ে বিছানার নীচে লুকিয়ে আছে অল্পবয়সী ছেলেটা। ওকে টেনে বের করে আনে ওরা, তারপর অপকর্মের সাক্ষী রাখতে চায় না বলে বিনা-দ্বিধায় খুন করে।

এত বড় অপকর্ম যারা করেছে তাদের সবাইকে চিনত শহরের লোকেরা। তারপরও কাউকে গ্রেপ্তার করা হলো না; কারণ ওরা যত টাকা লুট করেছে তার কিছু অংশ ঘুষ হিসেবে দিয়েছে আইনশৃঙ্খলা "রক্ষাকারী" অফিসারদেরকে।

আমার ধর্মপিতা যখন নসিহৎ করছিলেন তখন এই খুনি ডাকাতদের মধ্যে দু'জন উপস্থিত ছিল গির্জায়। তিনি তখন ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিলেন বাইবেলের একটা বাণী: "তোমরা অন্যায়ভাবে কাউকে খুন কোরো না।" তাঁর কথা শুনে দুই খুনি নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল, বিবেকতাড়িত হয়ে মাথা নিচু করে বের হয়ে গেল গির্জা

থেকে। ধর্মপিতা যখন বললেন ওই নিষ্পাপ বালকের খুনের দায় আমাদের সবাইকে বহন করতে হবে পরকালে, তখন দেখি উপস্থিত লোকদের অনেকেই ভেঙে পড়েছে কান্নায়।

ঘটনাটা উল্লেখ করলাম কারণ সেটা গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল আমাকে। ওই যে অল্পবয়সী ছেলেটা, হয়তো আমারই সমান বয়স ওর। ক'দিন আগেও সে ছিল প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। আর আজ? আজ সে হারিয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে। মৃত্যু কী তা যেন প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করতে পারছি। একদিন আমাকেও মরতে হবে। একদিন আমারও ঠাঁই হবে হয় স্বর্গে নয়তো নরকে। কথাটা মাথায় আসামাত্র আশঙ্কায় কেঁপে উঠলাম—যেন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে যম। ওই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলাম পাদ্রি হবো। সারাজীবন অন্যের ভালো করার চেষ্টা করবো যাতে পরকালে শান্তি পাই। স্বর্গে ঠাঁই পাই বা না-পাই অন্তত নরকবাস যেন এড়াতে পারি।

পরদিন গিয়ে হাজির হলাম আমার ধর্মপিতার কাছে। তাঁকে বললাম আমার ইচ্ছার কথা। মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলেন তিনি। তারপর বললেন, 'তোমার নিয়তিতে যদি থাকে তা হলে অবশ্যই তুমি পাদ্রি হতে পারবে। চেষ্টা করে যাও, বাকিটা তোমার ভাগ্য। সময়ই বলে দেবে সব।'

আরও পাঁচ বছর কেটে গেছে। এই সময়ে আরও শক্তিশালী আর কর্মঠ হয়েছি, অনেক কাজ শিখেছি। আমার ধর্মপিতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থেকে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বইপত্র পড়তে হয়েছে আমাকে। আমার জন্য এমনকী সুদূর স্পেন থেকে বই আনিয়েছেন তিনি।

এসব বইয়ের মধ্যে বেশিরভাগই ইণ্ডিয়ানদের ইতিহাসবিষয়ক। স্প্যানিয়ার্ডরা কেন এল আমাদের দেশে, কীভাবে দখল করল আমাদের দেশটা ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব পড়তে কখনোই খারাপ

লাগে না আমার। বরং যত পড়ি তত উৎসাহ পাই, এই দেশের অভাগা লোকগুলোর জন্য তত বেশি হাহাকার জাগে মনে। ওদের জন্য কিছু একটা করতে ইচ্ছা করে। আমাদের দুঃখদুর্দশা দেখে, আমাদের প্রতি স্প্যানিয়ার্ডদের নিষ্ঠুর আচরণ লক্ষ করে নিজেদেরকে দাস বলে মনে হয়।

কী আশ্চর্য! দেশ আমাদের, দেশের সব প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের। অথচ গুটিকয়েক ভিনদেশী আমাদেরই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শুধু অস্ত্রের জোরে আমাদেরকে পরাধীন করে রেখেছে। নিজদেশে আমরাই পরবাসী হয়ে গেছি। মুক্তমানব হয়েও আমাদের হাতে-পায়ে দাসত্বের অদৃশ্য শিকল!

আমার বিশতম জন্মদিনে, নিজের চেম্বারে আমাকে ডেকে পাঠালেন আমার ধর্মপিতা। ইতোমধ্যে অনেক বয়স হয়েছে তাঁর, দুর্বল হয়ে গেছেন। আমি তাঁর ঘরে যাওয়ার পর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলতে লাগলেন, 'শোনো, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলার জন্য ডেকেছি তোমাকে। আমার সময় মনে হয় শেষ, আর বেশিদিন বাঁচবো না। তোমার শ্রদ্ধেয় পিতা এবং আমার চাচাতো ভাই ও সবচেয়ে ভালো বন্ধুর শেষকথাটা জানিয়ে যেতে চাই তোমাকে। জানো হয়তো, তুমি যখন খুব ছোট তখন সৈন্যরা গুলি করে মেরে ফেলে তাঁকে। কিন্তু এটা জানো কি না জানি না—তিনি যতই সহজসরল জীবন যাপন করুক না কেন, তোমরা আসলে রাজবংশের সন্তান। তোমাদের বংশটা প্রাচীন। তোমার বাবা, তোমার দাদা, তোমার দাদার বাবা এভাবে যেতে যেতে এগারো নম্বরে কে আছেন জানো? শেষ অ্যাযটেক সম্রাট গুয়াটেমক যাকে খুন করেছে স্প্যানিয়ার্ডরা। বেশ কিছু প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ আর বংশলতিকা আছে আমার কাছে, সেগুলো দিয়ে তোমাদের এই বংশানুক্রম প্রমাণ করতে পারবো আমি। ওসব দলিল ভুয়া না, কারণ অনেক গণ্যমান্য ইণ্ডিয়ান সেগুলো সত্যায়িত করে গেছেন।'

'তারমানে...' উত্তেজনায় দম আটকে আসছে আমার।

হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন আমার ধর্মপিতা, আমার মনের কথাটা সম্ভবত পড়তে পেরেছেন। 'হ্যাঁ, ঠিকই ভাবছ। উত্তরাধিকারসূত্রে তুমি মেক্সিকোর সম্রাট। কিন্তু আফসোস! এই দেশটাও এখন আর মেক্সিকানদের না, তোমার সেই উত্তরাধিকারও অনেক জটিল আর বিপজ্জনক একটা বিষয়। এই পৃথিবীতে জোর যার মুল্লুক তার; স্প্যানিয়ার্ডরা প্রথমে অত্যাচার করে পরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে তোমার পূর্বপুরুষ গুয়াটেমককে। তোমার পরিচয় ফাঁস হলে ইণ্ডিয়ানদের কেউ কেউ হয়তো বিশ্বাসই করবে না, কেউ আবার সহজেই মেনে নিয়ে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতে শুরু করবে তোমাকে। কিন্তু আমি সে-প্রসঙ্গে যেতে চাচ্ছি না। মহান গুয়াটেমকের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজত্ব ছাড়া আর যা পাও তুমি সেগুলো নিয়ে কথা বলতে চাই।'

হাঁপিয়ে গেছেন ধর্মপিতা, তাই চুপ করে থেকে দম নিলেন কিছুক্ষণ। আমিও চুপ করে তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে।

'হয়তো মনে আছে তোমার,' কিছুক্ষণ পর বলতে লাগলেন তিনি, 'যেদিন হত্যা করা হলো তোমার বাবাকে তার আগের রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমি। আমার সঙ্গে তুমিও ছিলে। তোমার গলায় একটা কবচ ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন তোমার বাবা। তারপর সেটা খুলে দিয়েছিলেন আমার হাতে। বলেছিলেন তুমি উপযুক্ত বয়সে উপনীত না-হওয়া পর্যন্ত জিনিসটা সামলে রাখতে। এই নাও, আজ তোমার হাতে তোমারই জিনিস ফিরিয়ে দিচ্ছি।' বলতে বলতে আমার একটা হাত টেনে নিলেন তিনি, এতক্ষণ মুঠোর ভিতরে ধরে-রাখা জিনিসটা হস্তান্তর করলেন।

কবচটা এখন আমার হাতে। ভালোমতো দেখতে লাগলাম। হৃৎপিণ্ড আকৃতির একটা পান্নার অর্ধেকটা দিয়ে বানানো হয়েছে। ভালোমতো পলিশ করা হয়নি, তারপরও যথেষ্ট মসৃণ। বাকি অর্ধেকের সঙ্গে যদি জোড়া দেয়া যায় তা হলে ঘুঘুর ডিমের সমান

বড় হবে। খেয়াল করলাম, আসলে হাত থেকে পড়ে গিয়ে অথবা অন্য কোনো কারণে ভেঙে যায়নি পান্নাটা, বরং সুচারু কায়দায় উপর-থেকে-নীচের দিকে কেটে আলাদা করা হয়েছে। যে লোক করেছে কাজটা, নিঃসন্দেহে বলতে হবে তার হাত পাকা; কারণ একটা পান্নাকে যে দু'টুকরো করা হয়েছে বোঝাই যায় না। কায়দা করে একটা চেইন বসানো আছে যাতে গলায় পরা যায়। পান্নাটার গায়ে হায়ারোগ্লিফিক অক্ষরে কী যেন খোদাই করা। একপিঠে দেখা যাচ্ছে একজন মানুষের অস্পষ্ট চেহারা।

'কী এটা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন আমার ধর্মপিতা, 'আমিও ঠিক জানি না। কোনো পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হবে হয়তো। পৌত্তলিক যাদুটোনা থেকে বাঁচার জন্য গলায় পরা হতো সম্ভবত। তোমার বাবা বলে গেছেন, এটা নাকি অ্যাযটেক রাজাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মেক্সিকোর আদিবাসীরা কী বিশ্বাস করে জানো? এই পান্নার আরেকটা টুকরো যেদিন খুঁজে পাওয়া যাবে, যেদিন একসঙ্গে জোড়া দেয়া যাবে টুকরো দুটো, সেদিন নাকি সাদাচামড়ার মানুষদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবে মধ্য-আমেরিকার মানুষরা। সেদিন সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হবেন একজন ইণ্ডিয়ান সম্রাট!'

'অন্য টুকরোটা কোথায়?'

'জানি না। আমার জানার কথাও না। এসব গল্প বিশ্বাস করি না আমি। মূর্তির ছবি খোদাই-করা কোনো পাথরের অলৌকিক কোনো ক্ষমতা থাকতে পারে বলেও বিশ্বাস হয় না আমার। আমি একজন পাদ্রি। তারমানে খ্রিস্টান ধর্মের একনিষ্ঠ বিশ্বাসী এবং প্রচারক। কথাটা জানা ছিল বলেই তোমার বাবা এসব পাথর-টাথরের ব্যাপারে তেমন কিছু বলে যাননি আমাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো এই দেশেও কিছু গোপন সংগঠন ছিল এবং আছে অনেক আগে থেকে; প্রতীক হিসেবে এ-রকম হীরা-চুনি-পান্না ওরাই ব্যবহার করত এবং এখনও করে বলে শুনেছি। সে-রকম কোনো সংগঠনের সদস্য ছিল

তোমার বাপ-দাদা, রক্ষাকবচ হিসেবে এসব পরতেন তাঁরা। তুমিও যদি পরো তা হলে ওই দলের কেউ তোমাকে দেখলে নিঃসন্দেহে দলনেতা হিসেবে মেনে নেবে। তবে যতদূর জানি এসব সংগঠন করে কিংবা তাবিজ-কবচ পরে তোমার বাপ-দাদার কোনো উপকার হয়নি, তোমারও হবে বলে মনে হয় না।'

চুপ করে আছি, আনমনা হয়ে তাকিয়ে আছি পান্নাটার দিকে। বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছি সেটা।

ধর্মপিতা বলে চললেন, 'এই ব্যাপারে আর তেমন কিছু বলার নেই আমার। তবে কয়েকটা চিঠি আছে, সেগুলো দেবো তোমাকে। তোমার বাবা যে-এলাকার সর্দার ছিলেন সে-এলাকার জনৈক ইণ্ডিয়ানের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে চিঠিগুলো। তাঁর হাতে যদি দাও সেগুলো, যদি পান্নাটা দেখাও তাঁকে, আমার মনে হয় যে-রহস্য জানা আছে তাঁর তা তোমাকে বলতে দ্বিধা করবেন না তিনি।' থেমে দম নিতে লাগলেন তিনি, তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছেন হয়তো।

কোনো মন্তব্য না-করে আমিও তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে।

'শোনো ইগনাশিয়ো, তুমি আসলে ধনী ব্যক্তি। কত ধনী আমি নিজেও জানি না। তবে শুনেছি তোমার পূর্বপুরুষেরা বছরের পর বছর ধরে কোনো এক গোপন জায়গায় এই সম্পদ জমিয়েছে। তুমি যদি সেই গুপ্তধনের খোঁজে বের হও, যারা আজও সামলে রেখেছে সেই সম্পদ তারা যদি চিনতে পারে তোমাকে তা হলে আমার বিশ্বাস সব সম্পদ তুলে দেবে তোমার হাতে। মনে রেখো, এই বিপুল সম্পদের কারণেই মরতে হয়েছে তোমার বাপ-দাদাকে—গুজবে বিশ্বাস করে মেক্সিকোর বর্তমান শাসকরা ধরে নিয়ে যায় তাঁদেরকে, তারপর অমানুষিক অত্যাচার চালায় যাতে মুখ খুলতে বাধ্য হন তাঁরা। কিন্তু টুঁ শব্দও করেননি কেউ। তাই রেগে গিয়ে তাঁদেরকে শেষপর্যন্ত মেরেই ফেলে শয়তানের দল। তোমাদের বংশের সেই সম্পদ অজানা কোনো জায়গায় গুপ্ত অবস্থাতেই রয়ে

যায়।'

পান্নাটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মরার আগে আপনাকে কী বলেছিলেন বাবা?'

'যা বলেছিলেন তা আজও হুবহু খেয়াল আছে আমার: "যদি বেঁচে থাকে এবং যদি উপযুক্ত বয়সে উপনীত হয় আমার ছেলে ইগনাশিয়ো তা হলে ওকে বোলো, মহান গুয়াটেমক যে-মুকুট হারিয়েছেন তা ফিরে পাওয়ার ইচ্ছা আজও আছে আমাদের রক্তে। যদি তা না-পারি তা হলে অন্তত যেন অভিশপ্ত স্প্যানিয়ার্ড আর ওদের অনুচরদের তাড়িয়ে দিতে পারি আমাদের মাতৃভূমি থেকে সে-কসম খেয়েছি সবাই। এই দেশে একদিন-না-একদিন একটা ইণ্ডিয়ান প্রজাতন্ত্র গঠন করবোই আমরা। কাজটা করার জন্য চাই প্রচুর টাকা। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই টাকা, অন্যকথায় সোনা জমিয়েছি আমরা একটা গোপন স্থানে। যেদিন উপযুক্ত সময় আসবে সেদিন কাজে লাগবে সে-সব। গুপ্তচর আর বিশ্বাসঘাতকের অভাব নেই এ-দেশে, তাই আমাদের ওই সঞ্চিত সম্পদের ব্যাপারে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে; নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে আমার অনেক সঙ্গীকে, আজ রাতে খুন করা হবে আমাকেও।

'"কিন্তু ওরা আমাকে নিয়ে যা খুশি তা-ই করুক, একটা শব্দও উচ্চারণ করবো না। লুকানো সোনার ব্যাপারে কিছুই বলবো না ওদেরকে। আমার ছেলে যেদিন বড় হবে সেদিন হয়তো অন্য কেউ শাসন করবে মেক্সিকো, অথবা লোকে হয়তো ভুলে যাবে সবকিছু। যেখানে রেখে যাচ্ছি সেখানেই রয়ে যাবে সব সোনা। আমার ছেলেকে বোলো, যে-সম্পদ রেখে গেলাম আমি তা যেন উদ্ধার করে সে। বোলো, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাদাচামড়ার মানুষরূপী যে-পিশাচগুলো আমাদেরকে লুট করেছে ও করছে, খুন করেছে ও করছে এবং দাস বানিয়েছে ও বানাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যেন বিদ্রোহ করে সে।

'"এই ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে ওর জন্য কোনো

দিকনির্দেশনা নেই। নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে যা ভালো মনে করবে সে তা-ই যেন করে। ওর সামনে কোনো আদর্শও নেই। ওর বাপ-দাদারা যা করে গেছে তাতে উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হয়েছে; সাদা শয়তানগুলো আমাদের ঘাড়ে আরও বেশি করে চেপে বসার সুযোগ পেয়েছে। আমাদের পাপ আর পৌত্তলিকতা আমাদেরকে কয়েক যুগ পিছনে টেনে নিয়ে গেছে এবং এখনও সেখানেই পড়ে আছি আমরা।"

'খুন হওয়ার আগে তোমার বাবা এই কথাগুলোই বলে গিয়েছিলেন আমাকে, ইগনাশিয়ো। এখন কি বুঝতে পারছ, তুমি পাদ্রি হতে চাও শুনে কেন বলেছিলাম কিছুদিন ধৈর্য ধরতে? সব শোনার পরও যদি ওই পথেই যেতে চাও, আমি বলবো কোনো অসুবিধা নেই। কারণ তোমার বাবা তোমাকে একটা কর্তব্যের কথা বলে গেছেন, কাজটা বাধ্যতামূলক করে দিয়ে যাননি তোমার জন্য। যা খুশি করার রাস্তা এখনও খোলা আছে তোমার সামনে।'

ধর্মপিতার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললাম, 'বাবার খুনের বদলা না-নেয়া পর্যন্ত আমার পক্ষে পাদ্রি হওয়া সম্ভব বলে মনে হয় না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ লোকটা। 'আমিও তা-ই ভেবেছিলাম। তোমার উপর ওই কবচের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে, ইগনাশিয়ো। তোমার বাপ-দাদা যে-পথে গেছে; স্পষ্ট বুঝতে পারছি তুমিও একই পথে যাবে। ওদের যা পরিণতি হয়েছে, তোমারও একই পরিণতি হওয়ার সম্ভাবনা। ওহ্! মানুষ কেন পাপ-পুণ্যের বিচারের ভার ঈশ্বর আর তাঁর ফেরেশতাদের উপর ছেড়ে দেয় না?'

'কারণ একজন মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচার আরেকজন মানুষকে দিয়েই করান ঈশ্বর,' জবাব দিলাম আমি।

এই ঘটনার সপ্তাহখানেকের মধ্যে কুলির ছদ্মবেশে কয়েকজন

ইণ্ডিয়ান হাজির হলো টিয়াপায়। উদ্দেশ্য, বাবা যে-জায়গায় থাকতেন সেখানে নিয়ে যাবে আমাকে।

বিদায় জানানোর জন্য গিয়ে হাজির হলাম আমার ধর্মপিতার কাছে। কিছুই বলতে পারলেন না তিনি, খাটের এককোনায় বসে কাঁদতে লাগলেন নিঃশব্দে। কান্না চাপতে কষ্ট হচ্ছিল আমারও, তাই দু'-একটা কথা বলে বেরিয়ে এলাম। এরপর আর কখনও দেখা পাইনি তাঁর। শুনেছিলাম মাসখানেকের মধ্যেই তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হন তিনি, এবং কয়েকদিনের মধ্যেই মারা যান।

যা-হোক, শুরু হলো আমাদের যাত্রা। সারি সারি পর্বতের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে-চলা পথ ধরে যাচ্ছি। তৃতীয়দিন হাজির হলাম সঙ্কীর্ণ একটা গিরিপথের মুখে। এই গিরিপথের পিছনে একটা ইণ্ডিয়ান গ্রাম আছে। অ্যান্টোনিয়ো নামের জনৈক ইণ্ডিয়ানের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেল আমার গাইডরা। এই ভদ্রলোককে দেয়ার জন্য একটা চিঠি দিয়েছেন আমার ধর্মপিতা। ভদ্রলোকের বয়স অনেক। গ্রামের সবাই তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করে। আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন ইণ্ডিয়ান সর্দার আছেন, তাঁদের কাছে আমার পরিচয় দিলেন। এই সর্দাররা কেন এসে জড়ো হয়েছেন এখানে জানি না।

অ্যান্টোনিয়োর বাড়িতে গিয়ে ঢুকলাম আমরা। একজন সর্দার তখন কোনো একটা নামে সম্বোধন করলেন আমাকে। শব্দটা আমার কাছে অপরিচিত, তাই ঠিকমতো বুঝলাম না। তিনি আরও বললেন, 'যুবক, তোমার কাছে কোনো "হৃৎপিণ্ড" আছে?'

কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম প্রশ্নটা শুনে। হৃৎপিণ্ড আছে মানে কী? হৃৎপিণ্ড তো সবারই আছে।

বললাম, 'আছে বৈকি!'

আমার জবাব শুনে হেসে ফেললেন সর্দাররা সবাই।

তখন অ্যান্টোনিয়ো এগিয়ে এলেন আমার দিকে। কবচটা পরে আছি গলায়; আমার শার্টের বোতাম খুলে সেটা দেখিয়ে দিলেন সব

সর্দারকে। দেখামাত্র সম্ভ্রম ফুটে উঠল সবার চেহারায়, বাউ করে আমাকে সম্মান জানালেন তাঁরা।

দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়া হলো এরপর। কয়েকজন প্রহরী নিযুক্ত করা হলো বাড়ির চারদিকে। শুরু হলো অনাড়ম্বর একটা অনুষ্ঠান। ইণ্ডিয়ানদের রীতি অনুযায়ী ওই অনুষ্ঠান এতই গোপন যে, আজ এত বছর পরও বিস্তারিতভাবে বলতে পারছি না। শুধু বলে রাখি, আমাদের বংশের অনেক গোপন কথা জানানো হলো আমাকে এবং তারপর আমাকে সর্দারদের সর্দার হিসেবে মেনে নিলেন সবাই। এই দেশের দূরদূরান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা হাজার হাজার ইণ্ডিয়ানের নেতা হয়ে গেলাম আমি।

নেতা হিসেবে শপথ নেয়ার পরদিন আমার বাপ-দাদার রেখে যাওয়া সেই গোপন সম্পদ আমার হাতে তুলে দিলেন অ্যান্টোনিয়ো। বিশাল সেই সম্পদের বিবরণ দিতে গিয়ে আমার এই আত্মকথা দীর্ঘায়িত করার মানে হয় না, তাই শুধু বলছি, বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী ওই সম্পদের মূল্য দশ লক্ষ ডলারের কম না।

বড়লোক হয়ে গেলাম। আমার পকেটে এখন অনেক টাকা। আমার অধীনে অনেক লোক। অ্যান্টোনিয়োর পরামর্শ অনুযায়ী কিছুদিন রয়ে গেলাম ওই গ্রামে। খবর পেয়ে মেক্সিকোর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন দেখা করতে আসছে আমার সঙ্গে, ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই কেটে যাচ্ছে দিনের বেশিরভাগ সময়।

জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করে বসলাম এ-সময়।

যে-গ্রামে থাকি সেখান থেকে তিন মাইল দূরে বাস করে দুই বোন। খানদান ভালো, কিন্তু গরিব। একজন বিধবা। আরেকজন, এককথায় বললে, ডানাকাটা পরী। বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট।

এক রোববার সন্ধ্যায় ঘটনাক্রমে ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছি। গ্রামের বাইরে একটা উৎসব চলছে, তাই বেশিরভাগ

গ্রামবাসী তখন সে-উৎসবে যোগ দিতে গেছে। হঠাৎ শুনি ওই বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে আসছে আর্তচিৎকার।

ঘোড়া থামিয়ে নামলাম আমি। ছুটে গেলাম বাড়ির দরজার দিকে। খোলাই আছে দরজাটা। ভিতরে দেখা যাচ্ছে বিধবা মেয়েটাকে। মরে গেছে, উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। দুই মেক্সিকান ডাকাত ততক্ষণে জাপ্টে ধরেছে ছোট বোনটাকে। রাগে মাথা খারাপ হয়ে গেল আমার। একটানে বের করলাম কোমরে-ঝোলানো ভোজালি। প্রথম ডাকাতটা কিছু করার আগেই একপোচে জবাই করে ফেললাম ওকে। এ-রকম কিছু ঘটতে পারে কল্পনাও করেনি দ্বিতীয় ডাকাতটা, তাই লাফিয়ে সরে গেল পিছনে। দুই হাত তুলে বাধা দেয়ার ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'এ-রকম একটা সস্তা মেয়ের জন্য খুন করবে আমাকে? টাকা ফেললে এ-রকম মেয়ের অভাব হয় না...'

দেরি না-করে খুন করলাম এই লোকটাকেও। তারপর মাথা ঠাণ্ডা হওয়ার পর বুঝতে পারলাম কী করে ফেলেছি। তখন কাউকে কিছু না-জানিয়ে নিজের হাতেই কবর খুঁড়ে দাফন করলাম দুই ডাকাত আর বিধবা মেয়েটাকে। এরপর ওই সুন্দরী মেয়েটার সঙ্গে একটা কথাও না-বলে ফিরে এলাম গ্রামে।

এই ঘটনার কিছুদিন পর ওই মেয়েটা সম্ভবত বাধ্য হয়েই থাকতে চলে এল আমাদের গ্রামে। আমার সঙ্গে প্রতিনিয়ত দেখা হতে লাগল ওর।

সত্যিই, সে দেখতে যেমন সুন্দরী, বুদ্ধিতেও তেমন পাকা। কিছুদিনের মধ্যে আমার মন জয় করে নিল। ওর প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে একদিন বিয়েই করে ফেললাম ওকে। অ্যান্টোনিয়ো এবং অন্য সর্দাররা বার বার মানা করলেন আমাকে, কারও কথাতেই কান দিলাম না। আজ এই কাহিনি লেখার সময় অন্তরের অন্তস্তল থেকে উপলব্ধি করছি, ওই মেয়েকে বিয়ে করার আগে আমার মরণ হলে আমারও যেমন ভালো হতো, অনেক ইণ্ডিয়ানও তেমন অনেক

যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেত।

বলে রাখি, ওই ক'মাস কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকিনি ঘরে। সর্দারদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করেছি, কখনও কখনও সশরীরে হাজির হয়ে ইণ্ডিয়ানদের জীবনযাপন প্রণালী দেখে বুঝতে পেরেছি তাদের ভুলটা কোথায়। সে-কথা তাদেরকে বুঝিয়ে বলেছিও। আমার কথা মনে হয় বুঝতে পেরেছে ওরা। মেক্সিকোর প্রত্যেক প্রদেশের ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে পরিকল্পনা আঁটছি—উপযুক্ত এক দিনে স্প্যানিয়ার্ড আর তাদের জারজ সন্তান স্প্যানিশ-মেক্সিকানদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করবো সবাই মিলে, আবার গঠন করবো অ্যাযটেক সাম্রাজ্য।

পুরো ব্যাপারটাই সম্ভবত পাগলামি। কিন্তু এই পাগলামি মিশে গেছে আমার রক্তের সঙ্গে। আমার পূর্বপুরুষরা এই পাগলামিকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মেনে নিয়ে প্রাণ দিয়ে গেছেন। আমাকেও যদি একই কারণে মরতে হয়, মরবো; পরোয়া করি না।

সবচেয়ে মহান অথচ সবচেয়ে দুর্ভাগা ইণ্ডিয়ান গুয়াটেমক এখন আমার আদর্শ; তাঁর আহ্বান যেন শুনতে পাই দিবানিশি অষ্টপ্রহর। যোজন যোজন দূরে থেকেও স্বাধীনতার ডাক দিয়ে যান তিনি, সেই ডাকে সাড়া দেয়াটা এখন আমার জন্য অবশ্যপালনীয় কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। উপলব্ধি করি, আমার পূর্বপুরুষরা যেসব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন সে-সব ক্ষেত্রে সফল হতেই হবে আমাকে।

বছরের পর বছর ধরে চলল আমার প্রচেষ্টা। ঘুরে বেড়াতে লাগলাম মেক্সিকোর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। আমার পরিচয় জানতে পারল সবাই। আরও অনেক ইণ্ডিয়ান গোত্রের সঙ্গে, তাদের সর্দারদের সঙ্গে পরিচয় হলো আমার। যেখানেই যাই লোকজনকে শোনাই মুক্তির গান। বলি, সুন্দরভাবে বাঁচতে হলে আলস্যের জাল ছিঁড়ে বের হয়ে আসতে হবে সবাইকে। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করতে হবে। দেখে মনে হয় সহজসরল লোকগুলোর মনে ধরছে আমার কথাগুলো। নিজের

টাকা খরচ করে ওদেরকে অস্ত্র কিনে দিই। প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করি। আমার ডাকে সাড়া দেয়ার ব্যাপারে যারা এখনও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে তাদেরকে গোপনে ঘুষ দিই। মোটকথা, আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব করছি যাতে স্বাধীনতার যে-মহাপরিকল্পনা নিয়েছি তা ভেস্তে না-যায়। গাঁটের পয়সা খরচের ব্যাপারে দেশপ্রেমী অনেক ইণ্ডিয়ানও যোগ দিয়েছে আমার সঙ্গে। কেউ আমার হাতে তুলে দেয় বাপ-দাদার লুকানো সোনা, কেউ আবার নিয়ে আসে নগদ টাকা। দেশ ও জনগণের স্বাধীনতার স্বার্থে শেষ কপর্দক পর্যন্ত খরচ করছি আমি।

বছর ঘুরতে না-ঘুরতেই মেক্সিকোর সাধারণ জনগণের কাছে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিতে পরিণত হলাম। বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের আয়োজন করছি, কিন্তু খুবই গোপনে; যতদূর জানি কোনো কানাঘুষা নেই এ-নিয়ে, সরকারের কেউ কিছু জানে না এ-ব্যাপারে। আমাদের প্রস্তুতি শেষ। উপযুক্ত সময় এসে গেছে। এবার ঝাঁপিয়ে পড়ার পালা। সাফল্যের ব্যাপারে আমি শতভাগ নিশ্চিত।

কিন্তু ভাগ্যে লেখা ছিল অন্য কিছু। যে-মেয়ের জীবন বাঁচিয়েছি, যাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছি, যাকে ভালোবেসেছি এবং বিশ্বাস করেছি, সে-ই আমার পিঠে ছুরি মারল।

সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করেছিলাম, মেক্সিকোর তৎকালীন সরকারপ্রধানের বাসায় চাকরানি হিসেবে কাজ করবে সে। আসলে পালন করবে গুপ্তচরের ভূমিকা। কিন্তু কীসের গুপ্তচরগিরি? নজর রাখতে গিয়ে ওই লোকের নজরে পড়ে গেল আমার অতি-সুন্দরী স্ত্রী, দু'জনের মধ্যে কখন যেন মন দেয়া-নেয়াও হয়ে গেল। বাকিটা অনুমান করতে প্রাপ্তবয়স্ক কারও অসুবিধা হওয়ার কথা না।

আমাদের অভ্যুত্থান ঘটতে তখন আর মাত্র দিন সাতেক বাকি। এক রাতে আমি এবং আমার পাঁচ-ছ'জন বিশ্বস্ত অনুচর ধরা পড়লাম

স্প্যানিশ-মেক্সিকানদের হাতে। আমাকে বাদ দিয়ে বললে ওই লোকগুলোই ছিল আমাদের আন্দোলনের বড় বড় নেতা। আমরা কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওদেরকে কোথায় যেন নিয়ে চলে গেল সরকারি-বাহিনির লোকেরা। আর আমাকে হাজির করা হলো সরকারপ্রধানের সামনে, তাঁর কোনো এক বাড়ির নিভৃত কক্ষে।

হাতে পিস্তল নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল লোকটা। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে আমাকে দেখার পর বলতে লাগল, 'বন্ধু, তোমার সব পরিকল্পনা জানতে পেরেছি আমি। বলতে বাধ্য হচ্ছি, বাহবা পাওয়ার মতো একটা কাজ করে ফেলেছ আসলেই। একটা দেশের এত শক্তিশালী একটা সরকারের বিরুদ্ধে এত কিছু করে বসে আছো, অথচ কিছুই টের পেলাম না! অনেক আগে থেকেই জানতাম তোমার পূর্বপুরুষরা রাশি রাশি সোনা লুকিয়ে রেখে গেছেন কোথাও-না-কোথাও, তা-ও হাতিয়ে নিয়েছ কৌশলে। কিন্তু কথায় বলে না—অতি চালাকের গলায় দড়ি? তোমার হয়েছে সেই অবস্থা। যে-মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ে করেছ, যাকে বিশ্বাস করে আমার বাড়িতে পাঠিয়েছ সে-ই সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে। তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা তো করেছেই, তোমাদের সব কথাও বলে দিয়েছে আমাকে। শুধু ওই সোনার স্তূপ কোথায় লুকানো আছে বলতে পারেনি। কারণ কথাটা সম্ভবত জানাওনি তুমি ওকে। তারমানে তুমি বোকা, কিন্তু মহাবোকা না। সে-জন্যই যেচে পড়ে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি তোমাকে। আশা করি আমার প্রস্তাব পায়ে ঠেলবে না।

'অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলে তুমি আর তোমার সাঙ্গপাঙ্গরা, বুঝতেই পারছ তা ভেস্তে গেছে। ধরে নাও, "গোপন সূত্রে" খবর পেয়ে আমরাই তা বানচাল করে দিয়েছি। যেহেতু বিদ্রোহ করার মতো অপরাধ করোনি তুমি তাই তোমাকে বিশেষ বিবেচনায় ক্ষমা করা যেতে পারে। সেই বিবেচনাটা করতে চাচ্ছি আমি। তোমাদের সেই রাশি রাশি সোনা কোথায় লুকানো আছে বলে দাও আমাকে। বিনিময়ে, কথা দিচ্ছি, তোমার সঙ্গীসাথীদের

কপালে যা-ই জুটুক না কেন, তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে—অন্তত প্রাণে মারা হবে না। এবং ভবিষ্যতে আমাদের পক্ষ থেকে কেউ যেন তোমাকে বিরক্ত না-করে সে-ব্যবস্থাও গ্রহণ করবো। যদি আমার কথামতো কাজ না-করো তা হলে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবো তোমাকে এবং রায় কী হবে তা অনুমান করতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে না তোমার। অত্যন্ত নিষ্ঠুর আর যন্ত্রণাদায়ক উপায়ে তোমার মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করা হবে, বলে রাখলাম।'

জানি লাভ হবে না, তারপরও সময় নষ্ট করার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কথা দিলে কী হবে? সাদাচামড়ার অন্য যেসব লোক আছে এই দেশে তারা যদি অন্যকিছু করে বসে?'

'করবে না। কারণ প্রথম কথা, আমি তাদের সর্দার। দ্বিতীয় কথা, এখন পর্যন্ত আমি ছাড়া আর কেউ তেমন কিছু জানে না এ-ব্যাপারে। ওদের কেউ যদি কিছু জানতে পারে তা হলে তোমার লুকানো-সোনার ভাগ দিতে হবে আমাকে এবং আমি তা করতে চাই না। সব সোনা একাই নিতে চাই। কাজেই আমার হাতে সেগুলো তুলে দিয়ে তোমার যেখানে খুশি সেখানে চলে যাও, তারপর মেক্সিকোর সরকারের বিরুদ্ধে যত খুশি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করতে থাকো। আমার কোনো অসুবিধা নেই। ইচ্ছা করলে তোমার স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারো। ওর কাছ থেকে যা পাওয়ার তা পেয়ে গেছি আমি। আর দরকার নেই। এক ফুলের মধু দুই মৌমাছি খেলে মধু'র স্বাদ থাকে না,' খিক খিক করে কিছুক্ষণ হাসল সে। 'হাবার মতো দাঁড়িয়ে না-থেকে সিদ্ধান্ত নাও কী করবে। তোমার জন্য সারারাত অপেক্ষা করতে পারবো না। হাতে পিস্তল নিলে আমার আবার ট্রিগার না-টানা পর্যন্ত আঙুল নিশপিশ করে!'

'আমার সঙ্গীসাথীদের কী হবে?'

আবারও খিক খিক করে হাসল শয়তানটা। 'দু'-চারজন মনে হয় ইতোমধ্যেই মরে গেছে। ...না, না, আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ো না। আমার কোনো দোষ নেই। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

টাইফাস হয়েছিল ওদের সবার। এখানকার জেলখানাগুলো কেমন অস্বাস্থ্যকর জানো নিশ্চয়ই? তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত...' কথা শেষ না-করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে থেমে গেল সে।

'কী?' জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম।

'তুমি যদি তোমার সব সোনা তুলে দাও আমার হাতে তা হলে তোমার আর কোনো সঙ্গীর অন্তত টাইফাস হবে না।'

ভেবে দেখলাম, আমি আসলে নিরুপায়। পূর্বপুরুষের গুপ্তধনের হদিস যদি না-দিই শয়তানটাকে তা হলে সন্দেহ নেই আমাকে খুন করবে সে। বেঁচে থাকলে এবং ভাগ্যে থাকলে আবারও রাশি রাশি সম্পদের সন্ধান পাবো, সে-বিশ্বাস আছে আমার। তা ছাড়া আমিই যদি মরে যাই তা হলে অ্যাযটেক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে-স্বপ্ন দেখেছি তা পূরণ করবে কে? বাবা মরার আগে উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন আমাকে; কিন্তু আমার তো কোনো সন্তান নেই? আমি মরলে আমার সঙ্গীসাথীরাও মরবে, ওদের পরিবারের সদস্যরা মরবে। একজনকেও জীবিত রাখবে না মেক্সিকোর সরকার। হাজার হাজার নিরীহ ইণ্ডিয়ানের রক্তে ভিজে যাবে এই দেশের মাটি। তা ছাড়া সামনে-দাঁড়ানো এই লোকটা লোভী হলেও মনে হয় কথা রাখবে। এত সোনার সন্ধান পেলে আমাকে সত্যিই ছেড়ে দেবে সম্ভবত।

সুতরাং সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, বলা ভালো নিতে বাধ্য হলাম। তৎকালীন সরকারপ্রধান যা চাচ্ছিল তা পেয়ে গেল। ধরা পড়ার দশ দিনের মাথায় আমিও মুক্তি পেয়ে গেলাম।

মুক্তি? সরকারি-বাহিনির সৈন্যরা যখন লাথি মেরে তাড়িয়ে দিল আমাকে তখন বুঝলাম মুক্তি কাকে বলে। বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন ফিরে তাকাচ্ছি, আশঙ্কা হচ্ছে এই বুঝি একাধিক বুলেট ছুটে এসে ঝাঁঝরা করে দিল আমার পিঠ! কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটল না। অ্যান্টোনিয়োর গ্রামে একটা বাড়ি বানিয়েছিলাম নিজের জন্য; সেখানে ফিরে দেখি শুধু গ্রামটা আছে, বাকি প্রায় সবকিছু গুঁড়িয়ে

দেয়া হয়েছে। বাড়িটার ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে টের পেলাম, শুধু ঈশ্বরপ্রদত্ত জীবনটাই আছে আমার, অন্য কিছু নেই। দুঃসময়ের কথা ভেবে এ-বাড়িতে কিছু টাকা জমা করে রেখেছিলাম, সব চুরি হয়ে গেছে। যে-সর্দাররা আমাকে আমার স্বপ্নের-বিপ্লবে সঙ্গ দিয়েছিলেন তাঁদের প্রায় সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। আমার সব আশা শেষ, আমার কোথাও কোনো ভরসা নেই। আর এসবের জন্য দায়ী শুধু একজন নারী—একজন বিশ্বাসঘাতিনী, যাকে আমি বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলাম। চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করেছিলাম।

দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলাম আসলে। নারীজাতটাই কি এ-রকম? তাদেরকে বুকে নিলে পিঠে ছুরি মারে? সোহাগ করলে অতৃপ্তি বাড়ে ফলে পরপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়? অন্ধের মতো বিশ্বাস করলে সে-বিশ্বাসের প্রতিদান হিসেবে নিয়ে আসে চরম সর্বনাশ?

বিমূঢ় হয়ে গেছি আমি। কী করবো বুঝতে পারছি না। মনে মনে ঈশ্বরের কাছে শপথ করলাম, যত সুন্দরী মেয়েই দেখি না কেন, আমার স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আজকের পর থেকে সব মেয়েকেই ঘৃণা করবো। তাদের কারও সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক করবো না বা রাখবো না। তাদের কারও প্রতিই কথা-কাজে-চিন্তায় কখনোই দয়া প্রদর্শন করবো না।

আজ আমার এই আত্মকথা লেখার সময় জোর দিয়ে বলতে পারি, শুধু একটা ব্যতিক্রম বাদে সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি সবসময় এবং অনন্তকাল পালন করার ইচ্ছা আছে।

বন্ধু জোন্স, আপনার মনে হয়তো কৌতূহল জাগতে পারে, আমার সেই বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীর কী হলো। একবাক্যে যদি বলি, জানি না। ওর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধ নিইনি আমি, তারপরও শেষ হয়ে গেছে সে। জেলখানা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বেশ কয়েক সপ্তাহ অসুস্থ ছিলাম; সুস্থ হয়ে উঠছি এমন সময় একদিন হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যায় সে। আমার যে-ক'জন অনুচর তখনও রয়ে গিয়েছিল আমার সঙ্গে, সম্ভবত তাদেরই কেউ অথবা হয়তো

সবাই মিলে ওকে খুন করে ওর লাশ গুম করে ফেলে, প্রতিশোধ নেয় বিশ্বাসঘাতকতার। কিন্তু আসলে কী হয়েছিল তা কোনোদিন জানতে চাইনি আমি। জানার আগ্রহও হয়নি।

যা-হোক, আমার বাড়ির ধ্বংসস্তূপের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর পর প্রায় বিশ বছর ধরে আবারও ঘুরে বেড়াতে লাগলাম দেশের আনাচেকানাচে। পরিণত হলাম একজন পরিব্রাজকে। ইণ্ডিয়ানরা ভালোবাসত আমাকে, শ্রদ্ধা করত; আমার প্রতি ওদের সেই ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ন থাকল। ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাকারীর বদলে আমাকে ডাকতে লাগল ওরা "লর্ড অভ দ্য হার্ট" নামে। টের পেলাম, ক্ষমতাহীন হয়েও কোনো এক ক্ষমতার ছায়া যেন তখনও রয়ে গেছে আমার সঙ্গে। লোকজনকে আবারও সংগঠিত করার চেষ্টা করলাম কয়েকবার, কিন্তু কাজ হলো না। বন্ধুহীন এবং কপর্দকশূন্য কাউকে দিয়ে আর যা-ই হোক বিপ্লব হয় না।

শেষপর্যন্ত অভ্যুত্থানের চিন্তা বাদ দিলাম। বুঝতে পারছি ওসব হবে না। সরকার আগের চেয়ে অনেক সতর্ক হয়ে গেছে। সাধারণ জনগণ উপযুক্ত সর্দার হারিয়ে ধুঁকছে। যারা সর্দার সেজে বসে আছে তাদের মুখেই যত বাহাদুরি, কাজের বেলায় ঠুঁটো জগন্নাথ। সুতরাং নিজের মতো করে জীবন যাপন করতে লাগলাম।

অংশ নিলাম তিনটা বড় বড় যুদ্ধে। যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিলাম, লোকের কাছে আমার সম্মান আরও বাড়ল। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে যুক্ত হতে হলো বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু ভাগ্যদেবী একবারও প্রসন্ন হয়ে তাকালেন না আমার দিকে—আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলো না। শেষপর্যন্ত ভাবতে লাগলাম সব বাদ দিয়ে পাদ্রি হয়ে গেলেই বোধহয় ভালো হয়। কিন্তু ততদিনে অনেক সময় চলে গেছে, দূষিত পৃথিবীর হাজার জঞ্জাল গায়ে মেখে আমি কলঙ্কিত, তা ছাড়া অত পড়াশোনা করার মতো মন-মানসিকতাও নেই। কাজেই সে-চিন্তাও বাদ দিতে হলো।

ফিরে গেলাম অ্যান্টোনিয়োর সেই গ্রামে, যেখানে এককালে খুব শখ করে একটা বাড়ি বানিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুদিন যেতে-না-যেতেই হাঁপিয়ে উঠলাম। কিছুই করার নেই। শুয়ে-বসে থাকা অথবা এদিকে-সেদিকে হেঁটেচলে বেড়ানো ছাড়া আর কোনো কাজ খুঁজে পাই না। গ্রামের বাইরে নাম-কা-ওয়াস্তে কিছু খনি আছে, সেগুলোতে ঢুঁ দিই মাঝেমধ্যে—ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর প্রবাদটা বাস্তবে পরিণত করি।

এভাবে জীবনের নিয়মে জীবন কেটে যাচ্ছিল, এমন সময় পরিচয় হলো, একবাক্যে যদি বলি, আমার গল্পের নায়ক, সিনর জেমস স্ট্রিকল্যাণ্ডের সঙ্গে।

দুই

সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড

মেক্সিকোর তামাউলিপাস প্রদেশে কুমার্ভো নামের এক গ্রাম আছে। জায়গাটা সুন্দর। সারি সারি পর্বতের ঢালে অবস্থিত, পাইনগাছের জঙ্গল দিয়ে এমনভাবে ঢাকা যে, দূর থেকে দেখলে ঠিকমতো চোখে পড়ে না। আমার এক বন্ধু থাকে ওই গ্রামে। সে সম্প্রতি আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে সেখানে এক ইণ্ডিয়ান আছে যার কাছে পার্চমেন্টে লেখা প্রাচীন এক অ্যাযটেক গ্রন্থ আছে। ওই বইটা মূলত চিত্রলিপির সাহায্যে রচনা করা হয়েছে। কিন্তু অতিপ্রাচীন ওই চিত্রলিপির কারণে আমার সেই বন্ধু কিংবা যার কাছে বইটা আছে সে পড়তে পারেনি কিংবা পড়লেও কিছুই বোঝেনি।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বইটা সংরক্ষণ করছে ইণ্ডিয়ানরা;

কোনো বিশেষ কারণ আছে কি না জানি না। লোকে বলে, ওই বইয়ে আসলে খুবই সমৃদ্ধ একটা স্বর্ণখনির বর্ণনা আছে। খনিটা কোথায় আছে জানে না কেউ; সবাই বলে সেটা নাকি স্রেফ উধাও হয়ে গেছে। আসল কথা হচ্ছে, স্প্যানিয়ার্ডরা যখন এসে হাজির হয় এই দেশে, একের পর এক স্বর্ণখনি লুট করতে থাকে, তখন আমার পূর্বপুরুষ মহান গুয়াটেমক বাধ্য হয়ে অচিরেই ওই খনি বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। যারা ওই সময়ে চাকরি করত ওই খনিতে তারা জীবিকার তাগিদে ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, তা ছাড়া তখন দেশের উথালপাথাল অবস্থা, তাই সেভাবে খবর যোগাড় করার চেষ্টাও করেনি কেউ, আর করলেও যতদূর শুনেছি সফল হয়নি। মহান গুয়াটেমকের মৃত্যুর পর (যেসব অভিশপ্ত স্প্যানিয়ার্ড খুন করেছে তাঁকে তাদের আত্মা নরকে যাক!) ওই খনির কাহিনিটা তাই একরকম ভুলেই যায় সবাই।

আমার বাবার বন্ধু সর্দার অ্যান্টোনিয়োর কথা তো আগেই বলেছি। মানুষটা যেমন ভালো, তেমন জ্ঞানী। ঘটনাক্রমে প্রাচীন ও আধুনিক দু'রকম চিত্রলিপি সম্পর্কেই অনেক কিছু জানতেন তিনি। যে-ক'দিন তাঁর সাহচার্য পেয়েছিলাম, কাজের ফাঁকে অন্যান্য অনেক বিষয়ের পাশাপাশি চিত্রলিপি সম্পর্কেও অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন তিনি আমাকে।

গ্রামে অলসভাবে দিন কাটাচ্ছি, এমন সময় আমার সেই বন্ধুর চিঠি পেয়ে ভাবলাম, এই তো কাজের মতো কাজ পাওয়া গেছে! চিত্রলিপিতে লেখা ওই বইটা হাতে পেলে নেহাৎ মন্দ হয় না। কতদূর পাঠোদ্ধার করতে পারবো জানি না, কিন্তু কিছু একটা নিয়ে সময় কাটিয়ে দেয়া যাবে। অন্তত একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে নিঃসন্দেহে। সুতরাং দেরি না-করে রওয়ানা হলাম। পৌঁছে গেলাম কুমার্ভোয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে হতাশই হতে হলো আমাকে।

বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে শুনি, যে-ইণ্ডিয়ানের কথা বলেছিল সে, সে-লোক নাকি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মরে গেছে ওই লোকের একটা ছেলে

আছে, তাকে বলা হলো বিশেষ সেই বইটা খুঁজে নিয়ে আসতে। অনেকক্ষণ খুঁজল ছেলেটা, কিন্তু কোথাও সন্ধান পেল না বইটার।

আরেকটা ব্যাপার জানতে পারলাম তখন। মাস ছয়েক আগে নাকি এক সাদা লোক এসেছিল এই অঞ্চলে। এখানে কিছু পুরনো রূপার-খনি আছে, একটা কোম্পানির হয়ে কিছু কাজ করেছিল সে-সব খনিতে। শেষের দিকে ওই কাজ চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় লোকটার জন্য, কারণ সে তার অধীনস্থ কর্মচারীদের উপযুক্ত বেতন দিত বলে খনির আশপাশের জমির মালিকেরা ওর উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে ইণ্ডিয়ান শ্রমিকদের কাজে আসতে বাধা দিচ্ছিল।

এই এলাকার লোকজনের একটা বদভ্যাসের কথা না-বললেই নয়। এমনিতে এরা হাসিখুশি, নরম স্বভাবের মানুষ; সোমবার সকাল থেকে শুরু করে শনিবার রাত পর্যন্ত গাধার খাটুনি খাটে। কিন্তু বেশিরভাগ লোক শনিবার রাতে একদিকে কাজ শেষ করে আরেকদিকে গিয়ে ঢোকে শুঁড়িখানায়, গলা পর্যন্ত মদ গিলে মাতাল হয়ে যায়। ঘৃতকুমারী গাছের শিকড়ের রস চোলাই করে বানানো হয় মেস্কাল নামের এই মদ, কাজেই নেশাটাও হয় সে-রকম। উন্মত্ত অবস্থায় এই নরম লোকগুলোরই স্বভাব আমূল বদলে যায়, রীতিমতো হিংস্র হয়ে ওঠে ওরা। শুরু হয় ঝগড়া, তারপর মারামারি, শেষে খুনোখুনি।

কুমার্ভোয় যেদিন পা দিয়েছি, ঘটনাক্রমে সেদিনই ঘটে গেল এ-রকম বীভৎস এক ঘটনা। পরদিন সকালে রাস্তায় হাঁটতে বের হয়ে সেই মারামারির ফলাফল চাক্ষুষ করলাম।

খোয়া-বিছানো সরু রাস্তাটার দু'পাশে বেশকিছু সাদা, সমতল-ছাদের বাড়ি। আসলে চুনকাম-করা একটা গির্জায় যাতে নির্বিঘ্নে যেতে পারে গ্রামবাসী সে-কথা ভেবে বানানো হয়েছে রাস্তাটা। গ্রামে পা দিয়েই কিছুক্ষণ পর পরই শুনছি ঘণ্টা বাজানো হচ্ছে গির্জায়—খারাপ আত্মারা যাতে ভয় পেয়ে যেখান থেকে এসেছে সেখানে, মানে নরকে পালিয়ে যায়!

সরু রাস্তাটার প্রায় মাঝখানে, একটা বাড়ির ছায়ায় পড়ে আছে দু'জন মানুষের লাশ। কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হলো আমাকে। ক্রোধে বা আতঙ্কে বিকৃত-হওয়া চেহারার এক সুন্দরী ইণ্ডিয়ান যুবতীকে দেখি একটা লাশের গায়ে কম্বল পেঁচিয়ে দিচ্ছে। আরেকটা লাশ পড়ে আছে নিতান্ত অবহেলায়, দেখার কেউ নেই। ওই বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা লোক। মাথায় আর চেহারায় ক্ষতচিহ্ন। হাতে একটা ভোঁতা কেঁচি নিয়ে এই গ্রামের একমাত্র নাপিত-কাম-ডাক্তার দাঁড়িয়ে আছে লোকটার পিছনে—চুল কাটার চেষ্টা করছে যাতে ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে পারে।

নিঃসন্দেহে ভয়ঙ্কর দৃশ্য। কিন্তু কারও কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হচ্ছে না। পথেঘাটে এ-রকম সাধারণ ইণ্ডিয়ান, যারা পেশায় শ্রমিক আর অবসরে মাতাল, হরহামেশাই মারা যাচ্ছে; সুতরাং কার কী? যে-সময়ের কথা বলছি তখন মেক্সিকোতে সন্ত্রাস খুব সাধারণ ঘটনা, রাস্তাঘাটে লোকের লাশ পাওয়া যেন ডালভাত।

রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে এক কমলাবিক্রেতা বুড়ি, দর কষাকষি করছে জনৈক পথচারীর সঙ্গে। কাছেই চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে একদল বালক, ল্যাসো ছুঁড়ে আটকে ফেলেছে একটা শুয়োরকে, এবার টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। তাড়াহুড়ো করে হাঁটতে গিয়ে লাশটার সঙ্গে এইমাত্র হোঁচট খেল এক তরুণী, ভালোমতো তাকাচ্ছে সে লাশটার দিকে। বোধহয় চিনতে পেরেছে, ওর কোনো বন্ধু হবে সম্ভবত; কারণ বুকে ক্রস করছে সে। তারপর আগের চেয়েও দ্রুতগতিতে চলে গেল মেয়েটা।

গ্রামের নাপিত-কাম-ডাক্তারটাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘটনা কী, সিনর?'

লোকটা বোধহয় আমাকে চিনতে পেরেছে, কারণ আমাদের "ভ্রাতৃসঙ্ঘের" যে-গোপন সংকেত আছে তা দেখাল সে। আমিও একই সংকেত দেখানোর পর বলল, 'ঠিকই ভেবেছিলাম তা হলে। আপনিই তা হলে সেই মহান ডন ইগনাশিয়ো। আপনার আসার কথা

শুনেছি। আপনাকে দেখে খুশি লাগছে। কারণ প্রতি রোববারে লোকজনের ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করতে করতে আমার হাঁপ ধরে গেছে। এবার সম্ভবত এসব মারামারি থামাতে পারবেন আপনি।' কম্বল দিয়ে লাশ পেঁচাচ্ছিল যে-মেয়েটা তার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওই মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়া। সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে সবসময় কেন যে বিপদ থাকে বুঝি না। এর আগেও ওর জন্য একাধিক লোক মরেছে, কাল রাতে আবারও মরল।'

'বুঝলাম। কিন্তু ঘটনাটা তো বললেন না?'

'ঘটনা হচ্ছে,' হাতের কেঁচি দিয়ে সামনে-দাঁড়ানো লোকটার কাঁধে আলতো করে গুঁতো দিল ডাক্তার, 'এই লোকটাকে বিয়ে করার কথা ছিল ওই মেয়ের। কিন্তু মেয়েটার চরিত্র খারাপ, কাল রাতে গিয়ে ফষ্টিনষ্টি শুরু করে ওই কম্বলেমুড়ানো লোকটার সঙ্গে। এদিকে ওর তিন নম্বর প্রেমিক তখন মেস্কাল খেয়ে মাতাল; দুই নম্বর লোকটার জন্য ছুরি নিয়ে অপেক্ষা করছিল এখানে। সুযোগ বুঝে শেষ করে দিয়েছে দুই নম্বরকে। ওই লোক আবার এই হতচ্ছাড়ার মায়ের পেটের ভাই। বুঝুন অবস্থা! এক মেয়ের জন্য দুই ভাই পাগল! তো, ভাইকে মরতে দেখে দরদ উথলে উঠল এই হাবাটার, গিয়ে শেষ করে দিল খুনিটাকে। কিন্তু শেষ করার আগে নিজে মার খেয়ে আধমরা হলো।'

সব শুনে রাগ হলো আমার। এবং সব রাগ গিয়ে পড়ল ওই সুন্দরী মেয়েটার উপর। হনহন করে হেঁটে গিয়ে হাজির হলাম ওর সামনে। উঁচু গলায় বললাম, 'ছি! তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, বেহায়া মেয়ে কোথাকার! তোমার জন্য লোকগুলো মরল।'

'লজ্জা?' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা, কোমরে হাত রেখে মারমুখো ভঙ্গিতে ঘুরল আমার দিকে। 'কীসের লজ্জা, শুনি? আমি সুন্দরী, সে-দোষ কি আমার? আমার জন্য লোকে মারামারি করে মরে, সে-অপরাধ কি আমার? আমি ওদেরকে লড়তে বলেছি, না মরতে বলেছি? তা ছাড়া আমাকে এসব জিজ্ঞেস করার তুমিই বা

কে?'

'বোকা!' নাপিত-কাম-ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠল, 'ছুকরি তুই জানিস কার সাথে কথা বলছিস? লর্ড অভ দ্য হার্টকে চিনতে পারছিস না?'

চমকে উঠল মেয়েটা। কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'চিনতে পারলেই বা কী? আমি কি তাঁর ক্রীতদাসী নাকি?'

রাগে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। 'শোনো, মেয়ে! তোমার জন্য এর আগেও একাধিক লোক মরেছে!'

'জানলেন কীভাবে?' সমান তেজে চেঁচাল মেয়েটা। 'ও, ভুলেই গিয়েছিলাম আপনি তো আবার লর্ড অভ দ্য হার্ট। আপনার তো সবার গোপন খবর জানার শয়তানি উপায় আছে। তা-ই না?'

'শয়তানি উপায় থাকলে তোমার আছে, আমার না,' নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছে আমার। 'বেশিরভাগ মেয়ে যা, তুমিও ঠিক তা-ই। এবার শোনো, এই গ্রাম ছেড়ে এখনই চলে যাবে তুমি, আর কোনোদিন যেন এখানে না-দেখি তোমাকে। যদি দেখি তা হলে স্রেফ মরবে, বলে রাখলাম। আরও শুনে রাখো, তোমার কারণে যদি আর একটা লোকও মরে, তুমি যেখানেই যাও না কেন তোমাকে খুঁজে বের করে নিজের হাতে খুন করবো।'

'আপনি যে-ই হোন, সরকার না। আমাকে খুন করার অধিকার নেই আপনার,' দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে মেয়েটা, ভয় গোপন করতে চাচ্ছে।

'না, আমি সরকার না। কিন্তু ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে আমি সরকারের চেয়েও বেশি ক্ষমতাশালী। যদি বিশ্বাস না-হয়, ওই ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখো। জানতে পারবে কেন আমাকে দেখামাত্র সম্মান করতে হবে, কেন আমার সঙ্গে পূর্বপরিচয় না-থাকলেও আমার কথা শুনতে হবে। আমি যদি এই মুহূর্তে কাউকে ডেকে বলি তোমাকে হত্যা করতে, কারণ জিজ্ঞেস না-করে সঙ্গে সঙ্গে কাজটা করবে সে। আমি যদি এই মুহূর্তে অভিশাপ দিই তোমাকে, জেনে রাখো আজ হোক বা কাল সেই অভিশাপ নামবেই তোমার উপর।'

'কীসের অভিশাপ?' গলা কাঁপছে মেয়েটার।

'হয়তো কোনো এক পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে মরবে তুমি। অথবা হঠাৎ আক্রান্ত হবে কালাজ্বরে। অথবা নদী পার হতে গিয়ে ডুবে মরবে।'

এবার রীতিমতো কাঁপছে মেয়েটা, বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। একটু পর আমাকে শুনিয়ে নিচুকণ্ঠে বলল, 'এবারের মতো আমাকে ক্ষমা করে দিন লর্ড, ঈশ্বরের দোহাই। বিশ্বাস করুন এ-রকম কিছু করতে চাইনি আমি। কিন্তু একাধিক পুরুষ যখন তাদের হৃদয় মাত্র একজন নারীর হাতে তুলে দেয় তখন, ভেবে দেখুন, বাধ্য হয়ে ওই মেয়েকে কারও-না-কারও হৃদয় ভাঙতেই হবে, তা-ই না? আর যদি ওই মেয়ে পুরুষ জাতটাকেই ঘৃণা করে তা হলে তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই লোকটাকে,' কম্বল দিয়ে যে-লোকের লাশ পেঁচিয়েছে, ঝুঁকে পড়ে তার গাল আলতো করে স্পর্শ করল সে, 'আসলেই বিয়ে করতে চেয়েছিলাম আমি। আর যার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল আমার তাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতাম। শয়তানটা গুলি খেয়ে মরলে ভালো হতো। তা না-হলে ওকে নিজের হাতে বিষ খাইয়ে মারতাম!'

'কাউকে বিষ খাইয়ে মারতে হবে না তোমার। ওই লোকটার যা অবস্থা, সে বাঁচবে কি না সন্দেহ আছে। এবার যাও, দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে। আর মনে রেখো আমার কথাগুলো।'

প্রেমিকের কপালে চুমু খেল মেয়েটা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যদি সম্ভব হয় আমাকে ক্ষমা করে দেবেন, লর্ড। আমি আপনার দাসীর দাসী!' ঘুরে চলে গেল সে।

এরপর ওকে আর কোনোদিন দেখা যায়নি গ্রামে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। মদ কীভাবে মুহূর্তের মধ্যে বদলে দেয় একটা মানুষকে! একজন ভালোমানুষ নেশার ঘোরে কীভাবে রক্তপিপাসু হয়ে ওঠে! সামান্য একটা নারীর জন্য তিন তিনটা লোক এভাবে মারামারি করতে

পারল? কী করছে, কেন করছে সে-হুঁশটুকুও থাকল না কারও?

মনে মনে ভাবলাম, এই অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত লোকগুলোকে দোষ দিয়ে লাভ কী? আমিও কি এককালে নারীপ্রেমে অন্ধ হইনি? আমিও কি রূপের-সুরায় মাতাল হইনি? এদের উন্মত্ততায় মারা গেছে গুটিকয়েক লোক, আর আমার নির্বুদ্ধিতায় মরেছে ক'জন? এরা কী হারাচ্ছে? আর আমি ও আমার দেশের জনগণ কী হারিয়েছি?

মাথা নত করে ঘুরে চলে যাচ্ছিলাম, এমন সময় চমকে উঠে থমকে দাঁড়াতে হলো। মাথা তুলে দেখি, সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। এমন অদ্ভুত কিসিমের কাউকে আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না। আমার ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

ভদ্রলোক বিদেশি, মানে সাদাচামড়ার। স্প্যানিয়ার্ড না। মনে হয় ইংরেজ। সুদর্শন। বয়স ত্রিশের কিছু বেশি। তেমন লম্বা না। বরং চওড়া শরীরের কারণে উচ্চতা কম মনে হয়। কিন্তু হাত-পা বিসদৃশভাবে অমাংসল, সরু সরু। দুই চোখ সমুদ্রের পানির মতো নীল, ভাসা ভাসা; বালকের মতো হাসিখুশি। মৃত ইণ্ডিয়ানের প্রতি সম্মান দেখাতে হ্যাট খুলে হাতে নিয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে মিমোসা ফুলের মতো হলুদ কোঁকড়ানো চুল। জুলফির কাছটা রোদে পুড়ে বেশ গাঢ় রঙ ধারণ করেছে। পরনের শার্টের গলার কাছটা সম্ভবত গরমের কারণে খোলা; দেখা যাচ্ছে দুধের মতো ফর্সা চামড়া। চাহনি চঞ্চল। ঠোঁটের কোনায় সদাপ্রশান্ত হাসি।

তাঁকে প্রথমবার দেখে মার্বেলের দেয়ালে খোদাই-করা প্রাচীন কোনো গ্রিক দেবতার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল আমার, আজও খেয়াল আছে।

'পার্ডন, সিনর,' আমাকে বাউ করে খাসা স্প্যানিশে বলল সে, 'না জেনেশুনেই ওই সুন্দরী মেয়েটার সঙ্গে আপনার কথোপকথনের কিছু অংশ শুনে ফেলেছি। একটা ব্যাপার বুঝলাম না। আপনি

এখানে একজন আগন্তুক। তা হলে ওই মেয়ের উপর আপনার এত ক্ষমতা কীসের? অবশ্য, আপনি কিছু বলার আগে স্বীকার করে নিচ্ছি, আপনাকে প্রশ্ন করার কোনো অধিকার আমার নেই। কিন্তু এই গ্রামে খুনোখুনি এত বেড়ে গেছে যে, কীভাবে এসব বন্ধ করা যায় তা জানা দরকার আমার। যে দু'জন লাশ হয়ে পড়ে আছে এখানে, দুর্ভাগ্যক্রমে তারা আমার খনির সবচেয়ে ভালো শ্রমিক ছিল। এখন এদের বদলে এদের মতো দক্ষ লোক কোথায় পাবো বুঝতে পারছি না।'

ভদ্রলোক বাউ করেছেন, তাই আমিও বাউ করলাম। 'আপনার প্রশ্নের জবাবে বলছি, সিনর, সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারবো না আপনাকে। শুধু বলে রাখি, ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে বিশেষ একটা মর্যাদা আছে আমার। বিশেষ একটা কারণে ওরা মান্য করে আমাকে, অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। আমার কোনো কথা শুনে যদি খারাপ লেগে থাকে আপনার তা হলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কারণ যে-পদমর্যাদা আছে আমার তা এদেশের সরকার বা সরকারী কোনো কর্মকর্তা আবার সুনজরে দেখেন না।'

মিষ্টি করে হাসল লোকটা। 'আমি সরকার না, সরকারী কর্মকর্তাও না। আমার নাম জেমস স্ট্রিকল্যাণ্ড, কাছেপিঠের এক খনির...কী বলবো...ম্যানেজার বলতে পারেন। তা ছাড়া আপনি যা যা বলেছেন ওই মেয়েকে তার বেশিরভাগ ইতোমধ্যে ভুলেও গেছি। ঠিক আছে, আজকের মতো বিদায়। সময় কাটানোর জন্য এই জায়গা খুব একটা সুবিধার না,' মাথায় হ্যাট চাপিয়ে চলে গেল সে।

বেশ কয়েকদিন হলো কুমার্ভোতে আছি। আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। স্রেফ উধাও হয়ে গেছে ওই প্রাচীন চিত্রলিপি। তারপরও রয়ে গেছি এখানে—আশা, আজ না-হোক কাল খুঁজে পাওয়া যাবে বইটা। এই আশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরেকটা

ছোট্ট খায়েশ। কেন যেন ওই ইংরেজ লোকটার সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছা করছে।

সুযোগ পেতে খুব বেশি দেরি হলো না।

একদিন জানতে পারলাম, এই এলাকায় যেসব মেক্সিকানের বাস তাদের বেশিরভাগই ওই ইংরেজ লোকটাকে ঈর্ষা করে। ওর অধীনে যে-ক'জন নাখোশ মাইনার আছে তাদের সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করে ওকে খুন করার পরিকল্পনা করেছে ওরা। গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে, সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের বাড়িতে নাকি অনেক ধনরত্ন লুকানো আছে; যে বা যারা ওকে খুন করতে পারবে তাদেরকে দিয়ে দেয়া হবে সব সম্পদ।

আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের এক সদস্যের মাধ্যমে ওই জঘন্য পরিকল্পনাটার ব্যাপারে জানতে পারলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলাম, যেভাবেই হোক নস্যাৎ করবো এই পরিকল্পনা। যোগাড় করে ফেললাম বিশজন সাহসী আর বিশ্বস্ত লোক। ওদের হাতে তুলে দিলাম বন্দুক। বললাম শুধু আমার কথামতো কাজ করে যেতে এবং আমি যতক্ষণ কিছু না-বলবো ততক্ষণ কারও কাছে, অন্তত ওই ইংরেজটার কাছে মুখ না-খুলতে। আমি চাচ্ছি না অন্তত এই মুহূর্তে কিছু জানতে পারুক লোকটা।

দুর্বৃত্তদের পরিকল্পনা ছিল ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের বাড়িতে হামলা করবে। সেখানে মাত্র চার কি পাঁচজন চাকর নিয়ে থাকেন তিনি। কোনো বাছবিচার নেই, যাকে হাতের সামনে পাবে তাকেই গুলি করে মারবে দুর্বৃত্তরা যাতে পরে ডাকাতি করতে কোনো অসুবিধা না-হয়।

রাত একটার দিকে সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের বাড়ির কাছে গিয়ে হাজির হলাম আমি। দু'-তিনজনের ছোট ছোট দলে ভাগ করে ফেললাম আমার লোকদেরকে। সবাইকে বললাম, বাড়ির খাটো সীমানাপ্রাচীর এড়িয়ে পিছনদিকের পাহাড়ের ঢালে গিয়ে চড়তে। তারপর ওরা পরিস্থিতি বুঝে চুপিসারে নেমে এসে অবস্থান নেমে

বাড়ির পিছনদিকের বাগানে। সুবিধাজনক জায়গায় লুকিয়ে থাকবে সবাই। আমি কিছু না-বলা পর্যন্ত আগ বাড়িয়ে বাহাদুরি করবে না।

ঘণ্টাখানেক পর ওদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলাম আমি। ইতোমধ্যে ভালোমতো দেখে নিয়েছি আমাদের অবস্থান ফাঁস হয়ে গেছে কি না হামলাকারীদের গুপ্তচরদের কাছে। সে-রকম কিছু মনে হয়নি আমার। একটানা বৃষ্টি পড়ছে। রাতটাও আলকাতরার মতো কালো। বাগানে গিয়ে ঢুকলাম, হাজির হলাম আমার লোকদের কাছে। রাস্তা দিয়ে এই বাড়িতে ঢোকার প্রবেশপথের কাছে নিচু একটা দেয়াল আছে, কয়েকজনকে নিয়ে অবস্থান নিলাম সেখানে। আমার ধারণা, হামলাকারীরা এদিক দিয়েই আসবে; তখন আমরা অতর্কিতে আক্রমণ চালাতে পারবো ওদের উপর। যে-ক'জন রয়ে গেছে আগের জায়গায় তাদেরকে সতর্কতাবশত রেখে এসেছি সেখানে—কেউ যদি পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নেমে এসে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে তা হলে তাকে প্রতিহত করবে ওরা।

একভাবে পড়ে থেকে অপেক্ষা করছি আমরা। অন্ধকার আস্তে আস্তে ফিকে হচ্ছে। মোরগ ডাকতে শুরু করেছে। পুবাকাশের এককোণে কেউ যেন তুলি দিয়ে ধূসর একটা দাগ গিয়ে গেছে।

নীচে, গ্রামের দিক থেকে অস্পষ্ট কিছু শব্দ শোনা যাচ্ছে। কারা যেন চুপিসারে উঠে আসছে রাস্তাটা ধরে। আলো বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে, আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে লোকগুলোকে। সংখ্যায় পঞ্চাশ কিংবা তার কিছু বেশি হবে। জেমস স্ট্রিকল্যাণ্ডকে এতই ভয় পায় ওরা যে, যতজনকে পেরেছে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। শুধু তা-ই না, ঠাণ্ডামাথায় খুনের অপরাধ নিজের ঘাড়ে নিতে রাজি না কেউই, তাই সোনাদানার লোভ দেখিয়ে প্রতিবেশীদেরও জুটিয়েছে সঙ্গে।

আমার পাশের লোকটা এমন সময় নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল আমাকে, 'ইংরেজ লোকটাকে কি এখনও জাগাবেন না আপনি? বলবেন না এত বড় বিপদের কথা?'

'না,' জবাব দিলাম, 'সব মিটমাট হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে জাগানোর এবং সবকিছু জানানোর জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। আমি না-বলা পর্যন্ত তোমাদের কেউ যেন গুলি না-করে।'

আগেই বলেছি এলাকাটা পাহাড়ি, তাই রাস্তাটা কোথাও উঁচু কোথাও নিচু। নীচের ঢালেই অপেক্ষা করছে নির্লজ্জ ডাকাতের দল। ভোরের আলো আরও ভালোভাবে ফোটার অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ পর ধীরগতিতে এগিয়ে আসতে শুরু করল দরজার দিকে। ওদেরকে দেখে সন্ন্যাসীদের মিছিলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। সারারাত বৃষ্টি হয়েছে বলে আবহাওয়া ঠাণ্ডা; সেই ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য ওদের প্রায় সবাই কম্বল মুড়ি দিয়ে আছে, কম্বলের একপ্রান্ত দিয়ে ঢেকে রেখেছে মাথা আর কান। বেশিরভাগের কাছে রাইফেল। কারও কারও হাতের নগ্ন ভোজালি চকচক করছে ভোরের প্রথম আলোয়।

বাড়ির সদর-দরজা থেকে দশ কদম দূরে এসে এক মিনিটের জন্য থামল ওরা। সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেরে নিল। স্পষ্ট শুনতে পেলাম, ওদের নেতা জনৈক মেক্সিকান বলছে, 'তোমরা বিশ-পঁচিশজন থাকো আমার সঙ্গে। বাকিরা এগিয়ে গিয়ে চড়ো ওই পাহাড়ের ঢালে। এই বাড়ি থেকে পালানোর রাস্তা বন্ধ করে দেবে। আমরা হামলা করলে যাতে একজনও বাঁচতে না-পারে।'

আর দেরি করার মানে হয় না, তাই আগে থেকেই ঠিক করে রাখা উপায়ে প্রলম্বিত শিস বাজালাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে নিজের রাইফেল তাক করলাম ডাকাত সর্দারের বুক বরাবার।

আমার দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বাতাস বের হয়েছে কি হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পক্ষ থেকে গর্জে উঠল বিশটার মতো রাইফেল। পনেরো-ষোলোজন ডাকাত তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

হতবুদ্ধি হয়ে গেছে ডাকাতের দল। এই ঘটনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না ওরা। মাত্র একটা মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো

জান বাঁচাতে পালাবে ওরা। কিন্তু যা ভাবলাম ঘটল তার উল্টো। ডাকাতেরা বুঝে গেছে যারাই গুলি চালিয়ে থাকুক ওদের উপর তারা দেখে ফেলেছে ওদেরকে। সুতরাং এখন পালানো না-পালানো সমান কথা। বীভৎস রণহুঙ্কার ছাড়ল ওদের নেতা, সমস্বরে সাড়া দিল বাকিরা। আমাদের অবস্থান জেনে গেছে ওরা, তাই গুলি করতে করতে এগিয়ে আসছে দেয়ালের দিকে। খাটো দেয়ালের উপর একলাফে চড়ে বসতে অসুবিধা হলো না কারোরই।

রাইফেল ফেলে দিয়ে পিস্তল টেনে নিলাম আমরা। যাদের কাছে পিস্তল নেই তারা বের করেছে চকচকে ভোজালি। ডাকাতেরা বুঝে গেছে ওরা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশি। কাজেই শুরু হলো নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। আমার দলের যে-ক'জনকে পাহাড়ের ঢালে অবস্থান নিতে বলেছিলাম তারা খুব কাজে লাগল এমন সময়। দূর থেকে রাইফেলের অব্যর্থ নিশানায় একের পর এক ডাকাতকে ঘায়েল করছে ওরা, অথচ যেহেতু আমাদেরকেই একমাত্র শত্রু ভেবে নিয়েছে ডাকাতরা সেহেতু নিরাপদে রয়ে গেছে ওরা। গুলি করতে করতে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে ঢালের ওই লোকগুলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই সংখ্যায় আরও শক্তিশালী হবো আমরা।

যেমন হঠাৎ করেই শুরু হয়েছিল তেমন হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল এই খণ্ডযুদ্ধ। খাটো সীমানাপ্রাচীর ডিঙাতে গিয়ে অথবা সদর-দরজা ভাঙতে গিয়ে মরেছে বেশিরভাগ ডাকাত। চোদ্দজন পালিয়েছে। (এরা সবাই পরে ধরা পড়েছিল।)

মৃত ডাকাতদের কেউ পড়ে আছে রাস্তায়, কেউ বাগানের ফুলগাছের নীচে অথবা সব্জিবাগানের কোনায়। বারুদপোড়া ধোঁয়া পাতলা হতে শুরু করেছে। এমন সময় দেখি ওই ইংরেজ ভদ্রলোক হাই তুলতে তুলতে বের হয়ে আসছেন বাইরে! পরনে সাদা একটা পোশাক, এক হাতে একটা পিস্তল।

'এত আওয়াজ কীসের?' চোখ কচলাতে কচলাতে জিজ্ঞেস

করলেন তিনি। 'আমার বাগানে এসব কী শুরু করেছ তোমরা? ভাগো এখান থেকে, না-হলে গুলি করে মারবো সব ক'টাকে!'

এগিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম আমি। বাউ করে বললাম, 'আপনার ঘুম ভাঙানোর জন্য ক্ষমা করবেন সিনর। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আওয়াজ না-করে উপায় ছিল না। আপনাকে আমার কম্বলটা দেবো, সিনর? বাতাস ঠাণ্ডা, এত পাতলা কাপড়ে বাইরে থাকলে আপনার সর্দি লেগে যেতে পারে।'

'ধন্যবাদ,' আমার কম্বলটা নিতে নিতে বললেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। 'কিন্তু ব্যাপার কী? এই সাতসকালে কোত্থেকে হাজির হয়েছেন আপনি? আমার বাগানটা হঠাৎ করেই এ-রকম রণক্ষেত্রে পরিণত হলো কেন? আর এতগুলো লোকই বা মরে পড়ে আছে কোন্ কারণে?'

ঘটনা খুলে বললাম তাঁকে। কিন্তু আশ্চর্য! আমার কথা শুনে বিস্মিত হওয়ার বদলে দেখি রাগে কালো হয়ে যাচ্ছে সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের চেহারা!

'আমার জীবন বাঁচানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ,' ভোঁতা গলায় বললেন তিনি। 'কিন্তু আমার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে আপনার উপর। কেন জানেন? আমার বাড়িতে এসে আমার শত্রুদেরকে ঘায়েল করলেন, কিন্তু কিছুই জানতে দিলেন না আমাকে? কী মনে হয় আপনার—আমি একটা বাচ্চা মেয়ে? আমাকে বললে আমি আপনার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়তে পারতাম না?' হঠাৎ করেই হাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি। তারপর আমাকে চমকে দিয়ে আমার হাত ধরে ঝাঁকাতে শুরু করলেন।

সেদিন বিকেলে সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের পক্ষ থেকে হঠাৎই এক লোক এসে হাজির হলো আমার কাছে। জানাল, সব ঝামেলা মিটে গেছে। বাড়িটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে ফেলা হয়েছে ইতোমধ্যে। আজ রাতে আমি যদি সিনরের সঙ্গে ডিনার করি তা হলে তিনি নাকি

সম্মানিত বোধ করবেন।

প্রস্তাবটা গ্রহণ করলাম।

ডিনারের পর ধূমপান করছি, স্বাভাবিকভাবেই সকালের সেই লড়াইটা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো আমাদের মধ্যে। একপর্যায়ে সিনর বললেন, 'ডন ইগনাশিয়ো, আমার জীবন বাঁচানোর জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম আজীবন। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। আপনার কাছে আমি এক ভিনদেশী আগন্তুক ছাড়া আর কিছুই না। তা হলে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমার জীবন বাঁচাতে গেলেন কেন?'

'কারণ আপনাকে কেন যেন প্রথম দেখাতেই পছন্দ হয়ে গেছে আমার,' জবাব দিলাম। 'তারচেয়েও বড় কারণ, আমি সবসময় দুর্নীতির বিরুদ্ধে। একজন ইণ্ডিয়ান হিসেবে সাদাচামড়ার লোকদের খুব একটা পছন্দ করি না আমি—আশা করি কারণটা জানা আছে আপনার। কিন্তু এ-ও চাই না, আমার দেশের লোকেরা অকারণে হামলা করুক আপনাদের উপর। আজ সকালে যারা আক্রমণ করতে এসেছিল তারা স্রেফ ডাকাতি আর খুনের উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। একজন বীর ইণ্ডিয়ানের পক্ষে এই কাজ শোভা পায় না। তা ছাড়া ওই লোকগুলোকে অল্পবিস্তর চিনি আমি, জানি ওরা এমনিতেও খারাপ প্রকৃতির। তাই ওদেরকে বাধা দেয়াটা কর্তব্য বলে মনে হয়েছে। আজ যারা মরেছে আপনার বাগানে তারা কতখানি খারাপ হয়তো জানেন না আপনি। আইনবিরোধী কাজে ওদের কোনো লজ্জা ছিল না। তুচ্ছ কারণে মানুষ খুন করাকে ওরা বীরত্বের কাজ বলে মনে করত। আপনি যদি ওদের কারও হাতে মাত্র পাঁচটা ডলার ধরিয়ে দিয়ে বলতেন অমুকের কাটা-মাথা চাই তা হলে দেখতেন দু'-একদিন পর ঠিকই ওই লোকের মাথা হাজির হয়ে গেছে আপনার সামনে। হয়তো জিজ্ঞেস করবেন এত লোক থাকতে আপনার পিছনে লাগতে গেল কেন ওরা। কারণ আপনার কয়েকজন প্রতিবেশী চায় না এখানে থাকুন আপনি। আপনার অধীনে যেসব

ইণ্ডিয়ান শ্রমিক কাজ করে তাদের সঙ্গে সদয় আচরণ করেন আপনি, তাদেরকে উপযুক্ত বেতন দেন। আপনার এসব আচরণ আপনার বেশিরভাগ প্রতিবেশীর মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইণ্ডিয়ান শ্রমিকরা এখন শুধু আপনার খনিতে কাজ করতে চায়। আপনার কারণে শ্রমিকদের বেতন বাড়াতে বাধ্য হয়েছে অন্য খনি-মালিকরা। তা ছাড়া আপনি সাদাচামড়ার মানুষ, আপনার প্রযুক্তিগত জ্ঞান অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। মোটকথা, আপনার কারণে ব্যবসায় লোকসান হচ্ছে আপনার প্রতিবেশীদের। এসব মুখ বুজে সহ্য করার মতো ভালো মানুষ না ওরা।'

চুপ করে আছেন সিনর। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। একটু পর পর নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছেন।

'সুতরাং আপনাকে সরিয়ে দেয়াটাই ওদের কাছে সহজ এবং সবচেয়ে কার্যকরী সমাধান বলে মনে হয়েছে,' বলে চললাম আমি। 'আপনাকে খুন করতে পারলে একটা উদাহরণও তৈরি করতে পারত ওরা—এরপর আর কোনো ইউরোপিয়ান এই অঞ্চলের কোনো খনিতে কাজ করতে আসার আগে দশবার ভাবত। যা-হোক, বিপদ কেটে গেছে, আপাতত ভয়ের কিছু নেই আপনার। উপযুক্ত শিক্ষা হয়েছে আপনার কুচক্রী প্রতিবেশীদের। এবং ওরা জেনে গেছে আমি আছি আপনার পাশে। সুতরাং নতুন করে কিছু করার আগে এবার দশবার ভাবতে হবে ওদেরকে।'

আরও একবার নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন সিনর। 'আসলে...খনিটা চালাতে আমারও কিছু অসুবিধা হচ্ছিল প্রথম থেকেই। সবই ঠিকঠাক, তারপরও দেখি কোথায় যেন একটা-না-একটা ঘাপলা থেকেই যায়...' ইতস্তত করছেন তিনি, কী যেন বলি বলি করেও বলতে পারছেন না। শেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যদি কিছু মনে না-করেন, একটা প্রস্তাব দিতে চাই আপনাকে। আসলে...আমার এই প্রস্তাবটা কতটা উপযুক্ত হবে আপনার জন্য বুঝতে পারছি না। আমি জানি

ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে আপনি অত্যন্ত সম্মানিত একজন মানুষ। বিশেষ কোনো কারণে ওরা বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে আপনাকে...' এ-পর্যন্ত বলে থেমে গেলেন তিনি।

আমি বললাম, 'যা বলতে চাচ্ছেন সরাসরি বলতে পারেন। অসুবিধা নেই।'

'খনিতে যেসব ইণ্ডিয়ান কাজ করে তাদের কাজ বা আচরণ নিয়ে কোনো আপত্তি নেই আমার। সমস্যা অন্য জায়গায়। শনিবার রাত এলেই মানুষগুলো আমূল বদলে যায়। যে-লোকটা শনিবার সন্ধ্যায় বিদায় নেয় আমার কাছ থেকে সে সোমবার সকালে কাজে আসতে পারবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকি আমি। ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভেবেছি, কিন্তু এই লোকগুলো তাদের জীবনযাত্রার ধরন না-বদলালে অবস্থার উন্নতি হবে বলে মনে হয় না। আসলে খনির কাজে আমার এমন একজন সাব-ম্যানেজার দরকার যার কথা বেদবাক্যের মতো মান্য করবে ইণ্ডিয়ানরা। এ-রকম কাউকে মাসে একশ' ডলার করে দিতে রাজি আছি আমি। আরও বেশিই দিতাম, কিন্তু যে-কোম্পানির হয়ে কাজ করি তারা এর বেশি দিতে চাইবে না হয়তো...'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললাম, 'সিনর, যে-বেতন আপনি দিতে চাচ্ছেন তা আমাকে প্রলুব্ধ করার জন্য যথেষ্ট না তারপরও আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করছি। কারণ খাবার, কাপড় আর সিগার কেনার জন্য এবং থাকার জন্য প্রতিমাসে আমারও কিছু টাকার দরকার হয়। তা ছাড়া আরও একটা কারণ আছে—আগেও বলেছি, আপনাকে পছন্দ করি আমি। আপনার খনিতে আমার সাধ্যমতো কাজ করার চেষ্টা করবো। তবে একটা কথা আগেভাগেই জানিয়ে রাখি। সংক্ষিপ্ত নোটিশে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমাকে চলে যেতে হতে পারে। কারণ আপনার কোম্পানির চেয়ে বড় আরেক কোম্পানির হয়ে কাজ করি আমি। আপাতত ছুটিতে আছি, তবে যে-কোনোদিন চাকরিতে যোগদানের ডাক, অন্য কথায় সমন আসতে পারে।'

আমার শেষ কথাটার মানে যে বিপ্লব, তা আপাতত চেপে গেলাম সিনরের কাছে।

সিনর জেমস স্ট্রিকল্যাণ্ডের অধীনে, বলা ভালো তাঁর কোম্পানির অধীনে শুরু হলো আমার চাকরি-জীবন। এক বছরের কিছু বেশি সময় ধরে চাকরি করেছিলাম আমি। উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হতো আমাকে। তাতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। আমি দেখেছি, অকর্ম, কুকর্ম এবং মনের সব আকাশকুসুম চিন্তাভাবনা থেকে দূরে থাকার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে কাজে ডুবে থাকা। একজন ব্যস্ত মানুষকে তার যন্ত্রণাময় অতীত যন্ত্রণা দিতে পারে না, কষ্টকর বাস্তব কষ্ট দিতে পারে না, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলতে পারে না। আফসোস, বেশিরভাগ মানুষ কথাটা জানে না, জানলেও বোঝে না।

যা-হোক, আমার মতো সিনর জেমসও প্রচুর পরিশ্রম করেন। আসলে মাইনিং-এর কাজটাই এ-রকম। এখানে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে মামুলি ফল পাওয়া যায়। বন্ধু জোন্স, সে-সব কথা উল্লেখ করে আপনার বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না, কারণ ব্যাপারটা আমার চেয়ে হয়তো বেশিই বোঝেন আপনি। তবে এই কাহিনির নায়ক জেমস স্ট্রিকল্যাণ্ডের ব্যাপারে কিছু কথা না-বললেই নয়।

পেশায় মাইনার হলেও সিনর আসলে খানদানি বংশের সন্তান। তাঁর চেহারাতে সে-রকম একটা ছাপ আছে। তাঁর বাবা, আমার সেই ধর্মপিতার মতোই পাদ্রি ছিলেন। পাদ্রিদের ক্ষেত্রে যা হয়—মুখে ঈশ্বরের নাম অন্য যে-কারও চেয়ে বেশি থাকে অথচ পকেটে অন্য যে-কারও চেয়ে টাকা থাকে কম, সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের বাবার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একটা নামী গির্জার যাজক হওয়া সত্ত্বেও টানাটানি ছিল তাঁর সংসারে।

তিনি যখন মারা যান তখন সিনরের বয়স বিশ। বেচারা তখন নিতান্ত হতাশ হয়ে উপলব্ধি করেন, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া

অর্থসম্পদ বলতে মাত্র পাঁচ হাজার ডলার আছে তাঁর কাছে। যেহেতু বয়স কম সেহেতু মনে আশা আর অ্যাডভেঞ্চারের নেশা বেশি; পুরো টাকাটাই টেক্সাসের একটা রানশে বিনিয়োগ করেন তিনি। দু'মাস ঘুরতে-না-ঘুরতেই সব টাকা খুইয়ে শুধু পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে রাস্তায় নামতে বাধ্য হন সিনর।

অভিজ্ঞতাটা নিঃসন্দেহে অতি-তিক্ত। পরনের শার্ট-প্যান্টে পকেট আছে কিন্তু তাতে একটা পয়সাও নেই। গোগ্রাসে গেলার মতো মুখ আছে কিন্তু তাতে দেয়ার মতো খাবার নেই। শহরের আনাচে-কানাচে সারি সারি বাড়ি আছে কিন্তু থাকার কোনো জায়গা নেই। আশপাশে অনেক লোক আছে কিন্তু কোথাও কোনো বন্ধু নেই।

এ-রকম মানুষের মগজই টাকা, হাত হাতুড়ি আর পা যেন পুরো শরীর বহন করার কোনো যন্ত্র। এসব সম্বল নিয়ে কাজে নেমে পড়লেন সিনর। প্রথমে হলেন কাউবয়। নাম-কা-ওয়াস্তের বেতনে ঘোড়ার দেখভাল করা আর গরু খেদানোর চাকরি জুটল এক রানশে। কিন্তু ফোরম্যানের রোষানলে পড়ে বিনা-নোটিশে চাকরি গেল। গরু খেদানোর মতো করে ভাগ্য তাকে খেদিয়ে নিয়ে গেল পানামায়। অখ্যাত, বলা ভালো কুখ্যাত এক সরাইখানায় খদ্দেরদের ফুটফরমাশ খাটার কাজ জুটল এবার।

কিন্তু কথায় আছে যার কপাল কালো তার জীবন কালো। সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডেরও হলো সে-অবস্থা। ওই সরাইখানার জনৈকা বেশ্যা দেখল সিনরের চেহারানকশা খাসা, বাড়ন্ত শরীর-স্বাস্থ্যও তাগড়া। কাজেই তাঁকে পিরিতের নাগর বানানোর দুর্দমনীয় কামনা জাগল মহিলার মনে। ব্যাপার টের পেয়ে বেতনের টাকা না-নিয়েই পালালেন সিনর।

তাঁর পরবর্তী ঠিকানা নিকারাগুয়া। এখানেই মাইনিং-এ হাতেখড়ি হয় তাঁর। তবে একজায়গায় থিতু হতে পারছিলেন না, যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াতে হচ্ছিল। বেশিরভাগ সময় কেটেছে

হণ্ডুরাস সীমান্তে জনৈক আমেরিকানের একটা খনি তদারকির কাজে। যা বেতন পেতেন তা দিয়ে তাঁর মতো নিঃসঙ্গ মানুষের চলে গিয়ে কিছু থাকত হাতে। সমস্যা একটাই—ওই এলাকায় জ্বরের মারাত্মক প্রকোপ। সাদাচামড়ার কোনো মানুষের পক্ষে থাকা এককথায় অসম্ভব। কিন্তু ক্ষুধার কামড়ের তুলনায় মশার কামড় কিছুই না। কাজেই টিকে গেলেন সিনর। যেহেতু তাঁর চামড়া সাদা, বুদ্ধিও সাদা; অবসরের সময়টুকু ফলদায়ক কাজে ব্যয় করতে লাগলেন। শুরু করলেন পড়াশোনা। মাইনিং-এর উপর জানতে পারলেন অনেক কিছু। শিখলেন স্প্যানিশ এবং ইণ্ডিয়ান তথা "মায়া" ভাষা। আহরণ করলেন এই অঞ্চলের দেশগুলোর ভৌগলিক জ্ঞান। জানতে পারলেন ল্যাটিন আমেরিকার মানুষদের ইতিহাস।

মানুষের জীবনে দুঃখের পরে সুখ আসে, তারপর আবার আসে দুঃখ। প্রবল জ্বরে মুমূর্ষু হয়ে সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকেও তাঁর হণ্ডুরাস-জীবনের ইতি টানতে হলো। মেক্সিকোয় চলে এলেন তিনি। সুস্থ হয়ে ওঠার পর কিছুদিন কাটল বেকার অবস্থায়। তারপর চাকরি পেয়ে গেলেন কুমার্ভোয় এখন যে রূপার-খনিতে কাজ করছেন সেখানে। তাঁর আগে জনৈক মেক্সিকান ছিল এই খনির ম্যানেজারের দায়িত্বে। কিন্তু লোকটা ছিল আসলে একটা চোর। আকরিক তুলে বিক্রি করার সময় মোটা অঙ্কের টাকা নিজের পকেটে রেখে দিত। একদিন হাতেনাতে ধরা পড়ার পর ব্যাটার চাকরি যায়। সেই থেকে নতুন লোক খুঁজছিল মালিক এবং তখন পেয়ে যায় সিনরকে।

যে রূপার-খনিতে কাজ করছি আমরা তা বেশ সমৃদ্ধই বলা যায়। তারপরও এখান থেকে লাভের অংশ বের করাটা বেশ কঠিন। সবচেয়ে বড় কারণ, এখানে গর্ত করলেই ভিতরে পানি জমে যায়। সিনর আবার কায়দা করে টানেল তৈরি করতে জানেন; ও-রকম সুড়ঙ্গপথে গর্তের ভিতরের পানি বাইরে ফেলে দিতে পারেন।

আমি যখন কাজে যোগ দিই ততদিনে সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের মাইনিং অভিজ্ঞতা দশ বছরের। গিয়ে দেখি যেসব জায়গায় রূপার

আকরিক পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সে-সব জায়গায় গর্ত করে ফেলা হয়েছে, পানিও নিষ্কাশন করা হয়েছে। এবার আকরিক বের করা পালা। আকরিক তুলতে লাগলাম আমরা। এক টন আকরিক তুললে তা থেকে দু'শ' আউন্স রূপা পাওয়া যায়। এভাবে কয়েক মাস বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে চলল আমাদের কাজ।

কিন্তু তারপর একদিন হঠাৎ করেই মাটি ধসে আকরিকের স্তূপ নেমে গেল নীচে। গর্তের ভিতরে পানির পরিমাণ বেড়ে গেল অনেক। বিভিন্নভাবে চেষ্টা করলেন সিনর, কিন্তু লাভ হলো না। যে-সময়ের কথা বলছি তখন স্টীমপাম্প বলতে কিছু ছিল না মেক্সিকোতে। কাজেই সে-রকম কিছু এনে যে কাজে লাগাবো সে-উপায়ও ছিল না।

আরেকটা ধাতুশিরা খুঁজে বের করে খুঁড়বার চেষ্টা করলাম আমরা। লাভ হলো না। তারপর তিন মাস ধরে চেষ্টা করে মাটির এত নীচে একটা টানেলের মতো বানিয়ে ওই গর্তটার পানি বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা করলাম। এবারও ব্যর্থ হতে হলো। কাজেই রূপা উত্তোলনের আশা বাদ দিয়ে কাজ বন্ধ করে দিতে হলো আমাদেরকে।

এবার করার মতো একটাই কাজ আছে—চিঠি লিখে খনির মালিককে সব জানানো। আরও একটা কাজ অবশ্য করা যায়। গত ক'মাস থেকে শ্রমিকদের বেতনের টাকা পাঠাচ্ছে না মালিক; আমাদের মজুদে যে-পরিমাণ আকরিক আছে সেগুলো গলিয়ে রূপা সংগ্রহ করা যায়, তারপর সেখান থেকে কিছু রূপা দিয়ে পরিশোধ করা যায় শ্রমিকদের বেতন।

এক সন্ধ্যায় আকরিক গলানোর কাজ শেষ করে বাড়িতে ফিরছি, এমন সময় সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকে দেখি একটা ভাঙাচোরা টেবিলের পাশে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন। চোখে উদাস দৃষ্টি। ঠোঁটের কোনায় ঝুলছে নিভে-যাওয়া সিগার। টেবিলের উপর এক তা কাগজ, সম্ভবত কোনো চিঠি।

এ-পর্যন্ত অনেকবার দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছি আমরা। সেই শুরু থেকে প্রতিদিনই এত পরিশ্রম করতে হচ্ছে যে, দিন শেষে শুধু বিছানা ছাড়া অন্য কিছুর কথা মাথায় আসে না। এরপরও একটা দিনের জন্যও সিনরকে দেখিনি ভেঙে পড়তে। তাঁর ঠোঁটের কোনার সেই হাসি, দুই চোখের সেই দ্যুতি কখনও মুছে যেতে দেখিনি। কিন্তু আজ এ কী অবস্থা তাঁর? দেখে মনে হচ্ছে গভীর হতাশায় মুষড়ে পড়েছেন; অপরিচিত কেউ দেখলে ভাববে তাঁর মৃত মাকে দাফন করে এসেছেন কিছুক্ষণ আগে।

তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আবার কী গজব নাজিল হলো?'

'তেমন কিছু না, ইগনাশিয়ো,' জবাব দিলেন সিনর। 'একটা চিঠি এসেছে।' (চাকরির হিসেবে যেহেতু আমার চেয়ে উঁচু পদে আছেন সিনর সেহেতু আমাকে নাম ধরে ডাকেন তিনি এবং তুমি করে বলেন।)

'কে পাঠিয়েছে?'

'এই খনির মালিক।'

'কী বলেছে?'

'বলেছে আমার অদক্ষতা আর অবহেলার কারণেই নাকি খনিতে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই আমার চাকরি শেষ। আমার যে-ক'মাসের বেতন বকেয়া ছিল তা-ও দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। শুধু তা-ই না, আমার কারণে যে-পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তাঁর তা-ও দাবি করেছে আমার কাছে।'

থতমত খেয়ে গেছি। কল্পনাও করিনি এ-রকম কিছু ঘটতে পারে। হঠাৎ টের পেলাম রেগে যাচ্ছি, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। চিৎকার করে বলেই ফেললাম, 'অদক্ষতা, তা-ই না? অবহেলা? এই খনির মালিক আসলে একটা বেহায়া। আমি অভিশাপ দিচ্ছি ওকে। শিয়াল-শকুন যেন ছিঁড়ে খায় ওকে, মরার পরে যেন কবরে শোওয়ার সৌভাগ্য না-হয় শয়তানটার।'

'এ-রকম বোলো না, ইগনাশিয়ো,' করুণ হাসি হাসলেন সিনর। 'পৃথিবীর নিয়মই এ-রকম। একটা কাজ দেয়া হয়েছিল আমাকে, ব্যর্থ হয়েছি আমি, কাজেই তার দায় আমাকেই বহন করতে হবে। আমি যদি সফল হতাম তা হলে কি উল্টো ঘটনা ঘটত না? মালিক কি খুশি হয়ে আমার বেতন বাড়িয়ে দিতেন না? তবে অবহেলার যে-অভিযোগ তিনি আমার বিরুদ্ধে করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তুমি নিজে সাক্ষী আছো দিনরাত কী পরিশ্রম করেছি আমি এই খনির জন্য। মালিকের সঙ্গে যদি দেখা হয় কখনও, এত বড় মিথ্যা কথার জন্য তার পাছায় যদি লাথি না-মেরেছি তো আমার নাম জেমস স্ট্রিকল্যাণ্ড না। ইচ্ছা করলেই চুরি করতে পারতাম; ঈশ্বরের শপথ, এক আউন্স রূপাও এদিক-ওদিক করিনি কোনোদিন। মালিক যখন শ্রমিকদের বেতনের টাকা দিতে দেরি করেছেন তখন নিজের পকেটের টাকা খরচ করে ওদের বেতন দিয়েছি। আমার কাছে এখন মাত্র এক হাজার ডলার আছে; শ্রমিকদের যে-ক'মাসের বেতন বাকি আছে তা শোধ করতে গিয়ে আটশ' ডলার খরচ হয়ে যাবে। অথচ আমাকেই কি না দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ মাথায় নিয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে হলো?'

'চুপ করুন, সিনর, চুপ করুন। আপনার কথা আর সহ্য করতে পারছি না আমি। এই পৃথিবীতে ভালোমানুষদের কোনো দাম নেই। এই পৃথিবীতে ভালোমানুষরা শুধু ঠকে আর মার খায়...' জানি না কেন বুক ফেটে কান্না আসছে আমার, কিন্তু সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের সামনে কাঁদতেও পারছি না।

দৌড়ে পালিয়ে গেলাম তাঁর সামনে থেকে।

তিন

সমন

বিক্ষিপ্ত মনে গ্রামের রাস্তা ধরে হাঁটছি। এমন সময় দেখা হয়ে গেল আমার সেই বন্ধুর সঙ্গে যার চিঠি পেয়ে কুমার্ভোয় এসেছি, যার বাড়িতে আছি আপাতত।

'আহ্! লর্ড!' আমাকে দেখামাত্র বলল সে, এই গ্রামের লোকজন আজকাল এই নামেই ডাকে আমাকে, 'তোমাকেই খুঁজছিলাম। ওই চিত্রলিপির বইটা পাওয়া গেছে।'

মন ভেঙে গেছে, তাই বুঝতে পারলাম না কী বলছে সে। 'কীসের চিত্রলিপি?'

'যে-চিত্রলিপির জন্য এখানে এসেছ তুমি। নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার—যার কাছে ছিল বইটা সে মারা গেছে। তাঁর ছেলে খুঁজে পাচ্ছিল না কোথায় রেখেছিল বইটা। গতকাল ঘটনাক্রমে সেটা পেয়ে গেছে সে। আসলে হয়েছে কী, ওদের বাসায় ইঁদুরের উৎপাত সাংঘাতিকরকম বেড়ে গেছে। ঘরের জায়গায় জায়গায় গর্ত করে একেবারে বাসর সাজিয়ে বসেছিল হারামিগুলো। ওগুলোকে মারতে গিয়েই এক গর্তের ভিতর থেকে পাওয়া গেছে বইটা।' হলুদ লিনিনে মোড়ানো বইটা বাড়িয়ে ধরল সে আমার দিকে।

এতক্ষণে সব মনে পড়ছে। 'ভালো,' বইটা নিতে নিতে বললাম। 'দেখি আজ রাতে সময় করে পড়তে বসবো।' হাঁটা ধরলাম আবার। খুব একটা উৎসাহিত হতে পারছি না, কারণ আগেই বলেছি মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে বিভিন্নরকম চিন্তায়।

চমৎকার বাতাস বইছে। সন্ধ্যাটা মনোরম। সিদ্ধান্ত নিলাম কিছুক্ষণ বাইরেই থাকবো। স্নিগ্ধ বাতাসে শান্ত হবে মন। চাঁদ উঠল একসময়। তখন আস্তে আস্তে রওয়ানা হলাম বাড়ির দিকে। রাস্তার একপাশ ধরে হাঁটছি। এমন সময় ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ করেই আমার পথরোধ করে দাঁড়াল এক লোক। চমকে উঠলাম, তবে সঙ্গে সঙ্গে একটানে বের করলাম আমার ভোজালি।

'থামুন, লর্ড, থামুন,' আর্তনাদের মতো করে বলল লোকটা; সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাচ্ছে আমাকে, একইসঙ্গে দেখাচ্ছে আমাদের ভ্রাতৃসংঘের সংকেত। 'অনেক বছর আগে শেষ দেখা হয়েছিল আমাদের, সম্ভবত সে-জন্যই আমাকে চিনতে পারছেন না। তবে আমার নাম শুনলে হয়তো মনে করতে পারবেন আমার কথা। আমি মোলাস। আপনার সৎ ভাই।'

উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ভালোমতো তাকালাম লোকটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলাম। সত্যিই, অনেকগুলো বছর পার হয়েছে, মোলাসও বদলে গেছে অনেক। তারপরও ভাই যেহেতু, ওকে জড়িয়ে ধরলাম। আমার দুঃসময়ে যখন অনেকেই কেটে পড়েছিল, এই মোলাস তখন আমার সঙ্গে ছিল; ওর পক্ষে যতটা সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল।

আজও আমার মনে ওর প্রতি নরম একটা জায়গা আছে।

'তুমি এখানে কী করছ, মোলাস?' জিজ্ঞেস করলাম। 'শেষবার যখন তোমার কথা শুনলাম তখন তুমি এখান থেকে অনেক দূরে, চিয়াপায়।'

'কী করছি তা বলার জন্যই তো এত হন্তদন্ত হয়ে হাজির হয়েছি আপনার কাছে, লর্ড অভ দ্য হার্ট। আমরা কি কোথাও...নিরিবিলিতে বসে কথা বলতে পারি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'এসো আমার সঙ্গে।'

খেয়াল করলাম, হঠাৎ করেই অন্যরকম হয়ে গেছে মনটা। সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের চাকরিচ্যুতির খবর শুনে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে

গিয়েছিল, চিত্রলিপির বইটা পাওয়া গেছে শোনার পর কিছু হলেও লাঘব হয়েছে সেই ভার, আর এখন যথেষ্ট কৌতূহল বোধ করছি। কী এমন হয়েছে যা বলার জন্য এত দূর থেকে ছুটে এসেছে মোলাস?

বাড়িতে ফিরে গেলাম। নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালাম মোলাসকে। পথশ্রমে ক্লান্ত সে, তাই কিছু খাবার আর পানীয় দিলাম ওকে।

'এবার বলো ঘটনা কী,' বললাম আমি।

'কিন্তু তার আগে কবচটা আরেকবার দেখা দরকার আমার,' বলল মোলাস।

উঠে গিয়ে জানালা-দরজা বন্ধ করলাম। তারপর পরনের জামা খুলে কবচটা দেখালাম মোলাসকে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দেখল সে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। আচ্ছা লর্ড, এই কবচটা সম্বন্ধে যে-প্রাচীন প্রবাদ চালু আছে আমাদের মধ্যে সেটা কী?'

'লোকে বলে, আমার কাছে যে-রত্নপাথর আছে তা, যখন বাকি অর্ধেকের সঙ্গে মিলিত হবে তখন ইণ্ডিয়ানরা আবার এদেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে। আর শুধু এদেশেই না, সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে বিস্তৃত হবে আমাদের রাজত্ব।'

মাথা ঝাঁকাল মোলাস। 'হ্যাঁ, লর্ড। আপনার কাছে "হৃৎপিণ্ডের" যে-টুকরোটা আছে তার নাম "দিবা"। আর যে-অংশটা হারিয়ে গেছে তার নাম "নিশি"। দিবা আর নিশি একসঙ্গে হলেই বলয় পূর্ণ হবে, ইণ্ডিয়ানদের শত বছরের স্বপ্ন পূরণ হবে। দিবা-নিশির ঠিক কেন্দ্রের অংশটার নাম "হার্ট অভ হেভেন", তা-ই না?'

'হ্যাঁ, মোলাস।'

'এবার শুনুন। "নিশিকে" পাওয়া গেছে।'

চমকে উঠলাম। 'কী বললে?'

'জী, সত্য কথাই বলছি, লর্ড। নিশিকে পাওয়া গেছে। নিজের

চোখে দেখেছি আমি। এই কথাটা জানানোর জন্যই এত দূর থেকে ছুটে এসেছি।'

'সব ঘটনা বলো আমাকে,' আমার কৌতূহল বেড়ে গেছে অনেক।

'লর্ড, চিয়াপাসে একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির আছে। কিছুদিন আগে এক লোক আর তার মেয়ে গিয়ে হাজির হয় ওই মন্দিরে। লোকটা বুড়ো। দেখতে-শুনতে ভয়ঙ্কর...বলা ভালো পাগলাটে। দুই চোখে কেমন খুনি দৃষ্টি। কিন্তু ওর মেয়েটা আবার অপ্সরাদের মতো সুন্দরী। পরিচিত কেউ নেই ওদের, থাকার জায়গাও নেই। ওদের সঙ্গে বোধহয় টাকাপয়সাও তেমন নেই। তাই বাপ-বেটি মিলে ওই ধ্বংসস্তূপের ভিতরেই থাকতে শুরু করে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, চেহারা যতই ভয়ঙ্কর হোক, বুড়ো কিন্তু ধন্বন্তরী চিকিৎসক। সব রোগের চিকিৎসা জানা আছে তার। আর ওর দেয়া ওষুধ কাজও করে দারুণ! সবচেয়ে বড় কথা, চিকিৎসার বিনিময়ে কারও কাছ থেকে একটা পয়সাও নেয় না সে। তবে কেউ কোনো খাবার দিলে গ্রহণ করে। এভাবে ডাক্তারি করেই দিন কাটাতে লাগল সে। মাস চারেক কেটে গেল।

'লর্ড, হয়তো জানেন, দু'বছর আগে বিয়ে করেছি আমি। বিয়ের পর থেকেই স্বাস্থ্যটা ভালো যাচ্ছিল না আমার স্ত্রীর। কিছুদিন আগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। এতই অসুস্থ যে, আমাদের গ্রামের ডাক্তার কিছুই করতে পারল না ওর জন্য। কী করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। এমন সময় মন্দিরের ধ্বংসস্তূপে বাসকারী ওই ইণ্ডিয়ান ডাক্তারের কাহিনি শুনলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম যাবো বুড়োর কাছে। গিয়ে আমার স্ত্রীর অসুখের কথা বলবো। যদি সম্ভব হয়, বুড়োকে নিয়ে আসবো আমার বাড়িতে।

'তো, আমার স্ত্রীর কয়েকজন বোন আর আমাদের গ্রামের পাদ্রির তত্ত্বাবধানে ওকে রেখে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। সঙ্গে নিলাম আমার স্ত্রীর একগুচ্ছ চুল আর ওই বুড়ো ডাক্তারকে উপহার হিসেবে

দেয়ার জন্য কিছু মুরগি ও ডিম। যাত্রা শুরু করলাম ভোরের আগে। সারাদিন পথ চললাম। কখনও পার হলাম নদী, কখনও অতিক্রম করতে হলো জঙ্গলাকীর্ণ বন্ধুর পথ। শেষপর্যন্ত সন্ধ্যার দিকে পৌঁছে গেলাম ওই বিধ্বস্ত মন্দিরে।

'মন্দির না-বলে ভাঙা পাথরের বড় বড় টুকরো বললেই বোধহয় মানায় বেশি। এককালে যেখানে সিঁড়ি ছিল সে-জায়গা ভরে গেছে আগাছায়। সিঁড়ির ধাপগুলো ধসে পড়ে পরিণত হয়েছে টুকরো টুকরো পাথরে। অত্যন্ত বিপজ্জনক পথ। তারপরও এ-পথ দিয়েই উঠতে হবে—উপায় নেই। উঠতে শুরু করলাম। চূড়ায় পৌঁছে দেখি, অনতিদূরে একটা পাথরের-আর্চওয়ে পড় পড় করছে, সেটার কাছে মূর্তির মতো বসে আছে এক লোক। পশ্চিমাকাশে তখন অস্ত যাচ্ছে সূর্য। আগুনের সেই নিষ্প্রভ গোলকটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। দেখেই বোঝা যায় লোকটা বেশ বয়স্ক। পরনে খুব হালকা রঙের লিনিনের আলখাল্লা। মাথায় সাদা উসুখুসু চুল। গালে বড় বড় সাদা দাড়ি। নাকটা চিলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো। দুই চোখ...উফ্ কী ভয়ঙ্কর সেই দু'চোখ...যেন জ্বলছে। শুধু জ্বলছে বললে কম বলা হবে, বলা উচিত দাবানলের মতো জ্বলছে। যাদের দিকে তাকায় বুড়ো তাদের মনের কথাটা যেন পড়ে নিতে পারে একনিমেষেই।

'"স্বাগতম!" আমাকে চমকে দিয়ে বাজখাঁই কণ্ঠে আমাদেরই ভাষায় বলে উঠল বুড়ো, কথায় অদ্ভুত টান। শুধু ঈশ্বর জানেন সূর্যের দিকে তাকিয়ে থেকেও আমার উপস্থিতি কীভাবে টের পেল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল আমাকে। "আমার কাছে আসার কারণ?"

'কিছুই বলতে পারলাম না ওর প্রশ্নের জবাবে। আমি যেন বোবা হয়ে গেছি। বুড়োর সম্মোহনী দুই চোখের দিকে তাকিয়ে আমার নড়াচড়ার ক্ষমতা যেন শেষ হয়ে গেছে।

'"বলো, কী হয়েছে তোমার? কেন এলে আমার কাছে? তোমার কি হৃৎপিণ্ডে সমস্যা?"

'লর্ড অভ দ্য হার্ট, বিশ্বাস করুন, হৃৎপিণ্ড শব্দটা শুনে মাথা ঘুরে উঠল আমার। মনে হলো উল্টে পড়ে যাবো এখনই। সামলে নিলাম কোনোরকমে। কী মনে হলো হঠাৎ জানি না, আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের গোপন সংকেত দেখালাম বুড়োকে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল সে-ও! তখন আরেকটা সংকেত দেখালাম ওকে, আবারও জবাব দিল সে। এভাবে একে একে বারোটা সংকেত দেখালাম, উত্তর পেলাম প্রত্যেক বার। এরপর কী করবো বা বলবো ভেবে না-পেয়ে আগেরমতোই অর্ধ-সম্মোহিত অবস্থায় তাকিয়ে থাকলাম বুড়োর দিকে।

'বুড়ো তখন বলল, "নির্ভয়ে এই পুণ্যস্থানে প্রবেশ করতে পারো। এসো, আমার এই বেদির কাছে এসো।"

'এই অভয়বাণীর পরও কিছু করা সম্ভব হলো না আমার পক্ষে।

'"চাইল্ড অভ দ্য হার্ট," আমাকে সম্বোধন করে বলে চলল বুড়ো, "কেন যেন মনে হচ্ছে তোমার মনের কথা পড়তে পারছি আমি। মনে হচ্ছে মুমূর্ষু কারও জন্য আমার কাছে এসেছ তুমি।'

'এবার যেন কিছুটা সাহস পেলাম। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম বুড়োর দিকে। উপঢৌকনের ঝুড়িটা নামিয়ে রাখলাম ওর পায়ের কাছে। বললাম, "আপনার জন্য সামান্য কিছু উপহার।"

'বুড়ো বলল, "একজন লোক যখন তার ভাইকে কিছু উপহার দেয় তখন তার চেয়ে বড় উপহার আর হয় না। তা ছাড়া আমার এখানে খাবার যোগাড় করার কোনো উপায় নেই বললেই চলে, তাই যখনই কেউ আমার জন্য কোনো খাবার নিয়ে আসে আমি খুশি হই।" কথা শেষ করে গলা উঁচু করে মেয়েকে ডাকল বুড়ো, "মায়া, এখানে এসে এগুলো নিয়ে যা তো ভিতরে।"

'মেয়েটা বোধহয় কাছেই কোথাও দাঁড়িয়ে আমাদের সব কথা শুনছিল। বাপ ডাকতে-না-ডাকতেই এসে হাজির হলো সে। পরনে বাবার মতোই সুন্দর কিন্তু পুরনো এক আলখাল্লা। মেয়েটার চেহারার দিকে তাকিয়ে, লর্ড অভ দ্য হার্ট, আমার মাথা আবারও ঘুরে গেল।

আবারও মনে হলো উল্টে পড়ে ঘাড় মটকে গিয়ে মরবো। মেয়েটা এত সুন্দরী যে, ওকে দেখামাত্র আমার মন যেন গলে পানি হয়ে গেছে! এর আগে এত সুন্দরী মেয়ে বাস্তবে তো পরের কথা, স্বপ্নেও দেখিনি।'

মোলাসের এই কথাগুলো শুনে দাঁতে দাঁত চাপলাম আমি। মেয়েদের ব্যাপারে কঠিন এক প্রতিজ্ঞায় নিজেকে বেঁধে ফেলেছি, উল্লেখ করেছি আগেও। মেয়েমানুষ আমার দৃষ্টিতে সাপের মতো, তাদের সৌন্দর্য চোরাবালির মতো। সাপ যেমন নিঃশব্দে চলে, মেয়েরাও তেমন চুপিসারে জায়গা করে নেয় একজন পুরুষের বুকে। সাপ যেমন তার প্রয়োজনে বিষথলির সবটুকু বিষ ঢেলে দেয় শিকারের শিরায়, মেয়েরাও তেমন যথোপযুক্ত মুহূর্তে ছোবল বসায় অসতর্ক পুরুষের উপর। চোরাবালি দেখলে বোঝা যায় না, অথচ তাতে পা দিলে আর কোনোদিন বেরিয়ে আসা যায় না; নারীর ছলনাও সে-রকম—বোঝা যায় না এবং যখন টের পাওয়া যায় তখন করার আর কিছুই থাকে না।

কাজেই ওই বুড়ো ডাক্তারের মেয়ের রূপবর্ণনায় মোলাসের অতি-আগ্রহ দেখে যথেষ্ট বিরক্ত হলাম। তাগাদা দিয়ে বললাম, 'শুধু আসল কাহিনি বলো, খামোকা রঙ চড়িয়ো না। সুন্দরী মেয়েমানুষ আমিও দেখেছি এবং তাদের সঙ্গে থাকার পরিণতি কী হয় তা আমার চেয়ে কম জানো না তুমি। দ্বিতীয় কথা, ওই মেয়ের রূপের যা বর্ণনা দিচ্ছ, শুনে মনে হয় অপ্সরাদের রানি সে, যা অসম্ভব। তৃতীয় এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের সেই রত্নপাথরের গল্পের সঙ্গে মেয়েটার ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের কোনোই যোগাযোগ নেই, থাকতে পারে না।'

আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মোলাস। তারপর বলতে লাগল, 'মেয়েটার নাম মায়া।'

'ইতোমধ্যেই বলে ফেলেছ,' আমার বিরক্তি বাড়ছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে বলে চলল মোলাস, 'ওর চোখেমুখে, চালচলনে

কেমন বেপরোয়া ভঙ্গি। খাবারের ঝুড়িটা নিয়ে গেল সে। লর্ড, দয়া করে রাগ করবেন না আমার কথা শুনে—মেয়েটা যতক্ষণ না উধাও হলো বড় একটা বোল্ডারের আড়ালে ততক্ষণ ওর দিকে তাকিয়েই থাকলাম বেহায়ার মতো। তারপর বুড়োর দিকে তাকিয়ে আমার স্ত্রীর অসুস্থতার ব্যাপারে সব বললাম।'

'নাম কী বুড়োর?'

'যিব্যালবে।'

'যিব্যালবে? এটা আবার কোন্ ভাষা?'

'ল্যাকাণ্ডন হবে সম্ভবত।'

'মানে কী শব্দটার?'

'পাহারাদার।'

'তা-ই নাকি? তা, আর কী বললে "পাহারাদারকে"?'

'আমার সঙ্গে গ্রামে যেতে বললাম। বললাম, রোগীকে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি আমার পক্ষে, তাই তিনি যদি কষ্ট করে গিয়ে দেখেন তা হলে আমার মনে হয় সঠিক ওষুধ দিতে পারবেন।

'চুপ করে সব শুনল বুড়ো। আমার স্ত্রীর একগুচ্ছ চুল নিয়ে গিয়েছিলাম, আগেও বলেছি, আমার কাছ থেকে চেয়ে নিল গুচ্ছটা। চোখের সামনে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল কিছুক্ষণ। কী সব অদ্ভুত ভঙ্গি করল। কাছেই জ্বলছিল আগুন, উঠে এগিয়ে গেল আগুনের কাছে। একটুকরো জ্বলন্ত কয়লার উপর রাখল চুলের গুচ্ছটা। তাপে বেঁকে কুঁকড়ে গেল সেটা।

'"আমি কেন," হতাশ গলায় বলল বুড়ো, "পৃথিবীর কোনো ডাক্তারেরই ক্ষমতা নেই তোমার স্ত্রীর অসুখ সারায়। ইতোমধ্যে মনে হয় মরে গেছে সে। তুমি যখন দাঁড়িয়ে ছিলে ওই দরজার কাছে তখন টের পেয়েছি একটা আত্মা রওনা হয়েছে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে। তবে আমি নিশ্চিত না ওটা কার আত্মা।"

'লর্ড অভ দ্য হার্ট, এখানে বলে রাখি আপনাকে, পরে গ্রামে ফিরে এসে জানতে পারি, সেদিন সত্যিই সূর্যাস্তের সময় মারা যায়

আমার স্ত্রী। যিব্যালবে ঘটনাটা এত আগে কীভাবে আঁচ করতে পারল জানি না।

'বুড়োর কথা শুনে খুব খারাপ লাগল আমার, যদিও জানতাম এ-রকম কিছু ঘটতে পারে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলাম কিছুক্ষণ। হাজার হোক স্ত্রীকে ভালোবাসতাম আমি,' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মোলাস। আবেগ সামলানোর চেষ্টা করছে বোধহয়।

আমিও কিছু না-বলে তাকিয়ে আছি ওর দিকে।

'কিছুক্ষণ পর বেদি ছেড়ে উঠে আমার দিকে এগিয়ে এল যিব্যালবে,' বলে চলল মোলাস, 'আমার হাত ধরল। মা যেভাবে অশান্ত ছেলেকে বোঝায় সেভাবে বোঝাতে লাগল আমাকে। ওর কথা শুনে অনেকখানি শান্ত হলো আমার মন। কথা বলতে বলতে আমার মাথায় হাত বুলাচ্ছিল যিব্যালবে। কী আশ্চর্য! কিছুক্ষণ পর দেখি আমার এত ঘুম পাচ্ছে যে, চোখ খুলে রাখতে পারছি না। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম নিজেও জানি না।

'ঘুম ভাঙার পর টের পেলাম, স্ত্রী হারানোর শোক আছে মনে, কিন্তু অদ্ভুত এক প্রশান্তিও আছে। হয়তো আমার পাশেই বসে ছিল যিব্যালবে, আমার ঘুম ভাঙামাত্র বলে উঠল, "খাবার প্রস্তুত। চলো, খেয়ে নেবে। এত রাতে ফিরে গিয়ে কাজ নেই, আজ বরং এখানেই থেকে যাও। কাল সকাল সকাল রওনা দিয়ো।"

'খেতে বসলাম আমরা তিনজনে। বলে রাখি, মায়া মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্য।

'খেতে খেতে যিব্যালবে বলে উঠল হঠাৎ, "তুমি আমাদের দলের সদস্য, তোমাকে বিশ্বাস করে কয়েকটা কথা বলতে চাই।"

'আমি বললাম, "বলতে পারেন। কথা দিচ্ছি আমাদের দলের উচ্চপদস্থ সদস্য ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না আপনার বক্তব্য।"

'যিব্যালবে বলে চলল, "তা হলে শোনো। আমার এই কুমারী মেয়েকে নিয়ে অনেক দূর থেকে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছি আমি।

দেখে যা মনে হয়, আমরা আসলে তা না। কিন্তু আমাদের পরিচয় প্রকাশ করার মতো উপযুক্ত সময়ও আসেনি। তারপরও এখানে আসার কারণটা শুধু বলি তোমকে। যা হারিয়ে যায়নি, অথচ লুকানো আছে তা খুঁজে বের করতে এসেছি আমরা। তোমার যদি কিছু জানা থাকে এ-ব্যাপারে তা হলে জানাতে পারো আমাদেরকে।" জ্বলজ্বলে চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল সে।

'বুড়ো কী বলছিল বুঝতে অসুবিধা হয়নি আমার। তারপরও মুখ ফুটে কিছু বলিনি। কাছেই আগুন জ্বলছিল, উঠে গিয়ে একটা জ্বলন্ত লাকড়ি নিলাম। আগুন নেভালাম। এবার কয়লা হয়ে-যাওয়া ওই প্রান্ত দিয়ে পাথরের উপর পান্নাটার অর্ধেকের ছবি আঁকলাম কায়দা করে। এরপর লাকড়িটা দিলাম যিব্যালবের হাতে। বুড়ো তখন বলল, "আঁকাআঁকি ভালো পারি না আমি। মায়া, লাকড়িটা নে। ছবিটা শেষ কর্।"

'হাসল মেয়েটা। লাকড়িটা নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল আমার আঁকা ছবিটার পাশে। তারপর সুন্দর করে আঁকল পুরো "হৃৎপিণ্ড"। জিজ্ঞেস করল আমাকে, "হয়েছে, নাকি কিছু লিখতেও হবে?"

'আমি বললাম, "না, লিখতে হবে না। যা বোঝার বুঝে নিয়েছি আমি।" তাকালাম যিব্যালবের দিকে। "কী জানতে চান আমার কাছে?"

'বুড়ো বলল, "জানতে চাই, যে-জিনিসের খোঁজে এত দূর থেকে এখানে এসেছি তা এখানেই লুকানো আছে কি না। জানতে চাই, ওই জিনিসটা খুঁজে বের করা সম্ভব কি না।"

'আমি বললাম, "ওই জিনিসটা এখানেই লুকানো আছে। এবং যাঁর কাছে থাকার কথা তাঁর কাছেই আছে।"

'"ওই লোকের কাছে নিয়ে যেতে পারবে আমাদেরকে?"

'"না, পারবো না। কারণ আমার উপর সে-রকম কোনো আদেশ নেই। তবে সম্ভবত তাঁকে নিয়ে আসতে পারি আপনার কাছে। কিন্তু

আগেই বলে রাখি কাজটা সময়সাপেক্ষ। সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে আমাকে, পার হতে হবে অনেক লম্বা পথ। খুঁজে বের করতে হবে ওই লোককে। তারপর তাঁকে জানাতে হবে আপনার কথা। সব শোনার পর এমনও হতে পারে, হেসে উড়িয়ে দিলেন তিনি, আমার সঙ্গে আসতে রাজি হলেন না।"

'"কেন রাজি হবেন না?"

'"গিয়ে কী বলবো তাঁকে? এমন এক ডাক্তারের খোঁজ পেয়েছি আমি যে আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্য? যে প্রকৃতপ্রস্তাবে আগন্তুক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের পবিত্র প্রতীক পান্নার ওই আধখানা অংশ দেখতে চায়? আপনার কী মনে হয় এসব শুনলে এখানে আসতে রাজি হবেন তিনি?"

'"না, আমার মনে হয় না। তবে যদি দেখা হয় তাঁর সঙ্গে, বোলো, "দিবা" আর "নিশির" একসঙ্গে হওয়ার সময় হয়ে গেছে। বোলো নতুন আকাশে নতুন সূর্য ওঠার সময় হয়ে গেছে।"

'"ঠিক আছে, বলবো। কিন্তু কোনো প্রমাণ ছাড়া আমার কথা বিশ্বাস করবেন না তিনি। ভাববেন, তাঁর শত্রুরা কোনো ধূর্ত আগন্তুকের সহায়তায় তাঁকে ফাঁদে ফেলার বুদ্ধি বের করেছে। কিছু মনে করবেন না, বিনা-প্রমাণে মরীচিকার পেছনে ছুটতে পারবো না আমি।"

'"তুমি যদি নিজের চোখে কিছু দেখো আর সেই কথা গিয়ে জানাও তাঁকে তা হলে কি বিশ্বাস করবেন তিনি?"

'"করতে পারেন। ছোটবেলা থেকেই আমাকে খুব বিশ্বাস করেন তিনি।"

'"ঠিক আছে, তা হলে দেখো," বলেই আলখাল্লার গলার কাছটা সরিয়ে ফেলল যিব্যালবে। তারপর উবু হয়ে বসে পড়ল আগুনের সামনে।

'লর্ড অভ দ্য হার্ট, কী বলবো আপনাকে! দেখামাত্র সে-রাতে তৃতীয়বারের মতো মাথা ঘুরে উঠল আমার; এবার এত বেশি যে,

মনে হলো শুধু জ্ঞানই হারাবো না, মারাই যাবো শেষপর্যন্ত! আপনার গলায় যে-রকম কবচ আছে, বুড়োর গলায় ঝুলছে হুবহু সে-রকম একটা কবচ। কোনো সন্দেহ নেই, আপনার গলার পান্নাটা যদি "দিবা" হয় তা হলে যিব্যালবের গলার পান্নাটা "নিশি।"'

একবাক্যে যদি বলি, স্তম্ভিত হয়ে গেছি। কখনও কল্পনাও করিনি এ-রকম কিছু শুনতে হবে। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললাম, 'আমাকে বলার জন্য বিশেষ কোনো কথা বলেনি তোমাকে যিব্যালবে?'

'না, তেমন কিছু না। শুধু বলেছে আপনি যদি মেক্সিকানদের এই রহস্যের একজন খাঁটি ধারক ও বাহক হন তা হলে অবশ্যই দেখা করতে যাবেন ওঁর সঙ্গে, অথবা তাঁকে দেখা করার সুযোগ দেবেন আপনার সঙ্গে।'

'আচ্ছা মোলাস, আমার ব্যাপারে, অথবা আমার অতীত নিয়ে কিছু জানিয়েছ তাঁকে?'

'কিচ্ছু না। কেন জানাবো? সেই অনুমতি কি আছে আমার?'

'তোমার কাহিনি কি এখানেই শেষ, নাকি আরও কিছু বলবে?'

'মূল কাহিনি শেষ। তবে আপনি জানতে চাইলে "উপসংহার" বলতে পারি।'

'যেমন?'

'যেমন পরদিন ভোরে ওই মন্দির ছেড়ে চলে আসি আমি। গ্রামে পৌঁছে দেখি মারা গেছে আমার স্ত্রী। ওকে দাফন করলাম। তারপর ভেবে দেখলাম আপনার খোঁজে বের হওয়াটাই হবে আমার প্রথম কাজ। ও...বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। মন্দির ছেড়ে চলে আসার আগে যিব্যালবে আমাকে জিজ্ঞেস করে আমার টাকাপয়সার দরকার আছে কি না। বলি, আছে। তখন চামড়ার একটা ব্যাগ থেকে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দেয় সে আমাকে। প্রতিটা মুদ্রার গায়ে "হৃৎপিণ্ডের" প্রতিকৃতি খোদাই-করা।'

'তা-ই নাকি? দেখি তো?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মোলাস। 'আফসোস, লর্ড, একটা মুদ্রাও নেই আমার কাছে।'

'কেন? সব খরচ হয়ে গেছে?'

'ওই ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির ছেড়ে চলে আসছি, এমন সময় আমার কাছ থেকে সব মুদ্রা ছিনিয়ে নেয় ডাকাতরা। জানেন হয়তো, ওই অঞ্চলে ডন পেদ্রো মোরেনো নামের এক লোকের সাণ্টা ক্রুয নামের জমিদারি আছে। ওই লোকটা নিজে চোরাকারবারি এবং ওর অধীনে যত লোক আছে সব ডাকাত আর খুনি। কপাল ভালো শুধু মুদ্রাগুলো ছিনিয়ে নিয়েছে শয়তানগুলো, আমাকে জানে মারেনি।'

'কিন্তু...ওই জমিদারির প্রজারা শুনেছি কফি আর কোকো চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে?'

'ঠিকই শুনেছেন। সাধারণ প্রজা যারা আছে, মানে যারা নিতান্ত গরিব, তারা চাষবাস করে। যারা জমিদার পেদ্রো মোরেনোর সঙ্গে খাতির বজায় রেখে চলে, যারা চায় একটু আরামআয়েশে দিন কাটাবে তারাই সব কুকর্ম করে।'

'বুঝলাম। কিন্তু তোমাকে ওরা ধরল কেন? তোমার কাছে স্বর্ণমুদ্রা আছে জানল কীভাবে?'

'কেন ধরল জানি না। আমার কাছে স্বর্ণমুদ্রা থাকার খবর জানল কীভাবে তা-ও বলতে পারবো না। আমি তখন সাণ্টা ক্রুয পার হচ্ছি, এমন সময় ওই লোকগুলোর খপ্পরে পড়ি। আমাকে পাকড়াও করে তল্লাশি করতে শুরু করে ওরা। আমার পকেটে পেয়ে যায় সব মুদ্রা। জালে বড় মাছ পড়েছে জানতে পেরে ঘোড়া দাবড়ে নিজে এসে হাজির হয় পেদ্রো মোরেনো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সবগুলো মুদ্রা। কোত্থেকে পেলাম ওগুলো জানতে চায় আমার কাছে। বলতে অস্বীকার করি প্রথমে। তখন শয়তানটা বলে, আমি চুপ করে থাকলে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েদ করবে ওর জমিদারির কোনো পাতালকক্ষে। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট দিয়ে মারবে।

'আমার তখন ভয়ে পাগল হওয়ার মতো অবস্থা। তা ছাড়া তখনও কিন্তু জানি না কী হয়েছে আমার স্ত্রীর, তাই ওর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম সত্য কথাই বলবো। কিন্তু একটু ঘুরিয়ে বলবো।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম মোলাসের দিকে।

'বললাম, কাছের এক বিধ্বস্ত মন্দিরে এক বুড়ো ইণ্ডিয়ান ডাক্তার থাকে। আমার স্ত্রীর খুব অসুখ, তাই ওর কাছে গিয়েছিলাম ওষুধ আনার জন্য। উপঢৌকন হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলাম কিছু খাবার। কিন্তু চিকিৎসার বিনিময়ে আমার কাছ থেকে কিছু নিতে অস্বীকৃতি জানায় বুড়ো। বলে, এতে ওর নাকি অসম্মান হবে। এদিকে খাবারগুলো ফিরিয়ে আনারও উপায় নেই আমার। তখন সামান্য কিছু বিনিময় দেয়ার কথা বলি ওকে। খুশি হয়ে আমাকে স্বর্ণমুদ্রাগুলো দিয়েছে সে।'

'তোমার কথা শুনে পেদ্রো মোরেনো কী বলল?'

'"যিশুর মায়ের কসম!" বলল সে চিৎকার করে, "এই লোকের কথা শুনেছি আমি। কিন্তু ওই বুড়োর কাছে যে এত স্বর্ণমুদ্রা আছে তা এই প্রথম জানলাম। ঠিক আছে, তা হলে তো একবার গিয়ে দেখে আসতে হয় বুড়োকে...কী বলো তোমরা?" শুনে হো হো করে হাসতে লাগল ওর চ্যালাচামুণ্ডারা। অতি উৎসাহী দু'-চারজন এগিয়ে এল আমার দিকে। চড়-থাপ্পড় মেরে জিজ্ঞেস করল আর কিছু আছে কি না। বললাম, নেই। তারপরও ভালোমতো হাতাল আমাকে, যা যা পেল সবই নিয়ে নিল। ভুনা করার আগে পাখির ছাল যেভাবে ছাড়াই আমরা, সেভাবে "ছিল্" দেয়ার পর আমাকে ছেড়ে দিল ওরা। আর কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা ছাড়াই ফিরে গেলাম গ্রামে।

'তবে আমার আক্ষেপ দুটো। বউকে তো সারাজীবনের জন্য হারিয়েছিই, জান বাঁচাতে ওই বুড়োর কথাও ফাঁস করে দিয়েছি ভয়ঙ্কর এক ডাকাত-সর্দারের কাছে। এতদিনে হয়তো দলবল নিয়ে ওই মন্দিরে গিয়ে হামলা করেছে পেদ্রো মোনেরো। না জানি কী

অবস্থা করেছে যিব্যালবে আর ওর যুবতী সুন্দরী মেয়েটার! যদি না-গিয়ে থাকে তা হলে আপনি যেদিন সেখানে যাবেন ততদিনে হয়তো ঠিকই হামলা করে বসবে। সব লুট করে নেয়ার পর গলা কেটে ফেলে রাখবে বাপ-বেটিকে।'

'ঈশ্বর তাঁদেরকে রক্ষা করুন!' আন্তরিকভাবেই প্রার্থনা করলাম। 'কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি মোলাস, ওই বুড়োর কথা ফাঁস করে দেয়াটা উচিত হয়নি তোমার। ঘাবড়ে গিয়ে বোকার মতো কাজ করে ফেলেছ তুমি। যা-হোক, এবার বলো আমাকে খুঁজে পেলে কীভাবে? আর একেবারে খালিহাতে এতদূর এলেই বা কী করে?'

'একেবারে খালিহাতে না, লর্ড। আমার বাড়িতে সামান্য কিছু টাকা ছিল। বউকে কবর দেয়ার পর রওনা হয়ে গেলাম উপকূলবর্তী শহর ফ্রন্টেরা'র দিকে। গিয়ে দেখি ভেরা ক্রুযের উদ্দেশে রওনা দেয়ার জন্য একটা জাহাজ প্রস্তুত। ভাড়া দেয়ার মতো টাকা নেই, তাই ক্যাপ্টেনকে বলেকয়ে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে খণ্ডকালীন নাবিকের চাকরি নিয়ে নিলাম। ভেরা ক্রুয থেকে হাজির হলাম মেক্সিকোয়। আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের আঞ্চলিক প্রধানকে খুঁজে বের করলাম। তাঁর কাছে জানতে চাইলাম আপনার বর্তমান ঠিকানা। তখন জানতে পারলাম আপাতত এই গ্রামে আছেন আপনি। ব্যস, আর কী? আজ সন্ধ্যায় পৌঁছেছি এখানে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করতেই দেখিয়ে দিল কোন্ বাড়িতে থাকেন আপনি। হুট করে তো আর ঢুকে পড়া যায় না, তাই অপেক্ষা করছিলাম রাস্তার একধারে। সেই চিয়াপাস থেকে এখানে আসতে মোট এক মাস দু'দিন লেগেছে আমার। এবার লর্ড, যদি একটু দয়া করেন, যদি ঘুমানোর মতো একটু জায়গা দেন তা হলে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। ক্লান্তিতে আমার শরীর ভেঙে আসছে। শুনলে বিশ্বাস করবেন কি না জানি না—উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় গত তিন দিন দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি আমি। ...যিব্যালবের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন কি না, না-গেলে ওকে কিছু বলার আছে কি না—দয়া করে আগামীকাল সকালে

জানিয়ে দেবেন আমাকে।'

রাত গভীর হয়েছে। জেগে বসে আছি আমি। বিছানায় গিয়েছিলাম, বেশ কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে শেষে বিরক্ত হয়ে উঠে চলে এসেছি। এখন একা বসে ভাবছি মোলাসের কথাগুলো। ওর কাহিনি শুনে অদ্ভুত এক আশা জেগেছে আমার মনে। এত বছর অপেক্ষা করার পর আমার স্বপ্ন কি সত্যিই বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে? আমার পূর্বপুরুষদের ভবিষ্যদ্বাণী যদি নিখাদ হয়ে থাকে তা হলে তো তা-ই মনে হয়। যিব্যালবে—ওই বুড়ো ডাক্তার, মোলাস যাকে দেখে এসেছে, যার ব্যাপারে এত কথা বলেছে আমাকে, হয়তো আসলে একটা পাগল। আধখানা "হৃৎপিণ্ডের" মতো যা সে ঝুলিয়েছে গলায়, হতে পারে তা নকল। কিন্তু যা-ই হোক, এখানে বসে নিশ্চিত করে কিছু বলার উপায় নেই আমার। আবার মোলাসকে ছোটবেলা থেকে চিনি বলে যিব্যালবে'র গল্পটা হেসে উড়িয়েও দিতে পারছি না। বুঝতে পারছি, এই ব্যাপারে নিঃসন্দেহ না-হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই আমার। এবং আগামীকাল হোক বা একমাস পরে, কাজটা করতে হবে আমাকেই। নিজের চোখে দেখে, নিজের কানে শুনে বিশ্বাস করতে চাই আমি। এবং তা করতে হলে চিয়াপাসে যেতে হবে আমাকে, খুঁজে বের করতে হবে যিব্যালবেকে।

সিদ্ধান্ত নিলাম, কাজটা করবো।

কিছুটা শান্ত হলো মন। গিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কিন্তু ওই একই অবস্থা—ঘুম আসছে না। মনে পড়ল চিত্রলিপির ওই বইটার কথা যা আমাকে দিয়েছে আমার বন্ধু। উঠে বসলাম। এক কাজ করলে কেমন হয়? বসে পড়ি বইটা নিয়ে। কিছুই হয়তো বুঝবো না, তারপরও উল্টেপাল্টে দেখি। আসলে এমন কিছু করতে চাচ্ছি যার ফলে উত্তেজনা দূর হবে মন থেকে, ক্লান্ত হবে মস্তিষ্ক, শেষপর্যন্ত নিদ্রাদেবী প্রসন্ন হবেন আমার উপর।

কিন্তু আজ রাতে সম্ভবত ঘুম নেই আমার কপালে। চিত্রলিপির

বইটা পড়তে গিয়ে প্রথমে খুব জটিল মনে হলো আমার কাছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, যত জটিল মনে হচ্ছে, আমার আগ্রহ তত বাড়ছে। বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে আমার বাবার সেই বন্ধু অ্যান্টোনিয়োর কথা যিনি চিত্রলিপির ব্যাপারে অনেক কিছু শিখিয়েছেন আমাকে। সেই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে শেষপর্যন্ত পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হলাম আমি। জানতে পারলাম, কুমার্ভো থেকে বেশি দূরে না খনিটা। সেখানে ঢোকার সুড়ঙ্গমুখের সঠিক অবস্থান সম্পর্কেও মোটামুটি নিশ্চিত হতে পারলাম।

মহান গুয়াটেমকের শাসনামলের শেষদিকে বন্ধ করে দেয়া হয় সুড়ঙ্গমুখটা। ওই সময়ে খনির দায়িত্বে ছিলেন যে স্থানীয় সর্দার, পড়ে মনে হচ্ছে চিত্রলিপির বইটা তিনিই লিখেছেন। উদ্দেশ্য, যদি পরে কখনও প্রয়োজন দেখা দেয় তা হলে তাঁর বংশধরদের কেউ যেন আবার খুলতে পারে সুড়ঙ্গমুখটা। এই বইয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, এমন একটা সময় আসবে যখন স্প্যানিয়ার্ডরা বিতাড়িত হবে মেক্সিকো থেকে; তখন দেশের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে নতুন সর্দাররা প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে স্বর্ণখনিগুলো পুনরায় আবিষ্কারের তোড়জোড় শুরু করবে। বর্ণনা অনুযায়ী, এই খনির সোনা এতই নিখাদ যে, এগুলো দিয়ে বানানো পাত নাকি উপহার হিসেবে সম্রাট মন্টেজুমার দরবারে পাঠাত স্থানীয় সর্দাররা।

পরদিন সকালে গিয়ে হাজির হলাম সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের ঘরে। কোনো ভূমিকা না-করে বললাম, 'সিনর, আপনার হয়তো খেয়াল আছে, চাকরি নেয়ার আগে বলেছিলাম চাকরিটা যে-কোনো সময় ছেড়ে দিতে হতে পারে আমাকে। বলতে বাধ্য হচ্ছি, সেই সময় এসে গেছে। গতকাল রাতে একজন দূত এসেছে আমার কাছে। বিশেষ একটা জরুরি কাজে আমাকে অনতিবিলম্বে রওনা হয়ে যেতে হবে মেক্সিকোর আরেক প্রান্তের উদ্দেশে। দয়া করে জিজ্ঞেস করবেন না কাজটা কী, জবাব দিতে পারবো না। আপনি অনুমতি দিলে আগামীকালই রওনা করতে চাই।'

'শুনে খারাপ লাগছে, ইগনাশিয়ো,' বললেন সিনর, 'কারণ এই ক'মাস তুমি শুধু আমার সহকর্মীই না, একজন ভালো বন্ধুও ছিলে। তারপরও আমি চাই তোমার মঙ্গল হোক। আমার মতো একজন হতভাগা লোকের সঙ্গে থাকার চেয়ে নিজের মতো করে আয়-উপার্জনের চেষ্টা করাটা অনেক ভালো।'

'কথাটা ঠিক বললেন না। নিজের মতো করে আয়-উপার্জনের চেষ্টা করতে যাচ্ছি না আমি। সত্যিই জরুরি কাজ আছে আমার, সেটা করার জন্যই চলে যেতে চাচ্ছি। ...তবে...সিনর, একটা কথা বলতে চাই আপনাকে। ব্রেকফাস্ট করার পর আমার সঙ্গে কি একজায়গায় যেতে পারবেন?'

'কেন পারবো না?' তিক্ত হাসি হাসলেন সিনর। 'এখন চাকরি নেই আমার, কাজেই হাতে অফুরন্ত অবসর। এই সুযোগে দরকার হলে নরক থেকেও ঘুরে আসতে পারি! ...কোথায় নিয়ে যেতে চাও আমাকে?'

'আরেকটা খনিতে। আমি ঠিকমতো চিনি না খনিটা। তবে যতদূর মনে হয় ঘোড়ায় চড়ে গেলে বড়জোর দু'ঘণ্টা সময় লাগবে। বিশেষ কিছু চিহ্ন খুঁজে বের করে সেগুলো অনুসরণ করতে হবে আমাদেরকে। ধারণা করছি কাছেপিঠের কোনো এক পর্বতের পাদদেশে খনির সুড়ঙ্গমুখটা খুঁজে পাবো।'

সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের চোখেমুখে আগ্রহের ছাপ দেখা যাচ্ছে। 'এতদিন বলোনি কেন খনিটার কথা?'

'মাত্র গতকাল রাতে জানতে পেরেছি, তাই। মজার ব্যাপার কী জানেন? ওই খনি খুঁজে বের করতেই কিন্তু কুমার্ভোতে এসেছিলাম।'

'তা, কী জানতে পারলে?'

'সংক্ষেপে বললে, খনিটা খুবই সমৃদ্ধ। সম্রাট মণ্টেজুমার আমলেও চালু ছিল।'

'মণ্টেজুমার আমলেও? বলো কী!'

'জী। মহান গুয়াটেমকের শেষদিকে বন্ধ করে দেয়া হয় খনিটা।

...আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

'কী?'

'যদি আমরা খুঁজে বের করতে পারি খনিটা, যদি দেখি আগের মতোই সমৃদ্ধ আছে সেটা, নামজারি করবো আপনার নামে। অর্থাৎ যেহেতু অন্য কোনো দাবিদার নেই, আপনিই হবেন সেটার মালিক। তবে যে ইণ্ডিয়ান লোকটা তথ্য সরবরাহ করেছে, আপনি যদি তাকে কিছু বখশিস দেন তা হলে ভালো হয়। বেচারা গরিব মানুষ।'

'ঠিক আছে, বখশিস না-হয় দেয়া যাবে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, এত প্রাচীন একটা স্বর্ণখনি...শুনে মনে হচ্ছে যথেষ্ট সমৃদ্ধ, তারপরও তুমি নিজের নামে কেন নামজারি করছ না? আমাকে কেন টেনে আনছ এসবের মধ্যে? তা ছাড়া এত বছর পর এই খনির ব্যাপারে এত কথা জানলে কীভাবে?'

'আপনার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো, এত সময় নেই আমার হাতে। তা ছাড়া, আগেও বলেছি আবারও বলছি, আপনাকে পছন্দ করি আমি; আমার ক্ষমতায় কুলালে আপনার জন্য ভালো কিছু করতে চাই। খনিটা হয়তো নিজের নামে দাবি করতে পারতাম, কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখাশোনার দায়িত্ব দেবো কাকে? আগামীকাল কুমার্ভো ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে আমাকে...'

'এবং কেন যেন মনে হচ্ছে আমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে তেমন একটা দুঃখ নেই তোমার মনে,' সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের কণ্ঠে অভিমানের সুর।

'না, সিনর। কুমার্ভো ছেড়ে, আপনাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি বলে খুশি না আমি। বরং সত্য কথা হলো আমার যেতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু আমার সেই কাজ এত জরুরি যে, ফেলে রাখার অথবা অন্য কাউকে বুঝিয়ে দেয়ার অবকাশ নেই। কুমার্ভোতে যে-ক'দিন ছিলাম, হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়েছে, তারপরও বলবো সুখী ছিলাম। আপনার মতো একজন মহৎ আর পণ্ডিত লোকের সঙ্গে

ছিলাম। হয়তো কাজ সেরে আবারও ফিরে আসবো এখানে, তখন যদি ইচ্ছা হয় আপনার লাভের টাকা থেকে কিছু অংশ দিয়েন আমাকে।'

মাথা ঝাঁকালেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। 'খনিটার ব্যাপারে জানতে পারলে কীভাবে?'

পোশাকের ভিতর থেকে বের করলাম চিত্রলিপির বইটা, সঙ্গে আমার লেখা অনুবাদের পাণ্ডুলিপি। পড়ে শোনালাম সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকে। যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে শুনলেন তিনি। বোঝা গেল অ্যাডভেঞ্চার, অ্যাণ্টিক এসব নিয়ে উৎসাহ আছে তাঁর।

'চলো এখনই রওনা করি আমরা,' আমার কথা শেষ হওয়ামাত্র বললেন তিনি, 'ঘোড়া আর মালবাহী খচ্চর প্রস্তুত করতে বলছি। সঙ্গে অন্য কাউকে নেয়ার দরকার আছে?'

'না-নিলেই ভালো হবে মনে হয়। এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি খনিটা, ওটার উপর কারও দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়নি এখনও। এই অবস্থায় লোক জানাজানি যত কম হয় তত ভালো। আপনার আগেই কেউ যদি গিয়ে হাজির হতে পারে সেখানে, নিজের নামে নিবন্ধন করে নেয়, তা হলে কোনো লাভ হবে না আপনার। গত রাতে আমার সঙ্গে যে-লোকটা দেখা করতে এসেছে সে বিশ্বস্ত, কিন্তু পথশ্রমে ক্লান্ত। কাজেই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আমাদের দু'জনকেই যেতে হবে।'

ঘণ্টাখানেক পর শুরু হলো আমাদের যাত্রা। মোলাসের জন্য একটা মেসেজ রেখে এসেছি—সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবো আমি। যে-পাহাড়ি ট্রেইল ধরে এগোচ্ছি আমরা তা যথেষ্ট বন্ধুর। একটা পাহাড়ের কিনারা ধরে এগিয়ে গেছে ট্রেইলটা। পথ কোথাও কোথাও এত খারাপ যে, বাধ্য হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে লাগাম ধরে টেনে এগোতে হচ্ছে আমাদেরকে। এখানে-সেখানে গজিয়ে-থাকা ফার্ণ আঁকড়ে ধরে ভারসাম্য বজায় রাখতে হচ্ছে কখনও কখনও।

শেষপর্যন্ত হাজির হলাম পাহাড়ের চূড়ায়। এবার ঢাল বেয়ে নামতে হবে নীচের দিকে। পাহাড়ের এদিকে গজিয়ে আছে ওক আর ফার গাছের ঘন জঙ্গল। ট্রেইলটা এগিয়ে গেছে একটা পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত উপত্যকার দিকে। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি, ছোট্ট একটা পাহাড়ি নদী বয়ে চলেছে ওই উপত্যকা দিয়ে। ওই নদীর তীর ঘেঁষে মাইলখানেকের মতো এগোলাম আমরা। আসলে বিশেষ একটা সুউচ্চ পাহাড়ি চূড়া খুঁজছি আমি। চিত্রলিপির বইটাতে উল্লেখ আছে পাহাড়টার, বলা হয়েছে সেটার দু'পাশের ঢালই নাকি ন্যাড়া, মানে কোনো গাছপালা নেই। ঠিক পিছনেই আছে একটা সঙ্কীর্ণ উপত্যকা। এই উপত্যকা চেনার একটা উপায় বর্ণনা করা হয়েছে বইয়ে, কিন্তু উপায়টা কতখানি কাজে লাগবে জানি না। মহান গুয়াটেমকের আমলে নাকি ওই জায়গায় বিশাল এক সিবা গাছ ছিল। গাছটা দেখলেই নাকি বোঝা যেত জায়গামতো হাজির হওয়া গেছে। কিন্তু এতদিন পর ওই গাছ আছে কি না সেটাই প্রশ্ন। গাছটা খুঁজে পাওয়া জরুরি, কারণ ওই গাছ বিশেষ একটা সময়ে বিশেষ একটা জায়গায় ছায়া ফেলে; আর যেখানে ছায়া পড়ছে সে-জায়গাটাই হলো সমৃদ্ধ ওই স্বর্ণখনির বন্ধ-করে-দেয়া মুখ।

ওক আর ফারের জঙ্গল পার হয়ে হাজির হলাম ওই সঙ্কীর্ণ উপত্যকায়। আশপাশে ভালোমতো তাকালাম। তারপর বললাম সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকে, 'মনে হয় জায়গামতো হাজির হয়ে গেছি। কিন্তু কোনো সিবা গাছ তো চোখে পড়ছে না!'

'এতদিন পর চোখে না-পড়াটাই স্বাভাবিক। আমার মনে হয় অনেক আগেই মরে গেছে গাছটা, তারপর উল্টে পড়ে একসময় পচে মিশে গেছে মাটির সঙ্গে। চলো নামি ঘোড়া থেকে। এগুলোকে বেঁধে রাখি এখানেই কোথাও। তারপর ভালোমতো খুঁজে দেখি।'

"ভালোমতো" খুঁজতে গিয়ে যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে হলো আমাদেরকে। কারণ বইয়ে যদিও বলা হয়েছে জায়গাটা ন্যাড়া, কিন্তু কালের বিবর্তনে বিভিন্নরকমের অনেক গাছ গজিয়ে গেছে। বিশেষ

করে ফার্ণের ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে জায়গাটা। তারপরও, অনেক পুরনো একটা গাছ পচে নষ্ট হয়েছে এ-রকম একটা জায়গা খুঁজে বের করতে পারলাম আমি। ওই গাছ বা কাণ্ডের কোনোকিছুই অবশিষ্ট নেই এখন আর; শুধু মাটিতে বিশেষ কিছু বলয় দেখলে বোঝা যায় এককালে এখানে খসে পড়েছিল দানবীয় কোনো গাছ। সবুজ ফার্ণের সঙ্গে জড়াজড়ি করে চোখের প্রায় আড়ালে চলে গেছে বড় বড় শিকড়ের দু'-একটা, কোনোমতে মাথা উঁচু করে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

এই শিকড়গুলোর আশপাশে এক ঘণ্টার কিছু বেশি সময় ধরে খোঁজাখুঁজি করলাম আমরা। একসময় খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। শেষে হাল ছেড়ে দিলেন, সম্ভবত আশাও ছেড়ে দিলেন। এগিয়ে গেলেন একটা তালগাছের দিকে। ইচ্ছা, কিছু তাল নিয়ে গিয়ে লাগাবেন তাঁর বাগানে। তাঁর আবার বাগান করার খুব শখ।

নিজের কাজে ব্যস্ত আমি। বড় বড় ঘাস সরিয়ে দেখছি খনিমুখটা পাওয়া যায় কি না। কিন্তু কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। শেষপর্যন্ত ভাবতে শুরু করেছি চিরজীবনের জন্য হারিয়ে গেছে খনিটা, এমন সময় হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড, 'ইগনাশিয়ো! জলদি এসো এখানে!'

ছুটে গেলাম তাঁর কাছে।

একটা তালগাছের গোড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ানোমাত্র বললেন, 'এই গাছের শিকড়ের কাছটা ঢেকে আছে বড় বড় ঘাসে। ঘাসগুলো সরিয়ে দেখো। কারা যেন পাথর দিয়ে ঢালাই করে দিয়েছে কিছুটা জায়গা। হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মেরে কিছুটা পাথর ভেঙেছি আমি। আমার কাছে নিরেট মনে হচ্ছে না ভিতরটা। ইগনাশিয়ো, তোমার ওই খনির কাহিনি যদি সত্য হয় তা হলে আমার মনে হয় এই পাথরের আস্তরণ ভাঙলেই পাওয়া যাবে খনির প্ল্যাটফর্ম। তা ছাড়া মাটিও অন্য জায়গার মতো উঁচুনিচু

না এখানে, বরং খেয়াল করে দেখো বেশ সমতল। তারমানে বহুল ব্যবহারে ক্ষয়ে গিয়ে এমনটা হয়েছে।'

তালগাছের গোড়ার কাছটা খেয়াল করলাম ভালোমতো। ভুল বলেননি সিনর। আবার শুরু হলো আমাদের খোঁজ। সৌভাগ্যবশত একজায়গার ঢালাইয়ের গায়ে মোটামুটি বড় একটা ছিদ্র পাওয়া গেল। চিন্তিত ভঙ্গিতে ছিদ্রটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বললেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড, 'এখনও বুঝতে পারছি না গর্তটা কে বানিয়েছে—মানুষ না নেকড়ে। মানুষ বানিয়ে থাকলে এটাই কি সেই খনিমুখ?'

'ভিতরে না-ঢুকলে বোঝা যাবে না,' জবাব দিলাম আমি। 'খনিটা যখন বন্ধ করে দেয়া হয় তখন যারা ভিতরে কাজ করছিল তাদের জন্য বাতাস চলাচলের সুবিধার্থে এ-রকম ছিদ্র করা হয়েছিল সম্ভবত। সিনর, বড় কুড়ালটা কি নিয়ে আসবেন? ছিদ্রটা বড় করি।'

শুধু কুড়ালই না, একটা কোদালও নিয়ে এলেন সিনর। দু'জনে মিলে মিনিট দশেকের চেষ্টায় আরও বড় করলাম ছিদ্রটাকে। এখন এটাকে বড়সড় একটা গর্ত বলা যায়। আপাতদৃষ্টিতে খনিমুখ বলেই মনে হচ্ছে সুড়ঙ্গটাকে।

'আর কষ্ট করার দরকার নেই,' বললাম আমি, 'কেউ একজন অথবা একাধিক লোক আমাদের আগে তামার বাটালি চালিয়েছে এই জায়গায়। কিছু তামা রয়ে গেছে এখনও, অনেকদিন ধরে একভাবে পড়ে থেকে সবুজ রঙ ধারণ করেছে। সন্দেহ নেই খনিমুখটা অবশেষে খুঁজে পেয়েছি আমরা। হাতুড়ি আর মোমবাতিগুলো দিন আমার কাছে। নমুনা যোগাড় করার জন্য যে চামড়ার-ব্যাগটা নিয়ে এসেছি আমরা সেটা নিয়ে চলুন আমার সঙ্গে। ভিতরে ঢুকবো আমরা।'

চার

"হৃৎপিণ্ডের" লোককাহিনি

সুড়ঙ্গমুখ ধরে কয়েক কদম এগোনোর পরই হঠাৎ করে চওড়া হয়ে গেল গর্তটা। এবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে না আমাদের। মোমবাতি জ্বাললাম আমরা। আশপাশে তাকালে যে-কেউ বলতে পারবে অনেক পুরনো একটা খনির প্রবেশপথ এটা। তবে পরিকল্পিত উপায়ে না, বরং বেশ তাড়াহুড়ো করে খনন করা হয়েছে এই সুড়ঙ্গ। এঁকেবেঁকে সামনের দিকে গেছে, কিছুদূর পর পর বাঁক নিয়েছে।

এই সুড়ঙ্গ ধরে ত্রিশ কি চল্লিশ কদমের মতো এগোলাম আমরা। কোথাও পড়ে আছে পাথরের বড় বড় চাঁই, প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে পথ; দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে গিয়ে শরীর মুচড়ে এগোতে হয়েছে আমাদেরকে। ভাগ্য ভালো, আমি বা সিনর কেউই মোটা না। সুড়ঙ্গের ছাদ থেকে বিন্দু বিন্দু পানি বের হয়ে কোথাও আবার সৃষ্টি করেছে স্ট্যালেকটাইট বা ঝুলন্ত চুনের দণ্ড; সাবধানে পাশ কাটাতে হয়েছে সেগুলোকেও। এই স্ট্যালেকটাইটগুলো যেমন শক্ত, ক্ষেত্রবিশেষে তেমন ধারালো; মাথায় বাড়ি লাগলে আর দেখতে হবে না। শ্যাওলা পড়ে-যাওয়া মেঝের কোনো কোনো জায়গায় জন্মে আছে একইরকম স্ট্যালেকটাইট।

আমাদের পথ এখন বন্ধ। কারণ সুড়ঙ্গের ছাদ ধসে ছোট-বড় পাথরের টুকরো পড়তে পড়তে পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে পুরোপুরি। হতাশ দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক দেয়ালটার উপর নজর বুলিয়ে বললাম,

'সিনর, মনে হচ্ছে ফিরে যেতে হবে আমাদেরকে। চিত্রলিপির ওই বইটাতে বলা হয়েছে এই স্বর্ণখনি সমৃদ্ধ, কিন্তু নরম পাথরের কারণে বিপজ্জনক। আমাদের বহু আগে যারা চলাচল করেছে এই সুড়ঙ্গ দিয়ে, ছাদ যেসব জায়গায় সমস্যাযুক্ত বলে মনে করেছে সে-সব জায়গায় পাটাতনের ঠেস দিয়েছিল। কিন্তু যুগের পর যুগ ধরে আর্দ্রতার কারণে পচতে পচতে একসময় খসে পড়েছে পাটাতন, সেই সঙ্গে ধসে পড়েছে ছাদ।'

'হ্যাঁ,' আমার সঙ্গে একমত হলেন সিনর। 'শ্রমিকদের সাহায্য ছাড়া এই "দেয়াল" ভেদ করা শুধু আমাদের দু'জনের পক্ষে এককথায় অসম্ভব। তা ছাড়া ইগনাশিয়ো, আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করেছ কি না জানি না—ছাদের জায়গায় জায়গায় কিন্তু বড় বড় ফাটল ধরেছে। যে-কোনো সময় আবার ধস নামতে পারে। তখন যে বা যারা ভিতরে থাকবে, বেচারাদের জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে।'

তিনি কথাটা বলেছেন কি বলেননি, সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাদের খুলির সমান আকৃতির একখণ্ড পাথর সুড়ঙ্গের ছাদ থেকে খসে তাঁর পায়ের কাছে পড়ল।

'আস্তে কথা বলুন!' ফিসফিস করে বললাম আমি। 'তা না হলে শব্দের ধাক্কায় পুরো ছাদটাই ধসে পড়বে আমাদের মাথার উপর!'

খসে-পড়া পাথরটা কোনো আকরিকের টুকরো কি না দেখার জন্য নিচু হয়ে সেটা তুলতে গেলাম আমি। পাথরের বদলে তীক্ষ্ণ কিছু একটা লাগল আমার হাতে। তুলে নিলাম জিনিসটা। মোমবাতির শিখার সামনে ধরলাম। মানুষের চোয়ালের হাড়। কালের ছোবলে হলুদ হয়ে গেছে, আর্দ্রতার কারণে ক্ষয়ে গেছে। সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকে দেখালাম হাড়টা। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম দু'জনে।

মনোযোগ দিয়ে টানেলের মাটি দেখছি আমরা। খুলিটা খুঁজে পেতে বেশি সময় লাগল না। আর্মবোনের কিছু অংশও পাওয়া গেল। কঙ্কালটা খুঁজলাম, কিন্তু সন্ধান মিলল না।

'বেচারা!' ফিসফিস করে বললেন সিনর। 'লোকটা যখন বের হয়ে আসছিল খনি থেকে তখনই কোনো কারণে ধসে পড়ে এই জায়গার ছাদ। পাথরের নীচে জ্যান্ত কবর হয়ে যায় ওর।' মোমবাতির আলোয় চকচক করছে মাটিতে পড়ে-থাকা কিছু, সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'দেখো!'

তাকালাম। ছ'-সাত আউন্সের মতো খাঁটি সোনার তাল। কোনো এক ব্যাগে ছিল এককালে, পচে নষ্ট হয়ে গেছে ব্যাগটা, বেরিয়ে পড়েছে সোনার তালগুলো।

সন্দেহ নেই খনিটা বন্ধ করে দেয়ার পরও জনৈক অ্যাযটেক, যে এই গোপন খনির ব্যাপারে জানত, নিজের লাভের জন্যই আসা-যাওয়া করত এখানে। ওর পক্ষে যতটুকু সম্ভব সোনা নিয়ে যেত এখান থেকে। কিন্তু একদিন অজানা কোনো কারণে সুড়ঙ্গের ছাদ ধসে পড়ে লোকটার উপর, অপমৃত্যু হয় ওর। হয়তো আজও ওর আত্মা মুক্তির আশায় ছটফট করে বেড়াচ্ছে এই সুড়ঙ্গের কোনায় কোনায়। হয়তো আজও ওর মরণ-আর্তনাদে ভারী হয়ে আছে খনির ভিতরের বাতাস!

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। সচকিত দৃষ্টিতে ডানে-বাঁয়ে তাকালাম।

'সন্দেহ নেই খনিটা খুবই সমৃদ্ধ,' কানের কাছে সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের ফিসফিসানি শুনে চমকে উঠলাম, 'কিন্তু আমার মনে হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বের হওয়া উচিত এখান থেকে। তা না হলে এই হতভাগ্য লোকটার যে-অবস্থা হয়েছে আমাদেরও তা-ই হতে পারে। তুমি শুনতে পাচ্ছ কি না জানি না, সেই প্রথম থেকেই অদ্ভুত কিছু শব্দ আর গুড়গুড় আওয়াজ কিন্তু আসছে আমার কানে। সত্য বলতে কী, ভয় পাচ্ছি আমি। চলো, ইগনাশিয়ো,' বলে ঘুরলেন তিনি, এগিয়ে যাচ্ছেন সুড়ঙ্গমুখের দিকে।

কিন্তু দু'কদম এগোতে-না-এগোতেই সুড়ঙ্গের মাটি থেকে ইঞ্চি আটেক উপরে উঠে-থাকা এক টুকরো পাথরের সঙ্গে হোঁচট খেলেন

তিনি। এত জোরে যে, কোথায় আছেন ভুলে গিয়ে ব্যথায় গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। পরমুহূর্তেই চাপা গুড়গুড় আওয়াজ শুনতে পেলাম মাথার ঠিক উপরে, একচুল নড়ার আগে বিশাল এক পাথর খসে পড়ল আমার গা ঘেঁষে।

লোকের পায়ের নীচে পড়ে গুবরেপোকা যেভাবে ভর্তা হয়ে যায়, আরেকটু হলেই সে-অবস্থা হতো আমার। তবে পড়ার আগে আমার পিঠে ঘষা দিয়ে গেছে পাথরটা, প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছি। কিন্তু চেঁচিয়ে ওঠার আগেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছি মাটিতে। হাত থেকে ছুটে গিয়ে পাথরের নীচে পড়ে নিভে গেছে আমার মোমবাতি। সারা সুড়ঙ্গ ঢেকে গেছে আলকাতরার মতো কালো অন্ধকারে। সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড হয় মারা পড়েছেন, অথবা অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়ে থাকলেও গুরুতর আহত হয়েছেন।

তিনি যে বেঁচে আছেন তা টের পেলাম কিছুক্ষণ পর। হঠাৎ নিচু কণ্ঠে বললেন, 'ইগনাশিয়ো, বেঁচে আছো? ইগনাশিয়ো?'

জবাব দেয়ার আগে ভাবলাম কিছুক্ষণ। আসলেই কি বেঁচে আছি? পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা। হুমড়ি খেয়ে পড়ার সময় মাথার একপাশে জোরে বাড়ি খেয়েছি। আমাদের দু'জনের মাঝখানে পড়েছে বিশাল পাথরটা, একজনের কাছ থেকে আলাদা করে দিয়েছে আরেকজনকে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি উদ্ধার পাওয়ার কোনো আশা নেই আমার। এই সুড়ঙ্গের ভিতরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে সম্ভবত। সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড তো পরের কথা, দেবদূত এলেও আমাকে বাঁচাতে পারবে কি না সন্দেহ। কিন্তু আমি যদি সাহায্যের আবেদন জানাই সিনরের কাছে তা হলে আমাকে উদ্ধার করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবেন তিনি। ফলে তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট হবে। পরে আমার মতো হয়তো সারাজীবনের জন্য আটকা পড়তে হবে তাঁকেও। তারচেয়ে ভালো আমি মরি, তিনি বেঁচে থাকুন।

বললাম, 'পালান, সিনর। আমি ভালো আছি, নিরাপদে আছি। যাওয়ার আগে শুধু একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে যান, আর কিছু

লাগবে না। আপনার পিছন পিছন আসছি আমি।'

'মিথ্যা কথা বলছ,' শোনা গেল সিনরের গম্ভীর কণ্ঠ, 'পাথরের আড়াল থেকে আসছে তোমার গলার আওয়াজ। তার মানে আটকা পড়েছ তুমি। তা ছাড়া আমার মনে হয় তুমি মাটিতে পড়ে গেছ,' শুনতে পেলাম দেশলাই জ্বালাচ্ছেন তিনি।

কিছুক্ষণ পর জ্বলে উঠল একটা মোমবাতি। হাঁটু গেড়ে বসে পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে আমার দিকে তাকালেন সিনর। এরপর তাকালেন সুড়ঙ্গের ছাদটার দিকে যেখান থেকে খসে পড়েছে বিশাল পাথরটা। পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা, তাই চিত হতে পারছি না; কোনোরকমে ঘাড় ঘুরিয়ে আমিও তাকালাম সেদিকে।

যে-পাথরটা খসে পড়েছে সেটা আসলে এককালে সুড়ঙ্গ-ছাদেরই অংশ ছিল। যেখান থেকে খসে পড়েছে সেখান থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরছে এখন। তার মানে বছরের পর বছর ধরে পানি জমতে জমতে আলগা করে দিয়েছে পাথরটাকে। আজ না-হোক কাল এমনিতেই খসে পড়ত, সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের প্রচণ্ড চিৎকারের কম্পনে ঘটে গেছে ঘটনাটা।

'ঈশ্বরের দোহাই লাগে পালান,' ফিসফিস করে বললাম আমি। 'আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাকি ছাদটাও ধসে পড়বে আমার উপর। আমাকে কোনো সাহায্যই করতে পারবেন না আপনি। ধরে নিন মারা গেছি আমি। চলে যান, সুড়ঙ্গমুখটা খোলা আছে এখনও। এখানে থাকলে আমার মতো অবস্থা হবে আপনারও।'

মাত্র একটা মুহূর্ত ইতস্তত করলেন তিনি। তারপর দেখে মনে হলো সাহস ফিরে পেয়েছেন। কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'বন্ধু, এই জায়গায় একসঙ্গে ঢুকেছি আমরা। বের হলে একসঙ্গেই বের হবো। যদি না-পারি তা হলে বের হবো না কেউই। কী করা উচিত ভেবে বের করতে দাও আমাকে

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। মোমবাতির আলোয় দেখছেন খসে-পড়া পাথরটা। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' বললেন অবশেষে, 'আশা

আছে। বোল্ডারটা কোথায় পড়েছে জানো? আমি যে-পাথরের সঙ্গে হোঁচট খেয়েছি ঠিক সেটার উপর। নীচের পাথরটা মনে হয় আরও বড়, আরও শক্ত; তাই একটুও ভাঙেনি। সম্পূর্ণ অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছ তুমি, ইগনাশিয়ো। কী মনে হয় তোমার? কোনো হাড় ভেঙেছে?'

'জানি না, সিনর। প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছি পিঠে। টের পাচ্ছি আস্তে আস্তে মারা যাচ্ছি। ...আমার হাড় ভাঙুক বা না-ভাঙুক, আপনার সব হাড় তো আস্ত আছে, নাকি? আবারও মিনতি করছি সময় থাকতে পালান।'

'শুধু শুধু মিনতি কোরো না। লাভ হবে না। তোমাকে রেখে আমি যাবো না। ...আমার মনে হয় পাথরটা তোমার পিঠ ঘেঁষে পড়েছে বলেই প্রচণ্ড ব্যথায় কাবু হয়ে গেছ। তবে বড় কোনো সমস্যা হয়নি। দেখি ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরানো যায় কি না পাথরটা। তা হলে শরীর বাঁকিয়ে-মুচড়ে যে-কোনোভাবেই হোক বাইরে বের হয়ে আসতে পারবে।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি। প্রাণপণে ঠেলা দিতে লাগলেন ভারী পাথরটাকে। কিন্তু লাভ হচ্ছে না। সিনর কেন, পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষেই এত বড় পাথর ঠেলে সরানো সম্ভব না। যেখানে যেভাবে ছিল সেটা, সেখানে সেভাবেই পড়ে থাকল। সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড গলদঘর্ম হলেন।

'না, হবে না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন তিনি। 'বাইরের সাহায্য লাগবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সিনর, আমিও তো একই কথা বলছি প্রথম থেকেই। যান, গিয়ে লোক ডেকে আনুন।' ভালোমতোই জানি গ্রামে ফিরে গিয়ে লোক নিয়ে আসতে আসতে ছাদের বাকিটাও ধসে পড়বে আমার উপর। প্রার্থনা করছি প্রথম আঘাতেই যেন মরণ হয় আমার। তা হলে এত ভুগতে হবে না।

এমন সময় হঠাৎ করেই একটা কথা মনে হলো। বললাম,

'যাওয়ার আগে একটা কথা শুনবেন, সিনর? আপনাকে একটা জিনিস দিতে চাই আমি। আশা করি মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুর শেষ উপহার মনে করে গ্রহণ করবেন জিনিসটা। তবে আমি তো নড়তে পারছি না, আপনাকেই একটু কষ্ট করে আমার গলা থেকে খুলে নিতে হবে সেটা। ছোট্ট একটা চেইনের মতো...আসলে একটা কবচ। ...হ্যাঁ, হয়েছে, খুলেছে...এবার আরেকটু কষ্ট করে হাত বাড়িয়ে টেনে নিন আপনার দিকে। হয়তো খেয়াল করেছেন ইতোমধ্যে, বিশেষ আকৃতিতে কাটা একটা পান্না লাগানো আছে কবচটাতে। ওটা আসলে একটা প্রতীক। কীসের প্রতীক জানানোর সময় নেই। শুধু বলে রাখি, কখনও যদি কোনো ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে কোনো ঝামেলা হয় আপনার, ওদের সর্দারের কাছে গিয়ে এই কবচটা দেখাবেন। সঙ্গে সঙ্গে যাদুমন্ত্রের মতো কাজ হয়ে যাবে। আপনার গোলাম হয়ে যাবে ইণ্ডিয়ানরা। দরকার হলে আপনার জন্য জান দিয়ে দেবে।'

'কিন্তু...' আমার সেই বিশেষ লকেটটা হাতে নিয়ে ইতস্তত করছেন সিনর, আসলে এই অবস্থায় এ-রকম কিছু পেয়ে যাবেন কল্পনাও করেননি তিনি।

তাঁর দ্বিধা কাটানোর জন্য সংক্ষেপে বললাম, 'শুনে হয়তো আশ্চর্য লাগবে আপনার, কিন্তু জেনে রাখুন, ওই কবচটা যতদিন থাকবে আপনার কাছে ততদিন প্রত্যেক ইণ্ডিয়ানের হৃদয়ে অ্যাযটেক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকবেন আপনি। সারা মেক্সিকোতে বিশাল এক ভ্রাতৃসঙ্ঘ আছে আমাদের, সেই সঙ্ঘের নেতা হয়ে থাকবেন। ...মোলাস, মানে কাল রাতে আমার কাছে যে-দূত এসেছে, গ্রামে আমার বাড়িতে পাবেন ওকে। ওর কাছ থেকে সব জানতে পারবেন। আমাকে উদ্ধার করার আশা বাদ দিন। এই স্বর্ণখনি তো চেনা হয়েই গেল, এবার গিয়ে হাজির হোন মোলাসের কাছে। আমাকে যেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিল সে, ওর সঙ্গে সেখানে যান। আমি নিশ্চিত, গিয়ে যা দেখতে পাবেন তা এই

স্বর্ণখনির চেয়ে কোনো অংশে কম চমকপ্রদ না। ...বিদায়; বন্ধু বলে ডেকেছেন তাই আমিও বলছি—বিদায় বন্ধু। প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন আপনার সঙ্গে থাকেন। ইণ্ডিয়ানদেরকে জানাবেন কীভাবে মারা গেছি আমি। আপনার কথা বিশ্বাস করবে ওরা, আপনাকে আমার খুনি বলে ভেবে নিয়ে চরম ভুল করবে না।'

সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড কিছু বললেন না। কবচটা পকেটে ঢুকালেন। মোমবাতিটা নামিয়ে রেখেছিলেন মাটিতে, সেটা তুলে নিলেন। সতর্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে একসময় বের হয়ে গেলেন সুড়ঙ্গ থেকে।

মিথ্যা বলবো না—সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড চলে যাওয়ামাত্র আমার সব আশা, তেল ফুরিয়ে আসা কুপির মতো দপ করে নিভে গেল। ভেবেছিলাম চলে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো অন্তত বিদায় শব্দটা উচ্চারণ করবেন তিনি, কিন্তু তা-ও যখন করলেন না তখন ধরেই নিলাম প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন, তাই কথা বলতে চাচ্ছেন না। কী আর করা? পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে পড়ে থাকলাম একভাবে। মনে মনে বললাম, 'পালিয়ে গিয়ে ঠিকই করেছে লোকটা। এখানে থেকে করবে কী? আমাকে উদ্ধার করা সম্ভব না ওর পক্ষে। যে-কাজ সম্ভব না তা করতে গিয়ে অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দেয়ার মতো বোকামি আর যারাই করুক, অন্তত ইউরোপিয়ানরা করবে না।'

পরে জানতে পারি সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছিলাম। তিনি আসলে ভাবছিলেন আমাকে কীভাবে উদ্ধার করা যায়। কিন্তু পুরো এলাকাটাই পাহাড়ি, জনবসতি বলতে গেলে নেই; যারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে এখানে তাদের কাউকেই সিনর চেনেন না। আবার কুমার্ভোতে গিয়ে সাহায্য নিয়ে ফিরে আসতে আসতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে।

খনির বাইরে বের হয়ে বসে পড়েন তিনি, কী করা যায় ভাবতে শুরু করেন। পাথরটা শক্ত দড়ি দিয়ে কায়দা করে বেঁধে ঘোড়া দিয়ে টানানো যেতে পারত, কিন্তু যে-সুড়ঙ্গে মানুষের ঢুকতে কষ্ট হয়

সেখানে ঘোড়া ঢুকবে কী করে? হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ান তিনি, মরিয়া হয়ে তাকাতে শুরু করেন এদিকে-সেদিকে। দেখতে পান, কাছেই এক গভীর সঙ্কীর্ণ উপত্যকা। এর জায়গায় জায়গায় খানাখন্দ, সেগুলোতে জমে আছে বৃষ্টির পানি। এককোনায় জন্মে আছে ছোট একটা মিমোসা গাছ। এর দীর্ঘ শেকড়গুলোর প্রায় সব কাঁটা বন্যার পানিতে উধাও। গাছটা দেখামাত্র আশা জাগল সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের মনে। গাছের কাণ্ড যদি ব্যবহার করা যায় লিভার হিসেবে তা হলে পাথর কিছুটা হলেও সরানো যাবে। আর পাথর কিছুটা সরাতে পারলেই হয়তো উদ্ধার করা সম্ভব হবে আমাকে।

সঙ্গে করে আনা কুড়াল দিয়ে গাছটা কেটে ফেললেন তিনি। এরপর বড় হান্টিং নাইফ দিয়ে কুপিয়ে আলগা করলেন অপ্রয়োজনীয় ডাল-পাতা। মিমোসার কাণ্ডটাকে টানতে টানতে হাজির হলেন খনিমুখের কাছে, ঢুকে পড়লেন সুড়ঙ্গে। গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগলেন, পেছন পেছন টেনে আনছেন কাণ্ডটাকে। বিশ ফুটের মতো এগোতে-না-এগোতেই শুনতে পেলেন ছাদের আরও কিছুটা অংশের ধসে পড়ার আওয়াজ। তাঁর এগোনোর গতি আরও দ্রুত হলো তখন।

যেখানে পড়ে আছি আমি সেখানে হাজির হলেন তিনি। তিনি এসেছেন টের পাওয়ার পরও কিছু বললাম না। মড়ার মতো পড়ে থাকলাম যাতে তাঁর মনে হয় আমি মরে গেছি। কিন্তু সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড হাল ছাড়ার পাত্র না। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'বেঁচে আছো, ইগনাশিয়ো?'

প্রথমে ভাবলাম কিছু বলবো না। তাই চুপ করে থাকলাম।

তখন প্রশ্নটা আবার জিজ্ঞেস করলেন সিনর।

এবার ভনিতা করে নিচু কণ্ঠে বললাম, 'আমি কি ভূত দেখছি? নাকি আসলেই ফিরে এসেছেন আপনি?'

'আমি ফিরে এসেছি, ইগনাশিয়ো। সঙ্গে করে একটা লিভার নিয়ে এসেছি। এবার সময় নষ্ট না-করে আমার পরিকল্পনাটা

শোনো। কোনো কিছুর সঙ্গে ঠেস দিয়ে লিভারটা ব্যবহার করবো। আমার মনে হয় পাথরটা সামান্য নড়লেই বের হতে পারবে তুমি। তবে একটু কষ্ট করতে হবে তোমাকে। শরীর বেঁকেচুড়ে যেভাবেই পারো বাইরে আসার চেষ্টা কোরো।'

লিভারটা কোথায় বসালেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড, অন্ধকারে দেখতে পেলাম না। টের পেলাম, সর্বশক্তিতে বল প্রয়োগ করছেন তিনি লিভারের অপরপ্রান্তে। প্রথমে লাভ হলো না। শক্তি অপচয় করছেন টের পেয়ে অনুমানের উপর ভর করে বললাম, 'আপনি বরং একটু ডানদিকে চেষ্টা করে দেখুন।'

জায়গা বদল করে লিভারটা আরেকদিকে স্থাপন করলেন সিনর। মটমট শব্দ হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে আবারও শরীরের সব শক্তি প্রয়োগ করছেন তিনি। খুব খুশি লাগছে আমার, কারণ টের পাচ্ছি কিছুটা হলেও উঠতে শুরু করেছে ভারী পাথরটা। ইতোমধ্যে সরে গেছে কয়েক ইঞ্চি, অতি সামান্য হলেও ফাঁক তৈরি হয়েছে।

'এবার তোমাকে কসরত করতে হবে, ইগনাশিয়ো,' দাঁতে দাঁত চেপে কোনোরকমে বললেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। 'যেভাবে পারো বের হয়ে এসো। যদি না-পারো তা হলে...আর কোনোদিনই পারবে না।'

তাঁর শেষের কথাটা যেন বিছার হুলের মতো বিদ্ধ হলো আমার গায়ে। বাঁকানো লাঠির মাথায় সাপ ধরলে তা যেভাবে শরীরটা মোচড়াতে থাকে, সেভাবে কোনোরকমে বের হয়ে এলাম পাথরের আড়াল থেকে। ভাবলে আজও আশ্চর্য লাগে, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মানুষ কত অসম্ভব কাজই না করতে পারে! পিঠের প্রচণ্ড ব্যথা ভুলে গিয়েছিলাম, ওই বিশাল পাথর আর সুড়ঙ্গের দেয়ালের মাঝখানে মাত্র আট থেকে দশ ইঞ্চি জায়গা থাকার পরও বাইরে আসতে সক্ষম হয়েছিলাম।

বের হয়েছি কি হইনি, সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের ঘামেভেজা হাত থেকে পিছলে গেল লিভারটা। সঙ্গে সঙ্গে আগের জায়গায় আছড়ে পড়ল জগদ্দল পাথর। ভারী একটা কম্পন জাগল সুড়ঙ্গের ভিতরে।

পড়ে যাচ্ছিলাম, আমাকে খামচে ধরে ফেললেন সিনর। একটানে খাড়া করে দিলেন দু'পায়ের উপর। ততক্ষণে আমার এক পায়ের বুটের গোড়ালি পাথরের নীচে চাপা পড়ে হ্যাঁচকা টানে খুলে আলগা হয়ে গেছে। এসব দেখার সময় নেই, আবার পিঠের ব্যথার কারণে ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারছি না। তাই বললাম, 'সিনর, আমাকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। আমি হাঁটতে পারবো বলে মনে হয় না।'

কোনো কথা না-বলে মোমবাতিটা আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। নিচু হয়ে কাঁধে তুলে নিলেন আমাকে। তারপর টলমল পায়ে এগোতে লাগলেন সুড়ঙ্গমুখের দিকে। সাত কি আট কদম এগোনোমাত্র, আমি যে-জায়গায় পড়ে ছিলাম সেখানে ধসে পড়ল ছাদের বাকিটা। কোনোরকমে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, ছোট-বড় পাথরের স্তূপে পরিণত হয়েছে ওই জায়গা।

'ওহ!' বললাম আমি, 'আমাদের মাথার উপরের পাথরেও ফাটল দেখা দিয়েছে!'

শোনামাত্র চলার গতি বাড়ল সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের। আমাকে কাঁধে নিয়ে যতটা দ্রুত সম্ভব এগোতে লাগলেন সুড়ঙ্গমুখের দিকে। আর কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই আমরা বের হয়ে আসতে পারলাম ভয়ঙ্কর ওই সুড়ঙ্গের বাইরে।

জীবন বাঁচানোর জন্য মাথা নুইয়ে কৃতজ্ঞতা জানালাম সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকে। তারপর মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ঈশ্বরের শপথ, সিনর, আপনার মতো মহৎপ্রাণের কোনো লোক আজ পর্যন্ত দেখিনি।'

কথাটা বলার পর পরই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম আমি।

ওই অভিশপ্ত খনি থেকে একটা পালকিতে করে আমাকে কুমার্ভোতে নিয়ে আসার পর দশ দিন কেটে গেছে। এই ক'টা দিন খুবই অসুস্থ ছিলাম। একরকম সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে ছিলাম। পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা ছাড়া আর তেমন কিছু টের পাইনি। আমার সঙ্গে কাউকে দেখা

করার অথবা কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়নি।

তবে এখন কিছুটা সুস্থ বোধ করছি। কিছুক্ষণ আগে সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে আমার সৎ ভাই মোলাস। দু'জনে মিলে ধরাধরি করে বিছানা থেকে নামিয়েছেন আমাকে। একটা দোলনা-বিছানায় শুইয়ে দিয়েছেন।

সিনর বললেন, 'তুমি এখন মোটামুটি সুস্থ, ইগনাশিয়ো। তোমার সঙ্গে একটা বিষয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি।' গলা থেকে সেই কবচটা খুললেন তিনি। 'কী অদ্ভুত জিনিস! এ-রকম কোনোকিছু আগে কখনও দেখিনি। আচ্ছা, সুড়ঙ্গের ভিতরে তুমি বলেছিলে, এটা আমার সঙ্গে থাকলে আমি নাকি ইণ্ডিয়ানদের নেতা হয়ে যাবো। কথাটা কি আসলেই ঠিক? নাকি প্রচণ্ড ব্যথায় অস্থির হয়ে উল্টোপাল্টা বলে ফেলেছ?'

আমি বললাম, 'দরজাটা কি বন্ধ, সিনর?'

'হ্যাঁ।'

'বারান্দায় কেউ নেই তো?'

'না। কেন?'

'কারণ আপনার প্রশ্নের জবাবে এমন কিছু কথা বলতে চাই যা অন্য কেউ শুনে ফেললে সমস্যা হতে পারে। চেয়ারটা টেনে আরেকটু কাছে এসে বসুন। হ্যাঁ, এবার শুনুন।

'কবচটা আসলে মানুষের হৃদপিণ্ডের আদলে কাটা একটা পান্নার অর্ধেক অংশ। এটা বিশেষ একটা ভ্রাতৃসঙ্ঘের গোপন প্রতীক। সংক্ষেপে বলছি, তাই বোঝার সুবিধার্থে ধরে নিন আমাদের সঙ্ঘের নাম "হার্ট"। আর আমি এতদিন ছিলাম লর্ড অভ দ্য হার্ট। যেহেতু আমি স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে আপনাকে দিয়েছি কবচটা এবং আপনিও গত দশদিন থেকে পরে আছেন সেটা, সেহেতু নিয়মানুযায়ী এখন আপনিই আমাদের সেই সঙ্ঘের নেতা।

'যদি সময় ও সুযোগ পাই, যদি আপনার সম্মতি থাকে তা হলে আনুষ্ঠানিকভাবে আপনাকে নেতা বানানো হবে। আপনার সে-

অধিকার আছে। তবে তার আগে আপনাকে "হৃৎপিণ্ডের লোককাহিনি" জানাতে চাই। জানানোটা আমার কর্তব্য।

'কিন্তু সবকিছুর আগে একটা কথা জেনে রাখুন। যে বা যারা এই হৃৎপিণ্ডের দাস বা সেবক যা-ই বলি না কেন, তাদের প্রথম এবং অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হচ্ছে, নীরবতা ও গোপনীয়তা। ইউরোপের ধর্মবিচারসভায় যারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তাদেরকে কত কারাগারে, কত ডানজনে বন্দি করে রেখে দিনের পর দিন ধরে চরম নির্যাতন করা হয়েছে, কিন্তু লোকগুলো কোনোদিন দলের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। কাউকে কাউকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, তারাও টুঁ শব্দটা পর্যন্ত করেনি। আমাদের এই সঙ্ঘের নিয়মও একই রকম। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, যদি কোনোদিন ধরা পড়েন শত্রুদের হাতে, যত অত্যাচারই করুক ওরা, দলের কোনো গোপন কথা ফাঁস করতে পারবেন না। বুঝতে পেরেছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। 'কিন্তু ধরো ফাঁস করে দিলাম। তখন কী হবে?'

'এমন একটা জগৎ আছে যেখানে অতি-বাচালরাও বোবা হয়ে যায়। এই পৃথিবীতে যে যত বড় ক্ষমতাবানই হোক না কেন, একদিন-না-একদিন সে-জগতে যেতে হবে সবাইকেই। এমনকী লর্ড অভ দ্য হার্টকেও। কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তা হলে আমাদের বিশ্বাস, অন্যদের আগে সে-জগতে ঠাঁই হবে লোকটার।'

'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ, তোমাদের কোনো গোপন কথা যদি ফাঁস করি আমি তা হলে হত্যা করা হবে আমাকে?'

'না, হত্যা করা হবে না। হত্যা করার দরকার পড়বে না। আপনার গলায় যে-কবচটা ঝুলছে তার অভিশাপ নামবে আপনার উপর। আমাদের কাউকে কিছু করতে হবে না, আপনাথেকেই ধ্বংস হয়ে যাবেন আপনি। চরম ক্ষতি হবে আপনার।'

'আচ্ছা?' দেখে মনে হচ্ছে কিছুটা হলেও ঘাবড়ে গেছেন সিনর

স্ট্রিকল্যাণ্ড।

'তা হলে শপথ করুন, আজ এবং আজকের পর যা যা দেখবেন ও শুনবেন, আমাদের সঙ্ঘের সদস্য না এমন কেউ তা জানতে পারবে না আপনার কাছ থেকে।'

শপথ করলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড।

'খুব ভালো,' বলে চললাম আমি, 'যেহেতু আন্তরিকভাবেই শপথ করেছেন সেহেতু "হৃৎপিণ্ডের লোককাহিনি" আপনার কাছে বর্ণনা করতে অসুবিধা নেই। তবে একটা কথা বলে রাখি, এই কিংবদন্তি কতখানি সত্য তা নিশ্চিত করে বলতে পারবো না।'

'ঠিক আছে। এবার বলো তোমার কাহিনি।'

'লোকটাকে ইণ্ডিয়ানদের কেউ কেউ কুইটযাল আবার কেউ কেউ কুকুমাট্য নামে ডাকে,' বলতে লাগলাম। 'শুনেছেন নামটা কখনও? আজ থেকে অনেক অনেক বছর আগে এই দেশে এসেছিলেন তিনি। অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইণ্ডিয়ানদের মনে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। ধর্মের অন্ধবিশ্বাস আর কুপ্রভাব থেকে বের করে আনেন সহজ-সরল লোকগুলোকে। তারপর একদিন এক জাহাজে সওয়ার হয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে যান। যাওয়ার আগে বলে যান, অনেক বছর পর আবার ফিরে আসবেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম যখন বন্দি হয়ে যাবে পরাধীনতার শিকলে, তখন। এসে সাহায্য করবেন নির্যাতিত লোকদেরকে।

'তিনি যে-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁর অন্তর্ধানের পর তা দখল করে নেয় দুই ভাই। এই সাম্রাজ্যের প্রধান শহর ছিল প্যালেঙ্ক অথবা তার আশপাশের কোনো শহর। অধিবাসীরা, খ্রিস্টানদের মতোই একেশ্বরবাদী ছিল। সেই ঈশ্বরের নাম "হার্ট অভ হেভেন"। তাঁর নামে ফুল-ফল ছাড়া আর কিছু উৎসর্গ করা হতো না। যে দুই ভাইয়ের কথা বললাম, তাদের একজন এমন সময় বিয়ে করল এক ভিনদেশী মেয়েকে। মেয়েটা যেমন সুন্দরী, তার স্বভাব-চরিত্র তেমন খারাপ। লোকে বলে, সে নাকি আসলে ডাইনি ছিল।

'এই ডাইনিটা ছলে-বলে-কৌশলে ভুলিয়ে আস্তে আস্তে হাত করল তার স্বামীকে। প্রচার করল, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সামান্য ফুল-ফল বলি দিয়ে নাকি মহাপাপ করা হচ্ছে। এই পাপ কাটানোর একটাই উপায়—মানুষ বলি দিতে হবে। সারা দেশে তখন শুরু হলো চরম ধর্মীয় বিশৃঙ্খলা। দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল সাধারণ লোকজন। একদল ওই ডাইনির পক্ষে। ওরা বলতে লাগল, "রানি" মানে আসলে ডাইনি যা বলছে তা-ই ঠিক। আরেকদল সনাতনী পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইল—অর্থাৎ "হার্ট অভ হেভেন"-এর পক্ষে থাকতে চাইল।

'প্রথমে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, তারপর হট্টগোল, শেষে লেগে গেল মারামারি। রীতিমতো যুদ্ধ আর কী। নিহত হলো অনেক লোক, মারা পড়লেন অনেক সর্দার। সমঝোতায় আসা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখলেন না বড় বড় নেতারা। ফলাফল যা হওয়ার তা-ই—দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল দেশটা। যে ভাই মানে রাজা বিয়ে করেছেন ওই ডাইনিকে তাঁর নেতৃত্বে একদল চলে গেল উত্তরদিকে। অ্যাযটেক আর অন্যান্য মেক্সিকান উপজাতির পূর্বপুরুষ এরাই। আরেকদল, মানে যারা হার্ট অভ হেভেনের একনিষ্ঠ দাস, তারা রয়ে গেল মূল ভূখণ্ডে। তখন থেকে ওই দেশের নাম হয়ে গেল টোবাস্কো।

'কিন্তু আলাদা হয়েও শয়তানি করা থেকে বিরত হলো না ডাইনিটা। নানা ষড়যন্ত্র শুরু করল সে টোবাস্কোর শান্তিপ্রিয় মানুষদের বিরুদ্ধে। এবং সফলও হলো। আস্তে আস্তে অ্যাযটেকদের ধর্ম প্রাধান্য বিস্তার করল দুই দেশেই। একসময় টোবাস্কোও চলে গেল অ্যাযটেকদের অধীনে। তারপর স্প্যানিয়ার্ডরা এল এদেশে, বন্দুকের ক্ষমতায় দখল করল পুরো দেশ। আশ্চর্যের ব্যাপার, এবং একইসঙ্গে খুবই দুঃখের ব্যাপার, এই দেশের লোকেরা তখন যদি মানুষ বলি দেবে কি দেবে না এই বিষয়ে বিভক্ত না থাকত তা হলে হয়তো একসঙ্গে মিলে ঠেকাতে পারত দখলদার স্প্যানিয়ার্ডদেরকে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? দেশের ভালোমন্দ নিয়ে ভাবে ক'জন?

স্প্যানিয়ার্ডরা বোধহয় খোঁজখবর করেই এসেছিল। অথবা আসার পর সবকিছু জানতে পেরেছিল। প্রথমে অ্যাযটেকদের কাবু করল ওরা। তারপর অ্যাযটেকদের সঙ্গে নিয়ে দুর্দমনীয় টোবাস্কোবাসীদের পরাস্ত করল। হার্ট অভ হেভেনের উপাসকরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো বনেজঙ্গলে। অনেকে জান বাঁচানোর তাগিদে ধর্মান্তরিত হলো। আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান হলো, সনাতনী সেই ধর্মের বিনাশ ঘটেছে। ওই ধর্মটা তখন পরিণত হলো গোপন আর একরকম নিষিদ্ধ এক ধর্মে। অনুসারীরা হয়ে গেল গোপন এক সংগঠনের সদস্য।'

'কিন্তু এ-সবের সঙ্গে এই কবচের সম্পর্ক কী?' সিনরের কণ্ঠে অস্থিরতা।

'সবই জানতে পারবেন, একটু ধৈর্য ধরে শুনতে থাকুন। এই কবচটা, বলা ভালো পান্নাটা আসলে ছিল কুইটযালের। তিনি এটা পরতেন কপালে। চলে যাওয়ার আগে অনুসারীদেরকে এটা দিয়ে যান তিনি। বলে যান, যতদিন এই হৃদয়ের দুটো অংশ একসঙ্গে থাকবে ততদিন তাঁর অনুসারীরা একত্রিত থাকবে। যদি কোনো দুর্ঘটনায় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে আলাদা করে ফেলা হয় টুকরো দুটো, তা হলে দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে সবাই। আবার যতদিন পর্যন্ত না জোড়া দেয়া হবে টুকরো দুটো ততদিন আলাদাই থাকবে একদল আরেকদলের কাছ থেকে।

'ঘটনাক্রমে ওই পান্নাটা গিয়ে পড়েছিল দুই ভাইয়ের কাছে। মারামারি করে আলাদা হয়ে যাওয়ার সময়, অন্য সবকিছুর মতো এই টুকরো দুটোও ভাগাভাগি করে নিতে চাইল ওরা। উত্তরাধিকারসূত্রে একটা টুকরো আমার কাছে চলে আসে। কেউ হয়তো শুয়ে আছে মৃত্যুশয্যায়, বড় ছেলেকে ডেকে নিয়ে তার হাতে ধরিয়ে দিল পান্নাটা। আবার কেউ হয়তো দিতে পারল না, মরার পর তার গলা থেকে খুলে নেয়া হলো সেটা। এভাবেই চলে আসছে শত শত বছর ধরে।

'মূল কথা হচ্ছে, যখনই যার হাতে গেছে এই পান্না, ধরে নেয়া যায় ওই লোকই ছিল তখনকার রাজা। এভাবে একদিন শেষ অ্যাযটেক সম্রাট গুয়াটেমকের হাতে গিয়ে পড়ে পান্নাটা। তারপরের কাহিনিটা জানেন কি না জানি না। স্প্যানিয়ার্ডরা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে তাঁকে। কিন্তু মরার আগে তিনি লোক মারফত পান্নাটা পাঠিয়ে দেন তাঁর ছেলের কাছে। তারপর একদিন জিনিসটা হাতে পাই আমি।'

'তুমি!' আশ্চর্য হয়ে গেছেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। 'তোমার সঙ্গে গুয়াটেমকের সম্পর্ক কী?'

'বিশ্বাস করুন বা না-করুন, আমি তাঁর বংশধর। আমাদের বংশলতিকায় আমি, আমার বাবা, আমার দাদা এভাবে যেতে থাকলে এগারো পুরুষ আগে মহান গুয়াটেমকের নাম পাওয়া যায়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। খবরটা হজম করতে সময় লাগছে তাঁর। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। একসময় ছোট করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'অথচ অতি সাধারণ এক খনি-শ্রমিকের ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে তোমাকে বছরের পর বছর! আফসোস! ইণ্ডিয়ানদের মুকুটহীন সম্রাট হয়েও কত সাদাসিধা জীবন তোমার!'

'হ্যাঁ, আমার কাহিনিও বলবো। তবে তার আগে এই পান্নার গল্পটা শেষ করি। দেখুন, এতগুলো বছর পার হয়েছে কিন্তু পান্নাটা হারিয়ে যায়নি। আমরা যারা শেষ অ্যাযটেক সম্রাটের বংশধর তাদের মধ্যেই রয়ে গেছে। এই দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে যেখানেই যান না কেন এমন অনেক লোক পাবেন যারা এই কবচের গল্প জানে, এটাকে মহাপবিত্র কিছু একটা বলে বিশ্বাস করে। যার গলায় এটা থাকে তাকে "হৃৎপিণ্ডের রক্ষক" এবং "অপেক্ষমাণদের আশা" বলে ডাকে। বলাবলি করে, একদিন না একদিন পান্নার দুটো টুকরো আবার একসঙ্গে হবেই।'

'কেন? এরকম বিশ্বাসের কারণ কী? পান্নার টুকরো দুটো

একসঙ্গে হলেই বা কী লাভ?'

'ইণ্ডিয়ানদের বিশ্বাস, পান্নার টুকরো দুটো যেদিন একসঙ্গে হবে সেদিন আবার শক্তিশালী এক জাতিতে পরিণত হবে তারা। সমুদ্র পার হয়ে এসে যারা এদেশকে উপনিবেশ বানিয়েছে তাদেরকে, ঝোড়ো বাতাস যেভাবে ধুলো উড়িয়ে নিয়ে যায় সেভাবে তাড়িয়ে দিতে পারবে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সিনর। পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন ঘরময়। হঠাৎ করেই জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্য করে বলো তো ইগনাশিয়ো, এসব বিশ্বাস করো তুমি?'

'হ্যাঁ, করি। তবে সবটা না, বেশিরভাগ। আমাদের জন্য আশার কথা কী জানেন? কবচটার বাকি অর্ধেকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এবং সেটা এই মেক্সিকোতেই আছে। একটু সুস্থ হলেই সেটার খোঁজে বের হবো আমি।'

'কার কাছে আছে টুকরোটা?'

হেঁয়ালি করে বললাম, 'যার কাছে থাকার কথা তার কাছেই আছে। আমাকে খোঁজার জন্যই অনেকদূর থেকে এসেছে সে। যতখানি এসেছে তার বেশি আসাটা বোধহয় সম্ভব না ওই লোকের পক্ষে। তাই বাকি পথ আমাকেই অতিক্রম করতে হবে। আর সে-জন্যই আপনার কাছ থেকে আলাদা হতে হবে আমাকে।'

'কোত্থেকে এসেছে এই লোক?' জিজ্ঞেস করলেন সিনর, তাঁর কণ্ঠে আগ্রহ।

'নিশ্চিত করে বলতে পারবো না। তবে আমার মনে হয় ইণ্ডিয়ানদের যে-গোপন শহর আছে, যে-শহরটা অনেক খুঁজেও বের করতে পারেনি স্প্যানিয়ার্ডরা, সেখান থেকে এসেছে। ইণ্ডিয়ানরা ওই শহরের নাম দিয়েছে স্বর্ণশহর। শহরটা আজও প্রবাদ বা উপকথার মতো হয়ে আছে আমাদের কাছে। কারণ লোকে শুধু গল্প করে সেটার, কেউ জানে না আসলে কোথায় আছে শহরটা। কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতেও পারবে না আসলেই আছে কি না। হয়তো

অনেক পর্বত, অনেক মরুভূমি পার হয়ে যেতে হয় সেখানে। আমি আসলে...ঠিক জানি না। তবে ওই লোকের সঙ্গে সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা আছে আমার।'

'স্বর্ণশহর! ইগনাশিয়ো, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এসব আসলে ইণ্ডিয়ানদের কিচ্ছাকাহিনি। ও-রকম কোনো শহর কোনোকালে ছিলও না, কোনোদিন হবেও না। থাকলে ধূর্ত স্প্যানিয়ার্ডরা অনেক আগেই তার সন্ধান বের করে ফেলত।'

'আমিও ভেবে দেখেছি ব্যাপারটা। কিন্তু ধূর্ত লোকেরা কি সবসময় সবকিছু খুঁজে বের করতে পারে? তাদের দৃষ্টির বাইরে কি কিছুই থাকে না? ...আমার পরিচিত এক লোক আছে। বিশ্বস্ত লোক, বানিয়ে কিছু বলার মতো না। আমার কাছে একাধিকবার বলেছে সে, ওর দাদা নাকি ওই শহরটা দেখেছে। টোবাস্কোর স্যান জুয়ান বাটিস্টায় থাকত ওর দাদা। এই লোকের বয়স যখন কম ছিল তখন কিছু অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য হয়ে পালাতে হয় তাঁকে। বনেজঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে একদিন নিতান্ত সৌভাগ্যবশতই সন্ধান পেয়ে যায় স্বর্ণশহরের।'

'তা-ই নাকি? তারপর কী হলো?'

'জানি না। মোদ্দা কথা হচ্ছে ঘুরতে ঘুরতে বিশাল এক হ্রদের তীরে হাজির হয় সে। চিন্তাভাবনা করে যতদূর বুঝতে পেরেছি, গুয়াতেমালার সীমান্ত-সংলগ্ন কোনো জায়গায় অবস্থিত এই হ্রদ। চরম পরিশ্রান্ত হয়ে সেখানেই শুয়ে পড়ে সে, ধরে নেয় মারা যাচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

'যখন ঘুম ভাঙে তখন দেখে, লোকজন জড়ো হয়ে গেছে ওর চারপাশে। সবাই ওকে গোল করে ঘিরে ধরে উৎসুক দৃষ্টিতে দেখছে। লোকগুলো দেখতে নাকি ইণ্ডিয়ানদের মতোই। তবে চামড়ার রঙ আমাদের মতো এত গাঢ় না, বরং অনেক হালকা। সবার পরনে সুন্দর সাদা আলখাল্লা। ভিতরে পালক-দিয়ে-বানানো ঢিলা আস্তিনহীন জামা। গলায় পান্নার নেকলেস। সবাই মিলে

ধরাধরি করে তুলল ওকে, বিশাল এক ডিঙি নৌকায় শুইয়ে দিল। তারপর নিয়ে গেল চমৎকার এক শহরে। শহরটার কেন্দ্রস্থলে একটা উঁচু পিরামিড আছে। লোকে বলে, শহরটার নাম "সিটি অভ দ্য হার্ট"।'

'সিটি অভ দ্য হার্ট...সিটি অভ দ্য হার্ট...' নিচু গলায় বিড়বিড় করছেন সিনর স্ট্রিকল্যান্ড, আনমনা হয়ে পড়েছেন।

আমি বলে চললাম, 'ওই শহরের বেশি কিছু দেখতে পারেনি লোকটা। কারণ শহরের বাসিন্দারা তেমন কোনো দুর্ব্যবহার না-করলেও শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বন্দি করে রেখেছিল ওকে। সময়ে সময়ে ওকে হাজির করা হতো রাজা বা সর্দারের সামনে। কখনও আবার বড় বড় নেতাদের সামনে। জেলখানা থেকে বিশাল এক দরবারে নিয়ে যাওয়া হতো ওকে। বিচার বা কথাবার্তা যা-ই বলি না কেন, শেষ হলে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো কারাগারে। দরবারের চারদিকের দেয়ালে মৃতমানুষদের সারি সারি ছবি। প্রতিটা ছবির ফ্রেম সোনা দিয়ে বাঁধাই-করা। দেখলে বোঝা যায় এককালে ওই রাজ্যের হর্তাকর্তা ছিল একেকজন। যা-হোক, সর্দার বা নেতারা বেশিরভাগ সময় একই রকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন ওকে: কোত্থেকে কীভাবে গেল সে ওই হ্রদের তীরে, আর গেলই বা কেন। কোন্ দেশে থাকে। কী করে। সাদাচামড়ার যে-মানুষটা শাসন করে দেশটা সে কেমন...ইত্যাদি ইত্যাদি।

'ওই লোকের বক্তব্য অনুযায়ী, পুরো শহর পরের কথা, শুধু ওই দরবারেই নাকি এত সোনা আর মূল্যবান রত্নপাথর আছে, সারা মেক্সিকোতেও যা নেই সম্ভবত। যা-হোক, জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হলো একসময়, কারণ এক কথার জবাব কতবার দেয়া যায়? আগেও বলেছি ওর সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করেনি স্বর্ণশহরের বাসিন্দারা। কিন্তু নেতারা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়, ওকে ছেড়ে দেয়াটা ঠিক হবে না। কারণ যদি দেশে ফিরে যেতে পারে সে তা হলে স্বর্ণশহরের গল্প করবেই অন্যদের কাছে। সেই গল্প গিয়ে পৌঁছাবে সাদাচামড়ার

মানুষদের কানে। আর কে না জানে, সারা দুনিয়ায় সোনার প্রতি লোভ, অন্য যে-কারোর চেয়ে সাদাচামড়ার মানুষদের অনেক অনেক বেশি? মাটিতে একফোঁটা মধু পড়ে থাকলে যেভাবে পিলপিল করে হাজির হয় পিঁপড়ার দল, সেভাবে গিয়ে হাজির হবে তারা স্বর্ণশহরে। শহরের শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের মেরেকেটে শেষ করে লুটে নেবে সব সোনা। তাই নেতারা সবাই বলল, হত্যা করা হোক লোকটাকে।

'এদিকে বন্দি অবস্থাতেই এক মহিলার সঙ্গে মন দেয়া-নেয়া হয়ে গেছে ওই লোকের। মহিলার সহায়তায় জেলখানা থেকে পালায় সে। ওকে পথ দেখিয়ে সাগরের দিকে নিয়ে আসছিল মহিলা। কিন্তু পথিমধ্যে যে-কোনো কারণেই হোক মারা যায় বেচারী। লোকটা একাই ফিরে আসে।

'প্যালেঙ্কের নিকটবর্তী যে-গ্রামে থাকত সে, সেখানে পৌঁছতে সক্ষম হয় অবশেষে। ততদিনে পরিস্থিতি অনেক শান্ত হয়েছে, সে কবে কী করেছিল না-করেছিল ভুলে গেছে বেশিরভাগ লোক। এবার ভালোমানুষের মতো থাকতে শুরু করে লোকটা। স্বর্ণশহরের ব্যাপারে টুঁ শব্দটাও উচ্চারণ করেনি বাকি জীবনের কখনও। ওর ধারণা ছিল, যদি কিছু বলে সে এবং ঘটনা জানাজানি হলে যদি কিছু হয় স্বর্ণশহরের তা হলে ওই শহরের সব অধিবাসীর অভিশাপ নামবে ওর উপর। তবে যখন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ছিল তখন কাহিনিটা বলে গেছে ছেলের কাছে। এই ছেলেও আবার সারাজীবন মুখ বন্ধ করে ছিল। মরার আগে বাপের মতোই বলে গেছে নিজের ছেলের কাছে। আর এই শেষের লোকটাই হলো আমার সেই পরিচিত লোক যার কথা একটু আগে বলেছি আপনাকে। এর কাছ থেকেই গল্পটা জানতে পারি আমি।

'সিনর, কাহিনিটা জানার পর থেকেই আমার খুব ইচ্ছা, যে-কোনোভাবে হোক একদিন যাবো ওই শহরে। নিজের চোখে দেখবো সবকিছু। তারপর আমাকে চাই ফাঁসিতে ঝুলাক বা জবাই করুক

শহরের বাসিন্দারা, আপত্তি নেই। এতদিন পর, বিশ্বাস করুন এতগুলো দিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার পর একটা সূত্র পেয়েছি। সেই সূত্রের কাছে যদি যেতে পারি, আমার ধারণা ওই স্বর্ণশহরেও যেতে পারবো।'

আবারও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলেন সিনর। তারপর বললেন, 'একটা কথা বলো তো, ইগনাশিয়ো। ওই শহরে কেন যেতে চাও তুমি?'

'বুঝতে হলে এবার আমার কাহিনি জানতে হবে আপনাকে।' আমার ব্যর্থ অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার ঘটনাটা বললাম সিনরকে। আমার জীবনের গোপন ইচ্ছা আর অভিলাসের কথাও জানালাম। তারপর বললাম, 'সিনর, আমি হেরে গেছি কিন্তু মরে যাইনি। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—কথাটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। এখনও চাই এদেশ থেকে বিতাড়িত হোক স্প্যানিয়ার্ডরা, সবাই মিলে সুখী-সমৃদ্ধ একটা ইণ্ডিয়ান সাম্রাজ্য গড়ে তুলি। আপনার চেহারা দেখে বুঝতে পারছি আমার কথা শুনে আমাকে বোকা ভাবছেন। হতে পারে আপনার ধারণা ঠিক, হতে পারে আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ঠিক। কিন্তু সত্য বা স্বপ্ন যেটার পিছনেই ছুটি না কেন, সুস্থমস্তিষ্কের ত্রাণকর্তা অথবা অসুস্থমস্তিষ্কের বোকা যা-ই হই না কেন, এখন আমার কাছে সব সমান। আমার সামনে এখন একটাই আলো—মাতৃভূমির স্বাধীনতা। পতঙ্গের মতো সে-আলোর দিকে দিনরাত ছুটতে হবে আমাকে, যতদিন না কাছাকাছি পৌঁছতে পারি। এ-আলো আলেয়ার না ধ্রুবতারার তা দেখার সময় নেই এখন আর। মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্যই জন্ম হয়েছে আমার, যদি তা না-পারি তা হলে মৃত্যুই আমার উপযুক্ত পুরস্কার। এতক্ষণ যা বললাম আপনাকে তার কোনোটাই যদি বিশ্বাস না-হয় আপনার, তা হলে সিনর অনুরোধ করবো অন্তত এই কথাটা বিশ্বাস করুন, নিজের ভালোর জন্য না, রাশি রাশি সোনা লুট করার জন্য না, বরং আরেকবার যাতে বিপ্লব ঘটাতে পারি সে-জন্য স্বর্ণশহরে যেতে চাই।'

'না-হয় তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম সত্যিই আছে ওই শহর। এ-ও বিশ্বাস করলাম, দেশের স্বাধীনতার জন্য সেখানে যাওয়া দরকার তোমার। কিন্তু স্বাধীনতার সঙ্গে স্বর্ণশহরের সম্পর্কটা কী?'

'যে লোকের কাছে কবচটার বাকি অর্ধেক আছে তার নাম বোধহয় বলেছি আপনাকে—যিব্যালবে। আমার যতদূর মনে হয় বুড়ো ওই স্বর্ণশহরের রাজা অথবা বড় কোনো নেতা বা সর্দার। ওর কাছে যেতে পারলে নিজের পরিচয় দেবো আমি। আমার পরিকল্পনার ব্যাপারে সব জানাবো। তখন আমাকে ওদের দেশে নিয়ে যাবে সে। আমার সেই পরিচিত লোক তার দাদার যে-কাহিনি শুনিয়েছে, খেয়াল করেছেন কি না জানি না, তাতে কিন্তু স্বর্ণশহরের বাসিন্দারা আশঙ্কা করেছিল "সাদাচামড়ার" মানুষরা সোনার লোভে ওদের দেশটা দখল করে নিতে পারে। তার মানে সাদাচামড়ার মানুষদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আছে ওদের মনেও। সেই ক্ষোভ কাজে লাগাতে চাই আমি। ওদের সমর্থন আর অর্থসাহায্য নিয়ে ফিরে আসতে চাই এখানে। আবার নতুন করে শুরু করতে চাই বিপ্লব।'

'কিন্তু যদি উল্টোটা হয়? যদি তোমাকে অবিশ্বাস করে লোকগুলো? যদি তোমাকেও নিয়ে গিয়ে বন্দি করে কারাগারে?'

'তা হলে নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে নেবো। আসলে আমার অবস্থা হয়েছে ওই সাঁতারুর মতো যে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরে সাঁতরাতে সাঁতরাতে হঠাৎই কোনো তক্তা দেখতে পায় অথবা মনে করে ও-রকম কিছু দেখতে পেয়েছে। হয়তো ওই তক্তার কাছে কখনও পৌঁছতে পারবে না সে, আবার পৌঁছতে পারলেও ওর ভারে হয়তো ডুবে যাবে তক্তাটা। আশা নেই জানার পরও শেষ চেষ্টা আর কী। ...ওই স্বর্ণশহরে আছে রাশি রাশি সোনা। সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য আমার দরকার অনেক টাকা। আর এত তাড়াতাড়ি এত টাকা যোগাড় করা অন্য কোনো উপায়ে সম্ভব না। আমি এখন মরিয়া। যে-কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।'

কিছু বলছেন না সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। আবারও আনমনা হয়ে পড়েছেন তিনি।

'যিব্যালবেকে খুঁজে বের করবো প্রথমে,' বলে চললাম আমি। 'হৃৎপিণ্ডের দুটো অংশ জোড়া লাগবে তখন। এই কবচের ব্যাপারে যে-ভবিষ্যদ্বাণী আছে তা পূর্ণ হবে। তারপর যদি সম্ভব হয় ওর সঙ্গে স্বর্ণশহরে যাবো। এরপর যা হওয়ার হবে, পরোয়া করি না।'

'তোমার সঙ্গে কে যাবে?' ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এসেছেন সিনর। 'একা পারবে এতদূর যেতে?'

'মোলাস যাবে আমার সঙ্গে। আমাকে ওই হ্রদের তীর পর্যন্ত পৌঁছে দেবে সে। তারপর কোনো সমস্যা হলে ফিরে আসবে। বাকিটা আমার কাজ, আমি একাই করবো। আর কাউকে সঙ্গে নেয়ার উপায় নেই। তেমন কেউ নেইও অবশ্য। কাকে বলতে যাবো এসব কথা? যে লোক কোনো যুদ্ধে একবার হেরে যায় তার কাছে যুদ্ধের গল্প শুনতে দ্বিতীয়বার যায় না কেউ। রাস্তার ছেলেছোকরারা যেভাবে পাগল ক্ষ্যাপায়, আমার কথা শুনলে আমাকে সেভাবে ক্ষ্যাপাতে শুরু করবে সবাই। কাজেই কপালে মরণ লেখা থাকলেও একা যেতে হবে আমাকে।'

'মৃত্যুর ব্যাপারে আসলে কিছু বলার নেই আমার। কিন্তু স্বর্ণশহরে যাওয়ার ব্যাপারে বলছি, একা যেয়ো না। যদি আপত্তি না-করো, আমি তোমার সঙ্গী হতে চাই।'

'আপনি! যা বলছেন বুঝেশুনে বলছেন তো? আবারও ভাবুন। অনেক বিপদ হতে পারে। যে-কোনো সময় যে-কোনোভাবে প্রাণ হারানোর সম্ভাবনা আছে। ধরুন সব বিপদের মোকাবেলা করতে পারলাম, মরতে মরতে বেঁচে গেলাম বার বার। কিন্তু তারপরও যে সফল হতে পারবো সে-নিশ্চয়তা কোথায়? না, সিনর; ব্যাপারটা আমার জন্যই যদি বোকামি হয় তা হলে বাধ্য হয়ে বলছি আপনার জন্য চরম নির্বুদ্ধিতা। আপনি কেন শুধু শুধু এত বড় ঝুঁকি নিতে যাবেন?'

'শুধু শুধু না, ইগনাশিয়ো। শোনো, কয়েকটা কথা সরাসরি বলতে চাই তোমাকে। ওই কবচ মানে হৃৎপিণ্ডের যে-কিংবদন্তি শোনালে আমাকে তা তেমন একটা...কী বলবো...আকর্ষণীয় মনে হয়নি আমার কাছে। কিছু মনে কোরো না, এসব ব্যাপারে আমার বিশ্বাস একটু কম। যিব্যালবের ব্যাপারে যা বলেছ তা-ও অতিরঞ্জিত মনে হয়েছে। কিন্তু তোমার একটা কথা আমার মনে ধরেছে— "মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্যই জন্ম হয়েছে আমার, যদি তা না-পারি তা হলে মৃত্যুই আমার উপযুক্ত পুরস্কার"। সত্যিই, তুমি একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। সেই সঙ্গে মহান একজন মানুষও। একবার যেচে পড়ে আমার জীবন বাঁচিয়েছ। আমার সবকিছু যখন শেষ হয়ে গেছে তখন, ইচ্ছা করলেই নিজে যে-খনির মালিক হতে পারতে সে-খনি তুলে দিতে চেয়েছ আমার হাতে। সুড়ঙ্গমুখের ভিতরে নিজের নিশ্চিত মৃত্যু জেনে আমাকে বাঁচানোর জন্য তোমাকে ফেলে চলে আসার তাগিদ দিয়েছ বার বার। আমি যখন চলে আসছি তখন আমার যাতে কোনো অমঙ্গল না-হয় সে-জন্য "হৃৎপিণ্ডের" অর্ধেকটা তুলে দিয়েছ আমার হাতে। তোমার প্রতি আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আমার মনে তোমার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আছে। আর সে-জন্যই তোমার সফরসঙ্গী হতে চাচ্ছি। শুধু সফরসঙ্গী না, তোমার মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য যে-লড়াই শুরু করতে চাচ্ছ তাতেও অংশ নিতে চাই। আমার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, তাই মহৎ কোনো কাজে জীবন উৎসর্গ করতেও আপত্তি নেই। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকালাম।

'ভালো। এবার এসো ওই স্বর্ণশহরের ব্যাপারে কিছু কথা বলা যাক। ও-রকম কোনো শহর আসলেই আছে কি না তা নিয়ে, আগেও বলেছি আমার সন্দেহ আছে। জনৈক আইনভঙ্গকারী পলাতক ব্যক্তি অনেকদিন পর ফিরে এসে এ-রকম গল্প শোনাতেই পারে। যতদূর অনুমান করছি, আজ থেকে সত্তর বা আশি বছর আগে বলা হয়েছে গল্পটা। এই সত্তর-আশি বছরেও স্প্যানিয়ার্ডদের

মতো চালাক জাতি খুঁজে বের করতে পারল না শহরটা—আশ্চর্যই লাগছে আমার কাছে। আবার দেখো, এতদিন পর কেউ একজন, যাকে তুমি যিব্যালবে বলে ডাকছ অথচ এখনও দেখোনি সামনাসামনি, হাজির হয়েছে ওই শহর থেকে এবং তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবে বলে ধারণা করছ। সবকিছুই কি বেশিমাত্রায় কল্পনানির্ভর হয়ে যাচ্ছে না?'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে চললেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড, 'তারপরও তোমার দেশপ্রেম আপ্লুত করেছে আমাকে এবং স্বর্ণশহরের মতো একটা হারিয়ে-যাওয়া শহর খুঁজে বের করার দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চারের নেশা পেয়ে বসেছে। আমি পেশায় মাইনার হলেও আমার রক্তে সেই ছোটবেলা থেকেই অ্যাডভেঞ্চারের বুনো ডাক। ইউরোপিয়ানদের কাছে মেক্সিকো এবং এর পার্শ্ববর্তী দেশগুলো আজও রহস্যাবৃত হয়ে আছে। আজও অনেক কিছু জানি না আমরা তোমাদের ব্যাপারে। সে-সব জানতে চাই আমি, নিজের চোখে দেখতে চাই। দরকার হলে যেতে চাই টোবাস্কোর জঙ্গলাকীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে আরও অনেক দূরে। জানি না, হয়তো তোমার কথাই ঠিক—এই অ্যাডভেঞ্চারের পরিণতি আমাদের অকালমৃত্যু। জঙ্গলের ভিতরে বা পাহাড়ের উপরে কোথাও মরে পড়ে থাকবো, শিয়াল-শকুন খাবে আমাদের লাশ।'

'সে-জন্যই তো বলছি...'

হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন সিনর। 'তাতে কিছু যায়-আসে না। আমার বউ-বাচ্চা নেই। কাঁধে বুড়ো বাপ-মা'র দায়িত্বও নেই যে, কিছু করার আগে দশবার ভাবতে হবে। আরেকজনের খনিতে বছরের পর বছর ধরে অমানবিক অথচ নিষ্ফল পরিশ্রম করতে হয়েছে আমাকে। কী পেয়েছি এত কষ্ট করে? নিশ্চিত করতে পেরেছি নিজের সুখের ভবিষ্যৎ? না। তা হলে কোন্ কারণে বন্দি হয়ে থাকবো সামাজিকতার এই জেলখানায়? পৃথিবীটা ঘুরেফিরে দেখতে চায় এই মন; তা করবো না কেন? আমাকে দিয়ে চাকরি

আর হবে না মনে হয়। সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন থেকে অন্যের জন্য নিজের মাথার ঘাম পায়ে না-ফেলে নিজের জন্য কিছু করবো। হয়তো দু'পয়সা কম কামাই করতে পারবো, কিন্তু যা আয় করবো তার পুরোটাই আমার। এবং সবচেয়ে বড় কথা, যখন-তখন আমার পেটে লাথি মারতে পারবে না কেউ।

'আমাকে যে-খনিটা দিতে চেয়েছ তুমি তা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। কিন্তু সেখান থেকে সোনা বের করে আনতে হলে শুধু অভিজ্ঞতা বা বাস্তব জ্ঞানই না, পাশাপাশি প্রচুর টাকার দরকার। এ-মুহূর্তে অত টাকা নেই আমার কাছে। কাজেই খনির মালিক হতে হলে আগে মোটা অঙ্কের টাকার মালিক হতে হবে। তা ছাড়া আমার যদি টাকা থাকতও, দিন দশেক আগে যে-অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেখানে দ্বিতীয়বার অভিযান চালানোর আগে দশবার ভাবতাম আমি। কাজেই আমার মাথায় এখন একটাই চিন্তা, কবে সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি। কবে তোমার সঙ্গে যাবো টোবাস্কোয় অথবা ওই স্বর্ণশহরে।'

'যেখানেই যাই আমি, যা-ই করি, আপনি কি প্রতিজ্ঞা করতে পারবেন, নিখাদ বন্ধুর মতো সবসময় পাশে থাকতে পারবেন? স্বার্থপরের মতো কখনোই কিছু করবেন না?'

হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার হাত ধরলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। 'প্রতিজ্ঞা করছি, ইগনাশিয়ো।'

'ভালো। আমার হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করেছেন আপনি। তা হলে আজ থেকে আমরা কমরেড। একটা কথা বলে রাখি। শেষপর্যন্ত ওই শহরটা খুঁজে পাবো কি না জানি না। খুঁজে পেলেও আপনার কোনো লাভ হবে কি না জানি না। তবে এটা জানি, টের পাচ্ছি আর কী, যেহেতু আমি একজন হতভাগ্য ব্যক্তি, আমার নিয়তির সঙ্গে নিজের নিয়তি জুড়ে দিয়ে বোধহয় ভুল করলেন। এখন থেকে আমার কপালে ভালোমন্দ যা-ই ঘটুক না কেন তা আপনার কপালেও জুটবে। আমিও শপথ করলাম, সুড়ঙ্গের ভিতরে আমাকে যেভাবে

কাঁধে তুলে বাইরে নিয়ে এসেছেন, দরকার হলে আপনার জন্য সেভাবে নিয়োজিত করবো নিজেকে। বাকিটা আমাদের ভাগ্য।'

পাঁচ

অভিযানের সূচনা

মাসখানেক পর মোলাসকে নিয়ে আমি আর সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড পৌঁছলাম ভেরা ক্রুযে। এখান থেকে জাহাজে চড়ার কথা আমাদের, গিয়ে নামবো ফ্রণ্টেরায়। ইচ্ছা করলে ফ্রণ্টেরার বদলে ক্যাম্পেখে বন্দরে নামতে পারতাম। আমাদের সেই ইণ্ডিয়ান বন্ধু যিব্যালবে যে-মন্দিরে আছে তা, ফ্রণ্টেরার চেয়ে ক্যাম্পেখে থেকেই বেশি কাছে। কিন্তু ওদিকে লোক সমাগম বেশি। হয়তো কেউ দেখে ফেলতে পারে আমাদেরকে। আমাদের পরিকল্পনা হচ্ছে, ফ্রণ্টেরায় নেমে বড় ডিঙি নৌকায় করে গ্রিজ্যালভা এবং অন্যান্য নদী দিয়ে চুপিসারে ওই মন্দিরে যাওয়া। এভাবে গেলে স্থানীয় আদিবাসী ছাড়া আর কেউ আমাদের দেখতে পাবে বলে মনে হয় না। বিশেষ করে সাদাচামড়ার লোকদেরকে নিয়েই যত সমস্যা।

এ-অঞ্চলে যে-সব ইউরোপিয়ান থাকে তাদের বেশিরভাগই চোর-বাটপার। হবে না কেন? নিজেদের দেশে অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে ফেঁসে গেছে, জান বাঁচাতে গোপনে জাহাজে চড়ে পালিয়ে এসেছে মেক্সিকো কিংবা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে। কয়লা ধুলে ময়লা যায় না, তাই এই লোকগুলোরও স্বভাবের পরিবর্তন হয়নি। এখানে আইনকানুনের বালাই নেই, অন্তত সাদাচামড়ার লোকদের জন্য আইন বলে কোনো কথা নেই। যেহেতু তারাই

শাসক সেহেতু তারাই শোষক। যে যেভাবে পারে মেরেকেটে শেষ করছে আদিবাসীদের। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্থানীয় চ্যালাচামুণ্ডারা। ফলে দুর্বৃত্তদের দল ভারী হয়েছে। কয়েক সপ্তাহ আগে মোলাসের সঙ্গে যে-ঘটনাটা ঘটে গেল তাতেই বোঝা যায় কত বাড় বেড়েছে এই সাদাচামড়ার লোকগুলোর। এমনিতেই ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর বড় বড় শহরগুলোতে লোকের মুখরোচক গল্পের বিষয়ে পরিণত হয়েছি আমি, তার উপর আমাদের সঙ্গে আছেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। তাঁকে দেখলে যে-কারও দৃষ্টি আকর্ষিত হবে। হয়তো গোপনে চোখ রাখতে শুরু করবে আমাদের উপর। সে-জন্য এই বাড়তি সতর্কতা।

ভেরা ক্রুযে পৌঁছনোর পর অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কিনে নিলাম। তবে বেশি কিছু না, কারণ সেগুলো কীভাবে বহন করবো সে-ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত না আমরা। এসব জিনিসের মধ্যে আছে হাতুড়ি, ছুরি, কুড়াল, ছররা বা বুলেটের যে-কোনোটা ফায়ার করা যাবে এমন তিনটা বন্দুক, যথেষ্ট পরিমাণ কার্তুজ, তিনটা আধুনিক মডেলের কোল্ট রিভলভার, কিছু ওষুধপত্র, কম্বল, বুট আর অতিরিক্ত কাপড়চোপড়।

আমাদের কাছে টাকাপয়সা বলতে যা ছিল সব নিয়েছি সঙ্গে। স্বর্ণমুদ্রায় মোট পনেরো শ' ডলারের কিছু বেশি হবে। পুরো টাকাটা তিনভাগে ভাগ করে নিয়েছি তিনজনে। কোমরে, জামার নীচে বেল্ট পরে তাতে রেখেছি যার যার টাকা।

ভেরা ক্রুযে, খুব স্বাভাবিকভাবেই, আমাদেরকে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল লোকজন। কোত্থেকে এসেছি, কোথায় যাবো জানতে চাচ্ছে অনেকেই। মোলাস তখন শিখানো-বুলি কপচাচ্ছে, 'আমাদের সঙ্গে যে-সাদাচামড়ার ভদ্রলোক আছেন তাঁর নাম স্ট্রিকল্যাণ্ড। তিনি এসেছেন ইংল্যাণ্ড থেকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন বা ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপনা পরিদর্শন করতে ভালোবাসেন তিনি। এবার এসেছেন মেক্সিকোতে। এখানে বেশ কিছুদিন থাকার ইচ্ছা আছে।'

আমাকে দেখিয়ে বলল, 'উনি হলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের গাইড। আর আমি সিনরের খাস ভৃত্য।'

ভেরা ক্রুযের বন্দরে গিয়ে দেখি সাগরের শান্ত পানিতে নোঙর ফেলে আছে চমৎকার একটা আমেরিকান জাহাজ। এটা মূলত বাণিজ্যজাহাজ, হাভানা আর নিউ ইয়র্কের বন্দরগুলোতে নিয়মিত আসা-যাওয়া করে। আমরা ভেরা ক্রুয়ে যাওয়ার দু'-একদিনের মধ্যেই ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল জাহাজটার। কিন্তু ঘটনাক্রমে তা কমপক্ষে এক সপ্তাহের জন্য পিছিয়ে গেছে। এদিকে আমাদের হাতে সময় কম, আবার বন্দরনগরীতে দেখা দিয়েছে মারাত্মক ছোঁয়াচে পীতজ্বর। কাজেই তাড়াহুড়ো করে সাণ্টা মারিয়া নামের একটা মোটামুটি বড় মেক্সিকান নৌকায় সওয়ার হতে হলো।

নৌকাটা পুরনো। ধারণক্ষমতা দু'শ' পঞ্চাশ টনের বেশি না। গঠনগত দিক দিয়ে যদি বলি, নৌকার মালিক এটাকে পরিণত করেছে একটা প্যাডল-হুইল স্টিমারে। ফল খুব একটা ভালো হয়নি। আবহাওয়া অনুকূল না-হলে নৌকাটায় পাল খাটিয়েও লাভ হয় না, দাঁড় টেনেও লাভ হয় না। লাভ হয় না বললাম এ-কারণে, তখন নৌকার গতি আর শামুকের গতির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য থাকে না। যাত্রীদের মনেও থাকে শঙ্কা—এই বুঝি ডুবে গেল! মাল বা যাত্রী যা-ই পায় মালিক তা-ই নিয়ে তোলে নৌকায়, ভেরা ক্রুয থেকে কখনও ফ্রণ্টেরা আবার কখনও ক্যাম্পেখের বন্দরে যাতায়াত করে।

টিকেট কেনার দায়িত্ব দেয়া হলো মোলাসকে। কেনার সময় মালিকপক্ষের লোক জিজ্ঞেস করল ওকে, 'কোথায় যাবে তোমরা?'

'ফ্রণ্টেরা,' জবাব দিল মোলাস। 'তোমাদের নৌকা সেখানে থামে তো, নাকি?'

'থামে না মানে?' টিকেট বিক্রির টাকা পকেটে গুঁজতে গুঁজতে বাঁকা হাসি হেসে বলল লোকটা।

কিন্তু এই নির্লজ্জ শয়তানটা খুব ভালোমতো জানত আগে

ক্যাম্পেখেতে যাবে সাণ্টা মারিয়া, সপ্তাহখানেক পর ভিড়বে ফ্রন্টেরার বন্দরে। অথচ এই ব্যাপারে একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি সে আমাদের সামনে।

সেদিন বিকেলে আমাদেরকে নিয়ে ভেরা ক্রুযের বন্দর ছাড়ল নৌকাটা। যাত্রা শুরু হতে-না-হতেই শুনি মাঝিদের সর্দারের মেজাজ খারাপ। নৌকার হাল কাজ করছে না, তাই অকথ্য সব গাল দিচ্ছে সে নৌকা আর তার মালিককে। ইঞ্জিনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা তিনজনে। দেখি, যাত্রা শুরুর আধ ঘণ্টাও হয়নি, এর মধ্যেই ইঞ্জিনের বিয়ারিং গরম হয়ে ধোঁয়া বের হতে শুরু করেছে। সেখানে এখন ক্রমাগত পানি ঢালতে হবে।

যে লোকটা নৌকার মেট-কাম-ইঞ্জিনিয়ার, তাকে এই ঘটনার কারণ জিজ্ঞেস করলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিল লোকটা, 'আগেরবার গ্রিজ্যালভা নদী দিয়ে যাওয়ার সময় ইঞ্জিনের ভিতরে বালি ঢুকেছে মনে হয়।'

'কিন্তু বিয়ারিং-এর সমস্যাটা কী?' আবারও জানতে চাইলেন সিনর।

'সমস্যা একটাই। যে লোকের মরার সময় হয়েছে, নাভিশ্বাস উঠছে, তাকে হাজার ওষুধ খাওয়ালে লাভ আছে? ওই বিয়ারিং-এরও হয়েছে একই অবস্থা। পুরনো, প্রায়-নষ্ট জিনিস দিয়ে আর কত? ঈশ্বরের যদি কৃপা থাকে, ওই বিয়ারিং দিয়ে আমার মনে হয় এটাই আমাদের শেষ যাত্রা। তবে স্রোতের ঠেলায় যদি উত্তর দিকে গিয়ে মেক্সিকো উপসাগরের বিশাল বিশাল ঢেউয়ের মধ্যে পড়ি তা হলে...' কথা শেষ না-করে থেমে গেল লোকটা।

'তা হলে?' জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলেন সিনর।

জবাব না-দিয়ে বুকে ক্রস করল লোকটা, আর কিছু না-বলে স্টোকহোলের ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সময় বাঁচাতে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে এই নৌকায় উঠেছি বলে

এখন খারাপ লাগছে আমাদের। আমেরিকান জাহাজটার টিকেট কাটিনি বলে আফসোস হচ্ছে। যে-গতিতে এগোচ্ছে নৌকাটা তাতে কবে নাগাদ পৌঁছতে পারবো ফ্রন্টেরায় জানি না। করার তেমন কিছু নেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই, নৌকার অন্যান্য যাত্রীদের দিকে নজর দিলাম।

আমাদেরকে বাদ দিয়ে সম্ভবত বিশ জন যাত্রী আছে সান্টা মারিয়ায়। কেউ কেউ ছোট-বড় জমিদার, কেউ তাদের নায়েব বা গোমস্তা। ভেরা ক্রুযে কাজে এসেছিল, এবার যার যার জমিদারিতে ফিরে যাচ্ছে। দু'-একজন সরকারি কর্মকর্তাও আছে। ক্যাম্পেখে বা ফ্রন্টেরায় কোনো কাজে যাচ্ছে এরা। কারও কারও চেহারা হাসিখুশি, কেউ কেউ আবার ভীষণ গম্ভীর। দু'-একজনের সঙ্গে তাদের বউ। কিন্তু ওই ভদ্রমহিলারা ইতোমধ্যেই গিয়ে ঢুকেছেন যার যার কেবিনে। সেখানে বাঙ্ক আছে, অসুস্থ হলে সেবাযত্নের ব্যবস্থা আছে। সাগর শান্ত, তারপরও হয়তো সী-সিকনেস পেয়ে বসেছে ওই মহিলাদের; তাঁরা চান না ডেকে দাঁড়িয়ে থাকলে তাঁদের অসুস্থ হয়ে পড়ার দৃশ্য কেউ দেখুক।

যাত্রীদের মধ্যে ত্রিশ বছর বয়সী এক যুবক আমাদের নজর কেড়ে নিল। ওর পরনে চমৎকার পোশাক। সে যেমন লম্বা তেমন চওড়া। সুদর্শন। মেজাজ তিরিক্ষি, ব্যবহার অমার্জিত। শরীরে ইণ্ডিয়ান রক্ত। চামড়ার রঙ গাঢ়, ঘন কালো ভ্রূ। যুদ্ধংদেহী মনোভাব। লোকটা কে হতে পারে ভাবছি, এমন সময় আমাকে একপাশে সরে আসার ইঙ্গিত করল মোলাস।

কিছুটা দূরে যাওয়ার পর বলল, 'ওই লোকটাকে দেখেছেন, লর্ড?'

'ওই যুবকের কথা বলছ তো?' পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমি। 'কোটের মধ্যে রূপার বোতাম?'

মাথা ঝাঁকাল মোলাস। 'চেনেন ওকে?'

'না। কিন্তু চেহারাটা কেন যেন পরিচিত মনে হচ্ছে।'

'স্বাভাবিক,' মন্তব্য করল মোলাস। 'সে ডন পেদ্রো মোরেনোর ছেলে ডন হোসে মোরেনো। ওর বাপ আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা মিলেই লুট করেছে আমার সব স্বর্ণমুদ্রা—আপনাকে খুঁজে বের করার জন্য খরচ হিসেবে যে-মুদ্রাগুলো আমাকে দিয়েছিল যিব্যালবে। তখনই শুনেছি বাপের সুযোগ্য পুত্র তাদের এলাকার বাইরে আছে। কোথায় ছিল জানতে পারলাম এখন। শয়তানটা ভেরা ক্রুযে এসেছিল কোনো কাজে। কাজ শেষে ফিরে যাচ্ছে বাপের কাছে। ...ওর ব্যাপারে সাবধান থাকবেন, লর্ড। সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকেও বলে দেবেন যাতে দূরে দূরে থাকেন হোসে মোরেনোর কাছ থেকে। বাপ আর ছেলে দুটোই কিন্তু ইবলিস।'

কথা শেষ করে মোরেনো পরিবারের কুৎসিত কিছু ইতিহাস জানাতে শুরু করল সে আমাকে।

মোলাস যখন কথা বলছে তখন ঘণ্টা বাজাল কেউ। তারমানে ডিনারের সময় হয়েছে। কিন্তু মোলাসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি আগের জায়গায়, মোরেনো পরিবারের ইতিহাসের পুরোটা জানা দরকার। তারপর হাঁটা ধরলাম ডাইনিং-কেবিনের দিকে। কেবিনের দরজায় দেখা হয়ে গেল সাণ্টা মারিয়ার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। বলিষ্ঠ গড়নের লোক। চেহারাটা পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল। ঠোঁটের কোনায় বিনয়ী হাসি।

'কী খুঁজছেন, সিনর?' নরম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আমার ডিনার, সিনর,' জবাব দিলাম।

'কিছু মনে করবেন না,' ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ আগের মতোই মসৃণ, 'ভিতরে আসার দরকার নেই আপনার। আমি নিজে স্প্যানিয়ার্ড এবং সে-জন্য আমার কথায় কে কী মনে করল না-করল তা পরোয়া করি না। কেবিনের ভিতরে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা সম্ভ্রান্ত মেক্সিকান। আপনার মতো সাধারণ একজন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে একই টেবিলে বসে ডিনার করতে আপত্তি করবেন তাঁরা। সে-জন্যই বলছিলাম ভিতরে আসার দরকার নেই। যদি সে-চেষ্টা করেন তা হলে ঝামেলা হবে।

ডেকে ফিরে যান, কাউকে দিয়ে সেখানেই আপনার ডিনার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

চরম অপমান। না-দেখতে পেলেও টের পাচ্ছি আমার চেহারা লাল হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু করার নেই। দেশটা হয়ে গেছে মগের মুল্লুক। এখানে নীতিবাক্যের কোনো স্থান নেই। স্প্যানিয়ার্ডরা দখল করার পরে এদেশের জনগণ যাতে জোট বাঁধতে না-পারে সে-জন্য চালু করে দিয়েছে জমিদারিপ্রথা। ডন পেদ্রো মোরেনো বা ডন হোসে মোরেনোর মতো কিছু সংখ্যক পাষণ্ড অবৈধ পথে উপার্জিত টাকার জোরে হয়ে গেছে একেক অঞ্চলের তথাকথিত জমিদার। সেখানে তারা শাসনের নামে লুটতরাজ বা চৌর্যবৃত্তি যা-ই করুক না কেন, দেখার কেউ নেই। ওই লোকগুলোই এখন সমাজের মাথা। তারা যেখানেই যায়, তাদেরকে লোকদেখানো ভক্তি করে স্প্যানিশ সরকারের প্রতিনিধিরা বা স্প্যানিয়ার্ডরা। আমরা ইণ্ডিয়ানরা এই পরাধীন দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকও না, এখানে আমাদের মূল্য গরু-ছাগলের চেয়ে বেশি বলে মনে হয় না। আমরা এখানে নিগৃহীত, সমাজতাড়িত।

স্রষ্টা মানুষের দেহে হৃৎপিণ্ডের উপরে মস্তিষ্ককে স্থান দিয়েছেন। তার মানে তিনি বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, আবেগের চেয়ে যুক্তি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্রোহে ফেটে পড়তে ইচ্ছা করছে আমার, কিন্তু জোর করে সামলে রেখেছি নিজেকে। ক্যাপ্টেনকে একহাত দেখে নিতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু তাতে বাড়াবাড়ি রকমের ঝামেলা হতে পারে। এখন যে-অবস্থা, কোনো ঝামেলায় যাওয়াটা চরম বোকামি হবে আমার জন্য। যিব্যালবের সঙ্গে দেখা করাটা বেশি জরুরি। সময় এলে দেখা যাবে—নিজের মনকে নিঃশব্দে এই প্রবোধ দিয়ে বাউ করে সম্মান জানালাম ক্যাপ্টেনকে, উল্টো ঘুরে চলে এলাম ডেকে।

এদিকে ডিনারের ঘণ্টা বাজার পরও আমি টেবিলে যাইনি দেখে ক্যাপ্টেনকে আমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। বলেছিলেন, খাবার পরিবেশন করা হয়েছে সম্ভবত জানি

না আমি।

জবাবে ক্যাপ্টেন বলেন, 'আপনার ইণ্ডিয়ান চাকরটার কথা বলছেন তো, সিনর? কেবিনের দরজায় ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। ভিতরে ঢুকতে চাচ্ছিল সে। কিন্তু আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। সিনর নিশ্চয়ই জানেন এসব নিচুজাতের লোকদের সঙ্গে একটেবিলে বসে ডিনার করতে হয় না?'

শান্ত, শীতল কণ্ঠে বললেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড, 'কে নিচু আর কে উঁচু তা বিচার করার দায়িত্ব কে দিয়েছে আপনাকে? আপনি নিজে কতটা উঁচু? ক্যাপ্টেন, যে লোকটাকে কেবিনের ভিতরে ঢুকতে দেননি আপনি সে আমার বন্ধু, চাকর না। এবং সে একজন ভদ্রলোক—এই কামরার অন্য ভদ্রলোকদের মতোই। তাকে অপমান করা মানে আমাকে অপমান করা। সবচেয়ে বড় কথা, ফার্স্ট ক্লাস কেবিনের ভাড়া পরিশোধ করে সাণ্টা মারিয়ায় উঠেছে সে। সুতরাং একজন ফার্স্ট ক্লাস কেবিনের যাত্রী যেসব সুযোগসুবিধা ভোগ করে তারও সে-সব ভোগ করার অধিকার আছে। কই, টিকেট বেচার সময় আপনার লোক তো একবারও বলেনি ইণ্ডিয়ানের কাছে ফার্স্ট ক্লাস টিকেট বেচা যাবে না? যান, জাত্যাভিমানের ফালতু ভাষণ বাদ দিয়ে খবর দিন ওকে। আমি যে-টেবিলে ডিনার খাবো, আমার পাশে বসে একই টেবিলে ডিনার খাবে সে।'

'আপনি যা ভালো মনে করেন, সিনর,' ঠোঁটের কোনার সেই বিনয়ী হাসিটা ধরে রেখে বললেন ক্যাপ্টেন। 'তবে আপনাকে অগ্রীম বলে রাখি, আপনার বন্ধু এই কেবিনে ঢুকলে ঝামেলা হবে।' আমাকে ডেকে আনার আদেশ দিলেন তিনি স্টুয়ার্ডকে।

এই স্টুয়ার্ড লোকটা একজন ইণ্ডিয়ান। আমি কে তা মোটামুটি জানা আছে ওর। সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের কী কথা হয়েছে তা একবর্ণও আমাকে জানাল না সে—পাছে মনে কষ্ট পাই আমি। বরং আমার সামনে এসে বলল, 'আপনার সঙ্গে যে-আচরণ করেছেন ক্যাপ্টেন তার জন্য তিনি দুঃখিত। তিনি চাচ্ছেন আপনি

ফিরে আসুন কেবিনে, সবার সঙ্গে একটেবিলে বসে ডিনার করুন।'

খটকা লাগল, তারপরও গেলাম। দরজায় আমাকে দেখে হাঁক ছাড়লেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড, 'আসতে দেরি হয়ে গেছে তোমার, বন্ধু। আমাদের অনেকেই ডিনার শুরু করে দিয়েছে। তবে তোমার জন্য নিজের পাশে জায়গা রেখেছি আমি। এসো, তাড়াতাড়ি বসে পড়ো। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

টেবিলে যারা বসে আছে তাদের উদ্দেশ্যে ছোট করে বাউ করলাম। গিয়ে বসে পড়লাম সিনরের পাশে। সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত সম্ভ্রান্ত মেক্সিকানদের মধ্যে শুরু হলো গুঞ্জন আর ফিসফিস। আমার একপাশে সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড; আরেকপাশে যে মেক্সিকান বসে ছিল সে অবজ্ঞাভরে নিজের প্লেট-গ্লাস সরিয়ে নিল।

ঘটনাক্রমে আমার ঠিক উল্টোদিকে বসেছে ডন হোসে মোরেনো, যার পরিবারের নোংরা ইতিহাস কিছুক্ষণ আগেও আমাকে শোনাচ্ছিল মোলাস। আমি বসতে-না-বসতেই ওর ডান পাশে বসা জনৈক মেক্সিকানের সঙ্গে নিচু গলায় দ্রুত আলাপ সেরে নিল সে। তারপর ক্যাপ্টেনকে উদ্দেশ্য করে উঁচু গলায় বলল, 'তোমার ভুল হচ্ছে, ক্যাপ্টেন। ইণ্ডিয়ান কুত্তারা মেক্সিকান ভদ্রলোকদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে কোনোদিন খায়নি, খাবেও না।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। মৃদু গলায় বললেন, 'সিনর, আমার বাঁ পাশে একজন ইংরেজ সিনর বসে আছেন। ভালো হয় ব্যাপারটা যদি তাঁর সঙ্গে মীমাংসা করেন। আমার আসলে এ-ব্যাপারে কিছু করার নেই, বলারও নেই। আমি একজন গরিব নাবিক মাত্র। সবরকম লোকের সঙ্গে উঠবস করতে হয় আমাকে। এবং আমার কাজই হচ্ছে আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যা বলে তা মান্য করা।'

এবার আমাদের দিকে সরাসরি তাকাল ডন হোসে। 'সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড, দয়া করে এই কেবিন থেকে বের হয়ে যেতে বলুন আপনার চাকরকে।'

সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের ব্যবহার খুব ভালো হলেও তিনি মাথাগরম স্বভাবের মানুষ। হঠাৎ করেই রেগে যান, আবার তাঁর সেই রাগ ঠাণ্ডা হতেও সময় লাগে না। ডন হোসের দম্ভোক্তি শুনে তাঁর মাথায় সম্ভবত রক্ত উঠে গেল। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'আমার বন্ধু যদি কুত্তা হয় তা হলে তুই কুত্তার বাপ! তোর চোদ্দ গুষ্ঠি কুত্তা! জাহান্নামে যা তোরা!'

'কী?!' লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ডন হোসে, আঁকড়ে ধরেছে কোমরে ঝোলানো ছুরির বাঁট। 'এত বড় সাহস? আয় দেখাচ্ছি মজা!'

'আপত্তি নেই আমার,' দাঁড়িয়ে গেছেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডও। 'কখন এবং কীভাবে মজা দেখাবি?'

অত্যন্ত বেরসিকের মতো এমন সময় বাগড়া দিয়ে বসলেন ক্যাপ্টেন। ভোজবাজির মতো পকেট থেকে বের করেছেন বিশাল এক পিস্তল। এ-রকম একটা পরিস্থিতিতেও সেই বিনয়ী হাসিটা ধরে রেখে বলতে লাগলেন, 'সিনরেরা, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই কাজ করতে হচ্ছে আমাকে। আগেও বলেছি আমি একজন গরিব নাবিক। কিন্তু একইসঙ্গে এ-কথাও সত্য যে, এই নৌকায় রক্তপাতের কোনো ঘটনা যাতে না-ঘটতে পারে তা দেখার দায়িত্বও আমার। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি, আপনাদের দু'জনের মধ্যে যে আগে কোনো অস্ত্র বের করবে তাকে গুলি করতে বাধ্য হবো। এবং তা করতে হাত কাঁপবে না আমার,' পিস্তল কক করলেন তিনি।

ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি করল ডন হোসে। আর, ভেড়ার মতো চেহারার ক্যাপ্টেনকে পিস্তল হাতে নেকড়ের মতো গর্জে উঠতে দেখে হঠাৎ এতটাই কৌতুক বোধ করলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড যে, ফেটে পড়লেন অট্টহাসিতে। এদিকে উঠে দাঁড়িয়েছি আমিও, এত অপমান আর সহ্য করতে পারছি না।

'সিনরেরা,' বলতে লাগলাম স্প্যানিশে, 'বুঝতে পারছি এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের বেশিরভাগের কাছেই আমার উপস্থিতি

অবাঞ্ছিত। কাজেই আমি চলে যাচ্ছি। আমার মনে হয় আমি চলে গেলেই সবদিক দিয়ে ভালো। তবে যাওয়ার আগে দুটো কথা বলতে চাই। দয়া করে কেউ ভাববেন না গর্ব করে বলছি কথাগুলো। বরং আমার বন্ধু এই ইংরেজ ভদ্রলোকের পক্ষে সাফাই গাইছি আসলে। আপনারা যত সম্ভ্রান্ত বংশেরই হোন না কেন, আপনাদের বংশের যত প্রাচীন পরিচয়ই থাকুক না কেন, আমার বংশ কিন্তু তারচেয়েও সম্ভ্রান্ত, তারচেয়েও প্রাচীন। আমার মনে হয় আমার পরিচয় যদি জানতেন আপনারা তা হলে আমার সঙ্গে একটেবিলে বসে ডিনার করতে আপত্তি করতেন না। সিনর ডন হোসে মোরেনো, আমাকে কুত্তা বলেছেন আপনি। সবিনয়ে জানতে চাই, আপনি কী? মেক্সিকান বা ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে কে না-জানে আপনার বংশের পরিচয়? আপনার বাবা একটা খুনি ও রাহাজান এবং এমন একজন লোক যার লজ্জাশরম আছে বলে মনে হয় না। থাকলে সঙ্করজাতের একটা নোংরা অগোছালো মেয়েমানুষকে বিয়ে করতে পারত না। আপনিও আপনার বাবার মতোই উদ্ধত। কারণ তা না-হলে আমার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করতে পারতেন না। আপনি চিনতে পারেননি, অথচ এই নৌকার প্রতিটা ইণ্ডিয়ান কিন্তু ঠিকই চিনেছে আমাকে। আমি যে একজন রাজপুত্র বুঝতে পেরেছে।'

আমার শেষের কথাটা শোনার পর সবাই তাকাল ডন হোসের দিকে। আমার কথা শুনতে শুনতে কেমন সাদাটে সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে ওর ফ্যাকাসে চেহারাটা। প্রবল রাগ সামলাতে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল সে। তারপর আবার হঠাৎ করেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, আবারও আঁকড়ে ধরেছে ছুরির বাঁট। 'কুত্তা!' বলল চেঁচিয়ে, 'কাছে আয়, যে-জিভ দিয়ে এত জঘন্য মিথ্যা বলছিস তা কেটে আলাদা করে নেবো!'

'তুমি সে-রকম কিছুই করতে পারবে না, ডন হোসে মোরেনো,' শান্ত গলায় বললাম, আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে শয়তানটার চেহারার উপর। 'তোমার বাবার ব্যাপারে যা বলেছি তার প্রতিটা বর্ণ

সত্য। এবং তার প্রমাণও দিতে পারবো আমি। এই জাহাজে এখন এমন একজন লোক আছে যাকে মাস তিনেকও হয়নি রাস্তায় একা পেয়ে লুট করেছে তোমার বাবা আর তার লোকেরা। তোমার সঙ্গে যেসব তথাকথিত ভদ্রলোক বসে আছে তারা যদি গল্পটা শুনতে চায় তা হলে বলতে কোনো আপত্তি নেই আমার। তুমি যদি লড়তে চাও আমার সঙ্গে তাতেও আপত্তি নেই। নিজেকে কীভাবে রক্ষা করতে হয় জানি আমি। আরেকটা কথা। এই নৌকার নাম সাণ্টা মারিয়া। তারমানে নৌকার মালিক একজন ইণ্ডিয়ান। এখানে ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যাই বেশি। সবাই আমাকে চেনে, অথবা পরিচয় পেলে মান্য করবে। আমার অথবা আমার বন্ধু সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের যদি কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করো তুমি, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি জ্যান্ত ফিরতে পারবে না বাড়িতে।' কথা শেষ করে কেবিনের বাকি "ভদ্রলোকদের" উদ্দেশ্যে বাউ করে বেরিয়ে গেলাম।

ডিনার শেষ। খোলা ডেকে বের হয়ে এসেছেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। নৌকার রেলিং ধরে এককোনায় দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে দেখতে পেলেন তিনি। এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন আমার পাশে।

তাঁকে বললাম, 'ধন্যবাদ, বন্ধু।'

আমার দিকে তাকালেন সিনর। 'কীসের জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছ?'

'আমাকে অপমানিত করা হয়েছে। প্রথমবার প্রতিবাদ করতে পারিনি আমি। কিন্তু আপনি ঠিকই করেছেন কাজটা। আমার জন্য আরেকটু হলে মারামারি শুরু করে দিয়েছিলেন ডন হোসের সঙ্গে। খালিহাতে ওর বিরুদ্ধে...সম্ভবত পারতেন না আপনি।'

'অন্যায়ের প্রতিবাদ করা উচিত, ইগনাশিয়ো। তা না হলে অন্যায়কারীরা আরও সুযোগ পেয়ে যায়।'

'মাথা গরম করে যা করলাম আমরা তা আমাদের জন্য ভালো হলো, না খারাপ হলো বুঝতে পারছি না।'

'ভেবে আর লাভ কী? যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। তোমার

পরিচয়ও ফাঁস হয়ে গেল, আমিও পরিণত হলাম ডন হোসের শত্রুতে। আজ যা ঘটল, শয়তানটার কাছ থেকে আসলেই সমঝে চলতে হবে। সে এমন লোক না, যে-চাবুকের বাড়ি খাবে সে-চাবুককে চুমু দেবে। সুযোগ পেলেই আমাদের দু'জনের সর্বনাশ করে ছাড়বে হারামিটা।'

পরিবেশ হালকা করার জন্য হাসলাম জোর করে। 'ঘাবড়াবেন না। স্টুয়ার্ড আর মোলাস ছাড়াও বিশজন ইণ্ডিয়ান আছে এই নৌকায়। এদের বেশিরভাগেরই বাড়ি ক্যাম্পেখে ছাড়িয়ে আরও দূরে। দু'জন আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্য। বাকিরা জানে আমি কে। আমার জানামতে ওরা ইতোমধ্যেই নজর রাখতে শুরু করেছে ডন হোসের উপর। ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে শয়তানটা আসতে পারবে না আমাদের কাছে। তবে আমার মনে হয় রাতে কেবিনের বদলে যদি ডেকে ঘুমাই আমরা তা হলে ভালো হয়।'

সে-রাতে সাণ্টা মারিয়ার ফো'ক্যাসলে দুই কুণ্ডলী দড়িকে বিছানা বানিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা। আমাদের পিছনেই শুয়ে আছে মোলাস। রাতটা মনোরম। ঘুম আসছে না, তাই গল্প করছি তিনজনে মিলে। একেকবার একেকজন মজার মজার সব অ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলছি। শেষপর্যন্ত আমাদের কথা ফুরাল, মন থেকে আশঙ্কাও দূর হলো অনেকখানি। ধরেই নিলাম ডন হোসের পক্ষ থেকে কোনোরকম হামলা করা হবে না আমাদের উপর। আর কেউ সে-রকম কোনো চেষ্টা করলেও ইণ্ডিয়ানরা ঠেকিয়ে দেবে, অন্তত সতর্ক করবে আমাদেরকে। তাই মন হালকা হয়ে আসামাত্র চোখ ভারী হয়ে এল আমাদের। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না।

কতক্ষণ পর বলতে পারবো না, হঠাৎ প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল সাণ্টা মারিয়া। আপনাথেকেই ঘুম ভেঙে গেল আমাদের।

চোখ মেলে দেখি ভোরের আলো ফুটছে। মুক্তার মতো সেই আলোর চমৎকার প্রতিফলন সাগরের শান্ত পানিতে। মাথার উপরে গুটিকয়েক তারা অনুজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। কিন্তু আকাশের পুবপ্রান্তে

কিছুটা গোলাপি কিছুটা বেগুনি মেঘ জমাট বেঁধেছে। কী হয়েছে ভাবতে ভাবতে উঠে বসলাম। প্রথমেই চোখে পড়ল ক্যাপ্টেনকে। নোংরা একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ব্যস্ত ভঙ্গিতে কথা বলছেন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। ক্যাপ্টেনের কম্বলের চেয়েও নোংরা একটা শার্ট ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারের পরনে আর কিছু নেই। দেখে মনে হচ্ছে মাথা খারাপ হয়ে গেছে লোকটার।

কোনো একটা গণ্ডগোল হয়েছে বুঝতে পেরে "বিছানা" ছেড়ে উঠলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড, এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেনের দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'থামলেন কেন?'

'কারণ ইঞ্জিন বিগড়ে গেছে। আকাশে মেঘ জমে থাকায় বাতাস পড়ে গেছে। তাই পাল খাটালেও কোনো লাভ হবে না।' ঠোঁটের কোনায় সেই বিনয়ী হাসিটা ছিল না এতক্ষণ, বুঝতে পেরে চট্ করে নিজের চেহারায় হাসিটা ফিরিয়ে আনলেন ক্যাপ্টেন। আশ্বাস দেয়ার সুরে বললেন, 'কোনো ভয় নেই। কিচ্ছু হবে না। ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। আমাকে বলেছে সে, ইঞ্জিনের সমস্যা ঠিক করা কোনো ব্যাপারই না ওর জন্য। বছরের পর বছর ধরে এই ইঞ্জিন নিয়েই ওর কারবার। কোথায় কী সমস্যা তা ওর চেয়ে ভালো বোধহয় ঈশ্বরও জানে না।'

আকাশের পুবপ্রান্তের দিকে ইঙ্গিত করলেন সিনর। 'ঝড় না-উঠলে এই আবহাওয়ায় ভয় পাওয়ার আসলেই কিছু নেই। সমস্যা একটাই—দেরি হয়ে যাচ্ছে আমাদের সবার।'

'না, না, কোনো দেরি না,' জমাট মেঘের দিকে সরু চোখে তাকালেন ক্যাপ্টেন। দিগন্তরেখার উপরে বৃত্তাকারে জমছে মেঘ, ঘন থেকে আরও ঘন হচ্ছে ক্রমশ। সময় যত যাচ্ছে ভোরের ধূসর আলো তত উজ্জ্বলতা হারাচ্ছে।

'কী মনে হয় আপনার?' আবারও জিজ্ঞেস করলেন সিনর, 'মেক্সিকো উপসাগরের উষ্ণ স্রোতের মধ্যে পড়ে যেতে পারি আমরা?'

'না, না,' বলেই বুকে ক্রস করলেন ক্যাপ্টেন, 'এসব অশুভ কথা বলতে হয় না। কিন্তু একটা ব্যাপার কী জানেন? আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ঈশ্বরের হাতে। আমরা গরিব নাবিকরা এক্ষেত্রে কী করতে পারি?' মেঘের দিকে আরেকবার তাকিয়ে দ্রুত প্রস্থান করলেন তিনি, সম্ভবত সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের সঙ্গে আর কোনো কথা বলতে চাচ্ছেন না।

কিছুক্ষণ পর আবার কাজ করতে শুরু করল সাণ্টা মারিয়ার ইঞ্জিন। কিন্তু থামে, চলে, থামে, চলে—এই অবস্থা। নৌকার এই দুর্দশা দেখে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে খোঁড়া কোনো খচ্চরের কথা। একটাই আশা—দিগন্তরেখা থেকে আস্তে আস্তে উধাও হচ্ছে ভোরের মেঘমালা। পরিষ্কার হচ্ছে আকাশ, আগের চেয়ে আরও ঝকঝকে হয়ে উঠছে সকালটা।

বিকেল তিনটার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল মোলাস। আঙুলের ইশারায় উপকূলরেখার বিশেষ একটা জায়গা দেখাচ্ছে সে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে সেখানে যেন কিছুটা অশান্ত হয়ে আছে সাগর। তরঙ্গবিক্ষোভ দেখা দিয়েছে ওই জায়গার পানিতে। এত দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছি, ঢেউয়ের মাথায় ভাসছে সাদা ফেনা।

মোলাস বলল, 'ওই তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জায়গাটাই হচ্ছে গ্রিজ্যালভা নদী আর সাগরের মোহনা। মোহনা পার হওয়া মানে নদীতে ঢুকে পড়া। আর গ্রিজ্যালভার পরই ফ্রণ্টেরা গ্রাম, মানে আমাদের গন্তব্য।'

'ভালো,' সন্তুষ্ট গলায় বললেন সিনর, 'তা হলে আমার মনে হয় আমার জিনিসপত্র নিয়ে এসে ডেকে রাখার সময় হয়েছে।' বলে নিজের কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন তিনি, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র আর কিছু শুকনো খাবারের একটা বস্তা এনে রাখলেন ডেকে।

ক্যাপ্টেন ততক্ষণে আবার উদয় হয়েছেন। চোখ বড় বড় করে সিনরের বস্তাটা দেখলেন তিনি। যেন খুবই আশ্চর্য হয়েছেন এমন গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'গাঁটরি-বোঁচকা নিয়ে এসেছেন কেন, সিনর? কী করবেন এসব দিয়ে?'

'ফ্রন্টেরায় কি খালিহাতে নামবো?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন সিনর।

'ফ্রন্টেরায় নামবেন মানে? সপ্তাহখানেকের আগে এই নৌকা সেখানে যাবে এমন তথ্য কার কাছ থেকে পেলেন? ফ্রন্টেরা ছাড়িয়ে এগোবো আমরা, সোজা এগিয়ে যাবো ক্যাম্পেখের দিকে। ভাগ্য সহায় থাকলে আগামীকাল সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যাবো সেখানে।'

'কিন্তু আমরা ফ্রন্টেরার টিকেট কিনেছি, আপনার লোকের কাছ থেকেই। আমি দাবি করছি আমাকে আর আমার দুই সঙ্গীকে ফ্রন্টেরার বন্দরে নামিয়ে দেয়া হোক।'

'অস্বীকার করছি না আমার লোক আপনাদের কাছে ফ্রন্টেরার টিকিট বিক্রি করেছে। কিন্তু এই নৌকা সান্টা ক্রুয থেকে সরাসরি ফ্রন্টেরায় যায় না। আগে যায় ক্যাম্পেখেতে। ফেরার পথে যাত্রাবিরতি করে ফ্রন্টেরায়। এতে এক সপ্তাহের মতো সময় লাগে। আপনাকে আশ্বস্ত করছি, ফ্রন্টেরায় নামতে পারবেন আপনি এবং তার জন্য অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে না। কিন্তু তার আগে, মাঝিদের সবার উপর আমার নির্দেশ আছে, ক্যাম্পেখে অভিমুখেই যেন চালানো হয় নৌকা। অবশ্য উষ্ণ মেক্সিকান স্রোত যদি নৌকাটা ঠেলে অন্য কোনো দিকে যায় তা হলে বাধ্য হয়ে হয়তো...'

'মনেপ্রাণে প্রার্থনা করছি,' চেহারা দেখে বুঝতে পারছি মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেছে সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের, 'মেক্সিকান স্রোতের কবলে পড়ে যেন আপনি, আপনার নৌকা, আপনার ওই এজেন্ট যে টিকেট বিক্রি করেছে আমাদের কাছে এবং আপনার সঙ্গে যা যা আছে সব ডুবে যায়।'

সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের এই দুরবস্থা দেখে হাসিতে ফেটে পড়েছে ডেকে উপস্থিত কিছু সংখ্যক মেক্সিকান যাত্রী। কেউ কেউ আবার সিনরের অভিশাপ শুনে বুকের উপর সমানে ক্রস করছে।

সে-রাতে ডেকেই ডিনার সেরে নিলাম আমরা। সবারই মেজাজ কমবেশি খারাপ। কারোরই ইচ্ছা করছে না নীচে, কেবিনে গিয়ে ডিনার করতে। কেউ চাচ্ছি না ডন হোসে মোরেনোর সঙ্গে দেখা

হয়ে যাক। গত রাতের পর থেকে এখন পর্যন্ত আর দেখা পাইনি ওর। কী হয়েছে শয়তানটার কে জানে!

আমাদের খাওয়া তখন শেষের পথে, এমন সময় খেয়াল করলাম, সকালের সেই মেঘমালা আবার ফিরে এসেছে আকাশে। অন্ধকার যেন আরও বেশি করে ঘনিয়েছে, আকাশটা যেন আরও বেশি কালো হয়ে গেছে। দিগন্তের উত্তর কোণে বিস্তার লাভ করছে এই মেঘমালা, ঠিক যেমনটা করেছিল সকালের পুবাকাশে। কারখানার চুল্লি থেকে রাতের বেলায় ধোঁয়া বের হলে যেমন লালচে আকাশের পটভূমিতে ছাইসাদা দেখায়, এই মেঘমালাও যেন সে-রকম বর্ণ ধারণ করেছে।

'আকাশের অবস্থা সুবিধার না, ইগনাশিয়ো,' মন্তব্য করলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নীচের স্রোত দেখতে দেখতে জনৈক ইণ্ডিয়ান নাবিকের সঙ্গে আলাপচারিতায় ব্যস্ত মোলাস; ওদের কিছু কথা কানে এল এমন সময়। শুনলাম মোলাস বলছে, 'এল্ নর্টে! (সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত মেক্সিকো উপসাগরের উত্তরদিক থেকে যে-প্রচণ্ড শক্তিশালী স্রোত প্রবাহিত হয়) খবর আছে আমাদের!'

'হ্যাঁ, এল্ নর্টে। ঠিকই বলেছেন। আমাদের খবর আছে,' বলেই ঘুরল ইণ্ডিয়ান নাবিকটা, একছুটে গিয়ে ঢুকল কেবিনে।

কিছুক্ষণ পরই কম্প্যানিয়ন-ল্যাডার বেয়ে উঠে এলেন ক্যাপ্টেন। ডেকে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন উত্তরের দিগন্তটা। মনে হচ্ছে ঘাবড়ে গেছেন তিনি। মিনিটখানেক পর ইঞ্জিন হ্যাচ থেকে বের হয়ে নৌকার মেট গিয়ে দাঁড়াল তাঁর পাশে। দু'জনে মিলে কথা বলতে লাগল, বলা ভালো ঝগড়া করতে লাগল।

কাছেই বসে আছি আমি, অন্ধকারে আমাকে হয়তো খেয়াল করেনি দু'জনের কেউই। ওদের কথা শুনে বুঝতে পারছি, মেট লোকটা চাচ্ছে না এই অবস্থায় ক্যাম্পেখের দিকে যেতে। এখনই নৌকার মুখ ঘুরিয়ে নেয়ার পক্ষে সে। এখন যে-জায়গায় আছি

আমরা সে-জায়গা থেকে বেশি হলে চল্লিশ মাইল দূরে ফ্রন্টেরা। সেখানে যাওয়ার জন্য ক্যাপ্টেনকে বার বার অনুরোধ করছে মেট।

ক্যাপ্টেন বলছেন, 'সহজ একটা কথা তোমার মাথায় আসছে না কেন বুঝতে পারছি না। ধরো ফ্রন্টেরার দিকে গেলাম আমরা। ইতোমধ্যে চলে এল এল্ নর্টে। তখন কী হবে? ফ্রন্টেরায় পৌঁছানোর আগেই ভয়ঙ্কর ওই স্রোতের কবলে পড়ে যাবো। গ্রিজ্যালভা নদীর মোহনায় পৌঁছানোর আগেই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে সাণ্টা মারিয়া। আবার এমনও হতে পারে শেষপর্যন্ত এলই না স্রোতটা। যদি আসেও, আমাদের জন্য কোন্ কাজটা সবচেয়ে উপযুক্ত হবে জানো? খোলা সাগরে থাকা। বরাবরের মতোই মোহনা-সংলগ্ন অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাবে স্রোতটা, বড় কোনো ক্ষতি হবে না আমাদের।'

মেট বলল, 'নৌকা ঠিক থাকলে, নৌকার ইঞ্জিন ঠিক থাকলে আপনার কথা মেনে নিতাম বিনাবাক্যে। কিন্তু সমস্যা তো সেখানেই। বয়লারের জায়গায় জায়গায় ছিদ্র হয়ে গেছে—জানেন কি না জানি না। প্যাডল হুইলেও মরিচা ধরে আছে অনেকদিন থেকে। এই অবস্থায় সাণ্টা মারিয়ায় চড়ে এল্ নর্টের মুখোমুখি হওয়া আর সিগারেট-দিয়ে-বানানো মাস্তুলের কোনো নৌকায় করে সাগর পাড়ি দেয়া সমান কথা।'

ক্যাপ্টেন দেখলেন তাঁর মুখে মুখে তর্ক করছে মেট। এদিকে মেট বুঝতে পারছে হাজার বোঝানোর পরও শুধু একগুঁয়েমির কারণে নিজের সিদ্ধান্ত বদলাচ্ছেন না ক্যাপ্টেন। ব্যস, শুরু হয়ে গেল দু'জনের চরম ঝগড়া। তবে সে-ঝগড়া শেষে ক্যাপ্টেনের সিদ্ধান্তই বহাল থাকল—যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই যাবে সাণ্টা মারিয়া আপাতত। যদি অবস্থা বেগতিক হয় তা হলে মেক্সিকো উপসাগরের "পয়েন্ট যিকাল্যাঙ্গো" ঘুরে আশ্রয় নেবে কারমেন দ্বীপে। অথবা পারলে উসুমাসিণ্টো নদীর মোহনায় গিয়ে উঠবে।

রফা হয়ে গেছে, এবার ক্যাপ্টেন আর মেট যার যার কাজে চলে

যাবে। তবে যাওয়ার আগে শুনি মেটকে নিচু গলায় বলছেন ক্যাপ্টেন, 'আবহাওয়ার এই খারাপ অবস্থা নিয়ে যাত্রীদের কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। বিশেষ করে ওই অভিশপ্ত ইংরেজটার কানে যাতে কিছু না-যায়। শয়তানটাকে ফ্রন্টেরায় নামানো হয়নি বলে সবার সামনে আমাকে, আমাদের সবাইকে অভিশাপ দিয়েছে। কপাল খারাপ, ওর অভিশাপ লেগে গেছে। লোকে যে বলে কারও কারও বদনজর আসলেই ভয়ঙ্কর, শুধু শুধু বলে না।'

তেমন কোনো পরিবর্তন ছাড়াই কাটল আরও দু'ঘণ্টা। রাতের অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছে। ঝড়ের আগে প্রকৃতি যে-রকম থম্ খেয়ে যায় সে-রকম হয়ে গেছে আমাদের চারপাশ। অনেকক্ষণ আগে থেকে অস্থিরভঙ্গিতে ডেকে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। একটার পর একটা সিগার ফুঁকছেন। হঠাৎ করেই থেমে দাঁড়ালেন তিনি, এগিয়ে এলেন আমার দিকে। আমার পাশে, দড়ির একটা কুণ্ডলীর উপর বসে পড়লেন। বললেন, 'কী মনে হয় তোমার, ইগনাশিয়ো? এল্ নর্টে আসছে নাকি?'

'হ্যাঁ, আসছে,' মিথ্যা বলার কোনো মানে হয় না, তাই সরাসরি জানিয়ে দিলাম। 'এবং আমার আশঙ্কা ভয়ঙ্কর ওই স্রোতের কবলে পড়লে ডুবে যাবে আমাদের নৌকা। অন্তত ইণ্ডিয়ান নাবিকেরা তা-ই বলছে।'

কিছুক্ষণ আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন সিনর। তারপর বললেন, 'তোমার তো দেখছি কোনো চিন্তাই নেই! সাণ্টা মারিয়া ডুবে গেলে আমাদের কী হবে ভেবেছ একবার? তোমার কী হবে ভেবেছ? কুকুরছানাকে বস্তায় ভরে পানিতে চুবিয়ে মারলে যে-অবস্থা হয়, আমাদের সবার একই অবস্থা হবে। অথচ তুমি শান্ত গলায় বলছ ডুবে যাবে আমাদের নৌকা? ...পয়েন্ট যিকাল্যাঙ্গো থেকে কত দূরে আছি আমরা?'

'মনে হয় বারো মাইল। ...দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না,

সিনর। এই ঝড়, এল্ নর্টে, সাণ্টা মারিয়ার ডুবে যাওয়া—সবকিছু স্বাভাবিকভাবে নিয়েছি আমি, কারণ স্বাভাবিকভাবে না-নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। কী করবো বলুন? ভয়ে পাগলের মতো চিৎকার শুরু করবো? তাতে কোনো লাভ হবে? আসলে আমাকে...নিয়তিবাদী বলতে পারেন। নিয়তিকে মেনে নেয়ার প্রবণতা আছে আমার মধ্যে। ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয় আমাদেরকে রক্ষা করবেন। তাঁর যদি ইচ্ছা হয় আমাদের সবাইকে ডুবিয়ে মারবেন। আমার মতে নিয়তির বিরুদ্ধে লড়াই করা ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই না।'

'বলতে বাধ্য হচ্ছি মতবাদটা ইণ্ডিয়ানদের মতোই। এবং এ-ও বলতে বাধ্য হচ্ছি, নিয়তিও বোধহয় চায় না মানুষ সবসময় নিয়তিকে মেনে নিক। এজন্যই যারা নিয়তির বিরুদ্ধাচারণ করে তাদেরকে পুরস্কৃত করে সে। আমরা যারা সাদাচামড়ার মানুষ, ইউরোপের মানুষ তাদেরকে নিয়ে চিন্তা করলেই বিষয়টা বুঝতে পারবে আশা করি। আমি দেখেছি, আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হয় এ-রকম কোনো কাজ সামনে এলেই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকো তোমরা এবং বলতে থাকো, এটাই আমাদের নিয়তি, একে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। অথচ আমি কিংবা আমার দেশের মানুষরা কিন্তু নিয়তিতে খুব একটা বিশ্বাস করি না। যদি করতাম তা হলে আজ ইংল্যাণ্ড পৃথিবীর প্রথম সারির একটা দেশে পরিণত হওয়ার বদলে হয়তো অস্তিত্বহীন হয়ে যেত অনেক আগেই। আমাদের ইতিহাস জানো না তুমি, ইগনাশিয়ো। কতবার কত ঝড় গেছে আমাদের উপর দিয়ে। কতবার কত আঘাত এসেছে আমাদের দেশের উপর। কিন্তু প্রতিবারই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি আমরা, বিরুদ্ধাচরণ করেছি তোমার সেই তথাকথিত নিয়তির। সে-জন্যই আজ আমরা নিয়তির কাছে না, নিয়তিই আমাদের কাছে পরাজিত। নিজের কথা যদি বলি, মরতে হলে লড়াই করে মরতে চাই আমি। ...আচ্ছা একটা কথা বলো তো, তোমার এই ইণ্ডিয়ান নাবিকদের

উপর কি প্রয়োজনের সময় ভরসা করা যায়?'

সিনর আসলে কী বোঝাতে চাচ্ছেন বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'এদের বেশিরভাগই, আগেও বলেছি বোধহয়, ক্যাম্পেখের লোক। এরা কমবেশি সাহসী। এই অঞ্চলের উপকূল আর সাগর সম্পর্কে ভালো জানে। আমাকে মান্য করে। আমার বিশ্বাস, প্রয়োজনের সময় আমি যা করতে বলবো তা করতে দ্বিধা করবে না ওরা। ...দেখুন, দেখুন!'

কথা বলছিলাম এমন সময় আকাশটাকে চিরে দিয়ে গেছে কোটি মোমবাতির আলোর সমান উজ্জ্বল একটা আলোকরশ্মি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কানে তালা লাগানোর শব্দে বাজ পড়ল কোথাও। এক কি বেশি হলে দু'মুহূর্তের জন্য বিদায় নিল অন্ধকার। তিন-চার মাইল দূরের উপকূলরেখা চোখে পড়ল হঠাৎ করেই। বলতে গেলে আমাদের ঠিক সামনেই পয়েন্ট যিকাল্যাঙ্গো।

নৌকার পাশ দিয়ে বয়ে-চলা সাগরজল নিস্তরঙ্গ, যেন মৃত; এমনভাবে নৌকা ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে পানি না, তেলের সাগরে ভাসছি আমরা। একটুও বাতাস নেই—ফানেল থেকে বের-হওয়া ধোঁয়া সোজা উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। তবে নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত ওঠার পর বার কয়েক গোত্তা খেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে রাতের আকাশে। বাতাসের আশায় খাটানো পাল বাতাসের অভাবে ন্যাতাকানির মতো দুলছে এদিকে-সেদিকে।

আরও মাইলখানেকের মতো এগোলাম আমরা। তারপরই পড়লাম এল্ নর্টের পাল্লায়। জ্যান্ত কোনোকিছুর মতো আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে স্রোতটা। একেবারে সামনে সর্বগ্রাসী বিক্ষুব্ধ ফেনিল তরঙ্গমালা। অন্ধকারের পটভূমিতে হঠাৎ দেখলে মনে হয় সমুদ্রসমতল থেকে আলাদা হয়ে যেন ছুটে আসছে মূর্তিমান কোনো দানব। পিছনে আলকাতরার মতো কালো আকাশে ছোট ছোট দুধসাদা আলোকরশ্মির মুহুর্মুহু ঝলক। দিগন্ত বেয়ে আকাশের সর্বোচ্চ শিখর পর্যন্ত লতানো-গাছের-মতো পাক খেয়ে খেয়ে বিছিয়ে

আছে মেঘ।

ডেকেই আছেন ক্যাপ্টেন। এতক্ষণে বোধহয় বুঝতে পারছেন কত বড় বিপদ ঘনিয়েছে। কারণ এল্ নর্টের কবলে যদি পড়ি আমরা তা হলে নিশ্চিত ডুবে মরবো। বজ্রপাতের আওয়াজের পর অদ্ভুত এক নীরবতা আমাদের চারদিকে, সেই নীরবতা খান খান করে দিয়ে মাঝি আর নাবিকদের উদ্দেশ্যে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি হঠাৎ, 'নৌকার মুখ ঘুরাও! মোহনার কাছ থেকে খোলা সাগরে নিয়ে যাও! আফটার-হ্যাচ বন্ধ করো! যাত্রীদের সবাইকে কেবিনে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে বলো!'

যথাযথভাবে এবং দ্রুত পালিত হলো তাঁর আদেশ। মোহনা থেকে এতক্ষণে অনেকখানি সরে গেছে সাণ্টা মারিয়া। আমার মনে হচ্ছে নৌকাটা নিয়ে লোফালুফি খেলছে সাগরের উন্মত্ত স্রোত। আমাদের চারপাশে এখন বিশাল বিশাল ফেনিল ঢেউ। একটু পর পর কেন যেন শুধু মৃত্যুর কথা মনে পড়ছে আমার। কিছুক্ষণ আগের সেই জমাট নিস্তব্ধতা ভেঙে গেছে। বাতাসের নিচু কিন্তু একটানা শোঁ শোঁ আওয়াজ কানে বাজছে। নৌকার দু'পাশ থেকে কয়েক মুহূর্ত পর পর ছলকে উঠছে টন টন পানি। হিসহিস আওয়াজ তুলে ফোয়ারার মতো ছুটে যাচ্ছে আমরা যারা ডেকে আছি তাদের মাথার উপর দিয়ে। উড়ন্ত পানির আঘাত চেহারায় এত জোরে লাগছে যে, মনে হচ্ছে চাবুকের বাড়ি খাচ্ছি যেন।

কাটল আরও কয়েকটা মুহূর্ত। আমাদের সামনে এখন সাদা আর প্রকাণ্ড কিছু একটা। সেটা এতই বিশাল যে, পুরোপুরি দেখতে হলে মুখ উঁচু করে তাকাতে হচ্ছে আমাদেরকে। ওটা দেখামাত্র মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ক্যাপ্টেনের চেহারা। মুহুর্মুহু বিদ্যুচ্চমকে তাঁর সেই চেহারা আরও পাণ্ডুর দেখাচ্ছে যেন। পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো স্থির হয়ে গেছেন তিনি। কিছু বলার আপ্রাণ কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টায় বোবাদের মুখ যেভাবে ঝুলে পড়ে সেভাবে ঝুলে পড়েছে তাঁর মুখটা। অবশেষে আর্তনাদের মতো করে চেঁচিয়ে উঠতে

পারলেন তিনি, 'শুয়ে পড়ো! শুয়ে পড়ো সবাই! হাতের কাছে দড়িদড়া যা পাও তা-ই আঁকড়ে ধরো!'

আমার একপাশে সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড, আরেকপাশে মোলাস। ওদেরকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'শুয়ে পড়ুন আপনারাও। যে যেভাবে পারেন প্রাণ বাঁচান। এল্ নর্টে এসে গেছে। সাণ্টা মারিয়ার একটা মানুষও বাঁচবে কি না সন্দেহ!'

ছয়

এল্ নর্টে

আমাদের উপর পূর্ণশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এল্ নর্টে। প্রথমে তীব্র বায়ুপ্রবাহ কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে আমাদের পাল-মাস্তুল। মূল পালের সামনে তিনকোনা একটা ছোট পাল ছিল, সেটা গুটানো হয়নি, বাতাসের ধাক্কায় পালটা ছিঁড়ে উড়ে চলে গেছে কয়েক মাইল দূরে। বেশ কিছুক্ষণ চলল বাতাসের তর্জন-গর্জন, তারপর শুরু হলো ঝড়।

এই উন্মত্ত ঝড়ের বর্ণনা দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। সম্ভবত কারও পক্ষেই সম্ভব না। বিশাল বিশাল জাহাজের প্রধান মাস্তুলের গোড়ায় দাঁড়িয়ে চূড়ার দিকে তাকালে যেমন বোঝা যায় মাস্তুলটা কত উঁচু, আমাদের চারপাশে সে-রকম দৈত্যাকারের একেকটা ঢেউ। বাতাসের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বা কমছে ঢেউয়ের সংখ্যা। দেখলে মনে হয় সাণ্টা মারিয়া যেন কোনো নৌকা না, পাখি—ভর করে আছে কোনো ঢেউয়ের চূড়ায়, ঢেউটা সরে যাওয়ামাত্র নাক নিচু করে সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে উড়ে গিয়ে সওয়ার হচ্ছে অন্য কোনো ঢেউয়ের উপর। অবিরাম বিদ্যুচ্চমকের

আলোর কাছে রাতের অন্ধকার পরাস্ত। বাতাসের বেগ বেড়ে গেছে অনেক, ঝড়টা পরিণত হয়েছে হারিকেনে। স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে বিজয়ের পর খুশিতে যেভাবে নাচতে থাকে বিদ্রোহী জনতা, সাণ্টা মারিয়ার ডেকের উপর ঠিক সেভাবে নাচছে একফুট-উঁচু-হয়ে-জমা ফেনিল সাগরজল—নৌকার একখুঁটি থেকে আরেকখুঁটির দিকে ধেয়ে যাচ্ছে বিদ্যুৎগতিতে। দড়ির টুকরো, আবর্জনা, টুকটাক জিনিসপত্র, ভাঙা হারিকেন—যা যা পাচ্ছে সব ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলছে উন্মুক্ত সাগরে। দুই ইণ্ডিয়ান নাবিকও চোখের পলকে ভেসে চলে গেল আমাদের সামনে দিয়ে। জাহাজের সামনের মাস্তুলের সঙ্গে বাঁধা দড়ির কুণ্ডলী সর্বশক্তিতে ধরে ঝুলে আছি আমরা, তাই ভেসে যাইনি এখনও। তবে স্রোতের ছিটায় ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছি অনেক আগেই।

কিছুক্ষণ পর মনে হলো একটু যেন কমেছে বাতাসের বেগ। হারিকেনটাও আগের মতো তীব্র না। তবে এমন কিছু টের পাচ্ছি যার ফলে নতুন এক আতঙ্কে মাথা খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা। ডেকে যে-পরিমাণ পানি জমেছে তার ওজন কয়েক টনের কম হবে না; মনে হচ্ছে সেই পানির চাপে আস্তে আস্তে যেন নীচের দিকে দেবে যাচ্ছে সাণ্টা মারিয়া, ঢুকে যাচ্ছে সাগরজলের ভিতরে। আসলে কিছুক্ষণ আগে সরে গেছে বিশাল এক স্রোত, পনেরো-বিশ ফুট উঁচু থেকে নীচের দিকে পড়ছে নৌকাটা, তাই এ-রকম মনে হচ্ছে। ঢেউয়ের মাথায় চড়ে আবার নাক উঁচু করল সে, এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। ভাগ্য ভালো, ঝড়ের প্রথম ধাক্কাটাই ছিল সবচেয়ে খারাপ; সেটা চলে যাওয়ার পর এখন কিছুটা হলেও ধাতস্থ হতে পারছি আমরা। তা ছাড়া দানবীয় স্রোত যদি নৌকার পার্শ্বদেশ থেকে না-এসে সামনের দিক থেকে আঘাত করত তা হলে আর দেখতে হতো না, নৌকা উল্টে গিয়ে সলিলসমাধি হতো আমাদের সবার।

কিছুক্ষণ পর দিক পাল্টাল হারিকেনটা। কিছুটা সরে গিয়ে সরাসরি ধেয়ে যাচ্ছে উপকূলের দিকে। বাতাসের টানে সরে গেছে

দানবীয় স্রোতগুলোও। কেমন একটা স্থবির অবস্থা বিরাজ করছে। হাঁপ ছাড়তে যাচ্ছি, এমন সময় আবার হামলে পড়ল এল্ নর্টে। দিক বদল করে ফিরে এল তুমুল বাতাস। মড়মড় করে উঠল আমাদের পুরনো নৌকা। শুরু হলো ঢেউয়ের জংলি নাচ। বাধ্য হয়ে ইঞ্জিনের গতি অর্ধেক কমিয়ে দিতে বললেন ক্যাপ্টেন।

তাঁর সিদ্ধান্ত কাজে লাগল। এবার আর আগের মতো টন টন পানিতে ভেসে যাচ্ছে না সাণ্টা মারিয়ার ডেক। কিন্তু ক্ষতি হলো আরেকদিক দিয়ে। স্রোতের ধাক্কায় ঘুরে গেছে নৌকার মুখ, পয়েণ্ট যিকাল্যাঙ্গোর দিকে এগোচ্ছি আমরা। অলৌকিক কোনো ঘটনা ছাড়া বাঁচার উপায় নেই। এল্ নর্টের বিরুদ্ধে এখনও অসম লড়াই করছে আমাদের নৌকা। ঝড়ের ধাক্কায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছি আমরা। বিদ্যুচ্চমকের আলোয় দেখি, বড়জোর দু'শ' গজ দূরে আছে পয়েণ্ট যিকাল্যাঙ্গো। ক্যাপ্টেনও দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি। নৌকার নাক কিছুটা ঘুরাতে বললেন যাতে মাতাল স্রোত এসে বাড়ি দেয় নৌকার বাঁ দিকে। ইঞ্জিনের গতি বাড়াতে বললেন। একটু একটু করে আবারও এগোতে শুরু করলাম আমরা।

এই ঘটনার অনেক পরে বেশ কয়েকবার গালফ অভ মেক্সিকো দিয়ে যাত্রা করেছি আমি—বছরের বিভিন্ন সময়ে, খারাপ বা ভালো দুই আবহাওয়াতেই। কিন্তু এ-রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইনি আর কখনও।

কখনও বিশাল স্রোতের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছি, কখনও আবার স্রোতের মাথায় চড়ে থেমে দাঁড়াতে হচ্ছে স্থির হয়ে। কখনও উঁচু হয়ে যাচ্ছে নৌকার নাক, আবার কখনও উঁচু হচ্ছে পিছনদিকটা। আমার মনে হচ্ছে নৌকাটা কাঠের না, কাগজের; আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

দড়ি আঁকড়ে-থাকা দুই হাত টনটন করছে ব্যথায়। ডেকে আছড়ে-পড়া স্রোতের বারংবার আঘাতে আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীর। নৌকার নাক নিচু হলেই বিশাল কোনো স্রোত হুমড়ি খেয়ে পড়ছে

ডেকের উপর। নাকটা উঁচু হওয়ামাত্র আমাদেরকে পুরো গোসল করিয়ে দিয়ে নেমে যাচ্ছে নৌকার পিছনদিক দিয়ে।

পয়েন্ট যিকাল্যাঙ্গো আর কারমেন দ্বীপের মাঝখানে যে-প্রণালী আছে তা কাছিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। কিন্তু সুখবরটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। আচমকা কাজ করা থামিয়ে দিল নৌকার একটা প্যাডলহুইল, আরেকটা ভেঙে ভেসে গেল স্রোতের ধাক্কায়। ডেকের নীচ থেকে আর্তনাদের মতো আওয়াজ ভেসে এল এমন সময়, বুঝলাম বহু-পুরনো মেশিনটাও বোধহয় শেষ।

প্রণালীতে হাজির হয়ে গেছি আমরা। হারিকেনের প্রভাবে পানি উথালপাথাল। এল্ নর্টে আগের মতোই একটানা বাড়ি দিচ্ছে নৌকার একপাশে। আমাদের গতি বেশি হলে পনেরো কি ষোলো নট। আমার মনে হচ্ছে উন্মুক্ত সাগরবক্ষে নৌকায় না, কাঠের পাটাতনে ভাসছি। স্রোতের ধাক্কায় নৌকাটা ঘুরপাক খেল দু'বার। মেশিন বিগড়ে গেছে, তাই স্রোত যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকেই যেতে হচ্ছে আমাদের। আরেকবার মনে হলো পুরো সাগরটাই যেন জ্যান্ত হয়ে উঠে এসেছে নৌকার পাশ দিয়ে—আমাদেরকে গিলে খাওয়ার অভিপ্রায়ে। পানি সরে যাওয়ার পর প্রথমে মনে হলো দড়ি ছিঁড়ে ভাসছি সাগরে। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম আগের জায়গাতেই আছি। তবে ডেকের উপর আর কেউ বা কিছু আছে কি না বুঝতে পারছি না। সে-সুযোগ আপাতত নেই আমার, কিছু ঠাহর করার মতো অবস্থাতেও নেই আমি। টের পাচ্ছি চেতন-অচেতনের মাঝামাঝি একটা অবস্থায় চলে যাচ্ছি আস্তে আস্তে।

বোধহয় আমার অবস্থা টের পেয়েই শক্তিশালী একটা হাত এগিয়ে এল আমার দিকে। আমাকে ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল। কিছুটা হলেও যেন ফিরে এল আমার চেতনা। তাকিয়ে দেখি, মাস্তুলের সেই দড়িদড়া ধরে এখনও ঝুলে আছি আমরা তিনজনে। স্রোতের পর স্রোত আসছে, আমাদেরকে পিষে দিয়ে যাচ্ছে ডেকের সঙ্গে। একটা স্রোত চলে যাওয়ার পর বুক ভরে দম নেয়ার

অবকাশটুকুও পাচ্ছি না। তার আগেই ছুটে আসছে আরেকটা স্রোত। বাতাসের অভাবে আকুলিবিকুলি করছে ফুসফুস, মনে হচ্ছে ফেটে মরবো।

আরেকটা বিশাল স্রোত এল এমন সময়। স্টারবোর্ডের পরিকূটে অবশিষ্ট বলতে যা ছিল সব ভেঙেচুরে নিয়ে গেল। ভালোই হলো একদিক দিয়ে—দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে ভাবলাম, স্টারবোর্ডটা ভেঙে না-গেলে ওই প্রচণ্ড স্রোতের ধাক্কায় উল্টে যেত নৌকা। তারপর কী হতো জানি না। কোনোরকমে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, ইঞ্জিনরুম হ্যাচওয়ে এবং কেবিনের বাতিগুলো নিভে গেছে। যতদূর বুঝতে পারছি সান্টা মারিয়ার অর্ধেকটা ভর্তি হয়ে গেছে পানিতে।

ঘন মেঘের আড়াল থেকে কিছুক্ষণ পর পর উঁকি দিচ্ছে চাঁদ। এটা না-হলেই ভালো হতো বোধহয়। চাঁদের আলোয় বিভীষিকাময় হয়েছে মাতাল সাগরটা। অন্ধকারে টের পাইনি, এখন দেখে আতঙ্কে পাগলপারা হওয়ার মতো অবস্থা। বিধ্বংসী স্রোতের বারংবার আঘাতে ভেঙেচুরে গেছে নৌকার ছোট্ট ব্রিজটা। যেটুকু বাকি আছে সেটুকুর সঙ্গে কীভাবে যেন আটকে আছে ক্যাপ্টেনের বিশাল শরীর। তিনি ভয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছেন, নাকি ভেঙে-পড়া মাস্তুলের আঘাতে মারা গিয়ে লটকে আছেন ব্রিজের সঙ্গে বুঝতে পারছি না।

জাহাজের সব যাত্রীকে কেবিনে গিয়ে আশ্রয় নেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন তিনি। জায়গামতোই গিয়েছিল যাত্রীরা। কিন্তু হ্যাচওয়ে দিয়ে ক্রমাগত ঢুকতে ঢুকতে নীচে পানি জমে গেছে, যারা ডুবে মারা গেছে তারা ছাড়া বাকিরা কম্প্যানিয়নওয়ে ধরে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বেরিয়ে আসছে ডেকে। হুড়োহুড়ি শুরু করে দিয়েছে ওরা। কে পুরুষ কে নারী দেখার অবকাশটুকুও নেই কারও। ওদের কেউ কাঁদছে, কেউ চেঁচাচ্ছে, কেউ অভিশাপ দিচ্ছে। পরিকূট, ব্রিজ, মাস্তুল—যে যেটার অবশিষ্টাংশ হাতের কাছে পাচ্ছে সেটাই খামচে ধরে দুলুনি সামলানোর চেষ্টা করছে।

মহিলাদের পরনে নাইটড্রেস। তাদের চিৎকার বাতাসের শোঁ

শোঁ আওয়াজের চেয়ে কোনো অংশে কম না। ভেরা ক্রুয থেকে যাত্রা শুরু করার পর কেবিনে গিয়ে ঢুকেছিল এরা, এই প্রথমবারের মতো বের হয়ে এল। আতঙ্কে পাগলপারা একেকজন। কিন্তু ওরা আসলে ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত আগুনে এসে পড়েছে। দোদুল্যমান ডেকের একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে। পিচ্ছিল তক্তা, ছেঁড়া দড়ি—যা পাচ্ছে তা-ই ধরে বাঁচার চেষ্টা করছে। বেচারীদের দেখে মায়া লাগছে। তবে বেশিক্ষণ কষ্ট করতে হলো না ওদের কাউকে। বিশাল আরেক ঢেউ আছড়ে পড়ল ডেকের উপর, পলক ফেলার আগেই ভেসে গিয়ে সমুদ্রে পড়ল মহিলারা। চিরজীবনের জন্য থেমে গেল তাদের চিৎকার।

পরিকূটের অবশিষ্টাংশ ধরে দাঁড়িয়ে-থাকা কয়েকজন পুরুষও গিয়ে পড়েছে পানিতে। বাকিদের কেউ দাঁড়িয়ে আছে আগের জায়গায়, কেউ গড়াগড়ি খাচ্ছে ডেকের উপর। কেউ কাউকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাচ্ছে না। সেটা সম্ভবও না।

আমরা তিনজন এবং কয়েকজন ইণ্ডিয়ান নাবিক মাস্তুলের গোড়ার যে-জায়গায় দড়ি আঁকড়ে ঝুলে আছি, কিছুক্ষণ পর তাকিয়ে দেখি গুড়ি মেরে সে-জায়গার দিকে এগিয়ে আসছে কয়েকজন যাত্রী। ওরা বুঝে গেছে ডেকের কোন্ জায়গাটা আশ্রয় নেয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। এই লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে কেন যেন আমার বুকের ভিতরে ধড়াস করে উঠল। কারণ এদের একজন ডন হোসে মোরেনো। ভীষণ ঘাবড়ে গেছে সে, তারপরও জিঘাংসা যায়নি চেহারা থেকে। সম্ভবত সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে আসছে শয়তানটা। কাছাকাছি এসে সিনরের উদ্দেশ্যে বলল, 'হারামির বাচ্চা, তোর জন্যই এত বড় বিপদে পড়েছি আমরা। আমাদের সবাইকে অভিশাপ দিয়েছিস তুই। কাজে লেগে গেছে তোর অভিশাপ। তোর অভিশাপেই এল্ নর্টে হামলে পড়েছে আমাদের উপর,' বলতে বলতে কোমর থেকে একটানে বড় একটা ছুরি বের করল। একহাতে দড়ি ধরে রেখে আরেকহাতে ছুরিটা

ঢুকিয়ে দিতে চাইল সিনরের পেটে।

সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড এমন বেকায়দা অবস্থায় আছেন যে, ডন হোসেকে বাধা দেয়া সম্ভব না তাঁর পক্ষে। সন্দেহ নেই ছুরিটা তাঁর পেটে ঢুকলে ভবলীলা সাঙ্গ হতো তৎক্ষণাৎ, কিন্তু বেঁচে গেলেন নেহাৎ কপালগুণে। এক ইণ্ডিয়ান নাবিক নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দড়ি ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেল কিছুদূর, তারপর জোরে আঘাত করল ডন হোসের ছুরি-ধরা হাতে। ব্যাপারটা শয়তানটার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। দু'-এক মুহূর্ত হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সে ইণ্ডিয়ান নাবিকটার দিকে, তারপর ছুটে-যাওয়া ছুরিটা উদ্ধারের জন্য দড়ি ছেড়ে দিয়ে ঘুরতে চাইল। ঠিক তখনই বিশাল এক ঢেউ আঘাত করল সাণ্টা মারিয়াকে। তাল সামলাতে পারল না ডন হোসে। উপুড় হয়ে পড়ে গেল ডেকের উপর, মাথাটা জোরে ঠুকে গেল পাটাতনের সঙ্গে। আর নড়ছে না। আমরা ধরে নিলাম জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে।

এদিকে ঝড়ের দাপটে স্রোতের ধাক্কায় অজানা গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে সাণ্টা মারিয়া। পানিতে ভরে গেছে নৌকার বেশিরভাগ কেবিন। টের পাচ্ছি আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে নৌকাটা। সলিলসমাধি হতে যাচ্ছে আমাদের সবার। মরতে বড়জোর ঘণ্টাখানেক বাকি আছে।

ব্যাপারটা টের পেলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডও। আমার দিকে কিছুটা সরে এলেন তিনি। হাত রাখলেন আমার কাঁধে। বললেন, 'কিছুই কি করা যায় না? ইণ্ডিয়ানদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো না ওরা কিছু করতে পারবে কি না।'

শরীর মানতে চাচ্ছে না, তারপরও জোর করে এগিয়ে গেলাম এক ইণ্ডিয়ান নাবিকের দিকে। সিনর যা জানতে চেয়েছেন তা জানতে চাইলাম লোকটার কাছে। কিন্তু বাতাসের গর্জনের কারণে ঠিকমতো শুনতে পেল না সে। তখন ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচাতে হলো আমাকে। প্রত্যুত্তরে সে যা বলল তা সিনরকে

শোনানোর জন্য চেঁচাতে হলো আরেকদফা, 'এই লোকটা বলছে স্রোতের ধাক্কায় সাণ্টা মারিয়া উন্মুক্ত সাগরের দিকে না-গিয়ে বরং কারমেন দ্বীপের দিকেই সরে যাচ্ছে একটু একটু করে। যদি কপাল ভালো থাকে আমাদের, যদি স্রোতের ধাক্কায় একইদিকে যেতে পারি আর কিছুক্ষণ, তা হলে নাকি মোহনা-সংলগ্ন অপেক্ষাকৃত শান্ত পানিতে পৌঁছাতে পারবো। এই স্টিমারবোটের সঙ্গে অন্য কোনো নৌকা বাঁধা থাকলে সেটা তখন পানিতে নামিয়ে বাঁচার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু আপাতত ভাগ্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া রাস্তা নেই। সাণ্টা মারিয়া ডুববেই।'

কিছু বলতে যাচ্ছিলেন সিনর কিন্তু বলতে পারলেন না। কারণ বাতাসের বেগ বেড়ে গেছে হঠাৎ করেই। স্রোতের মাতামাতিও বেড়েছে। আমাদের নৌকার পাশে আরও একবার আঘাত করেছে বিশাল এক স্রোত। ছিটকে পড়ে যাচ্ছিলাম, পিচ্ছিল হাত থেকে ছুটে যাচ্ছিল পানিতে-ভেজা দড়ি, শেষমুহূর্তে আঁকড়ে ধরতে পারলাম। একমনে প্রার্থনা করছি ঈশ্বরের কাছে, এমন সময় সম্ভবত শেষবারের মতো ছোবল দিল এল্ নর্টে। আমার শুধু খেয়াল আছে, ঘড়ির পেণ্ডুলাম যেভাবে দোলে সেভাবে একবার ডানে আরেকবার বাঁয়ে দোল খাচ্ছিলাম আমি। বাকিদের কী অবস্থা জানার সুযোগ পাইনি।

বেশ কিছুক্ষণ এই অবস্থা থাকার পর মাথা যখন ঘুরাচ্ছে, আবারও যখন চলে গেছি চেতন-অচেতনের মাঝামাঝি অবস্থায়, তখন হঠাৎ করেই টের পেলাম, সাগর অনেক শান্ত হয়ে গেছে। নৌকাটা সেভাবে দুলছে না, ঘুরপাকও খাচ্ছে না। বরং আস্তে আস্তে কাত হয়ে যাচ্ছে একদিকে—নৌকা বা জাহাজ ডুবে যাওয়ার আগে যে-রকম হয় অনেকটা সে-রকম। মেঘের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে চাঁদ। আলো ততটা উজ্জ্বল না, তারপরও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, পানি থেকে বেশি হলে দুই-আড়াই ফুট উপরে আছে আমাদের নৌকা। নাবিকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে শুধু ছয় ইণ্ডিয়ান আর ক্যাপ্টেনকে। অবশ্য, আগেও বলেছি, অলৌকিক কোনো

উপায়ে ভাঙা-ব্রিজের সঙ্গে লটকে আছে ক্যাপ্টেনের নিথর দেহ; তিনি জীবিত না মৃত বোঝা যাচ্ছে না। যাত্রীদের মধ্যে বেঁচে আছি আমরা তিনজন এবং ডন হোসে মোরেনো। অবশ্য এই লোকটা বেঁচে আছে না মরে গেছে বোঝা যাচ্ছে না। বাকিদের কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। তারমানে স্রোতের তোড়ে ভেসে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে ওরা। ধরে নেয়া যায় সলিলসমাধি হয়েছে সবার। অতি আশ্চর্যের ব্যাপার, নৌক্রোঞ্চে জায়গামতোই আছে সাণ্টা মারিয়ার কাটার (কোনো জাহাজের নিজস্ব এক মাস্তুলবিশিষ্ট নৌকা, যা তীর এবং জাহাজের মধ্যে সাধারণত মাল পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়); এত দুলুনি সত্ত্বেও খসে পড়ে ভেসে যায়নি।

আমার মতো সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডও দেখেছেন নৌকাটা। কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন, হাল ছেড়ে দিতে রাজি নন তিনি, শেষ চেষ্টা করে দেখতে চান। বোধহয় সেই অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন গলা ফাটিয়ে, 'সাণ্টা মারিয়া ডুবছে। যারা বাঁচতে চাও তারা তাড়াতাড়ি কাটারের কাছে চলো।' বলে দড়ি ছেড়ে দিলেন তিনি, ডেকের উপর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে হাজির হলেন নৌকার কাছে। তাঁর পিছন পিছন গেলাম আমি, মোলাস আর ছয় ইণ্ডিয়ান।

কিন্তু এই নৌকাটাও ভর্তি হয়ে গেছে পানিতে। এ-রকম নৌকায় কাঠের একটা বিশেষ ছিপি থাকে, সেটা টেনে সরিয়ে দিলে নৌকায় জমা পানি বাইরে পড়তে পারে। যে ইণ্ডিয়ান ডন হোসের হাতে আঘাত করেছিল, ফলে ছুরিটা পড়ে গিয়েছিল শয়তানটার হাত থেকে, সৌভাগ্যক্রমে সে জানে কোথায় আছে বিশেষ ওই ছিপিটা। হাতড়ে হাতড়ে সেটা খুঁজে বের করল সে, তারপর একটানে খুলে ফেলল। ছিপি সরে যাওয়ায় নৌকার ভিতরে জমা পানি হড়হড় করে বের হয়ে গেল। ছিপিটা আবার লাগিয়ে দেয়া হলো জায়গামতো। এবার নৌকায় একে একে চড়ে বসলাম আমরা। দড়ির বাঁধন খুলে ডুবন্ত সাণ্টা মারিয়া থেকে আলাদা করলাম ছোট নৌকাটাকে। আধ মিনিট পরই দাঁড় বাইতে শুরু করল ইণ্ডিয়ানরা।

কিন্তু তিন কি বেশি হলে চারবার পানিতে দাঁড় ফেলেছে ইণ্ডিয়ানরা, এমন সময় সাণ্টা মারিয়ার ডেক থেকে ভেসে এল কারও চিৎকার। সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছে লোকটা। মুখ তুলে তাকিয়ে চাঁদের ঘোলাটে আলোয় দেখি, বিধ্বস্ত পরিকূটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ডন হোসে মোরেনো, দুই হাত তুলে ডাকছে আমাদেরকে।

'ঈশ্বরের দোহাই লাগে,' বলছে সে, 'থামো তোমরা! আমাকেও নিয়ে যাও।'

ইণ্ডিয়ানরা ইতস্তত করছে। কিন্তু যে ইণ্ডিয়ানটা ডন হোসের হাতে আঘাত করেছিল সে দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'কেউ দাঁড় টানা থামাবে না! ডুবে মরুক কুত্তাটা।'

তখন আবারও সাহায্যের আবেদন জানাল ডন হোসে, 'ঈশ্বরের দোহাই লাগে চলে যেয়ো না তোমরা।'

সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড এমনিতে শক্তমনের মানুষ, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাঁর মনও নরম হলো। নিচু কণ্ঠে ইণ্ডিয়ানদের উদ্দেশ্যে বললেন তিনি, 'নৌকা ফেরাও। ওই লোকটাকে ফেলে এভাবে চলে যেতে পারি না আমরা।'

ইণ্ডিয়ানদের নেতা তখন চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাল, 'কিছুক্ষণ আগে আপনাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল হারামিটা, এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছেন? তা ছাড়া এই অবস্থায় সাণ্টা মারিয়ার কাছে যাওয়াটা আমাদের জন্য নিরাপদও না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুববে নৌকাটা, কাছাকাছি থাকলে পানির ধাক্কায় আমাদের এই ছোট্ট নৌকাটাও উল্টে যেতে পারে।'

সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড আবার বললেন, 'নৌকা ফেরাও।'

নাবিকদের নেতা তখন তাকাল আমার দিকে। 'আপনি কী বলেন, লর্ড? ওই কুত্তাটাকে বাঁচাবো?'

'যেহেতু সিনর কাজটা করতে বলেছেন সেহেতু ধরে নাও আমারও একই মত। আমিও একই আদেশ দিচ্ছি তোমাদেরকে।

সাণ্টা মারিয়ার কাছে যাও। ডন হোসেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবো আমরা।'

এ-ব্যাপারে আর কিছু বলল না নাবিকদের নেতা। নিজের লোকদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নৌকার মুখ ঘুরাও, ভাইয়েরা। সাণ্টা মারিয়ার কাছে চলো।'

ইণ্ডিয়ানদের কারোরই ইচ্ছা নেই কাজটা করার। কিন্তু এড়ানোর উপায়ও নেই। গোমড়ামুখে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে নিল ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুবন্ত সাণ্টা মারিয়ার পাশে গিয়ে থামলাম আমরা।

ডন হোসে তখন ডেকের ভাঙা কাঠ ধরে বলতে গেলে ঝুলছে। ওর তেল-দেয়া বড় বড় চুলগুলো লেপ্টে আছে চেহারার সঙ্গে। পানিতে ভিজে এলোমেলো হয়ে গেছে দামি জামাকাপড়। সব মিলিয়ে হাস্যকর দেখাচ্ছে ওকে।

'বাঁচাও আমাকে!' ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠল সে আবারও, 'যিশুর দোহাই লাগে বাঁচাও!'

'ডেকের ভাঙাকাঠ ধরে বোকার মতো ঝুলে আছো কেন এখনও?' ধমকে উঠলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। 'ওটা ছেড়ে দিয়ে পানিতে পড়ো। তোমাকে নৌকায় তুলে নেবো আমরা।'

'আমার সাহসে কুলায় না!' বোকার মতো জবাব দিল ডন হোসে। 'তোমরা ডেকে উঠে এসো। তারপর সঙ্গে করে নিয়ে যাও।'

সিনরের দিকে তাকাল নাবিকদের নেতা। 'আপনি কি এখনও চান এখানে থাকি আমরা? ওই গর্দভটাকে উদ্ধার করার ইচ্ছা কি এখনও আছে আপনার মনে?'

ওর প্রশ্নের জবাব দিলেন না সিনর। ডন হোসেকে বললেন, 'শোনো কাপুরুষ! সাণ্টা মারিয়া ডুবছে। তোমাকে উদ্ধার করার জন্য আমাদের কেউ যদি উপরে যায় তা হলে সে-ও ডুবে মরবে। কাজেই এসব জমিদারি চিন্তাভাবনা বাদ দাও। যা করতে বলেছি করো। এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনবো আমি। এর মধ্যে যদি ডেক থেকে নীচে

না-পড়ো তা হলে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে নেবো আমরা। বোঝা গেছে? ...এক, দুই...'

'আসছি,' আবারও গলা ফাটাল ডন হোসে, 'আসছি আমি,' বলতে বলতে পড়ল সে সাগরের পানিতে।

সিনর আর এক ইণ্ডিয়ান মিলে একটা বোটহুকের সাহায্যে পানি থেকে উদ্ধার করলেন ডন হোসেকে। স্বীকার করে নিচ্ছি, ইচ্ছা করেই এই উদ্ধারকাজে হাত লাগাইনি আমি। কারণ ডন হোসের মতো জঘন্য একটা শয়তানকে বাঁচানোর কোনো ইচ্ছা ছিল না আমার। এতে যদি আমার পাপ হয়ে থাকে তা হলে ক্ষমা চাই ঈশ্বরের কাছে। কিন্তু চরম শত্রুকে যেচে-পড়ে প্রাণে বাঁচানোর মতো মহত্ত্ব নেই আমার ভিতরে।

যা-হোক, ডন হোসে নৌকায় উঠেছে কি উঠেনি, এমন সময় বিকট আওয়াজ করে ফেটে গেল সাণ্টা মারিয়ার ডেক। চমকে উঠে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি, সমুদ্র সমতলের সঙ্গে প্রায় সমকোণে অবস্থান করছে নৌকাটা, এখনই সোজা ঢুকে যাবে সাগরের বুকে। হঠাৎ করেই প্রচণ্ড একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে আমাদের আশপাশের পানিতে।

'বাঁচতে চাইলে দাঁড় টানো ভাইয়েরা,' এবার গলা ফাটাল নাবিকদের নেতা, কথা শেষ করার আগেই দাঁড় বাইতে শুরু করে দিয়েছে। অন্যরাও দ্রুত বৈঠা তুলে নিচ্ছে হাতে।

আমাকে যেহেতু দাঁড় বাইতে হচ্ছে না সেহেতু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি সাণ্টা মারিয়ার দিকে। নৌকার নাকটা ইতোমধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে সাগরজলে। অদ্ভুত এক গহ্বর যেন তৈরি হয়েছে, আমাদের কাটারকে অমোঘ আকর্ষণে টানছে। মনে হচ্ছে পারবো না আমরা—সাণ্টা মারিয়াকে ঘিরে যে-ঘূর্ণি জেগেছে তার টানে উল্টে যাবে আমাদের নৌকাও। কিন্তু বাঁচার তাগিদে অতিমানবিক শক্তি যেন ভর করেছে ইণ্ডিয়ানদের শরীরে। মুহুর্মুহু দাঁড় ফেলছে ওরা পানিতে, সবাই মিলে সর্বশক্তিতে বৈঠা বাইছে। শেষপর্যন্ত ওই ঘূর্ণির

কবল থেকে বের হয়ে আসতে পারলাম আমরা। ডন হোসের মোরেনোর দিকে তাকালাম। কোনো আঘাত পেয়েছে বলে মনে হয় না। তবে এখনও হাঁপাচ্ছে।

এখন কোথায় যাবো আমরা? কীভাবে জীবন বাঁচাবো?

যতদূর বুঝতে পারছি, কারমেন দ্বীপের কাছাকাছি আছি। ওখানে গিয়ে উঠলে এল্ নর্টের কবল থেকে রেহাই পাবো আপাতত। আবার উসুমাসিন্টো নদীর মোহনার দিকেও যাওয়া যায়। আরও একটা কাজ করতে পারি: শান্ত সাগর বরাবর নৌকা চালাতে পারি আগামীকাল সকাল পর্যন্ত। হয়তো কোনো জাহাজের সন্ধান পেয়ে যাবো, দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকে তুলে নেবে ওরা।

কী করবো তা নিয়ে কথা বলছি আমরা, এমন সময় মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ল চাঁদ, কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। আস্তে আস্তে অশান্ত হয়ে উঠছে সাগর। এই অন্ধকারে দ্বীপঅভিমুখে নৌকা চালানো যাবে না। কারণ দিক ভুল করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, গিয়ে হাজির হবো আরেক জায়গায়। তা ছাড়া অন্ধকারে ডুবোপাথর দেখতে পাবো না। ঘষা লেগে তলা ফুটো হয়ে তীরে পৌঁছনোর আগেই ডুববে আমাদের তরি। কাজেই এখন আমাদের কাজ হচ্ছে নৌকায় কিছুতেই পানি জমতে না-দেয়া এবং নৌকাটা যাতে স্রোতের ধাক্কায় উল্টে না-যায় সে-চেষ্টা করতে থাকা। দেরি না-করে কাজে লেগে পড়লাম।

হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হচ্ছে। বৃষ্টির প্রথমদিকে সাগর উথালপাথাল থাকলেও এখন আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে আসছে। তা না-হলে পানি কাঁচতে কাঁচতে একসময় অবশ হয়ে যেত আমাদের হাত, তারপর একসময় আর করতে পারতাম না কাজটা। তখন নৌকায় পানি জমে ডুবে মরতাম। তা ছাড়া সৌভাগ্যক্রমে নৌকাটা প্রায় নতুন। আর নাবিকদের যে-নেতার কথা বলেছি সে পুরোপুরি পেশাদার। হাতে বৈঠা তুলে নেয়ার পর থেকে আমাদেরকে প্রকৃতপক্ষে সে-ই নেতৃত্ব দিচ্ছে। শুরু থেকে বসে আছে নৌকার

গলুইয়ে। চিলের মতো দৃষ্টিশক্তি কাজে লাগিয়ে বৃষ্টি আর অন্ধকারের ঘন চাদর ভেদ করে কীভাবে দিক চিনে নিতে পারছে জানি না। শুধু তা-ই না, চোখ রেখেছে সাগরের ঢেউয়ের উপরও। বিশাল কোনো ফেনিল স্রোত আমাদের দিকে ছুটে এলেই সতর্ক করছে, প্রাণপণে বৈঠা বেয়ে ওর সাগরেদরা সরে যাচ্ছে সে-ঢেউয়ের কবল থেকে। কখনও কখনও সফল হচ্ছি আমরা, কখনও পারছি না। তখন দু'-তিনজনকে বৈঠা চালানোর দায়িত্ব দিয়ে বাকিরা পানি কাঁচছি।

মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে। গভীর থেকে আরও গভীর হচ্ছে রাত। উদ্ধার পাওয়ার আশা আস্তে আস্তে বিদায় নিচ্ছে আমাদের মন থেকে। আমার কথা যদি বলি, আমি মোটামুটি নিশ্চিত মরতে চলেছি আমরা। কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে তেমন একটা উদ্বিগ্ন নই। একটা আজব কথা বলি। শুনেছি খুনের আসামির যখন বিচার হয় তখন রায় কী হবে সে-ব্যাপারে একরকম উৎকণ্ঠা কাজ করে তার ভিতরে—সে দোষী প্রমাণিত হবে কি হবে না, তার ফাঁসি হবে কি হবে না। কিন্তু যদি ফাঁসির আদেশ হয়, এবং কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় ফাঁসির দিন যদি ঘনিয়ে আসে, ওই লোক নাকি নির্বিকার হয়ে যায়। আসলে মৃত্যু নিশ্চিত জানলে মানুষের সব উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসান ঘটে সম্ভবত। আমারও একই অবস্থা হয়েছে। তা ছাড়া সত্য বলতে কী, জীবনের উপর আমি এমনিতেও বীতশ্রদ্ধ। আমার সারাজীবনের সব ঘটনা ঘাঁটলে তেমন কোনো সাফল্যের ইতিহাস পাওয়া যাবে না। কাজেই এই ব্যর্থ জীবনের যদি এখানেই ইতি ঘটে তা হলে আফসোসের কিছু আছে বলে মনে হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, কৈশোর কাটিয়ে যখন যৌবনের দরজায় পা দিয়েছি তখন থেকেই মৃত্যুর জন্য প্রতিদিনই অপেক্ষা করতে হয়েছে আমাকে। প্রতিটা দিনই ভেবেছি, আজই বুঝি আমার জীবনের শেষদিন। কাজেই আজ সলিলসমাধি হলে হবে। আমি প্রস্তুত।

কম্বলটা খুললাম গা থেকে, সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের শরীরে ভালোমতো জড়িয়ে দিলাম। ঠাণ্ডা লাগছে। ক্লান্তিতে ভেঙে আসতে

চাচ্ছে শরীর। তৃতীয়বারের মতো চলে গেলাম চেতন-অচেতনের মাঝামাঝি অবস্থায়। বিশাল বিস্তৃত সাগরটা উধাও হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। এবার যেন অদ্ভুত এক কবরস্থান দেখতে পাচ্ছি। আমার পরিচিত মৃত লোকেরা সারি করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে মনে হয় ডাকছে। ওদের সেই আহ্বানে সাড়া দিতে চাচ্ছি কিন্তু পারছি না। একসময় সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেল। যেভাবে হঠাৎ করেই এসেছিল মৃত লোকগুলো সেভাবে আচমকাই বিদায় নিল সবাই। অন্ধকার গিলে খেল আমাকে।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম জানি না। টের পাচ্ছি, কে যেন বার বার ধাক্কা দিচ্ছে আমাকে। পরিচিত একটা কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। লোকটার গলা কাঁপছে। কেন কাঁপছে বুঝতে পারছি না। সম্ভবত খুশিতে অথবা ঠাণ্ডায়। আবার দুটো কারণেই হতে পারে। যা-ই হোক, লোকটা যে মোলাস তা বুঝতে অনেক সময় লাগল।

মোলাস বলছে, 'উঠুন, উঠুন, লর্ড! আমরা বেঁচে গেছি!'

'বেঁচে গেছি?' কিছুই বুঝতে পারছি না। 'মরলাম কখন?'

'মরিনি, মরতে বসেছিলাম। দয়া করে উঠে বসুন। চোখ খুলে দেখুন।'

সাগরের লবণাক্ত পানির ছিটা বিরামহীনভাবে চোখে লেগেছে রাতভর। কিছু পানি বাষ্পীভূত হয়ে গেছে সকালের রোদের তাপে। লবণের পাতলা স্তর জমে আছে চোখের পাতায়। তাই চোখ খুলতে কষ্ট হচ্ছে। খোলার পর দুই চোখই জ্বালা করল কিছুক্ষণ।

সকাল হয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে। আকাশে এখনও ভারী মেঘ। নৌকায় আছি আমরা। কিন্তু নীচের পানি সাগরের না, বরং কোনো নদীর। কারণ প্রায় দুলছেই না নৌকাটা। অনেক দূর থেকে, কত দূর থেকে জানি না, ভেসে আসছে সাগরের গর্জন।

'আমরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম।

'উসুমাসিন্টো নদীতে,' বলল মোলাস। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! স্রোতের ধাক্কায় কাল রাতে কীভাবে যেন উপসাগরের মোহনায় চলে

এসেছি আমরা। ভোর হওয়ার পর নদীর মোহনাটা চিনতে ভুল হয়নি কারোরই। যেভাবেই হোক নিরাপদেই সাগর পাড়ি দিয়ে মোহনায় ঢুকে পড়েছি। এখন আমাদের কাছেই মাটি।'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। ঠিকই, অনতিদূরেই নলখাগড়ায়-ভরা ঘাসে-ছাওয়া নদীর তীর। একটু পর পর জন্মে আছে তালগাছ। এবার তাকালাম আমার সঙ্গীদের দিকে। গতরাতে যে-কম্বলটা জড়িয়ে দিয়েছিলাম সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের গায়ে সেটা এখনও আছে তাঁর গায়ে। নৌকাটার পাটাতনের উপর শুয়ে আছেন তিনি। একটুও নড়ছেন না। দেখে মনে হচ্ছে মারা গেছেন। ডন হোসে বসে আছে নৌকার আরেকপ্রান্তে। কেমন বুনো দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তীরের দিকে।

আমাদের জীবনের জন্য যে-ইণ্ডিয়ানদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ আমরা, তারা এককথায় বিধ্বস্ত। ওদের দু'জনকে দেখে মনে হচ্ছে যেখানে বসে আছে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে গেছে। দাঁড় টানতে টানতে ওদের হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে। তারপরও দাঁড় টানা থামায়নি। তাই ফোস্কা ফেটে বা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। তিনজন হাঁ করে হাঁপাচ্ছে, চোখে শূন্য দৃষ্টি। নৌকার হাল ঘোরানোর হাতলটা ধরে আছে মোলাস। আর ইণ্ডিয়ানদের নেতা সেই আগের জায়গাতেই বসে আছে মূর্তির মতো। চেহারা সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন।

আমাকে চোখ মেলতে দেখে আমার দিকে তাকাল সে। ওর চেহারাতেও দেখি জমে আছে লবণের স্তর। 'লর্ড,' আমাকে বলল সে, 'আপনি কি দাঁড় টানতে পারবেন? আমাদের হাত আর চলছে না।'

উঠে বসতে যথেষ্ট কসরত করতে হলো আমাকে। টের পাচ্ছি, সামান্য নড়াচড়াতেই যেন প্রতিবাদ জানাচ্ছে শরীরের প্রতিটা মাংসপেশী। সারা শরীরে এত ব্যথা যে, মনে হচ্ছে গণপিটুনি খেয়েছি। তারপরও সবার কথা ভেবে দাঁড় তুলে নিলাম হাতে। বাইতে শুরু করলাম। খুবই ধীর গতিতে নৌকাটা এগিয়ে যাচ্ছে

তীরের দিকে। তীর স্পর্শ করামাত্র মেঘের আড়াল থেকে বের হয়ে এল সূর্য।

নৌকা থেকে নামলাম আমরা। তীরের কাছাকাছি জন্মে-থাকা একটা তালগাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেললাম নৌকাটা। পাটাতন থেকে তীরে নামিয়ে আনলাম সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকে। মাটিতে শুইয়ে দিলাম তাঁকে। জামাকাপড় খুলে নিলাম যাতে রোদের তেজে গরম হয় শরীর। ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছেন বেচারা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘ কেটে গেল। এখন রোদের তেজে ঝকঝক করছে চারদিক। গরম বাড়ছে। সিনরের ফ্যাকাসে চামড়ায় রঙ ফিরতে শুরু করেছে। গাঢ় ঘুমে তলিয়ে আছেন তিনি। জীবন ফিরে পাচ্ছেন আস্তে আস্তে। আমিও আগের চেয়ে সুস্থ বোধ করছি।

বসে বসে রোদের তেজে গা গরম করছি, এমন সময় হাজির হলো কয়েকজন ইণ্ডিয়ান। আধ লিগ দূরের একটা গ্রামে থাকে এরা। আমরা কে জানতে চাইল। জবাব দিলাম। কোত্থেকে কীভাবে এসেছি জিজ্ঞেস করল, বললাম। শুনে আর দেরি করল না ওরা, খাবার আনার জন্য ছুট লাগাল গ্রামের উদ্দেশে। তবে যাওয়ার আগে সুপেয় বৃষ্টির-পানির একটা জলাশয় দেখিয়ে দিয়ে গেল। সত্যিই, তেষ্টা মেটানোর জন্য পানি খুব দরকার আমাদের। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

ওই গ্রামবাসীরা খাবার আনতে গেছে ঘণ্টাখানেক হয়েছে, এমন সময় ঘুম থেকে জেগে উঠলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। প্রথমেই পানি খেতে চাইলেন। কাটার থেকে পানি সেঁচে ফেলার জন্য বোলের মতো দেখতে যে-জিনিসটা ব্যবহার করেছি তাতে করে পানি এনে দিলাম তাঁকে। একচুমুকে সব শেষ করলেন তিনি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় আছি আমরা? কীভাবে হাজির হলাম এখানে?'

তাঁর প্রশ্নের জবাব দিলাম আমি।

শুনে দু'হাতে চেহারা ঢাকলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর হাত সরিয়ে মুখ তুলে বললেন, 'আমি একটা বোকা। এবং সেই সঙ্গে অহঙ্কারী।

বলেছিলাম যদি মরি লড়াই করে মরবো। অথচ কষ্ট সহ্য করতে না-পেরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি বাচ্চাদের মতো। অথচ এই লোকগুলো, যাদেরকে উপহাস করেছি তারা আমার জীবন বাঁচিয়েছে?'

'একই ঘটনা ঘটেছে আমার বেলাতেও,' বললাম আমি। 'আসলে ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গিয়েছিল আমাদের শরীর। তারপর একসময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি আমরা। কিন্তু দাঁড় বাইছিল ইণ্ডিয়ানরা, ফলে ওদের শরীর গরম ছিল। ...আসুন, নদীর পানি দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিন ভালোমতো। আপনার কাপড় শুকিয়ে গেছে এতক্ষণে।' কম্বলটা আবারও জড়িয়ে দিলাম তাঁর গায়ে। ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে গেলাম নদীর কাছে।

পানির কাছে গেছি এমন সময় দেখা হলো নাবিকদের সর্দারের সঙ্গে। ওকে দেখামাত্র হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন সিনর, 'তুমি খুব সাহসী লোক। আমাদের সবার জীবন বাঁচানোর কৃতিত্ব তোমার।'

'না, সিনর, আসলে কিছুই করিনি আমি,' সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে করতে বিনীতভঙ্গিতে বলল লোকটা, 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন লর্ড অভ দ্য হার্ট আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমাদের ইতিহাস বলে, "হৃৎপিণ্ড" কোনোদিনও হারিয়ে যাবে না। কাজেই যত ঝড়ঝাপ্টাই আসুক, সাগরে ডুবে মরতাম না আমরা। এই কথাটা জানা ছিল আমার। আর সে-জন্যই সাহস হারাইনি, একটানা খাটতে পেরেছি। আমার লোকদেরকে বার বার বলেছি আমাদের এত পরিশ্রম বৃথা যাবে না।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন সিনর। 'তোমার ওই কবচের কী ক্ষমতা আছে জানি না, ইগনাশিয়ো। তবে যদি কিছু থেকে থাকে তা হলে নিঃসন্দেহে বলা যায় কাল রাতে আমাদের অনেক বড় উপকার করেছে জিনিসটা।'

আর কিছু না-বলে পানিতে নেমে গেলেন তিনি। হাত-পা শরীর ধুতে শুরু করলেন ভালোমতো। তারপর তীরে উঠে এসে কাপড় পরে নিলেন। এসময় দেখি গ্রাম থেকে বেশ কয়েকজন মহিলা

আসছে আমাদের দিকে। সঙ্গে খাবারভর্তি ঝুড়ি। খাবার বলতে টরটিলা অর্থাৎ আটা দিয়ে বানানো একরকম কেক, মটরশুঁটি, আস্ত একটা ছাগলের-বাচ্চার রোস্ট এবং স্থানীয় কায়দায় বানানো ব্র্যাণ্ডি। খাবারগুলো কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করলাম আমরা। খেতে শুরু করলাম।

খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই নদীতীরে হাজির হলো গ্রামের সর্দার। আমাকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আপনি আমাদের এখানে এসেছেন—এটা আমাদের জন্য খুবই সম্মানের। দয়া করে আমাদের গ্রামে চলুন। আপনাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করি।'

এই লোকটার সঙ্গে অল্পবিস্তর খাতির আছে মোলাসের। ওর কানে কানে বললাম, 'এই লোকটাকে নিয়ে একটু দূরে চলে যাও। যিব্যালবের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে দেখো কিছু বলতে পারে কি না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল মোলাস। মোড়ল লোকটাকে নিয়ে সরে গেল দূরে। কিছুক্ষণ পর আমিও উঠে দাঁড়ালাম। ওরা দু'জনে যেদিকে গেছে সেদিকে হাঁটা ধরলাম।

একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল মোলাস আর ওই মোড়ল লোকটা। আমাকে দেখে আবারও বাউ করল সে।

মোলাস বলল, 'এই লোকটা বলছে যিব্যালবে আর তার মেয়ের কথা শুনেছে সে। ঘটনাক্রমে আজ সকালে এক লোক এসেছে এদের গ্রামে। বলেছে, পাঁচ-ছয় দিন আগে নাকি ডন হোসের বাবা ডন পেদ্রো মোরেনোর হাতে বন্দি হয়েছে বাপ-বেটি। ওদেরকে নিয়ে গিয়ে সাণ্টা ক্রুযের জমিদারিতে আটকে রেখেছে ডন পেদ্রো। ওরা বেঁচে আছে, না মরে গেছে বলতে পারছে না কেউ।'

কিছুক্ষণ ভাবলাম বিষয়টা নিয়ে। তারপর মোলাসকে বললাম সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকে ডেকে আনতে। তিনি আসার পর ঘটনা জানালাম তাঁকে।

তিনি তখন বললেন, 'ওই বুড়ো ইণ্ডিয়ান আর ওর মেয়েকে আটকে রেখে ডন পেদ্রোর কী লাভ?'

জবাবটা দিল মোলাস, 'সিনর, আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন।

যিব্যালবে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিল আমাকে। ডন পেদ্রো তার দলবলসহ আমার উপর হামলা করে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয় সব মুদ্রা। জান বাঁচাতে বলে দিই আমি কোত্থেকে পেয়েছি মুদ্রাগুলো। সম্ভবত ডন পেদ্রোর দৃঢ় বিশ্বাস, বাপ-বেটিকে ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েদ করতে পারলে ওরা বলে দেবে কোত্থেকে পেয়েছিল সেগুলো। তা ছাড়া কোন্ টাকশালে মুদ্রার উপর হৃৎপিণ্ডের ওই বিশেষ চিহ্নের ছাপ মারা হয়েছে তা-ও জানতে চায় হয়তো। আরও একটা কারণ আছে। যিব্যালবের মেয়ে, এককথায় যদি বলি, ডানাকাটা পরী। আমি সারাজীবনে এত সুন্দরী মেয়েমানুষ দেখিনি। হলপ করে বলতে পারি, আমাদের এই দেশে এমন অনেক পুরুষ আছে যারা যে-কোনোকিছুর বিনিময়ে, দরকার হলে মেক্সিকোর সব সোনার বিনিময়ে হাসিল করতে চাইবে মেয়েটাকে। ডন পেদ্রোর বয়স হলে কী হবে, চরিত্র তো ভালো হয়নি আজও। কাজেই...। আমার মনে হয়, সিনর, যে-অভিযান শুরু করেছি আমরা তা এখানেই শেষ। কারণ ডন পেদ্রো যাকে একবার ধরে নিয়ে যায় তাকে কখনও মুক্তি দেয় না। এবং কেউ কোনোদিন উদ্ধারও করতে পারে না লোকটাকে।'

'ঝুঁকি নিতে হবে আমাদেরকে,' বললেন সিনর, 'পরেরটা পরে দেখা যাবে।'

'হ্যাঁ,' সায় জানালাম আমি, 'যিব্যালবের সঙ্গে দেখা করার জন্য এতদূর এসেছি আমরা। এই অবস্থায় ফিরে যাওয়ার মানে হয় না। সাণ্টা ক্রুযে আমাদের জন্য যে-বিপদ অপেক্ষা করছে তারচেয়ে বড় বিপদের মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে গত রাতেই। সুতরাং ভয় কীসের?'

সাত

ডন পেদ্রোর জমিদারি

নদীর তীরে যেখানে বসে খেয়েছি সেখানে ফিরে এলাম আমরা। মোড়ল চলে এসেছে আমাদের আগেই, মনের সুখে গল্প করছে নাবিকদের সঙ্গে। আমাদেরকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল নাবিকদের নেতা। বলল, 'আপনাদের যদি কোনো সমস্যা না-হয় তা হলে পার্শ্ববর্তী গ্রামে কয়েকটা দিন থাকতে চাই আমরা। তারপর অনুকূল আবহাওয়ায় উপকূল বরাবর নৌকা চালিয়ে হাজির হবো ক্যাম্পেখেতে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এখান থেকে ক্যাম্পেখেতে যেতে কত সময় লাগতে পারে?'

লোকটা বলল, 'বড়জোর ষাট ঘণ্টা।'

কিছুক্ষণ ভেবে বললাম, 'না, নৌপথে আর না। গতরাতে যে-অভিজ্ঞতা হয়েছে তা মনে থাকবে সারাজীবন। আমরা চাই না সে-রকম কোনো ঘটনা আবারও ঘটুক। তা ছাড়া আমাদের পরিকল্পনাতেও কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। এখন আমরা ক্যাম্পেখে ছাড়িয়ে আরও দূরে পোটরেরিলো শহরে যেতে চাই। সেখান থেকে যাবো ইউক্যাটানে। ওখানে চমৎকার কিছু ধ্বংসাবশেষ আছে। সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড দেখলে খুশি হবেন।'

'কিন্তু আমরা অতদূর যেতে পারবো না,' বিনীত ভঙ্গিতে বলল নাবিকদের সর্দার। 'আপনারা যদি যেতে চান তা হলে আপনাদেরকে ক্যাম্পেখেতে নামিয়ে দিতে পারি। তারপর ফিরতি পথ ধরতে হবে

আমাদেরকে। সাণ্টা মারিয়ার ডুবে যাওয়ার খবরটা জানাতে হবে নৌকার মালিককে। তিনি ক্যাম্পেখেতেই থাকেন।'

কোমরের বেল্ট থেকে কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা বের করে লোকটার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। 'নাও, এগুলো রাখো। তোমরা ভাগাভাগি করে নিয়ো।'

এমন সময় ডন হোসের দিকে হঠাৎ করেই চোখ পড়ল আমার। আমাদের কাছেই বসে আছে সে। একদৃষ্টিতে দেখছে সিনরের কোমরের বেল্টটা। লোভে চকচক করছে শয়তানটার দু'চোখ। অকৃত্রিম খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেছে পুরো চেহারা। হঠাৎ করেই বলে উঠল, 'তুমি সৌভাগ্যবান। বুদ্ধি করে মোটা অঙ্কের টাকা বাঁচাতে পেরেছ। আর আমি একটা মুদ্রাও রক্ষা করতে পারিনি। অথচ আমার সঙ্গে ছিল প্রায় তিন হাজার ডলার। সাণ্টা মারিয়ার সঙ্গে সব তলিয়ে গেছে সাগরে।'

'ঠিকই বলেছ—আমাদের কায়দা অবলম্বন করলে একটা মুদ্রাও হারাতে হতো না তোমাকে,' বললেন সিনর। 'আমাদের কাছে যত টাকা ছিল তিনভাগে ভাগ করে তিনজনে নিয়েছি। যাতে সবসময় সঙ্গে রাখতে পারি সে-জন্য কোমরের বেল্টে রেখে দিয়েছি যার যার টাকা। তবে কোনো কারণে যদি সাঁতরাতে হতো আমাদের কাউকে তা হলেই খবর ছিল। এত ওজন নিয়ে টুপ করে ডুবে যেতাম। যা-হোক, এখন কী করবে?'

'যদি তোমাদের অসুবিধা না-থাকে তা হলে তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই পোটরেরিলো পর্যন্ত,' বলল ডন হোসে। 'ওই পথেই আমার বাড়ি। আচ্ছা সিনর, আমি যদি তোমাদেরকে আমার বাবার পক্ষ থেকে আমাদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের নিমন্ত্রণ জানাই তা হলে কি...'

ওকে বাধা দিয়ে সিনর বললেন, 'দেখো ডন হোসে, কপট ভালোমানুষির চেয়ে সোজাসাপ্টা কথাবার্তা পছন্দ করি আমি। তোমার সঙ্গে আমার এবং আমার বন্ধুদের যা হয়েছে তারপরও যদি

তোমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি তা হলে ব্যাপারটা কেমন হয় বলো তো? কাল রাতে আমাকে ছুরি মারার চেষ্টা করেছিলে তুমি, মনে আছে?'

অনুশোচনাবোধ ফুটে উঠল ডন হোসের চেহারায়। ব্যাপারটা আসল না মেকি বুঝতে পারলাম না। বলল, 'সিনর, কী বলবো আর? গতরাতের ঘটনা তো নিজেই দেখেছ। আতঙ্কে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। যা করেছি তার জন্য আমি সত্যিই লজ্জিত, ক্ষমাপ্রার্থী। সিনর, তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। তোমার প্রতি আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আমি জানি আমার বাবার সম্বন্ধে ভালো কথার চেয়ে খারাপ কথাই বেশি শুনেছ তোমরা। সত্য বলতে কী, মদ একটু বেশি খেয়ে ফেললে বাবা আসলেই ভয়ঙ্কর হয়ে যায়। তখন কেমন হিংস্র হয়ে ওঠে তাঁর আচরণ। বাড়িয়ে বলা লোকের স্বভাব, জানো নিশ্চয়ই; তাই আবারও বলছি বাবার সম্বন্ধে যা শুনেছ তার সবটাই হয়তো সত্য না। আর ছেলে হিসেবে যদি মূল্যায়ন করি তাঁকে, আমাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন তিনি। যারা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে তাদেরকেও তিনি পছন্দ করেন। তোমাকে দোহাই দিয়ে বলছি, খারাপ ব্যবহার যা করেছি তোমার সঙ্গে দয়া করে মনে রেখো না। চলো, আমাদের এলাকায় চলো। কিছুদিন থাকো সেখানে। ভালোমন্দ খেয়ে তোমাদের স্বাস্থ্যও ফিরবে, আবার অস্ত্র ঘোড়া ইত্যাদিও যোগাড় করে নিতে পারবে।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকালেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড, 'যে-অভিযানে বের হয়েছি, অস্ত্র আর ঘোড়া আসলেই দরকার। যদি মনে করো তোমাদের পক্ষে ওগুলো যোগাড় করে দেয়া সম্ভব তা হলে দু'-চার দিন তোমাদের বাড়িতে থাকতে আপত্তি নেই আমার।'

'তোমাদের বাড়ি বলছ কেন?' ডন হোসের মুখে মধুর হাসি, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি ওর চোখে খেলা করছে অন্য কিছু, 'আমাদের বাড়িতে কেউ অতিথি হয়ে গেলে তাকে এত খাতির করি আমরা যে, সে লোক বলতে বাধ্য হয় নিজের বাড়িতেই ছিল

এ-ক'টা দিন।'

'নিঃসন্দেহে,' ব্যঙ্গ করে বলে উঠলাম আমি, 'খাতিরযত্নের জন্য আপনার বাবা ডন পেদ্রো মোরেনোকে স্থানীয় লোকেরা একনামে চেনে কি না! যা-ই হোক, আপনার বাড়িতে যাওয়ার আগে আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চয়তা চাচ্ছি আপনার কাছে। খুলেই বলি, পিস্তল আর ছুরি ছাড়া অস্ত্র বলতে অন্য কিছু নেই আমাদের কাছে।'

'তুমি কি আমাকে অপমান করতে চাও?' রেগে গেছে ডন হোসে।

'একটুও না, সিনর। কিন্তু আমার কাছে এই কথা ভেবে খুব আশ্চর্য লাগছে, যে লোক মাত্র দু'দিন আগে জনৈক "ইণ্ডিয়ান কুত্তার" সঙ্গে একটেবিলে বসে ডিনার খেতে অস্বীকার করেছে, সে আজ যেচে পড়ে ওই কুত্তাকেই দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিজের বাড়িতে!'

'একটু আগে কী বললাম? তুমি কি কালা? শোনোনি? আবার বলতে হবে? যা ঘটে গেছে তা অতীত। এবং আমি তার জন্য দুঃখিত। এর বেশি তুমি কী করতে বলো আমাকে? তোমার পা ধরে মাফ চাইতে হবে?'

আমি কিছু বললাম না।

ডন হোসে বলে চলল, 'আর নিরাপত্তার কথা বলছ? আমাদের বাড়িতে আমি থাকতে যদি কোনো বিপদ হয় তোমাদের, নিজের জীবন দিয়ে সে-বিপদের মোকাবেলা করবো...'

'ঠিক আছে, আর বলতে হবে না,' বাধা দিয়ে বলে উঠলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। 'এবার বলো তোমাদের জমিদারি এখান থেকে কত দূরে?'

'আমরা যদি এখনই রওনা করি তা হলে আশা করা যায় সূর্যাস্তের আগেই পৌঁছতে পারবো।'

'পায়ে হেঁটে?'

'তা ছাড়া আর কী? সঙ্গে ঘোড়া থাকলে অবশ্য তিন ঘণ্টার মধ্যে

পৌঁছে যেতে পারতাম।'

'তা হলে চলো আর দেরি না-করে রওনা হই,' বললেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড।

দশ মিনিটের মধ্যে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা।

তবে চলে আসার আগে ওই ছয় ইণ্ডিয়ান নাবিক আর পাশের গ্রামের মোড়লকে উষ্ণ বিদায় জানালাম। আমরা ডন হোসের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সাণ্টা ক্রুযে রাত কাটাতে যাচ্ছি শুনে ভ্রূ কুঁচকেছে ওদের সবাই, অজানা আশঙ্কার ছাপ পড়েছে প্রত্যেকের চেহারায়।

'জায়গাটা খারাপ,' বলেছেন গ্রামের মোড়ল, 'যদি কিছু মনে না-করেন সরাসরি একটা কথা বলি। সবাই বলে সাণ্টা ক্রুয হচ্ছে চোর-ডাকাত আর চোরাকারবারিদের অভয়ারণ্য। ও-রকম একটা জায়গায় আপনাদের মতো মানুষ কেন রাত কাটাতে যাচ্ছে বুঝলাম না। এই দেশে কি জায়গার এত অভাব? নাকি ভাবছেন আমরা গরিব মানুষরা আপনাদের খাতিরযত্ন করতে পারবো না? যা-হোক, যা ভালো বোঝেন করুন। আমি বাধা দেয়ার কে? তবে বলে রাখি, গত সপ্তাহে এই নদী দিয়েই নৌকা ভর্তি করে চোরাই-মাল নিয়ে সাণ্টা ক্রুযের দিকে গেছে দুর্বৃত্তের দল। লোকে বলে, ডন পেদ্রো নাকি মানুষ না, সাক্ষাৎ শয়তান। ওর কবল থেকে আপনাদেরকে রক্ষা করুন ঈশ্বর!'

আশ্বস্ত করার জন্য মোড়লের কাঁধে হাত রেখে আমি বলেছি, 'কী করবো বলুন? ঘটনাক্রমেই বলি অথবা ভাগ্যক্রমেই বলি, ওই শয়তানটার সঙ্গে জরুরি একটা কাজ আছে আমাদের। তাই যেতে হচ্ছে ওর ওখানে। ...একটা উপকার করবেন?'

'কী?' মোড়লের কণ্ঠে কৌতূহল।

'লোক লাগিয়ে খোঁজখবর রাখবেন আমাদের। আমরা সাণ্টা ক্রুযে যাওয়ার পর কী হয় না-হয় জানার চেষ্টা করবেন। যদি দেখেন বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে অথচ ফিরছি না আমরা, ক্যাম্পেখেতে

গিয়ে বা লোক পাঠিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের বলবেন আমাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পারবেন না?'

'পারবো। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ক্যাম্পেখের সরকারি কর্মকর্তারা ডন পেদ্রো মোরেনোর নাম শুনলেই ভয়ে কাঁপতে থাকে। তা ছাড়া শুনেছি নিজের পথ সবসময় পরিষ্কার রাখার জন্য কর্মকর্তাদের নাকি প্রতিমাসে মোটা অঙ্কের ঘুষ দেয় শয়তানটা। তারপরও কথা দিচ্ছি আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব করবো। নিশ্চিন্ত থাকুন, লর্ড। সবচেয়ে বড় কথা, একজন ইংরেজ আছেন আপনাদের সঙ্গে; আমাদের এই হতভাগা দেশে আমরা সাধারণ নাগরিকরা শিয়াল-শকুনের খাবারে পরিণত হলেও কারও কিছু যায়-আসে না, কিন্তু সাদাচামড়ার কোনো ভিনদেশীর দিকে যদি কেউ চোখ তুলেও তাকায় তা হলে...' বাকিটা না-বলে আক্ষেপ করার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকায় মোড়ল লোকটা।

যিব্যালবেকে উদ্ধার করার জন্য ডন হোসেকে দেখিয়ে ইণ্ডিয়ান নাবিকদের নেতাকে বখশিশ দিয়েছেন সিনর, কথাটা বললাম না মোড়লকে। ফাঁদ পেতেছেন তিনি, সে-ফাঁদে শেষপর্যন্ত আমরাই না আটকা পড়ি!

আবহাওয়া গরম। টুকটাক কাপড়চোপড় ছাড়া আর তেমন কিছু বহন করতে হচ্ছে না আমাদেরকে, তারপরও হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। আমাদের বেশিরভাগ জিনিসপত্রই সাণ্টা মারিয়ার সঙ্গে চলে গেছে সাগরের তলদেশে।

দুপুরের দিকে থামলাম আমরা। মাথার উপর গনগন করছে সূর্যটা। রোদের তেজে টেকা মুশকিল হয়ে পড়েছে। কিছু খাবার নিয়ে এসেছি সঙ্গে করে, সেগুলো খেয়ে নিলাম ভাগাভাগি করে। বিশাল একটা গাছের ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে নিলাম দু'ঘণ্টা।

ঘুমটা কাজে লাগল। এখন আর সে-রকম ক্লান্ত লাগছে না। উঠে আবার পথচলা শুরু করলাম। একসময় পৌঁছে গেলাম সাণ্টা

ক্রুযের কাছাকাছি।

একটা শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে এগোচ্ছি আমরা। এ-ধরনের ক্ষেতকে এই এলাকার লোকেরা বলে মিলপা। ক্ষেত পার হয়ে পৌঁছে গেলাম সদর-দরজার কাছে। ভিতরে বিশাল চত্বর। সেখানে পা দিতে-না-দিতেই কোত্থেকে যেন ছুটে এল একপাল কুকুর। আমাদেরকে ঘিরে ধরে এমন ভঙ্গিতে গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করছে, দেখলে মনে হয় ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে এখনই। পিটিয়ে কুকুরগুলোকে তাড়াল ডন হোসে। বোঝা গেল সবগুলো কুকুরই ওর পোষা। সঙ্করজাতের কয়েকজন চাকরকে আমাদের দেখভাল করার কথা বলে অন্দরমহলে ঢুকে গেল সে।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এল আবার। আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল ডাইনিং-হলে। এই বাড়িতে এটাই সবচেয়ে বড় কক্ষ। অনেক আগে এই বাড়ি ছিল সন্ন্যাসীদের আশ্রম, আর এই ডাইনিং হল ছিল তাদের ভোজনশালা।

আঁধার ঘনিয়েছে, তাই চারদিকের দেয়ালে ঝুলছে বেশকিছু জ্বলন্ত লণ্ঠন। লম্বা একটা টেবিল ঘিরে বসে আছে পাঁচ-ছ'জন লোক। অপেক্ষা করছে সাপারের জন্য। খাবারের থালা-বাটি এনে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখছে কয়েকজন ইণ্ডিয়ান মেয়ে। যে-লোকগুলো বসে আছে তাদের কেউ মেক্সিকান, কেউ ইণ্ডিয়ান, আবার কেউ সংকরজাতের। প্রত্যেকের চেহারায় শয়তানি ভাব। এদের উপর থেকে চোখ সরিয়ে হলের আরেকপ্রান্তের দিকে তাকালাম। সেখানে ছাদের কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে একটা দোলনা-বিছানা। তাতে শুয়ে আছে একটা লোক। এক সুন্দরী ইণ্ডিয়ান মেয়ে বার বার ধাক্কা দিচ্ছে দোলনা-বিছানাটাতে। শুয়ে শুয়ে আয়েশ করে দোল খাচ্ছে লোকটা।

'এসো, বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল ডন হোসে, 'তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি।' দোলনা-বিছানাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। 'বাবা, এই সেই সাহসী ইংরেজ যে গতরাতে

আমার জীবন বাঁচিয়েছে। ওর সঙ্গে আছে দু'জন ইণ্ডিয়ান, যারা আমাকে বাঁচাতে চায়নি। যা-ই হোক, ওদেরকে দাওয়াত দিয়ে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছি। আশা করি ওদেরকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা জানানো হবে।'

ছেলের কণ্ঠ শুনে চোখ খুলে তাকাল অথবা তাকানোর ভান করল ডন পেদ্রো। ইশারায় ইণ্ডিয়ান মেয়েটাকে নিষেধ করল দোলনা-বিছানায় আর ধাক্কা দিতে। উঠে বসে তাকাল আমাদের দিকে। লোকটা বেঁটে কিন্তু বলিষ্ঠ। বয়স ষাটের কাছাকাছি। আসলে ডন পেদ্রো একটু বেশিই বেঁটে, কারণ দোলনা-বিছানাটা অনেক নিচু করে বাঁধা, তা-সত্ত্বেও উঠে বসার পর ওর পা দুটো মেঝে স্পর্শ করেনি। কিন্তু উচ্চতা যা-ই হোক না কেন, ওর চেহারা আর ভাবভঙ্গি এককথায় দুর্দান্ত। লম্বা, যত্ন নিয়ে আঁচড়ানো সাদা চুল আভিজাত্য এনে দিয়েছে ওর চেহারায়।

তবে সে-চেহারায় বয়সের ছাপ আছে এবং তা লুকানোর চেষ্টা করেনি ডন পেদ্রো। ঝুলে পড়েছে দুই গাল, কিছুটা কুঁচকে গেছে চোখের নীচের চামড়া। নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বেশিরভাগ সময় বেঁকে থাকে মুখটা। লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলো চোখে পড়ে যাতে তন্দ্রায় ব্যাঘাত ঘটাতে না-পারে সে-জন্য কালো কাচের চশমা পরে ছিল সে, আমাদেরকে ভালোমতো দেখার জন্য খুলল চশমাটা। দেখা গেল ওর ছোট ছোট, অর্ধনিমীলিত দুই চোখ। তাতে সাপের মতো নিষ্প্রাণ কিন্তু ভয়ঙ্কর দৃষ্টি।

লোকে যে বলে এই লোক সাক্ষাৎ শয়তান, বাড়িয়ে বলে না, ভাবলাম আমি।

এই লোকের চেহারায় ভালোমানুষির ছিটেফোঁটাও নেই, আছে শুধু শয়তানি। তারপরও যথেষ্ট সৌজন্য দেখিয়ে সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকে বাউ করল সে, স্প্যানিশে বলল, 'তা হলে আপনিই সেই ইংরেজ যে আমার ছেলেকে ডুবন্ত জাহাজ থেকে উদ্ধার করেছে?' খেয়াল করছি ডন পেদ্রোর উচ্চারণ ধীর কিন্তু জোরালো, কথা বলতে বলতে বার

বার আমাদের আপাদমস্তক জরিপ করছে—যেন প্রথম পরিচয়েই দেখে নিতে চাচ্ছে কী আছে আমাদের মনে। 'ওর কাছ থেকে শুনেছি ঘটনাটা। জাহাজটা তখন ডুবছে। যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে আপনি ফিরে যান ডুবন্ত জাহাজের খুব কাছে, শুধু ওকে উদ্ধার করার জন্য। স্বীকার করতেই হবে সাহস আছে আপনার। আপনার জায়গায় আমি থাকলেও হয়তো এত বড় ঝুঁকি নেয়ার সাহস পেতাম না। কারণ, সোজাকথায় যদি বলি, অন্যের চেয়ে নিজের জীবন বেশি মূল্যবান মনে করি আমি। তবে এই ব্যাপারে আপনাদের, মানে ইংরেজদের আচরণ কখনও কখনও খুব আজব মনে হয় আমার। সোজাকথায়, আপনাদেরকে গোঁয়ার মনে হয়। কিছু মনে করবেন না, কথা বলার সময় সোজাসুজি বলি আমি, রাখঢাক পছন্দ করি না। যা-হোক, আমার ছেলের জীবন বাঁচিয়েছেন, সে-জন্য আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, সিনর। আপনি এবং আপনার সঙ্গীরা এখানে সাদরে আমন্ত্রিত। যখন যা লাগবে চেয়ে নিতে দ্বিধা করবেন না।' ওর পাশে বসে আছে লোমশ, ঝুলে-পড়া ভ্রূওয়ালা এক লোক; কথা শেষ করে লোকটার দিকে তাকাল সে। ওই লোক গোঁফে তা দিতে দিতে চোখের কোণ দিয়ে এতক্ষণ দেখছিল আমাদেরকে।

'যদি কিছু মনে না-করেন,' আগের মতোই ধীর কিন্তু জোরালো কণ্ঠে বলে উঠল ডন পেদ্রো, 'আমাদের এই গরিব দেশে আপনার আগমনের কারণ জানতে পারি, সিনর?'

'আপনাদের এই দেশ হয়তো টাকাপায়সার দিকে দিয়ে গরিব কিন্তু প্রাচীন নিদর্শনের দিক দিয়ে খুবই সমৃদ্ধ,' বললেন সিনর। 'এখানে অনেক ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপনা আছে যেসব নিয়েই আমার কারবার। সেগুলো দেখতে এবং জানতে এসেছি আমি। যদি ইংল্যাণ্ডে ফিরতে পারি, দেশবাসীকে জানাবো কী কী দেখলাম। আমার এই ইণ্ডিয়ান বন্ধু ডন ইগনাশিয়োকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম প্যালেঙ্কে যাবো বলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আপনার বাড়ির কাছে নৌকাডুবি হলো আমাদের। একদিক দিয়ে দুর্ভাগ্যজনক, আবার

আরেকদিক দিয়ে সৌভাগ্যজনক বলতে হবে। আপনার এবং আপনার ছেলের মতো অতিথিপরায়ণ লোকের সান্নিধ্য পেলাম কিছুদিনের জন্য। তা না-হলে, সত্যিই বলছি, উভয় সঙ্কটে পড়ে যেতাম আমরা।'

'উভয় সঙ্কট?' বুঝতে পারেনি ডন পেদ্রো।

'মানে থাকাখাওয়া এবং নতুন করে অভিযান শুরু করার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব।'

'কী কী জিনিসপত্র দরকার আপনার?'

'বন্দুক, ঘোড়া ইত্যাদি।'

'হুঁ!' কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল ডন পেদ্রো। তারপর বলল, 'ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপনার সঙ্গে বন্দুক আর ঘোড়ার সম্পর্ক মেলাতে আসলেই কষ্ট হচ্ছে আমার। তারপরও, যখন চেয়েছেন, আতিথেয়তার খাতিরেই সেগুলোর ব্যবস্থা করবো। তবে যা বলছিলাম, আপনারা ইংরেজরা আসলেই খুব অদ্ভুত। অনেক আগে ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছু ইটকাঠের মধ্যে এমন কী দেখার আছে বুঝি না। তবে হ্যাঁ, আপনার উদ্দেশ্য যদি হয় গুপ্তধন শিকার তা হলে অবশ্য অন্য কথা। আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলবো, প্রাচীন নিদর্শন ঘৃণা করি আমি। কেন জানেন? আমার কোনো কুসংস্কার নেই, তারপরও প্রায়ই মনে হয় এ-রকম কোনো ধ্বংসাবশেষের ভিতরেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হবে আমাকে। যা-হোক, আপনারা ভাগ্যবান—এত বড় দুর্ঘটনা ঘটল তারপরও জীবন আর টাকা দুই-ই বাঁচাতে পেরেছেন।'

তারমানে সুযোগ্য পুত্র ইতোমধ্যেই টাকার খবর বলে দিয়েছে বাপের কাছে!

'ঘোড়া আর বন্দুকের ব্যাপারে কী করা যায় তা দেখবো আগামীকাল,' বলে চলল ডন পেদ্রো মোরেনো, 'এতদূর এসেছেন, আপনারা ক্লান্ত। তা ছাড়া খেতে বসার আগে হাতমুখ ধুতে চান নিশ্চয়ই? হোসে, সিনর আর তাঁর ইণ্ডিয়ান বন্ধুকে নিয়ে যাও তাঁদের

ঘরে। সাপার পরিবেশন করা হলে ডাকবো তাঁদেরকে। ততক্ষণ পর্যন্ত বিদায়।' দোলনা-বিছানায় ধাক্কা দিচ্ছিল যে মেয়েটা তার দিকে তাকাল সে। 'এই মেয়ে! এঁদের সঙ্গে যাও। এঁরা যা যা চায় সবকিছুর ব্যবস্থা করো।'

বাউ করে ডন পেদ্রোকে সম্মান জানাল মেয়েটা। হলরুমের দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেল। আমরাও বাইরে আসার পর দেখি, হাতে জ্বলন্ত লণ্ঠন নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মেয়েটা।

এই বাড়ি একসময় সন্ন্যাসীদের আশ্রম ছিল, আগেও বলেছি। তাদের অধ্যক্ষ যে-ঘরে থাকত, পথ দেখিয়ে আমাদেরকে সে-ঘরে নিয়ে এল মেয়েটা। ঘরে আসবাব বলতে তেমন কিছু নেই। শুধু কয়েকটা চেয়ার, একটা রঙচটা ওয়াশিংস্ট্যাণ্ড, আর চাকাযুক্ত দুটো আমেরিকান খাট। একদিকের দেয়ালে ওই অধ্যক্ষ মহাশয়ের ছবি টানানো, সেটার দু'পাশে অল্পকিছু ব্যবধানে রাখা আছে খাট দুটো।

ডন হোসেও এসেছে আমাদের সঙ্গে। আমরা ঘরের এদিকে-সেদিকে তাকাচ্ছি দেখে বলল, 'হয়তো ঘরটা পছন্দ হয়নি তোমাদের। হয়তো ভাবছ, কোন্ গরিবখানায় থাকতে দেয়া হলো। হ্যাঁ, মেক্সিকোর ধনী লোকেরা যে-রকম বিলাসী জীবন যাপন করে তার তুলনায় এই ঘরটা গরিবখানাই বটে। কিন্তু আমাদের বাড়িতে কোনো অতিথি এলে তাকে এখানেই থাকতে দিই। অতিথিদের জন্য এরচেয়ে ভালো অন্য কোনো ঘর নেই।'

'ধন্যবাদ,' বললেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। 'থাকতে পারবো।'

ঘরের পশ্চিমদিকের দেয়ালে আঁকা আছে প্রমাণাকৃতির একটা ছবি, তাতে দেখা যাচ্ছে "অটো-দ্য-ফে"তে (শব্দটা পর্তুগিজ। এর ইংরেজি মানে: অ্যাক্ট অভ দ্য ফেইথ। প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতা করলে আঠারো শতকের গোড়ার দিকে স্প্যানিশ ধর্মবিচারসভা দোষী ব্যক্তিকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মারার আদেশ দিত। ধর্মান্ধ জনতা তখন ওই আদেশ কার্যকর করত) জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে অনেক ইণ্ডিয়ানকে। শয়তানের দল ঘুরছে তার মাথার আশপাশে,

দেহের ভিতর থেকে বের করে আনার চেষ্টা করছে আত্মাটা।

ছবিটার দিকে ইঙ্গিত করে সিনর বললেন, 'ঘুমানোর আগে এসব দেখলে, যে লোক রাত কাটাবে এখানে তার দুঃস্বপ্ন দেখাটাই স্বাভাবিক।'

'সুন্দর, তা-ই না?' দাঁত বের করে হাসছে ডন হোসে। 'আমার ইচ্ছা ছিল চুনকাম করিয়ে এসব ছবি ঢেকে দেবো। কিন্তু বাবা রাজি হলেন না। কেন যেন এই ছবিটা পছন্দ করেন তিনি। দেখো, যাকে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে সে কিন্তু একজন ইণ্ডিয়ান। সাদাচামড়ার কেউ না। এ-জন্যই বোধহয় ছবিটা মুছতে দেননি বাবা। তিনি আবার ইণ্ডিয়ানদেরকে দু'চোখে দেখতে পারেন না। যা-হোক, হাতমুখ ধুয়ে তরতাজা হয়ে হলরুমে আসতে পারবে না তোমরা? নাকি চিনতে অসুবিধা হবে? অসুবিধা হওয়ার কথা না—বাতাসে খাবারের ঘ্রাণ পেলেই বুঝবে ডাইনিংরুমটা কোন্‌দিকে।'

ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল মেয়েটা, আমি বলে উঠলাম, 'এক মিনিট। একটু দাঁড়াও। আমাদের চাকর,' ইশারায় দেখালাম মোলাসকে, 'আমাদের সঙ্গেই এসেছে এতদূর। কিন্তু সিনর ডন পেদ্রো বোধহয় ওর সঙ্গে একই টেবিলে বসে খাবার খেতে রাজি হবেন না। তুমি কি কিছু খাবার এনে দিতে পারবে ওকে?'

'সি (হ্যাঁ),' বলল মেয়েটা, খেয়াল করলাম আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

'নাম কী তোমার?'

'লুইসা,' সংক্ষেপে বলল মেয়েটা।

ইতোমধ্যে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেছে ডন হোসে। বাতাসের ধাক্কায় প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে দরজাটা। এমন সময় হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল আমার। আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘে বেশকিছু মহিলাও আছে। লুইসার দিকে এগিয়ে গিয়ে বিশেষ কিছু শব্দ উচ্চারণ করলাম নিচু গলায়। হাতের ইশারায় বিশেষ কিছু সংকেত দেখালাম। প্রত্যুত্তরে সঠিক শব্দ উচ্চরণ করল মেয়েটা, আমারই মতো হাতের ইশারায়

সঠিক সংকেত দেখাল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

অর্থাৎ আমার সেই কবচটা কোথায় জানতে চায়।

সেটা দেখালাম ওকে। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নুইয়ে আমাকে সম্মান জানাল লুইসা। কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দরজার বাইরে করিডোর থেকে ভেসে এল ডন হোসের চিৎকার। মেয়েটাকে ডাকছে সে।

'আসছি,' পাল্টা চিৎকার করে জানান দিল লুইসা। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'লর্ড, এই বাড়িতে থাকলে বিরাট বিপদে পড়বেন আপনি। সব কথা এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। সম্ভব হলে আবার আসবো এখানে, তখন বলবো। সাপারে হয়তো মদ খেতে দেয়া হবে আপনাদেরকে। সেটা খেতে পারেন। কিন্তু ভুলেও হাত দেবেন না কফির কাপে। আর বিছানায় শোওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়বেন না। মেঝেটা একটু পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝতে পারবেন কী বলতে চাচ্ছি। ...আসছি, সিনর! আসছি,' শেষের কথাগুলো আবারও চিৎকার করে বলে দরজা খুলে দৌড়ে পালাল সে।

মেয়েটা চলে যাওয়ামাত্র দরজার কাছে গিয়ে হাজির হলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। খুলে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলেন। তারপর ভিতরে এসে আটকে দিলেন দরজাটা। আমার কাছে ফিরে এসে নিচু গলায় বললেন, 'এসবের মানে কী, ইগনাশিয়ো?'

জবাব দিলাম না। এগিয়ে গেলাম একটা খাটের দিকে। ধাক্কা দিয়ে কিছুটা সরালাম খাটটাকে। মেঝের দিকে তাকালাম।

রঙ ক্ষয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়. বলা ভালো হালকা বাদামি একটা রঙ যেন লেপ্টে আছে মেঝের বিশেষ ওই জায়গাটাতে। এবার কম্বল সরিয়ে তাকালাম খাটের দিকে। মোটা করে বোনা শক্ত-কাপড়ের জাজিমেও একই দাগ। তবে এই দাগ মেঝের দাগের চেয়ে হালকা। কারণ ধুয়ে বা ভেজা কাপড় দিয়ে ঘষে দাগটা তুলে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।

সিনরের দিকে তাকালাম। 'এই খাটে এক বা একাধিক লোকের মৃত্যু হয়েছে। এবং সে-মৃত্যু যে স্বাভাবিক না তার প্রমাণ এই

রক্তের-দাগ। আমার কী অনুমান, জানেন?'

'কী?'

'ডন পেদ্রোর অতিথিদের ঘুম খুব ভালো হয়। কারণ কফি বা অন্যকিছুর সঙ্গে ঘুমের কড়া ওষুধ খাওয়ানো হয় ওদেরকে। তারপর তাদেরকে খুন করে ওর লোকেরা। এ-উদ্দেশ্যেই মিষ্টিকথায় ভুলিয়ে আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।'

'কিন্তু...'

'ডন হোসের সঙ্গে বলতে গেলে হাতাহাতি হয়ে গেছে আপনার,' সিনর কী বলতে চান অনুমান করে নিয়ে থামিয়ে দিলাম তাঁকে। 'আপনার কী ধারণা? আপনি ওর জীবন বাঁচিয়েছেন বলে সব ভুলে যাবে সে? এত ভালো মানুষ হলে ওদের গীবত গায় কেন লোকে?' মাথা নাড়লাম। 'না, সিনর। আমাদেরকে এখানে আনার একটাই উদ্দেশ্য ডন হোসের—শাস্তি দেয়া। এবং সে-শাস্তি কত মারাত্মক হতে পারে তার প্রমাণ মেঝের এই দাগ। যেহেতু আপনি ইংরেজ, আপনাকে যদি খুন না-ও করে, একটা স্বর্ণমুদ্রাও নিয়ে যাতে বের হতে না-পারেন এই বাড়ি থেকে সে-ব্যাপারটা নিশ্চিত করতে চাইবে ওরা।'

'ঘুমানোর সময় কেউ এসে আমাদের গলায় ছুরি চালাবে—ভাবলেও গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়।'

'ঘাবড়াবেন না। ভাগ্য ভালো, সময়মতো সাবধান করে দেয়া হয়েছে আমাদেরকে। লুইসাকে যদি হাত করতে পারি তা হলে ওর মাধ্যমে পালাতে পারবো। আশা করি অন্য যে-সব ইণ্ডিয়ান আছে এই বাড়িতে, ওই মেয়ের মাধ্যমে আমার পরিচয় জানতে পারবে কিছুক্ষণের মধ্যে। তখন সম্ভব হলে সবাই মিলে সাহায্য করবে। এবার চলুন প্রস্তুত হয়ে খেতে যাই। চেহারা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখতে হবে আমাদেরকে। যদি সত্যিই খারাপ কোনো মতলব থেকে থাকে ডন হোসের মনে, নিশ্চিন্ত থাকুন মাঝরাতের আগে কিছু করবে না সে। মোলাস, বুঝতে পেরেছ?'

'জী,' বলল সে।

'তা হলে চোখকান খোলা রেখো। ওই ইণ্ডিয়ান মেয়েটা তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসবে। ওর কাছ থেকে যা যা পারো জেনে নেয়ার চেষ্টা কোরো। যিব্যালবে আর তার মেয়েকে কোথায় বন্দি করে রাখা হয়েছে সে-ব্যাপারে কিছু জানতে পারো কি না দেখো। তবে প্রশ্ন করার আগে গোপন সংকেতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়ো তুমি আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের লোক। তা না-হলে ঘাবড়ে যেতে পারে মেয়েটা। তোমার পরিচয় পেলে হয়তো নিজে থেকেই অনেককিছু বলবে। আচ্ছা ভালো কথা, তোমাকে কি চিনতে পেরেছে কেউ?'

'চিনতে পেরেছে মানে?' আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি মোলাস।

'কেন, সাণ্টা ক্রুযের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় না দলবলসহ হামলা করে তোমাকে পাকড়াও করেছিল ডন পেদ্রো? সব স্বর্ণমুদ্রা কেড়ে নিয়েছিল?'

'ও হ্যাঁ,' বুঝতে পেরেছে মোলাস। 'আমার মনে হয় চিনতে পারেনি। আমরা যখন এই বাড়িতে ঢুকলাম ততক্ষণে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। তা ছাড়া সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড সাদাচামড়ার বলে বেশিরভাগ সময় তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিল ওরা, আমাকে সেভাবে খেয়াল করেনি।'

'ভালো। পারলে ওদের চোখের আড়ালেই থেকো। ওই মেয়েটার ব্যাপারে যা বললাম মাথায় রেখো। আর কী হয় না-হয় খেয়াল রেখো। বিদায়।'

ডাইনিং-হলে গিয়ে দেখি, টেবিল ঘিরে ইতোমধ্যেই বসে পড়েছে ন'জন লোক। তর সইছে না কারোরই। কখন ঝাঁপিয়ে পড়বে খাবারের উপর সে-জন্য উসখুস করছে। কিন্তু আমাদেরকে ফেলে খাওয়া শুরুও করতে পারছে না। সেই দোলনা-বিছানাতে এখনও বসে আছে ডন পেদ্রো। পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওর ছেলে। বাপ-ব্যাটা নিচু গলায় কী নিয়ে যেন আলাপ করছে।

টেবিলে যারা বসে আছে তাদের মধ্যে মাত্র একজন শ্বেতাঙ্গ। লোকটা কৃশকায়। দেখলেই বোঝা যায় বেশ লম্বা। লণ্ঠনের আলোয় কেমন পাণ্ডুর দেখাচ্ছে ওকে। নাকটা ভাঙা। চেহারায় এমন কিছু আছে যে, একবারের বেশি দু'বার তাকাতে ইচ্ছা করে না। বরং বিরক্তিতে ভরে যায় মন। কাজেই বাকিদের দিকে তাকালাম আমি।

এরা সবাই সঙ্করজাতের। বিদ্রোহী বিদ্রোহী ভাব আছে চেহারায়। সেই সঙ্গে আছে ধূর্ততা আর শয়তানি। আইনের হাত ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে আছে প্রত্যেকে। দেখলেই বোঝা যায় এদের পেশা ডাকাতি, নেশা খুন করা।

বুঝতে পারছি, এদের হাতে একবার যদি পড়ি, দয়ামায়া আশা করা বৃথা। আমাদের দিকে হাত বাড়ালে ঠাণ্ডামাথায় জবাই করার জন্যই বাড়াবে এরা। হরিণকে গুলি করার সময় দক্ষ শিকারীর যে-রকম বুক কাঁপে না, খুন করার সময় এদেরও কোনো ভাবান্তর হয় না।

আমাদেরকে দেখে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে দোলনা-বিছানা থেকে মেঝেতে নামল ডন পেদ্রো। এগিয়ে এসে সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের একটা হাত ধরে বলল, 'আসুন, আমার এখানে যে শ্রমিকরা কাজ করে তাদের নেতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ওর নাম স্মিথ। বাড়ি টেক্সাসে। জন্মসূত্রে আমেরিকান। চোস্ত ইংরেজি বলতে পারে এ-রকম কাউকে পেলে খুশিই হবে সে। কারণ চর্চা করে না বলে ওর স্প্যানিশ আমরা কেউই তেমন বুঝি না।'

স্মিথের উদ্দেশ্যে বাউ করলেন সিনর। জবাবে দেঁতো হাসি হেসে তাঁকে কী যেন বলল বেপরোয়া দুর্বৃত্তটা। সিনরও হেসে কিছু বললেন। ইংরেজি তেমন বুঝি না বলে তাঁদের কথোপকথন বুঝতে পারলাম না।

যা-হোক, দু'জনের সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকে খাতির করে নিয়ে গিয়ে নিজের পাশের আসনে বসিয়ে দিল ডন পেদ্রো। আমাকে বসতে দেয়া হলো পাশের আরেকটা

টেবিলে। আমি সামান্য এক ইণ্ডিয়ান; যারা ওই টেবিলে বসে আছে তারা পেশায় যা-ই হোক না কেন তাদের মতো "অভিজাত" রক্ত বইছে না আমার দেহে—এজন্যই আলাদা বসতে হয়েছে। ডন হোসে বসেছে স্মিথের পাশে। খেতে শুরু করার ইঙ্গিত করল ডন পেদ্রো। আমার মনে বঞ্চনার যত দুঃখই থাকুক, পেটে ক্ষুধা; তা ছাড়া যে পাচক রান্না করেছে তার হাত আছে স্বীকার করতেই হবে। সুতরাং গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলাম।

খেতে খেতে এটা-সেটা নিয়ে কথা বলছে ডন পেদ্রো। সিনরও মন্তব্য করছেন মাঝেমধ্যে। থেকে থেকে সায় জানাচ্ছে ডন হোসে বা স্মিথ। বাকিরা প্রায় নিশ্চুপ। আমি আলাদা টেবিলে বসায় কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছে না আমাকে। আলাদা বসায় একদিক দিয়ে বরং লাভই হয়েছে। নজর রাখতে পারছি সবার উপর। কে কী-রকম তা আরও ভালোমতো বুঝে নেয়ার চেষ্টা করছি।

দু'-একজন পানপাত্র পূর্ণ করে নিয়ে আসার ইঙ্গিত করল আমাকে। জবাবে আমিও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম, মদের চেয়ে মাংসই বেশি মজা লাগছে আমার কাছে।

খাওয়া শেষ করে আগের চেয়েও জোরালো আর ভারী গলায় সিনরকে বলল ডন পেদ্রো, 'আরে আপনি তো কিছুই খেলেন না! এত ভালো বাবুর্চি আমার, এত বিখ্যাত ওর হাতের রান্না, সব দেখি নষ্ট হলো! থাক বাদ দিন। আসুন এই বার্গাণ্ডি (ফ্রান্সের বার্গাণ্ডি অঞ্চলে প্রস্তুতকৃত সাদা বা লাল মদ) চেখে দেখুন।' বলতে বলতে হাতের পানপাত্রটা আবারও পূর্ণ করল সে, এই নিয়ে সপ্তম কি অষ্টমবার গিলছে। 'সরাসরি ফ্রান্স থেকে আনিয়েছি এই জিনিস। এবং এর জন্য এক পয়সাও শুল্ক দিতে হয়নি,' ভারী হয়ে আসা চোখের-পাতা খুলে রাখতে পিটপিট করছে। হাতের পানপাত্রটা উঁচু করে ধরে বলল, 'আপনার স্বাস্থ্য কামনা করে পান করছি। প্রার্থনা করি গতরাতে আমার ছেলেকে উদ্ধার করে যে-সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, জীবনে আরও অনেকবার তা করতে পারবেন।

কিন্তু...শুনলাম সাণ্টা মারিয়াতে থাকার সময় আপনি নাকি কী সব অভিশাপ দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেনকে? আপনার অভিশাপ নাকি লেগে গেছে?'

হা হা করে কিছুক্ষণ হাসলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। তারপর বললেন, 'এসব কুসংস্কার, সিনর। শকুনের দোয়ায় গরু কোনোদিনও মরে না। তা ছাড়া আপনি যে-সম্মান দিচ্ছেন আমাদেরকে, যে-রকম খাতিরযত্ন করছেন, আপনাকে অভিশাপ দেয়ার প্রশ্নই আসে না। সবচেয়ে বড় কথা, আজ রাতটা আপনার এখানে থেকে কাল আবার রওনা করতে চাই আমরা।'

বার্গাণ্ডির নেশা পেয়ে বসেছে ডন পেদ্রোকে। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে কষ্ট হচ্ছে ওর। বলল, 'অভিশাপের কথাটা এমনি বললাম। আপনি কী মনে করেন? এসব বিশ্বাস করি আমি? ভয় পাই? না, জীবনেও না। আমি আসলে ঠাট্টা করছিলাম।' গলা উঁচু করল সে, যাতে আমার শুনতে অসুবিধা না-হয়। 'আপনার বন্ধু, কী যেন নাম তার—ইগনাশিয়ো? তো আপনার এই ইণ্ডিয়ান বন্ধুও তো সাণ্টা মারিয়াতে সবার সামনে আমার একগাদা গীবত গেয়েছে। সেটাও তো আসলে ঠাট্টা, তা-ই না? সে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করে না যা বলেছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য?' হঠাৎ রক্তচক্ষু মেলে আমার দিকে তাকাল। 'নাকি করো?'

নড়েচড়ে বসলাম আমি, স্পষ্ট কণ্ঠে বললাম, 'যদি সত্যিই আমার মতামত চান সিনর পেদ্রো, আমি বলবো, এ-বিষয়ে কথা বলে কোনো লাভ নেই আসলে। কারণ আমি যা বলেছি তা অতীত এবং আপনার ব্যাপারে যা বলেছি তা যদি সত্যিই করে থাকেন তা হলে তা-ও অতীত। আপনার বাড়িতে, আপনার অতিথি হয়ে এসে সে-সব কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করাটা কি ঠিক হবে?'

জবাব না দিয়ে সিনরকে উদ্দেশ্য করে বলল ডন পেদ্রো, 'একটা কথা বলুন তো। এ-ঘরে এখন ক'জন আছে?'

'আমার বন্ধুসহ গণনা করলে তেরোজন,' জবাব দিলেন সিনর।

'হুঁ, আমিও তা-ই ভেবেছিলাম। তেরো সংখ্যাটা খুব অদ্ভুত। আমাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করবেন না, আসলে যতবার এই সংখ্যাটার মুখোমুখি হয়েছি ততবার কোনো-না-কোনো খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। একটা ঘটনা বলি। কয়েক মাস আগের কথা। স্মিথের দু'বন্ধু এসেছে এই বাড়িতে, ডিনার করতে বসেছে এই টেবিলেই। আমরা সব মিলিয়ে সংখ্যায় তেরোজন। দু'জনই আমেরিকান, এই অঞ্চলে নতুন কোনো ব্যবসা চালু করা যায় কি না তা যাচাই করাই ওদের উদ্দেশ্য। তো, যতটুকু হজম করতে পারবে তার অনেক বেশি বার্গাণ্ডি গিলে ফেলল বেচারারা। আপনাদেরকে যে-ঘরে থাকতে দেয়া হয়েছে ওদেরকেও একই ঘরে থাকতে দেয়া হয়েছিল। রাতে সেখানে গিয়ে দু'বন্ধুর মধ্যে প্রথমে শুরু হলো কথা কাটাকাটি। তারপর হাতাহাতি। শেষে মারামারি। একজন আরেকজনকে মারাত্মকভাবে জখম করে ফেলল। আমরা কিছু করার আগে দু'জনই মরল সেখানে। আফসোস! ভাগ্য ভালো স্মিথ ছিল আমাদের সঙ্গে। দেশে গিয়ে ওর লোকদেরকে ঠিকমতো বোঝাতে পেরেছে, তা না-হলে কী হতো কে জানে!'

'হুঁ!' সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের ভ্রূ কুঁচকে গেছে। 'আমার কাছে কোন্ ব্যাপারটা সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে জানেন? দু'জন মাতাল লোকের পক্ষে কথা কাটাকাটি করা সম্ভব, ধরে নিলাম হাতাহাতিও করা সম্ভব। কিন্তু খুনোখুনি করা সম্ভব কি?'

'কী বলতে চান আপনি?' গম্ভীর হয়ে গেছে ডন পেদ্রো। 'মিথ্যা বলছি আমি?'

'না, আসলে সে-রকম কিছু না...'

'ওই কথাটা আমার মাথাতেও এসেছিল,' সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের মুখের কথা কেড়ে নিয়েছে ডন পেদ্রো, 'তখন ভালোমতো খোঁজখবর করে দেখলাম। জানতে পারলাম, আসলে মারামারি করে মরেনি ওই দুই আমেরিকান। আমাদেরই কয়েকজন ইণ্ডিয়ান চাকর লোভে পড়ে সব হাতিয়ে নেয়ার জন্য ঢুকেছিল ওই ঘরে। কিন্তু ব্যাপারটা

যেভাবেই হোক টের পেয়ে যায় আমেরিকানরা। তখন বাধ্য হয়ে ওদেরকে খুন করে ইণ্ডিয়ানরা। এখন কথা হচ্ছে, আমি এই বাড়ির মালিক হয়ে নিশ্চয়ই চাইতে পারি না এত জঘন্য একটা কথা রাষ্ট্র হোক? আইন-আদালত এদেশেও আছে। তার উপর যারা খুন হয়েছে তারা ভিনদেশী। জানাজানি হলে লোকে ভাবত, আমেরিকানদের ডলার হাতিয়ে নেয়ার জন্য চাকর পাঠিয়ে আমিই খুন করিয়েছি। তাই আমার জন্য যাতে সুবিধা হয় সে-রকমভাবে সাজাতে হয়েছে পুরো ঘটনা। বুঝতে পেরেছেন?' ঢক ঢক করে আরও এক গ্লাস বার্গাণ্ডি গিলল সে। 'শালা ইণ্ডিয়ানের বাচ্চা ইণ্ডিয়ান! সব ক'টা শালাকে ভালোমতো চিনি আমি। আমার বাপ-দাদারা যে কথায় কথায় চাবুক চালাত ওদের উপর ঠিকই করত। হারামিগুলোর যন্ত্রণায় সভ্য সমাজে মুখ দেখানোর উপায় থাকল না!'

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন সিনর, হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিল ডন পেদ্রো। আরও এক গ্লাস মদ খেয়ে বলতে লাগল, 'ভাববেন না বাড়িয়ে বলছি। এই ইণ্ডিয়ানরা আসলেই খারাপ। বাপ-দাদাদের মিথ্যা ধর্ম নিয়ে আজও পড়ে আছে। মানে মূর্তি পূজা করে। বিপজ্জনক কিছু গোপন সংগঠন আছে ওদের। আগের দিনের রাজারানিদের মহামূল্যবান সম্পদ কোথায় লুকানো আছে জানে। কিন্তু গিয়ে ধরুন সব ক'টাকে, গলায় পা দিয়ে জিজ্ঞেস করুন, সোজা অস্বীকার করবে। ...শালা!' এবার আর গ্লাস না, সরাসরি বোতল থেকে গিলছে সে। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ আরও হারিয়েছে, বাঁ কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে আধশোয়া হয়ে গেছে। কী বলছে নিজেও জানে না সম্ভবত। 'এ-রকম এক শালাকে ধরে এনে কয়েদ করে রেখেছি আমার বাড়িতে। ব্যাটা থুত্থুরে বুড়ো। খাস ইণ্ডিয়ান, মানে খ্রিস্টান হয়নি এখনও। সঙ্গে ওর মেয়েও আছে। বাপরে বাপ! মেয়ে তো না যেন ডানাকাটা পরী। দেখলে ব্রহ্মচারিত্ব বাদ দিয়ে পোষা-কুকুরের মতো ওই মেয়ের পিছন পিছন ঘুরতে শুরু করবে যে-কোনো ব্রহ্মচারী। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? দাঁড়ান, আগামীকাল

সকালে ওই মেয়েকে হাজির করবো আপনার সামনে। তখন দেখলেই বুঝবেন আমার কথা ঠিক না বেঠিক। সুন্দরী...সাক্ষাৎ অপ্সরা মেয়েটা। কিন্তু দেমাগী। মেজাজমর্জিরও কোনো আগা-মাথা নেই।' টেবিল ঘিরে বসে-থাকা লোকগুলোকে ইঙ্গিতে দেখাল। 'ওই মেয়েটাকে এদের সামনে হাজির করার সাহস হয়নি আমার। বলা তো যায় না, কে কখন কী করে বসে...' অশ্লীল ভঙ্গিতে হাসল। 'তবে হোসে আজ রাতে যাচ্ছে ওই মেয়ের কাছে। না, না, ওসব কিছু না। ওই মেয়ে আর ওর বাপের সঙ্গে কথা বলতে চায় হোসে। আমার ছেলেটা আবার জাত সাপুড়ে,' অশ্লীল ইঙ্গিত করল, 'যত বড় গোখরা সাপই হোক না কেন জানে কীভাবে পাকড়াও করতে হয়।'

'কিন্তু...' না জানার ভান করছেন সিনর, 'একটা অসহায় বুড়ো লোক আর তার পরমা সুন্দরী মেয়েকে আটকে রেখেছেন জানতে পারলে লোকে কি আরও বদনাম রটাবে না আপনার?'

'রটাক। পরোয়া করি না। সাধে কি আর আটকে রেখেছি? জানেন ওই অপ্সরা আর তার বুড়ো বাপ কী জানে? সাত রাজার ধন লুকানো আছে এমন এক জায়গার সন্ধান জানা আছে ওদের। ওই পরিমাণ সম্পদ হাতে পেলে কোত্থেকে কোথায় চলে যেতে পারবো আমি বুঝতে পারছেন? ইংল্যাণ্ডের রানি যত ধনী, রাতারাতি তত ধনী হয়ে যাবো।'

'জানলেন কীভাবে?'

বার্গাণ্ডির বোতলটা শেষ করে সেটা ঘরের এককোনায় ছুঁড়ে ফেলে দিল ডন পেদ্রো। আরেকটা বোতল নিয়ে সেটার ছিপি খুলল। 'জানলাম কীভাবে, তা-ই না? বাপ-বেটির কাছ থেকেই শুনেছি। শুনতে চান ঘটনাটা?'

'শুনতে চাই মানে?' সিনরের বদলে আরেকটু হলে আমিই বলে ফেলেছিলাম।

দু'ঢোক বার্গাণ্ডি গলায় চালান করে দিল ডন পেদ্রো। 'আপনার

গ্লাসটা খালি হয়ে গেছে, সিনর। সেটা পূর্ণ করে নিন। চাইলে একটা সিগার ধরিয়ে আমার আরেকটু কাছে এসে বসতে পারেন। সব কথা আবার সবার সামনে বলা ঠিক না।'

আট

সাপারের পর

'শুনুন, সিনর,' জড়ানো গলায় বলছে ডন পেদ্রো, 'ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শন আর ইণ্ডিয়ানদের উপর তো আপনার খুব আগ্রহ, তা-ই না? তবে এসব বিষয়ে জানার আগে এদেশের বনেজঙ্গলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাস করছে এমন কিছু জাতি সম্পর্কে জানতে হবে আপনাকে। যে-বনজঙ্গলের কথা বলছি সেখানে আজ পর্যন্ত পা পড়েনি কোনো সাদামানুষের। অথচ সেখানেই নাকি চমৎকার চমৎকার সব শহর আছে। সে-সব শহর নাকি সোনা দিয়ে ঠাসা। অনেকে বলে এসব আষাঢ়ে গল্প। এ-রকম কোনো জাতি অথবা এ-রকম কোনো শহর নাকি নেই। এই দাবির পিছনে জোরালো যুক্তিও আছে। আজ পর্যন্ত অনেক খুঁজেছে লোকে, কিন্তু একটা শহরের হদিসও পায়নি। আমার কথা যদি বলি, আমি সবসময় বিশ্বাস করেছি এবং আজও করি, এই গল্প বানোয়াট না। বানোয়াট হলে যুগের পর যুগ ধরে এই গল্প লোকমুখে ফিরত না।

'কয়েক মাস আগের কথা। শুনলাম অনেক দূর থেকে আমাদের এলাকায় হাজির হয়েছে এক আজব ইণ্ডিয়ান ডাক্তার। আপাতত ঘাঁটি গেড়েছে কাছের এক জঙ্গলে। সঙ্গে ওর মেয়েও আছে। কিন্তু ঠিক কোথায় থাকে জানতাম না তখন। জানার চেষ্টাও করিনি। যা-

হোক, এই জমিদারি আমার; প্রজাদের দেখভাল, রাস্তাঘাট বানানো এসব কাজে খরচপাতি আছে, তাই ওদের কাছ থেকে কর আদায় করতে হয় আমাকে। প্রায় আট সপ্তাহ আগে এক ইণ্ডিয়ান যাচ্ছিল এই এলাকা দিয়ে। ওকে ধরে কর চাইল আমার লোকেরা। একটুকরো খাঁটি সোনা দিয়ে তা পরিশোধ করল লোকটা। মোহরটা অদ্ভুত—গায়ে একটা হৃৎপিণ্ডের চিহ্ন খোদাই-করা।

'হয়তো জানা নেই আপনাদের তাই বলছি। হৃদপিণ্ডের ওই বিশেষ চিহ্নটা এই অঞ্চলের ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে গোপন আর পবিত্র একটা প্রতীক। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই চিহ্ন ধারণ করছে ওরা। ওদের পুরনো অনেক বাসাবাড়িতে, এমনকী ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন স্থাপনার দেয়ালেও এই চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু এই চিহ্নের মানে কী তা সম্ভবত ওদের নেতাই ভালো জানে।

'কাজেই ওই বিশেষ চিহ্নযুক্ত মোহরটা যখন দেখলাম, ইণ্ডিয়ানটাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কোত্থেকে পেলে এটা?"

'ব্যাটা তখন আমার ভয়ে অস্থির। কাজেই আমি প্রশ্ন করামাত্র বলল, "ওই বুড়ো ইণ্ডিয়ান ডাক্তার দিয়েছে।"

'"তোমাকে এই জিনিস দিতে গেল কেন সে?"

'"ওর কাছে কিছু খাবার বিক্রি করেছি আমি। মূল্য বাবদ দিয়েছে।"

'জানতে চাইলাম, "কোথায় পাওয়া যাবে বুড়োকে?"

'এ-প্রশ্নের জবাব দিতেও দেরি করল না লোকটা।

'কিন্তু শয়তানটার মনে ছিল দুরভিসন্ধি। আমাকে ভুল জায়গার কথা বলে ধোঁকা দিতে চেয়েছিল সে। সে যে-জায়গার কথা বলেছিল সেখানে গিয়ে বোকা বনতে হলো। তবে আমার নামও ডন পেদ্রো। বনের পাখিকে ধরে কীভাবে খাঁচায় বন্দি করতে হয় তা ভালোই জানি আমি। আরও কিছু খোঁজখবর করে নিশ্ছিদ্র এক ফাঁদ পাতলাম তখন। সে-ফাঁদে শুধু ওই বুড়ো ডাক্তারই না, ওর সুন্দরীশ্রেষ্ঠা মেয়েটাও ধরা পড়ল।

'ফাঁদ?' জিজ্ঞেস না-করে পারলেন না সিনর। 'কীসের ফাঁদ?'

'সহজ কিন্তু কার্যকরী ফাঁদ। ওই যে বললাম কিছু খোঁজখবর করতে হয়েছিল আমাকে। এমন এক লোকের সন্ধান পেলাম যার পরিচিত এক লোক ওই বুড়োর কাছে গিয়ে ওষুধ আনে নিয়মিত। গিয়ে ধরলাম ওই লোককে। ভয়ভীতি দেখালাম। কিন্তু কিছুতেই কাজ হলো না। হারামজাদাটা বুড়োর ঠিকানা বলবেই না। শেষে বাধ্য হয়ে আমার পরিচিত ওই লোককে বললাম চোরের মতো নজর রাখতে। বেশ কিছুদিন কেটে গেল। তারপর একদিন আবার ওষুধ আনার জন্য বুড়োর আস্তানার দিকে রওনা দিল ওর একনিষ্ঠ ওই ভক্ত। আমার লোক তখন আঠার মতো লেগে আছে ওর পিছনে। এবার ঠিকই চিনে নিল সে। আমাকে এসে বলার পর বললাম, ওখানে ইণ্ডিয়ানদের শক্ত ঘাঁটি থাকতে পারে। কাজেই দলবলসহ হামলা করে বুড়োকে ধরে আনতে গেলে উল্টো বিপদের মধ্যে পড়ে যেতে পারি।

'কী করা যায়? বুদ্ধি বের করতে সময় লাগল না। দেখলে গোবেচারা মনে হয় এ-রকম একজনকে পাঠিয়ে দিলাম বুড়োর আস্তানায়। গিয়ে বলল সে, ওর ছেলের নাকি খুব অসুখ, মুমূর্ষু অবস্থা। বুড়োর হাতেপায়ে ধরে কান্নাকাটি শুরু করল। মন গলল বুড়োর। মেয়েকে নিয়ে বের হয়ে এল আস্তানা ছেড়ে। হাঁটতে হাঁটতে সোজা এসে ঢুকে পড়ল এই বাড়িতে। কারণ আমিই সেই মুমূর্ষু ছেলে কি না!' বলা শেষ করে আরও কয়েক ঢোক বার্গাণ্ডি গিলল ডন পেদ্রো। নীরবে হাসল কিছুক্ষণ।

'যে-রাতে ধরা পড়ল বাপ-বেটি সে-রাতে ঠিক এভাবেই হেসেছিলাম,' আবার বলতে লাগল সে, 'কিন্তু ওদের চেহারার দিকে তাকানোমাত্র আমার হাসি থেমে যায়। বুড়ো যেন সাধারণ কোনো ডাক্তার না। যেন...কোনো রাজা। আর ওর মেয়ে ঠিক রাজকুমারী! এই এলাকার ইণ্ডিয়ানদের চেহারানকশা, গায়ের রঙ যেমন হয় ওদের তেমন না। পরনের কাপড়ও আজব কিসিমের। লিনিনের

উপর সবুজ পালক দিয়ে বানানো কম্বল জাতীয় কিছু একটা পরে আছে আলখাল্লার মতো করে।

'বুড়ো যখন বুঝতে পারল খাঁচায় আটকা পড়েছে, জিজ্ঞেস করল, "এসবের মানে কী? কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে আমাদেরকে?"

'খেয়াল করলাম মায়া ভাষায় কথা বলছে সে। ভাষাটা ভালোই বুঝি আমি, বলতেও পারি। বললাম, "আমার অতিথি হয়ে এই বাড়িতে কিছুদিন থাকতে হবে আপনাদেরকে।"

'বুড়ো তখন কী রাগটাই না দেখাল! বুড়ো না-হয়ে যদি জওয়ান হতো সে তা হলে না জানি কী করত আমাকে! জঘন্য সব অভিশাপ দিতে লাগল এই বাড়ির প্রত্যেক বাসিন্দাকে। বিশেষ করে যে-লোক ওকে ধোঁকা দিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে তো পারলে খেয়ে ফেলে আর কী। ওর অভিশাপ শুনে আমার চুল দাঁড়িয়ে যায় এমন অবস্থা। আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার যে-লোক বুড়োকে ধোঁকা দিয়েছে, এই ঘটনার দু'দিনের মাথায় হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে মারা গেল সে। আমার সঙ্গে আরেকটা লোক ছিল, সে ভয়ের চোটে কোথায় যে পালিয়েছে আজ পর্যন্ত জানতে পারিনি।

'সুতরাং এখন শুধু আমিই জানি কোথায় বন্দি করে রেখেছি বাপ-বেটিকে। অবশ্য আজ রাতে হোসেকে নিয়ে যাবো ওখানে, পরিচয় করিয়ে দেবো ওদের সঙ্গে। আগেও বলেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই মেয়েটা আছে ওর বাপের সঙ্গে ততক্ষণ আমার লোকদের কাউকে বিশ্বাস করি না। এমনকী কোনো ইণ্ডিয়ান ওদের ধারেকাছে যাক তা-ও চাই না।

'যা-হোক, মানুষ রাগলে একসময়-না-একসময় শান্ত হয়ই। বুড়োর রাগও পড়ল। ততক্ষণে ওদেরকে নিয়ে গিয়ে জায়গামতো বন্দি করা হয়েছে। আমাকে জিজ্ঞেস করল সে, "কেন এনেছ আমাদেরকে এখানে?"

'জবাবে বললাম, "হৃৎপিণ্ডের চিহ্ন খোদাই-করা ওই মোহরগুলো

কোত্থেকে পেলেন আপনি জানতে চাই।"

'বুড়ো বলল, "এ-রকম কোনো মোহরের ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি। তোমার ভুল হচ্ছে।"

'আমি নিশ্চিত মিথ্যা বলছে বুড়ো। তখন ঘি তোলার জন্য আঙুল আবার বাঁকা করতে হলো আমাকে। যে-ঘরে নিয়ে গিয়ে বন্দি করেছি ওদেরকে সেখানে আগেরদিনে বিপথগামী সন্ন্যাসীদেরকে আটকে রাখা হতো। সেটার উপরে এক কুঠুরি আছে। এ-রকম কুঠুরি এই বাড়িতে অনেক আছে। কুঠুরিগুলো একজন মানুষের লুকিয়ে থাকার জন্য যথেষ্ট বড়। সেগুলোতে আসা-যাওয়ার জন্য সরু প্যাসেজও আছে। কেউ যদি সেখানে লুকিয়ে থাকে তা হলে নীচের ঘরে কী হচ্ছে দেখতে পাবে, কে কী বলছে শুনতে পাবে।

'তো, এ-রকম এক কুঠুরিতে ঢুকে পড়লাম। পায়ের উপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে ইঁদুর, পরোয়া করছি না। কারণ বাপ-বেটি কী বলে শুনতে হবে। কথায় বলে, কষ্টের ফল মিষ্টি হয়। ওদের কথোপকথনের বেশিরভাগ অংশই শুনতে পাইনি আমি। আবার যতটুকু শুনেছি তার সবটা বুঝতেও পারিনি। একসময় একটু জোরালো হলো মেয়েটার গলা। তখন শুনি সে বলছে, "বাবা, দেয়ালের এই ক্রুসিফিক্সটা দেখো! সোনা দিয়ে বানানো। তারমানে এখানেও সোনার ব্যবহার আছে।'

'"না, মা। ওটা সোনা দিয়ে বানানো না। সোনার মতো করে গিলটি করা। আমাদের ওখানে এসবের চল নেই। কারণ গিলটি করার দরকার নেই। তবে হ্রদের তীরে যারা পাখি শিকার করে তারা বল্লম বা তীর বানানোর সময় গিলটি করে।"

'"বাবা, ডাকাতের মতো দেখতে ওই লোকটা শেষপর্যন্ত কী করবে আমাদেরকে?"

'"সেটাই তো ভাবছি, মা। লোকটার চেহারা যেমন নিষ্ঠুর, দুই চোখ তেমন ধূর্ত। আমাদের দেশের সব মন্দিরের কথা বাদ দিলাম,

মাত্র একটা মন্দিরে যত সোনার-মোহর আছে তা দিয়ে এই ঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত পাঁচবার ভরে ফেলা যাবে; এ-রকম কোনো মন্দির যদি কখনও দেখতে পেত জানোয়ারটা তা হলে না জানি কী করত!"

'"আমার মনে হয় কোনোরকম ঝুঁকি না-নিলেই ভালো হবে আমাদের জন্য। যত খুশি জিজ্ঞেসাবাদ করুক ওই লোক, আমরা যদি নিরুত্তর থাকি অথবা কিছু না-জানার ভান করি তা হলে পালানোর সুযোগ পেয়েও যেতে পারি।"' কথা শেষ করে হাতের বোতলটা আবারও মুখে উপুড় করল ডন পেদ্রো। অনেকখানি খাওয়ার পর ঝিম মেরে থাকল।

উসখুস করতে করতে একসময় মুখ ফস্কে জিজ্ঞেস করেই ফেললেন সিনর, 'তারপর? যিব্যালবে কী বলল?'

'যিব্যালবে?' শব্দটা শোনামাত্র যেন ধাক্কা খেয়েছে ডন পেদ্রো, বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের দিকে।

'হ্যাঁ,' চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে সিনর বুঝতে পারছেন কত বড় ভুল করে ফেলেছেন তিনি। 'আপনিই তো বললেন বুড়ো লোকটার নাম যিব্যালবে।'

'না! আমি একবারও উচ্চারণ করিনি নামটা,' ডন পেদ্রোর কণ্ঠে স্পষ্ট সন্দেহ। ওর আচরণও বদলে গেছে হঠাৎ। 'তবে যা-ই হোক, মেয়ের কথা শুনে বুড়ো কিছু বলল না। পরদিন সকালে ঘরের দরজায় গিয়ে দেখি, পাখি পালিয়েছে। থাকলে জিজ্ঞেস করতাম, বুড়োর নাম আসলেই যিব্যালবে কি না। মনে হয় ইণ্ডিয়ানদের হাত করে কাজ সেরে ফেলেছে ধূর্ত বুড়ো।' বার্গাণ্ডির বোতলে আবারও চুমুক দিল সে।

'পালিয়েছে!' বিশ্বাস করতে পারছেন না সিনর। 'একটু আগে না বললেন আপনার ছেলেকে আজ রাতে নিয়ে যাবেন ওদের কাছে?'

'বলেছি নাকি? কী জানি, বলে থাকতেও পারি। আসলে ভুল হয়ে গেছে আমার। যেমন ভুল করেছেন আপনি বুড়োর নামটা

উচ্চারণ করে। হয়, এ-রকম হয় অনেক সময়। রার্গাণ্ডি তো সস্তা কোনো মদ না যে, বোতলের পর বোতল গিললাম অথচ কোনো নেশাই হলো না। বাদ দিন। আমার গল্প এখানেই শেষ। ...এবার কী করবেন? ঘরে ফিরে যাবেন? ঘুমাবেন? ঠিক আছে। তবে যাওয়ার আগে এক কাপ কফি খেয়ে যান।'

'না, ধন্যবাদ,' যথাসম্ভব বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন সিনর। 'আমি রাতে কফি খাই না। খেলে সারারাত ঘুম আসে না।'

'তারপরও বলছি আমাদের এই কফি খেয়ে দেখুন। এটা অন্য সব কফির মতো না। আমার নিজের বাগানের। নিজেরাই উৎপাদন করি। যেমন টাটকা তেমন সুঘ্রাণ। আজেবাজে কিছু না যে, খেলে রাতে ঘুম আসবে না। নিন।'

'দয়া করে সাধাসাধি করবেন না। এই জিনিস আমার জন্য বিষ। ভালো কথা, আপনার যে লোক এসব উৎপাদনের দায়িত্বে আছে তাঁর সাক্ষাৎ পেতে পারি?'

'অবশ্যই। ওর তত্ত্বাবধানেই তো আমার এখানে কফি আর কোকোর চাষ হচ্ছে। কী ভাবছেন বলুন তো? ওরা সবাই একেকটা গেঁয়ো ভূত? খারাপ লোক? ভুল, সিনর। ওরা আসলে খুবই ভালো। আমি যখন একটু-আধটু মদ গিলে দুর্বল হয়ে পড়ি তখন আমার দেখাশোনা করে ওরা। তখন মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হয় ওদেরকে। আর সে-টাকা যোগাড় করি ব্যবসা করে। আপনার কাছে লুকিয়ে কী লাভ, বলুন? এখানে পেটের দায়ে অনেক রকম ব্যবসাই করতে হয়। চাষবাস যত না-করি তারচয়ে বেশি করি চোরাকারবারি।'

'তা-ই নাকি?'

'জী, তা-ই। কিন্তু এখন অনেক কঠিন হয়ে গেছে ব্যবসাটা। লাভের পরিমাণও অনেক কমে গেছে। কাস্টম্‌স্‌-এর অফিসাররা আজকাল হাঙরের মতো আচরণ করে আমাদের সঙ্গে। ওদের মুখ বন্ধ রাখতে আর হাত নিষ্ক্রিয় রাখতে পানির মতো টাকা খরচ করতে

হয়। তারপর ছিটেফোঁটা যা পাই তা দিয়ে পেটেভাতে কোনোরকমে আছি আর কী। অথচ আগের দিনে না ছিল কাস্টম্‌স্‌, না ছিল তাদের লোকদেখানো তদারকি। ব্যবসায় লাভও ছিল প্রচুর। এখন তা তলানিতে এসে ঠেকেছে বলা যায়। আর সে-জন্যই মাঝেমধ্যে এদিকে-সেদিকে ঢুঁ মারতে হয়।'

'সেই ঢুঁ খেয়েই ওই দুই আমেরিকান মাতাল হয়নি তো?' সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের মুখ আবারও ফস্কে গেল। 'নিজেরা নিজেরা মারামারি করে মরেনি তো?'

শোনামাত্র পাল্টে গেল ডন পেদ্রোর চেহারা। এতক্ষণ যে-কপট মিশুকভাব ছিল ওর মধ্যে তা যেন ধুয়ে চলে গেল। রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে সে, দুই চোখ জ্বলছে।

'আমি ক্লান্ত, সিনর,' বলল সে, 'সম্ভবত আপনিও। কিছু মনে করবেন না, এখন একটা সিগার ধরাবো আমি। তারপর তা টানতে টানতে গিয়ে শুয়ে পড়বো আমার দোলনা-বিছানায়। ঘুমিয়ে যাবো। যদি ইচ্ছা করেন অন্যদের সঙ্গে গল্প করতে পারেন,' উঠে দাঁড়িয়ে বাউ করল, টলতে টলতে এগোচ্ছে।

ডন পেদ্রো চলে যাওয়ার পর লুইসাকে ডেকে পাঠানো হলো দোলনা-বিছানায় ধাক্কা দেয়ার জন্য। বিছানায় শুয়ে দোল না-খেলে ডন পেদ্রোর ঘুম আসে না। হোসে আর স্মিথসহ বাকিরা সবাই কমবেশি মাতাল হয়ে গেছে। স্মিথকে দেখি হোসের কানে কানে কী যেন বলছে। মনোযোগ দিয়ে কিছুক্ষণ শুনল হোসে, তারপর এগিয়ে গেল সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের দিকে। বলল, 'এসো সিনর, তাস খেলি।'

ধুরন্ধরটার মতলব বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না আমার। জুয়া খেলার ছলে জেনে নিতে চায় কী পরিমাণ টাকা আছে সিনরের সঙ্গে।

বলতে খারাপই লাগছে, ডন পেদ্রোর সঙ্গে কথা বলার সময় কমবেশি পান করছিলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। একটু একটু করতে করতেই সহ্যক্ষমতার বেশি হয়ে গেছে। নেশা পেয়ে বসেছে

তাঁকেও। ডন পেদ্রো চলে যাওয়ার পর থেকে ঝিম মেরে বসে আছেন। হোসের আমন্ত্রণ শুনে কিছুটা জড়ানো গলায় বললেন, 'না, ধন্যবাদ। এখন খেলবো না। মাথা কাজ করছে না। কাজ করলেও খেলতে পারতাম কি না সন্দেহ। তোমার মতো আমার বেশিরভাগ টাকাও নৌকাডুবির সময় খোয়া গেছে।'

শুনে চেহারা কালো হয়ে গেল ডন হোসের। বলল, 'না, আমার মনে হয় নৌকাডুবির সময় না, আমাদের এখানে আসার আগে যখন ঘুমিয়েছিলে তখন কেউ চুরি করেছে। পেটে একটা বেল্ট পরে ছিলে তুমি, নিজের চোখে দেখেছি সেখান থেকে সোনার মোহর বের করে ওই নাবিকদেরকে দিয়েছ। যা-হোক, আমি ভদ্রলোক, ভদ্রতার খাতিরেই জোরাজুরি করবো না তোমাকে। অন্যরা খেলুক, এসো আমরা দু'জনে মিলে গল্প করি।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলেন সিনর। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়ালেন ডাইনিং-টেবিল ছেড়ে। নিজের উপর জোর খাটিয়ে এগোলেন ঘরের আরেকপ্রান্তের একটা ছোট টেবিলের দিকে। আমি যে-টেবিলে বসে আছি তার থেকে খুব বেশি দূরে না টেবিলটা। সেটার সঙ্গে চেয়ারও আছে।

সিনর আসন গ্রহণ করার পর একজন ইণ্ডিয়ান চাকর এগিয়ে গেল তাঁদের দিকে। ওর উদ্দেশ্যে বিশেষ ইঙ্গিত করল হোসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হয়ে গেল মদের নতুন বোতল আর সিগারের আনকোরা বাক্স।

চুপ করে বসে আছেন সিনর। মদও খাচ্ছেন না, সিগারের বাক্সেও হাত দিচ্ছেন না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে জুয়ারিদের খেলা দেখছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে তিনি আসলে কিছুই দেখছেন না। সম্ভবত ডুবে আছেন নিজের চিন্তায়। জুয়ারিরা এটা-সেটা নিয়ে কথা বলছে, কখনও কখনও দূর থেকে একটু-আধটু মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে আবার চুপ হয়ে যাচ্ছেন সিনর।

সময় যত যাচ্ছে জুয়ারিদের আলোচনা তত জঘন্য হচ্ছে।

খেলার ফাঁকে ফাঁকে সবাই গর্ব করছে নিজেদের নিয়ে। কে কবে কোন্ কুকীর্তি করেছিল তার অতিরঞ্জিত বর্ণনা দিয়ে বাহ্বা কুড়ানোর চেষ্টা করছে। জনৈক ইণ্ডিয়ানকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে কীভাবে অত্যাচার করেছিল তার লোমহর্ষক বর্ণনা দিল একজন। ঈর্ষার বশবর্তী হয়ে জনৈকা রমণীকে ধর্ষণের পর কীভাবে হত্যা করেছে সে-বর্ণনা দিল আরেকজন। তৃতীয় আরেকজন মুখ খুলল তখন। বলল, যাত্রীবাহী একটা কোচ যাচ্ছিল কোনো এক পাহাড়ি পথ ধরে। দলবলসহ হামলা করে ওই কোচ থামায় সে। যাত্রীদের সর্বস্ব লুটে নেয়ার পর চালকসহ সবার গলা কাটে। তারপর লাশগুলো একে একে ছুঁড়ে ফেলে দেয় পাহাড়ের উপর থেকে।

সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের দিকে তাকালাম। কখন যেন মদের বোতলের ছিপিটা খুলেছেন তিনি। একটা গ্লাসে ঢেলে নিয়ে একটু একটু করে পান করছেন। উচিত হচ্ছে না কাজটা, বুঝতে পারছি, কিন্তু বাধাও দিতে পারছি না। একজন ইণ্ডিয়ান হয়ে এত লোকের সামনে সিনরকে নীতিবাক্য শোনালে ডন হোসে আর ওর সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে সিনরের মর্যাদা শেষ হয়ে যাবে। এদিকে মনে শান্তিও পাচ্ছি না। টের পাচ্ছি মদের নেশায় খারাপ কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারেন সিনর।

এমন সময় ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশে আমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলে উঠল স্মিথ নামের আমেরিকানটা। অন্যমনস্ক থাকায় প্রথমে খেয়াল করিনি, কিন্তু পরে যখন বুঝলাম আমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে সে তখন চমকে উঠলাম।

স্মিথ বলছে, 'ওই ইণ্ডিয়ান বদমাসটাকে দেখো, বন্ধুরা। তুর্কি মোরগের মতো দেমাগে মাটিতে যেন পা পড়ে না। কোথায় আমাদের একটু দেখভাল করবে, তা না-করে রাজা-বাদশার মতো ভাব ধরে সেই তখন থেকে এককোনায় বসে আছে।' মেক্সি বাউ করল সে আমাকে। 'আসুন, আসুন, রাজা মহাশয়, আমাদের সঙ্গে দু'ঢোক পান করে যান।'

'ধন্যবাদ, সিনর,' রাগে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে আমার, জোর করে শান্ত রেখেছি নিজেকে। 'যতটুকু পান করার দরকার করেছি।'

'তা হলে, হে মহান রাজা, একটা সিগার টানুন। আসুন।'

'ধন্যবাদ, সিনর। ধূমপানের তেমন অভ্যাস নেই আমার। তা ছাড়া ডিনারের পর ধোঁয়া টানি না আমি।'

চু চু জাতীয় শব্দ করল স্মিথ। 'মেক্সিকোর সব ইণ্ডিয়ানের মহান সর্দার, রাজাদের রাজা, বাদশাহদের বাদশাহ মদও খাবেন না, সিগারও টানবেন না। আসলে আমারই বুঝতে ভুল হয়েছে। রাজারা তো কষ্ট করে খান না। তাঁদেরকে খাইয়ে দিতে হয়। এই যেমন আমি এখন ধোঁয়া খাওয়াবো ইণ্ডিয়ানদের সর্দারকে,' বলে শুকনো তামাকপাতা আর সিগারেট-পেপার দিয়ে একটা প্লেট পূর্ণ করল সে। তারপর আগুন লাগিয়ে দিল। যেন মহাপবিত্র কোনো কিছু নিয়ে আসছে এমন ভঙ্গিতে প্লেটটা এনে রাখল আমি যে-টেবিলে বসে আছি তার উপর।

তামাকপোড়া ধোঁয়া আমার সামনে দিয়ে উঠছে, ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মাথার চারপাশে।

'বাহ্ কী সুন্দর!' নিজের কীর্তিতে নিজেই হাততালি দিল স্মিথ। 'এবার মহান সর্দারকে সত্যিকারের দেবতার মতো দেখাচ্ছে। হোসে, আমি বলি কী, এত বড় একজন দেবতার উদ্দেশ্যে কিছু বলি না-দিলে খারাপ দেখায় না? গত সপ্তাহে একটা মেয়ে না পালিয়ে গিয়েছিল এই বাড়ি থেকে? পরে কুকুর লাগিয়ে ওকে পাকড়াও করা হয়...'

'না, না, কমরেড,' বাধা দেয়ার চেষ্টা করল হোসে, 'আজ রাতে ঠাট্টা-মশকরা বাদ দাও। ভুলে যাচ্ছ আমাদের সঙ্গে একজন ভিনদেশী অতিথি আছে। তবে এই শয়তানের বাচ্চা ইণ্ডিয়ানটাকে এত সহজে ছাড়বো না আমি। সাণ্টা মারিয়ায় আমাকে আর আমার বাবা-মাকে সবার সামনে অপমান করেছে সে।'

'ছি ছি, হোসে,' মাথা নাড়ছে স্মিথ, 'তোমার বাবা-মাকে

অপমান করেছে অথচ একজন ভিনদেশীর দোহাই দিয়ে ওকে এখনও কিছু বলছ না? তোমার জায়গায় আমি থাকলে গুলি করতে করতে ওর শরীরে হাজারটা ফুটো বানিয়ে দিতাম।'

'আমিও তা-ই চাই,' দাঁতে দাঁত পিষে বলল হোসে, স্মিথের উস্কানিতে মেজাজ প্রচণ্ড খারাপ হয়ে গেছে ওর। 'কত বড় সাহস! আমাকে অপমান করে? ভয় দেখায়? কালো কুত্তা কোথাকার, দেখাচ্ছি মজা!' বলতে বলতে বিশাল এক ছুরি বের করল সে, কোপ মারল আমাকে লক্ষ্য করে। আমার নাকের এক ইঞ্চি দূর দিয়ে চলে গেল ধারালো চকচকে ছুরির ফলা।

যেভাবে বসে ছিলাম সেভাবেই বসে থাকলাম। একচুল নড়িনি, এমনকী আমার চোখের পাতাও পড়েনি। জানি আমার চেহারায় ভয়ের কোনো চিহ্ন যদি ফুটে ওঠে তা হলে ঠিক ঠিকই আমাকে আঘাত করবে হোসে। শান্ত গলায় বললাম, 'বুঝতে পারছি আমার সঙ্গে মজা করছেন আপনি, সিনর। কিন্তু সমস্যা হলো, আপনার তামাশা...কী বলবো...অমার্জিত হয়ে যাচ্ছে। তবে আমি কিছু মনে করিনি। কারণ আমি জানি, আপনারা ভদ্রলোক। আর ভদ্রলোকেরা কখনও তাদের অতিথিদের ক্ষতি করে না। কিন্তু খুনিরা করে। সিনর ডন হোসে মোরেনো, আপনি নিশ্চয়ই সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, খুনি না?'

'জবাই করে ফেলো শুয়োরটাকে, হোসে,' হিসহিস করে বলল স্মিথ। 'তোমাকে আবারও অপমান করছে সে। এখন যদি না-করো কাজটা তা হলে পরে ভুগতে হবে তোমাকে।'

পরামর্শটা হোসের মনে ধরেছে সম্ভবত। ছুরি বাগিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে সে। এমন সময় একলাফে উঠে দাঁড়ালেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। আরেক লাফে এসে পড়লেন আমার আর হোসের মাঝখানে। বললেন, 'আরে কী শুরু করলে বলো তো? ঠাট্টা ঠাট্টাই। সামান্য মনোমালিন্য থেকে খুনখারাপির দিকে যাওয়ার মতো ছেলেমানুষি কেন করতে চাও? নাকি এ-ই তোমাদের রীতি?' বলতে

বলতে পেশীবহুল দু'হাত দিয়ে ধরলেন হোসের দু'কাঁধ, সজোরে ধাক্কা দিয়ে একপাক ঘুরিয়ে দিলেন ওকে। পরের ধাক্কায় প্রায় উড়ে গিয়ে বড় টেবিলটার এককোনায় বাড়ি খেল হোসের উরু। তাল সামলাতে না-পেরে উল্টে গিয়ে প্রথমে টেবিলের উপর, তারপর টেবিল থেকে মেঝেতে পড়ল হোসে। জঘন্য সব অভিশাপ আর গাল দিতে দিতে উঠে দাঁড়াল।

চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভেঙেছে অথবা নেশা কেটেছে ডন পেদ্রোর। এতক্ষণ দোলনা-বিছানায় শুয়ে থেকে চুপ করে দেখছিল সে কোথাকার জল কোথায় যায়। এবার হঠাৎ করেই বলে উঠল, 'থামো, হোসে! যত যা-ই হোক, মনে রেখো ওই ভিনদেশী আর ওর ইণ্ডিয়ান বন্ধু আমাদের অতিথি। কাজেই ঝগড়া বন্ধ করো। ওদেরকে ওদের ঘরে যেতে দাও। ঘুমানোর সময় হয়েছে। তা ছাড়া ওদেরও বিশ্রামের দরকার আছে। কোনো সমস্যা থাকলে আগামীকাল আলোচনা করা যাবে।'

'চলো, ইগনাশিয়ো,' বললেন সিনর। তারপর হোসে আর ওর চ্যালাচামুণ্ডাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়েরা, প্রার্থনা করি রাতে ভালো ঘুম হবে আপনাদের।' ডাইনিং-হলের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। পিছন পিছন আমি।

দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে তাকালাম আমি। ঘরের সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে মাতলামি কেটে গেছে সবার। বড় রকমের কোনো এক শয়তানি মতলব যেন ফুটে আছে প্রত্যেকের চেহারায়। হোসের কানে কানে আবারও কী যেন বলছে স্মিথ। ভয়ালদর্শী ছুরিটা এখনও হোসের হাতে। ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় আসামির দিকে যেভাবে তাকিয়ে থাকে জনতা, হোসের বাকি সাঙ্গপাঙ্গরা সেভাবে দেখছে আমাদেরকে।

দোলনা-বিছানায় উঠে বসেছে ডন পেদ্রো। ঘুমে-মাখা (বলা ভালো নেশায় ভরা) দুই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আমাদের

দিকে। বিছানা ধরে দাঁড়িয়ে আছে লুইসা, ধাক্কা দেয়ার কথা মনে নেই। আমাদেরকে দেখছে মেয়েটাও। ওর দৃষ্টি বলে দিচ্ছে যেন আমাদেরকে না, আমাদের লাশ দেখছে। দরজা দিয়ে বের হওয়ার আগে একমুহূর্তের মধ্যে এসব খেয়াল করলাম আমি। কেঁপে উঠলাম আশঙ্কায়—অশুভ কিন্তু অবশ্যম্ভাবী কোনোকিছু অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

ডন পেদ্রোর বাড়ির "অতিথিকক্ষে" ফিরে এলাম আমরা।

দরজাটা আটকে দিয়েছি ভালোমতো। ওয়াশস্ট্যাণ্ডের উপর রাখা আছে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি; স্ট্যাণ্ডটার কাছেই বসে আছে মোলাস। কেন যেন দু'হাতে চেহারা ঢেকে রেখেছে সে।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস না-করে পারলেন না সিনর। 'তোমাকে কি খেতে দেয়নি? এই অবস্থা কেন তোমার?'

'ওই মেয়েটা, লুইসা, খাবার এনেছিল আমার জন্য,' ফিসফিস করে জবাব দিল মোলাস, যেন জোরে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। 'লর্ড এবং সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড, দয়া করে দু'জনই আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। আমাদের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ওরা আজ রাতেই আমাদেরকে খুন করার পরিকল্পনা এঁটেছে। এই ব্যাপারে লুইসা পুরোপুরি নিশ্চিত। স্মিথের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিল ডন পেদ্রো, লুকিয়ে থেকে ওদের কিছু কথা শুনে ফেলেছে মেয়েটা। পেদ্রোর এক চ্যালা নাকি বাগানে গিয়ে কোদালও নিয়ে এসেছে। এই ঘরের সঙ্গে গোপন কুঠুরি আছে, সেখানে নাকি আমাদের জন্য কবর খোঁড়া হবে।'

শুনে দমে গেল মন। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে মাত্র কয়েক ফুট নীচের মাটিতে কয়েক ঘণ্টা পরই মৃত অবস্থায় শুয়ে পড়তে হবে চিরজীবনের জন্য? ভাবতেই খারাপ লাগছে। ওই খুনিগুলো যদি সত্যিই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে শেষ করে দেবে আমাদেরকে তা হলে বিনা-দ্বিধায় বলা যায় আমাদের ভাগ্য নির্দিষ্ট

হয়ে গেছে। নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য ছুরি ছাড়া আর কিছু নেই আমাদের সঙ্গে। সঙ্গে পিস্তল আছে, কিন্তু সেগুলো কোনো কাজে দেবে বলে মনে হয় না। যে-ফ্ল্যাস্কে বারুদ রেখেছিলাম, নৌকাডুবির সময় তার ভিতরে পানি ঢুকে গেছে। ফলে প্রায় অকেজো হয়ে গেছে সব বারুদ।

'এখানে আসাটা উচিত হয়নি আমাদের,' হতাশ গলায় বললাম আমি। 'এখনই পালাতে না-পারলে নিজেদের জীবন দিয়ে এই বোকামির মাশুল দিতে হবে।'

'ভেঙে পড়বেন না, লর্ড,' সাহস দিল মোলাস। 'কারণ এখনও সব কথা বলিনি। লুইসা একটা উপায় বাতলে দিয়ে গেছে। আমার মনে হয় ওই পদ্ধতি অবলম্বন করলে অন্তত আজ রাতের জন্য বাঁচতে পারবো আমরা। এখানে আসুন,' বলে উঠে দাঁড়াল সে, অধ্যক্ষ মহাশয়ের ছবির ঠিক উল্টোদিকের দেয়ালের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেঝেতে। দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

না, বিশেষ কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। মোমবাতির অনুজ্জ্বল আলোয় দেয়ালের উপর ছায়া পড়েছে আমাদের তিনজনের। এ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মোলাস। বিশেষ একটা জায়গায় হাতটা রাখল। তারপর চাপ দিল ভিতরের দিকে।

আশ্চর্য! ভিতরের দিকে সরে গেছে দেয়ালের কিছুটা!

কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম আসল ব্যাপার কী। দেয়ালটা ইটের। কিন্তু মেঝের কাছে বিশেষ ওই জায়গায় মেঝে থেকে তিন ফুট উঁচু পর্যন্ত ইচ্ছা করেই ইট গাঁথা হয়নি। সে-জায়গায় আংটার সাহায্যে কায়দা করে বসিয়ে দেয়া হয়েছে পুরু সিডারউড কাঠের একটা প্যানেল। তারপর দেয়ালের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে এমনভাবে রঙ করা হয়েছে যে, যারা জানে না তারা দেখলে ভাববে পুরোটাই দেয়াল। এত কার্যকরী একটা চালাকি কত সহজেই ঢেকে

দেয়া হয়েছে শুধু রঙের কারসাজিতে!

মোলাসকে জিজ্ঞেস করলাম, 'নর্দমার ভিতরে ইঁদুর যেভাবে গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে থাকে, এই গর্তের ভিতরে সেভাবে লুকিয়ে থেকে কি বাঁচতে পারবো? তা ছাড়া ভিতরে আমাদের তিনজনের জায়গা হবে? আরও কথা আছে। গর্ত বা সুড়ঙ্গ যা-ই বলি না কেন, এটার কথা লুইসা যদি জেনে থাকে তা হলে ডন পেদ্রোও জানে। ঘরে আমাদেরকে না-পেলে প্রথমেই এই সুড়ঙ্গের ভিতরে খুঁজবে ওরা। তারপর টেনেহেঁচড়ে বের করে এনে জবাই করবে।'

'লুইসা জোর দিয়ে বলেছে এই সুড়ঙ্গের কথা সে ছাড়া আর কেউ জানে না, লর্ড। ঘটনাক্রমে এই সুড়ঙ্গটা আবিষ্কার করে ফেলেছে সে। মাস দু'-এক আগে এই ঘর ঝাড়ু দিচ্ছিল সে। অসাবধানতাবশত ঝাড়ুর ধাক্কা গিয়ে লাগে প্যানেলের গায়ে। তখন সরে যায় সেটা। কৌতূহলী হয়ে কারণ জানতে গিয়ে সুড়ঙ্গটা দেখতে পায় লুইসা। যা-হোক, এখনও এগারোটা বাজেনি; লুইসা বলেছে আমরা যদি মাঝরাত পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে পারি তা হলে বিপদের সম্ভাবনা কমবে। তারপর কোনো একটা ব্যবস্থা করতে পারবে সে।'

'ওর পরিকল্পনাটা কী?' জানতে চাইলাম।

'হ্যাঁ, একটা পরিকল্পনা আছে ওর, কিন্তু সেটা কতখানি কাজে লাগবে তা নিয়ে সংশয়ও আছে। ভেবে দেখুন, খুনিরা আমাদের ঘরে ঢুকে দেখল আমরা পালিয়েছি। তখন ভাববে, যে-কোনোভাবেই হোক উপায় করে নিতে পেরেছি আমরা। কিছুক্ষণ খুঁজবে। না-পেয়ে সকাল পর্যন্ত মুলতুবি করবে খোঁজাখুঁজি। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে আমাদের কাছে আসার চেষ্টা করবে লুইসা। গোপন পথ দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে আমাদের ঘরে। তারপর আমাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যাবে গির্জা পর্যন্ত। বাকিটা আমাদের হাতে। গির্জা থেকে যত দ্রুত সম্ভব পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকতে হবে আমাদেরকে।'

'ঘরে ঢোকার গোপন পথটা কোন্‌দিকে, মোলাস?'

'জানি না, লর্ড। আমাকে বলার সময় পায়নি লুইসা। কিন্তু ওর সন্দেহ ওই পথ দিয়েই ঘরের ভিতরে হাজির হবে খুনিরা। তবে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে সে। কয়েকদিন থেকে ওর মনে হচ্ছে, একটা লোক আর একটা মহিলাকে নাকি গির্জার আশপাশে কোথাও বন্দি করে রাখা হয়েছে। কিন্তু ওরা কারা জানে না লুইসা। ঠিক কোথায় আটকে রাখা হয়েছে ওদেরকে তা-ও জানে না। আমরা ইণ্ডিয়ানরা আবার কমবেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কারও কারও ভূতের-ভয় অনেক। এই বাড়িতে যেসব ইণ্ডিয়ান কাজ করে তারা বিশ্বাস করে গির্জাসংলগ্ন এলাকাটা ভূতুড়ে। তাই ভুলেও কেউ যায় না সেখানে। আর ডন পেদ্রো সম্ভবত সে-সুযোগটাই নিয়েছে। এখন লুইসার অনুমান যদি সত্য হয়ে থাকে তা হলে ওই লোক আর মহিলাটা, যিব্যালবে আর তাঁর মেয়ে ছাড়া অন্য কেউ না। যদি বেঁচে থাকেন আপনারা তা হলে ওদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

'মানে? "যদি বেঁচে থাকেন আপনারা" মানে কী?'

'আমার মনে হয় আগামীকাল সকাল পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবো না আমি।'

'কী বলছ এসব?' এবার জিজ্ঞেস করলেন সিনর।

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মোলাস। 'আমার খাবার নিয়ে এসেছিল লুইসা। খাওয়ার পর সামান্য মদ খাই আমি। তারপর মনে হয় ঘুমিয়ে পড়ি। যখন ঘুম ভাঙে তখন দেখি, মোমবাতিটা নিভে গেছে। পুরো ঘর অন্ধকার। ওয়াশস্ট্যাণ্ডের উপর বোতলটার পাশে আরেকটা মোমবাতি রেখেছিলাম, তাড়াহুড়ো করে সেটা খুঁজতে শুরু করি। আগুন জ্বালাবো, এমন সময় কিছু একটা, বিশেষ কিছু একটা আমার নজরে পড়ে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাই।

'কী দেখলাম জানেন? একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ঘরের এককোনায়। মানুষটা আর কেউ না, আমি নিজে। এখন যে-রকম কাপড় পরে আছি, পরনে ঠিক সে-রকম কাপড়। জোনাকির

আলোতে যেমন একটা আভা থাকে, আমার সেই প্রতিবিম্ব ঘিরে ঠিক সে-রকম একটা আভা। আমার চারপাশে যেন মৃদু আগুন জ্বলছে। চেহারাটা হয়ে গেছে মরা মানুষের চেহারার মতো। প্রতিবিম্বটা কিছু বলছে না, তারপরও তার ডাক যেন শুনতে পাচ্ছি।

'ভয়ে আমি তখন ঘেমে গেছি। আমার কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছে। বার বার জ্বালাতে চেষ্টা করছি মোমবাতিটা, বার বার ব্যর্থ হচ্ছি। শেষপর্যন্ত জ্বলে উঠল সেটা। উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ল। নিজের প্রতিবিম্ব বা ছায়া যা-ই বলি না কেন সেটা যে-জায়গায় দেখেছি, মোমবাতিটা মাথার উপর উঁচু করে ধরে এগিয়ে গেলাম সে-জায়গার দিকে। গিয়ে দেখি, কিছুই নেই।'

ঠোঁট বাঁকা করে হাসলেন সিনর। 'তোমার গল্প শেষ? এবার তা হলে আমি বলি। সম্ভবত পচাবাসি খাবার দেয়া হয়েছিল তোমাকে, সেগুলো খেয়ে বদহজম হয়েছে তোমার। মদটাও মনে হয় ভালো ছিল না। নিজেই স্বীকার করেছ ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আমার মনে হয় আসলে ঘুম থেকে জাগোনি তুমি। যা যা বললে তার সব স্বপ্নে দেখেছ। তবে যা-ই হোক, এত তাড়াতাড়ি ওই বাজে স্বপ্নের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তোমাকে অভিনন্দন!'

'ঠাট্টা করা খুব সহজ, সিনর,' বলল মোলাস, 'কিন্তু আমি যা দেখেছি ঠিকই দেখেছি। এবং আমি জানি সেটা আমার মৃত্যুর আলামত। যা হওয়ার হবে। আমার বয়স কম, কিন্তু মরতে ভয় পাই না। যে ক'দিন বাঁচার দরকার ছিল, বেঁচেছি। এবার একটাই প্রার্থনা, ঈশ্বর যেন আমার পাপ ক্ষমা করেন, আমাকে স্বর্গে ঠাঁই দেন।'

আমি আর সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড মিলে ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু লাভ হলো না; ওর সেই এক কথা: মরণ ঘনিয়েছে ওর, আগামীকাল সকালেই চিরবিদায় নিতে হবে ওকে। শেষে বিরক্ত হয়ে এ-ব্যাপারে কথা বলা বন্ধ করলাম আমরা।

মাঝরাতের কয়েক মিনিট আগে মোমবাতি নিভিয়ে দিলাম। মেঝের সেই কাঠের প্যানেল সরিয়ে একজন একজন করে ঢুকে

পড়লাম ওই সুড়ঙ্গে। ভালোমতো আটকে দিলাম প্যানেলটা।

এই সুড়ঙ্গ আসলে অনেকটা ডানজনের মতো। ভিতরে আলকাতরার মতো কালো অন্ধকার। সময় যত যাচ্ছে, ভয় তত চেপে বসছে মনের উপর। মোলাসের মতো বার বার মনে হচ্ছে আজ রাতই জীবনের শেষ রাত। নৌকাডুবির সময় কিছুটা হলেও আশা ছিল মনে, যেভাবেই হোক ঈশ্বর বাঁচাবেন আমাদেরকে। এখন তা-ও নেই।

এখানে নীরবতাও অখণ্ড। মাঝেমধ্যে অদ্ভুত কিছু আওয়াজ পাচ্ছি, তাতে নৈঃশব্দ্য আরও বাড়ছে মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পর ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। কখনও আবার শুনতে পাচ্ছি পাখির ডানা ঝাপ্টানোর মতো আওয়াজ। যখনই এ-রকম কোনো শব্দ পাচ্ছি, ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে যাচ্ছে মেরুদণ্ড বেয়ে। একমনে প্রার্থনা করতে করতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।

ঘুমে চোখ ঢুলু ঢুলু করছে কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত আতঙ্কের কারণে ঘুমাতে পারছি না। মনে হচ্ছে ঘুমালে আর কখনও ভাঙবে না সে-ঘুম। ডানজনের দেয়ালগুলো যেন প্রাণ পেয়ে চোখের সামনে নাচছে; অনেক আগে মারা-যাওয়া লোকদের চেহারা দেখতে পাচ্ছি কখনও কখনও, আবার কখনও যেন শুনতে পাচ্ছি কে বা কারা ফিসফিস করছে নিজেদের মধ্যে।

তারপর হঠাৎ, জানি না কীভাবে, অদ্ভুত এক দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে।

আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি ওই ঘরে। যে-অধ্যক্ষের ছবি আঁকা আছে দেয়ালে, তিনিও দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে। কিন্তু আমার উপস্থিতি টের পাচ্ছেন না তিনি। নিষ্ঠুর উল্লাস ফুটে আছে তাঁর চেহারায়। মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে কেউ, শুনে আরও বাড়ছে তাঁর আনন্দ। মুমূর্ষু লোকটা বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করছে তাঁর কাছে। তখন আরও বাড়ানো হচ্ছে ওর শাস্তির পরিমাণ...

দৃশ্যটা বদলে গেল এমন সময়। ঘরের ভিতরে এখন পাশাপাশি

দুটো খাট। তাতে শুয়ে আছে দুই তরতাজা আমেরিকান যুবক। যদিও তরতাজা, কিন্তু আমি জানি আসলে ওরা মৃত। খুন করা হয়েছে ওদেরকে। ওদের ছোপ ছোপ রক্ত লেগে আছে মেঝেতে, বিছানার চাদরে। ডন পেদ্রো, ডন হোসে, স্মিথ এবং আরও কয়েকজন ছায়ার মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে ঘরের ভিতরে। স্মিথকে দেখাচ্ছে সাক্ষাৎ শয়তানের মতো। জবাই-করা দুই আমেরিকানকে হাতের ইশারায় দেখিয়ে কী যেন বলছে সে। শুনে খাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দু'-চারজন। সেখানে গিয়ে থামল ওরা। এবার লাশ দুটোর শরীর হাতড়াচ্ছে যাতে টাকাভর্তি ব্যাগ খুলে আনতে পারে...

কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে আমাকে। আমি নড়ছি, চোখ খুলতে চাচ্ছি কিন্তু পারছি না। যত সময় যাচ্ছে তত জোরে ধাক্কা দিচ্ছে লোকটা। যেন আমি চোখ না-খুললে অনেক বড় অসুবিধা হয়ে যাবে তার। কী দরকার, ঘুমের মধ্যেই ভাবলাম, চোখ খোলার দরকারটা কী? কিয়ামত হয়ে গেলে হয়ে যাক। আমার কী করার আছে? আমি কেন...

চোখ খুলতে-না-খুলতেই আমার মুখ চেপে ধরল কে যেন। মুহূর্তের মধ্যে সেই আতঙ্কটা আবার গ্রাস করল আমাকে। সারা শরীর অবশ হয়ে গেল।

'চুপ!' আমার কানের কাছে ফিসফিস করে ধমক দিল লোকটা, 'একদম চুপ! ঘরে এসে ঢুকেছে ওরা!'

সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড কথাটা না-বললেও পারতেন। এখন আমার সঙ্গে বোবার কোনো পার্থক্য নেই। চেষ্টা করলেও কথা বলতে পারবো কি না সন্দেহ!

হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতটা চেপে ধরলাম আমি।

নয়

লড়াই

খুব সাবধানে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে গিয়ে কান রাখলাম কাঠের প্যানেলে।

আবার সেই ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ। বিড়াল কোনো উঁচু জায়গা থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়লে যেমন ধপ্ করে আওয়াজ হয়, সে-রকম কিছু আওয়াজ শুনতে পেলাম তারপর। এরপর মেঝের সঙ্গে কোমল কোনোকিছুর ঘষা খাওয়ার আওয়াজ—সম্ভবত মোজা-পায়ে হাঁটছে কেউ। তারপর কিছুক্ষণ আর কোনো আওয়াজ নেই। অতি-উত্তেজনায় এই নৈঃশব্দ্য স্নায়ুর উপর এত বেশি চেপে বসল যে, একসময় ঠুন্ করে মৃদু একটা ধাতব-আওয়াজ হতেই চমকে উঠলাম। এরপর আর দেরি হলো না, নরম কোনোকিছুর উপর তরবারি আর ছুরি দিয়ে সমানে আঘাত করার শব্দ শুনতে পেলাম। অন্ধকারে বুঝতে পারেনি, গলা পর্যন্ত কম্বল টেনে আমরা শুয়ে আছি ভেবে "আমাদেরকে" সমানে কোপাচ্ছে খুনিরা। কিছুক্ষণ পর ফিসফিস করে কথাবার্তা বলতে লাগল ওরা, গাল দিয়ে উঠল দু'-একজন, তারপর শুনি ডন হোসে বলছে, 'কী করছ তোমরা? বিছানায় তো কেউ নেই!'

পরমুহূর্তেই কয়েকটা মোমবাতি জ্বলে উঠল। প্যানেলের গায়ে পীপহোলের মতো ছোট ছোট গর্ত আছে, সেগুলোতে চোখ রাখলাম আমরা। ঘরের ভিতরে কী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।

হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে ডন হোসে, ডন স্মিথ এবং

ওদের চার সাঙ্গপাঙ্গ। সবার হাতে ছুরি বা ভোজালি। আমাদের ঠিক উল্টোদিকের দেয়ালে ঝুলছে আশ্রমের এককালের অধ্যক্ষের ছবিটা, তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে ডন পেদ্রো। উঁচু করে ধরে আছে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি। মাছের মতো দুই চোখ দিয়ে অস্থিরদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ঘরের সবখানে।

'কোথায় গেল?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ওরা কি মানুষ না জাদুকর? ভেল্কিবাজি দেখিয়ে উধাও হয়ে গেল নাকি? জলদি খুঁজে বের করো ওদেরকে। এবং জবাই করো।'

ঘরের এদিকে-সেদিকে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল বাকিদের। কেউ খাট টেনে সরিয়ে দেখছে আড়ালে আমরা আছি কি না। কেউ উঁকি দিয়ে দেখছে দেয়ালে ঝুলন্ত ছবির পিছনে।

কিন্তু, স্বাভাবিকভাবেই, "আমাদেরকে" পাওয়া গেল না ঘরের ভিতরে। শেষপর্যন্ত হোসে বলল, 'নেই। যেভাবেই হোক খাঁচার দরজা খুলে পালিয়ে গেছে পাখি। ওই ইণ্ডিয়ানটা, ইগনাশিয়ো না কী যেন নাম, একটা জাদুকর। একটা পিশাচ। ওর সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হলো সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম ব্যাপারটা। আফসোস! তখনই কিছু একটা করে ফেলা উচিত ছিল আমার।'

'অসম্ভব!' চিৎকার করে উঠল ডন পেদ্রো, ক্রোধে-ভয়ে চেহারা সাদা হয়ে গেছে ওর। 'এই ঘর থেকে বের হওয়ার দরজায় সার্বক্ষণিক নজর রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম। বাড়ির সদর-দরজাতেও পাহারায় ছিল আমার লোক। মানুষ তো বাদই দিলাম, একটা ইঁদুর বের হলেও ওদের চোখে পড়ার কথা। ...খোঁজো! খুঁজতে শুরু করো! এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছে হারামিগুলো।'

'আমি পারবো না,' সাফ জানিয়ে দিল স্মিথ, রাগে বা বিরক্তিতে চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে ওর। 'বেশি দরকার মনে করলে আপনি খুঁজুন। ওরা এই ঘরে নেই। ওই ইংরেজটা এত বোকা না যে, আমাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই ঘরেই লুকিয়ে থাকবে। ছবির চালাকিটা মনে হয় বুঝে গেছে সে। তারপর ওই প্যাসেজ দিয়ে গিয়ে

এতক্ষণে হাজির হয়ে গেছে গির্জার কাছে।'

ছবির চালাকি? কী বোঝাতে চেয়েছে স্মিথ?

'অসম্ভব,' আবারও বলল ডন পেদ্রো, 'কিছুক্ষণ আগে গির্জার ওখান থেকে এসেছি আমি। ওই তিন হারামজাদা তো পরের কথা, কোনো কুত্তাও চোখে পড়েনি আমার। আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এবং সে-ই পথ দেখিয়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে গেছে ওদেরকে। ওই বিশ্বাসঘাতকটাকে যদি একবার হাতে পাই...' কথা শেষ না-করে জঘন্য একটা গাল দিল সে।

'কী করবো এখন?' দেখে মনে হচ্ছে আমাদেরকে খুঁজে না-পাওয়ায় সবচেয়ে বেশি হতাশ হয়েছে হোসে। 'কুকুর লেলিয়ে দেবো? গন্ধ শুঁকে খুঁজে বের করতে পারবে।'

'গাধা!' চাপা গলায় ধমক দিল ডন পেদ্রো। 'যেখানে আমরা সবাই ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছি সেখানে আলাদা করে ওদের গন্ধ চেনাবে কীভাবে কুকুরগুলোকে? ওরা কি ওদের ব্যবহৃত কিছু ফেলে গেছে? নাকি ওদের গন্ধ সনাক্ত করার অন্য কোনো কায়দা জানা আছে তোমার?'

জবাব দিল না হোসে। অন্য কেউও কিছু বলল না।

'পালিয়ে আর কতদূর যাবে ওরা?' বলে চলল ডন পেদ্রো। 'আগামীকাল সকালে বাড়ির বাইরে খুঁজতে শুরু করবো। সবাই মনে রেখো, ওদেরকে খুঁজে বের করে খুন করতেই হবে। তা না-হলে মরতে হবে আমাদের নিজেদেরকেই। গতবার দুই আমেরিকান নিখোঁজ হওয়ার পর সরকারি কর্মকর্তারা বলতে গেলে তছনছ করে ফেলেছিল আমাদের সবকিছু। আমাদেরকে ভালোমতোই সন্দেহ করেছিল। অল্পের জন্য বেঁচে গেছি। কিন্তু এবার যদি ওই ইংরেজটা গিয়ে ফাঁস করে দেয় সব কথা তা হলে ভেরা ক্রুয থেকে সৈন্যরা এসে গুলি করে মারবে আমাদেরকে। কাজেই বাঁচতে চাইলে আমি যা বলবো তা করতে হবে।' থেমে সঙ্গীদের দিকে তাকাল সে। কেউ প্রতিবাদ করছে না।

'আমি নিশ্চিত এখানে কোথাও নেই ওরা,' ডন পেদ্রোর কথা শেষ হয়নি, 'কিন্তু আমি এই ব্যাপারেও নিশ্চিত, পালিয়ে বাড়ির বাইরে যেতে পারেনি। ভিতরেই কোথাও লুকিয়ে আছে। এবং তিনজন একসঙ্গে আছে। চলো, প্যাসেজগুলো দেখি। ছাদেও খোঁজ করা দরকার।' বলে দেয়ালের ওই চোরাকুঠুরির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। ওর সঙ্গীরাও একে একে পিছু নিল ওর। আবার আগের মতো অন্ধকার হয়ে গেল ঘরটা।

বিপদ কেটে গেছে আপাতত। কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে হাত মেলালাম আমরা। কিন্তু কথা বলার, এমনকী ফিসফিস করার সাহসও পাচ্ছি না। মিনিট দশেক কাটল। তারপর আবার আমাদের কানে এল অস্পষ্ট কিছু আওয়াজ। ঘরের ভিতরটা হঠাৎ করেই আলোকিত হয়ে উঠেছে। হাতে জ্বলন্ত লণ্ঠন নিয়ে ঘরে ঢুকেছে ডন পেদ্রো। সঙ্গে ওর ছেলে ডন হোসে।

কিছুক্ষণ এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে বলল ডন পেদ্রো, 'উধাও হয়ে গেছে ওরা। যেন স্রেফ মিলিয়ে গেছে বাতাসে। ওদের গুরু শয়তানই জানে কীভাবে করতে পারল কাজটা। যা-হোক, আগামীকাল সকালে খোঁজ শুরু করবো। তার আগে কিছু করা যাবে না। ওদেরকে এখানে এনে আসলে বোকার মতো কাজ করে ফেলেছ, হোসে। সামান্য ক'টা টাকার জন্য...'

'টাকার জন্য করিনি আমি কাজটা,' বাধা দিয়ে বলে উঠল হোসে।

'তা হলে কেন করেছ?'

'প্রতিশোধ নেয়ার জন্য।'

'চমৎকার প্রতিশোধ, সন্দেহ নেই,' ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বলল ডন পেদ্রো, 'আমাদের জান নিয়েই টানাটানি পড়ে গেছে। এত প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকার পরও নিস্তার পেতে পারবো কি না সন্দেহ।'

কিছু বলল না ডন হোসে।

ওর বাবা বলে চলল, 'একটা কথা আগে থেকেই বলে রাখি।

ওদেরকে যদি খুঁজে না-পাওয়া যায় তা হলে বুঝে নিতে হবে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে ওরা। সেক্ষেত্রে এখানে আর একটা দিনও থাকবো না আমি। পালাতে হবে আমাকে। চলে যাবো প্রত্যন্ত কোনো জায়গায় যেখানে আইনের হাত পৌঁছতে পারবে না। কুকুরের মতো গুলি খেয়ে মরার কোনো ইচ্ছা নেই আমার।'

এবারও কোনো মন্তব্য করল না হোসে। বোঝা যাচ্ছে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে সে। হয়তো অনুশোচনায় ভুগছে।

'শোনো হোসে, তোমার ওই উড়নচণ্ডী সাঙ্গপাঙ্গগুলোকে বলো অনর্থক খোঁজাখুঁজি না-করে গিয়ে ঘুমাতে। কারণ কোনো লাভ হবে না। শয়তানের ওই তিন চ্যালা এতক্ষণে হয় শয়তানের কাছে পৌঁছে গেছে, নয়তো অন্ধকারে লুকিয়ে আছে এমন কোনো জায়গায় যেখানে হাজার খুঁজলেও চোখে পড়বে না। কাজেই এসব বাদ দাও। তোমার চ্যালারা ঘুমালে চুপিসারে চলে এসো আমার কাছে। ওই বুড়ো ইণ্ডিয়ান আর ওর মেয়ের কাছে নিয়ে যাবো তোমাকে। কথা আদায় করতে হবে বাপ-বেটির পেট থেকে। ভুল শুধু তুমিই করোনি, আমিও করেছি—মদের ঘোরে ওই দু'জনের কথা বলে ফেলেছি ইংরেজটার কাছে। ভেবেছিলাম কথাগুলো অন্য কাউকে বলার আগেই খেল্ খতম হয়ে যাবে হারামিটার।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বাপের সঙ্গে তাল মেলাচ্ছে হোসে, 'বাপ-বেটির কাছ থেকে যা জানার আজ রাতেই জেনে নিতে হবে। কারণ আমারও কেন যেন মনে হচ্ছে কাল সকালে পালাতে হতে পারে আমাদেরকে। কিন্তু...ওরা যদি মুখ না-খোলে তখন কী করবো?'

দেয়ালের ফোকরে চোখ রেখে দেখি, অতি কুৎসিত হাসি ফুটে উঠেছে ডন পেদ্রোর ঠোঁটের কোনায়। হাসিটা ধরে রেখেই বলল সে, 'বাপের সঙ্গে যখন মেয়েও বন্দি তখন বাপকে কীভাবে কথা বলাতে হয় তা জানা আছে আমার। ...কথা বলবে না? বলতেই হবে। আর সব কথা জানা হয়ে গেলে...' হাত গলায় ঠেকিয়ে জবাই করার ভঙ্গি

করে বাকিটা বুঝিয়ে দিয়ে বলল, 'চলো।'

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেছে। ওই সুড়ঙ্গের ভিতরে এখনও দাঁড়িয়ে আছি আমরা। উত্তেজনা, আশা আর ভয়ে কাঁপছি রীতিমতো। আরও কিছুক্ষণ পর শুনতে পেলাম পায়ের আওয়াজ। প্যানেলের ওপাশ থেকে ফিসফিস করে উঠল কেউ, 'লর্ড, ভিতরে আছেন? আমি লুইসা।'

'আছি,' ফিসফিস করে জবাব দিলাম আমিও।

ধাক্কা দিয়ে প্যানেল সরাল মেয়েটা। 'শুনুন,' আগের মতোই নিচু কণ্ঠে বলছে সে, 'ওরা সবাই ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু ভোরের আগেই জেগে উঠবে, খুঁজতে শুরু করবে আপনাদেরকে। কাজেই ইচ্ছা হলে এখানেই লুকিয়ে থাকতে পারেন কয়েকটা দিন। অথবা এখনই পালাতে পারেন।'

'কিন্তু পালাবো কীভাবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'একটাই উপায় আছে—গির্জার ভিতর দিয়ে। দরজায় তালা মারা, কিন্তু গোপন একটা পথ আছে। ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে আগের দিনের যাজকরা দেখতেন নীচে কী হচ্ছে না-হচ্ছে। ওখান থেকে লাফ দিতে হবে আপনাদেরকে। তবে ভয়ের কিছু নেই, উচ্চতাটা বেশি না। বেদির উপরে একটা ভাঙা জানালা আছে। ওখান দিয়ে বের হয়ে বাগানে গিয়ে ঢুকতে পারবেন আপনারা। তবে এই জানালায় চড়তে হলে আপনাদের যে-কোনো একজনকে কঠিন একটা কাজ করতে হবে—আরেকজনকে কাঁধে নিতে হবে। বাগানে পৌঁছতে পারলে একমুহূর্তও দেরি করা যাবে না। চাঁদের আলোয় যতটুকু সম্ভব দিক চিনে নিয়ে ছুট লাগাবেন। জানেন না হয়তো, ইতোমধ্যে চাঁদ উঠে গেছে। কুকুরগুলোকে পেট ভরে খাইয়ে বেঁধে রেখেছি আমি। কাজেই কপালে খারাপ কিছু না-থাকলে তেমন একটা অসুবিধা হওয়ার কথা না আপনাদের।'

সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকে বললাম, 'গির্জার ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময়

যিব্যালবে আর ওর মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে আমাদের। কারণ ওদেরকে ওখানেই কোথাও বন্দি করে রাখা হয়েছে বলে আমার অনুমান। আর সে-জন্যই তালা দিয়ে রাখা হয়েছে গির্জার দরজায়। আজ রাতে বাপ-বেটির সঙ্গে দেখা করার জন্য ওখানে যাওয়ার কথা ডন পেদ্রো আর হোসের। কাজেই এই দুই শয়তানের সঙ্গেও দেখা হতে পারে। এবার বলুন, এত বড় ঝুঁকি নেয়া কি ঠিক হবে?'

'হ্যাঁ, হবে,' একমুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দিলেন সিনর। 'কারণ এখানে, এই গর্তের ভিতরে লুকিয়ে থাকলে ক্ষুধার জ্বালায় ভুগতে ভুগতে শেষে একদিন মরতে হবে আমাদেরকে। কে খাবার নিয়ে আসবে আমাদের জন্য? লুইসা? একদিন না একদিন ওর উপর সন্দেহ হবে ডন পেদ্রোর। তারপর শুরু হবে কড়া নজরদারি। তখন? আমাদেরকে একবার যদি ধরতে পারে শয়তানগুলো তা হলে ঠাণ্ডামাথায় খুন করবে। তারচেয়ে পালানোর চেষ্টা করাই কি ভালো না? তা ছাড়া, যেমনটা বললে—গির্জার ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় যিব্যালবে আর ওর মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তখন ওদেরকে উদ্ধার করার সুযোগ পেতে পারি। আমাদেরকে বাধা দেয়ার জন্য থাকবে শুধু ডন পেদ্রো আর ওর ছেলে হোসে। আমরা তিনজন আর ওরা দু'জন। লড়াই যদি বাধেও, ওদেরকে কাবু করতে খুব বেশি অসুবিধা হওয়ার কথা না আমাদের।'

মোলাসকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কী বলো?'

'আমার মনে হয় ঠিক কথাই বলেছেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড,' বলল মোলাস। 'তবে আপনারা কী করবেন না-করবেন, কোথায় যাবেন না-যাবেন তা নিয়ে আমার তেমন একটা মাথাব্যথা নেই। আমরা ডানে বা বাঁয়ে যেখানেই যা-ই না কেন, আমার মরণ সুনিশ্চিত।'

আমি বা সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড কেউই কিছু বললাম না এই ব্যাপারে। এখন মোলাসের সঙ্গে তর্ক করার মানে হয় না। তা ছাড়া হাতে সময় খুব কম, কাজে লাগাতে না-পারলে মোলাস একা না,

আমরা তিনজনই মরবো ।

কাজেই বের হলাম সুড়ঙ্গ থেকে, এসে দাঁড়ালাম ঘরের ভিতরে, দুই বিছানার মাঝখানে। আমাদের সামনের দেয়ালে ঝুলছে অধ্যক্ষের ছবিটা। ভালোমতো লক্ষ করে বুঝতে পারলাম, ছবিটা আঁকা হয়েছে একখণ্ড মসৃণ কাঠের উপর, বলা ভালো কাঠের বোর্ডের উপর। বোর্ডটার উপরের আর নীচের প্রান্তের মাঝামাঝি জায়গাটা খুব কায়দা করে বসিয়ে দেয়া হয়েছে দুটো পিভট বা আবর্তনকীলকের সঙ্গে। কেউ এই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বোর্ডের গায়ে জোরে চাপ দিলে ঘুরে যায় কীলক, ফলে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে একটা প্যাসেজ। অর্থাৎ ছবিটা আসলে দরজা হিসেবে কাজ করছে। ঘণ্টাখানেক আগে এই পথেই ঘরে ঢুকেছিল ডন পেদ্রো আর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা।

দরজাটার বিশেষ একটা জায়গায় হাত রেখে জোরে ধাক্কা দিল লুইসা। নিঃশব্দে ঘুরে গেল কীলক, সরে গেল বোর্ডটা। আমাদের মাথার উপরে এখন হাঁ করে আছে অন্ধকার একটা গহ্বর।

ইশারা করল লুইসা। ওকে তুলে দিলাম আমরা। তারপর আমরা তিনজনে একে একে উঠলাম উপরে। ঠোঁটে হাত রেখে কোনো শব্দ না-করার ইশারা করল মেয়েটা। বিড়ালের মতো চুপিসারে এগিয়ে চললাম আমরা। প্যাসেজটা ধরে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর আমার কানে ফিসফিস করে বলল লুইসা, 'সাবধান! সামনে, হাতের ডানদিকে অপ্রশস্ত সিঁড়ি আছে। ওই সিঁড়ি ধরে নামলে গির্জায় যাওয়া যাবে।'

সিঁড়ি বেয়ে নামলাম আমরা। একটা কোণ ঘুরলাম। লুইসা এখনও সবার সামনে; পথ দেখাচ্ছে। হঠাৎ একলাফে সরে এল সে, খামচে ধরল আমার হাত। কম্পিত কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলছে, 'ভূত! ভূত!'

ওকে যদি শক্ত করে ধরে না-রাখতাম তা হলে আমি নিশ্চিত ছুট লাগাত সে। টেনে সরিয়ে আনলাম ওকে সামনে থেকে, নিজে

এগিয়ে গেলাম। চারদিকে তাকিয়ে দেখি, সিঁড়ি বেয়ে নেমে ছোট্ট একটা কুলুঙ্গিতে এসে হাজির হয়েছি সবাই। দশ ফুট নীচে গির্জার মেঝে। এখানে যদি দাঁড়ায় কেউ তা হলে নীচে কী হচ্ছে না-হচ্ছে সবই দেখতে বা শুনতে পাবে, অথচ ওই লোকটাকে দেখা তো পরের কথা তার উপস্থিতি কল্পনা করাও কারও পক্ষে সম্ভব হবে কি না সন্দেহ।

এবং এই ব্যাপারেও আমার সন্দেহ আছে, এখন চোখের সামনে যে-অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি সে-রকম কোনো দৃশ্য এই গির্জা বা আশ্রমের কোনো অধ্যক্ষ বা সন্ন্যাসী কোনো কালে দেখেছিল কি না।

গির্জার চ্যান্সেলের উপরে ভাঙা জানালা। সেখান দিয়ে ভিতরে ঢুকছে উজ্জ্বল চন্দ্রালোক। রূপালী আলোয় আলোকিত হয়ে আছে চ্যান্সেলের বেশিরভাগ অংশ। পাথরের বেদি-সংলগ্ন একদিকের দেয়ালে ঝুলছে একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন। বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়েছে শক্তিশালী আলো। আলোর এই বৃত্তের ভিতরে চারজন মানুষ—ডন পেদ্রো, তার ছেলে ডন হোসে, এক বুড়ো ইণ্ডিয়ান এবং একটা মেয়ে।

বেদির দু'প্রান্তে সাপোটি গাছের কাঠ কেটে বানানো পিলার। উড়ন্ত দেবদূতের ছবি খোদাই করা ওগুলোতে। একদিকের পিলারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে ওই ইণ্ডিয়ান বুড়োকে, আরেকদিকেরটার সঙ্গে মেয়েটাকে। আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে মেয়েটাই কাছে। কাজেই প্রথমে ওর উপর পড়ল আমার দৃষ্টি। একবাক্যে যদি বলি, স্রেফ হাঁ হয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। একটুও বাড়িয়ে বলেনি মোলাস বা ডন পেদ্রো। এই মেয়ে আসলেই ডানাকাটা পরী। স্বর্গের অপ্সরাও বুঝি এর সৌন্দর্যের কাছে হার মানে। আলুথালু বেশ তার, ব্যথা আর ক্ষুধায় জর্জরিত সে। নিদারুণ সন্তাপ আর অক্ষম ক্রোধের মিশ্র ছাপ চেহারায়। তারপরও সেই ভরাট মুখশ্রীতে রূপের কোনো কমতি নেই।

মেয়েটা নিঃসন্দেহে ইণ্ডিয়ান। কিন্তু এ-রকম কোনো ইণ্ডিয়ান

কোনো কালে দেখিনি আমি। গায়ের রঙ দুধসাদা, প্রায় শ্বেতাঙ্গিনীদের মতো। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কালো, ঢেউ খেলানো চুল। চেহারাটা গোলাকার। তাতে যেন স্বয়ং ঈশ্বরের হাতে খোদাইকৃত একজোড়া অতি-সুন্দর গাঢ় নীল চোখ। পরনে সাদা আলখাল্লা। সে-পোশাক ভেদ করে যেন ফুটে বের হচ্ছে লম্বা আর পেলব শরীরের সমস্ত রমণীয়তা।

এই মেয়ের চেয়ে ওর বাবার, বলাই বাহুল্য লোকটা যিব্যালবে, অবস্থা আরও খারাপ। যেমনটা বলেছিল মোলাস, লোকটা হালকাপাতলা এবং অনেক লম্বা। মাথায় সাদা চুল, গালভর্তি সাদা দাড়ি। বাজপাখির মতো চোখে বুনো দৃষ্টি। চেহারাটা দেখলে কেন যেন ঈগল পাখির কথা মনে পড়ে যায়। মনে হয় এই লোক সাধারণ কেউ না; এই লোক একজন নেতা, একজন রাজা—যেমনটা বলেছিল ডন পেদ্রো। টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে বেচারার আলখাল্লা, কোমর পর্যন্ত নগ্ন সে। ওর কপালে, বুকে, বাহুতে কালশিরে আর রক্তের দাগ। ওর পায়ের কাছে পড়ে আছে একটা চাবুক। কাজেই কীভাবে তৈরি হয়েছে দাগগুলো তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

চাবুকটা কে ব্যবহার করেছে তা অনুমান করাও কঠিন কিছু না। যিব্যালবের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ডন হোসে। হাঁপাচ্ছে। অর্থাৎ আমরা আসার কিছুক্ষণ আগে মারপিটের কাজটা শেষ করেছে আপাতত। কপালে ঘাম জমে গেছে, মুছল হাত দিয়ে। বাপের দিকে তাকিয়ে স্প্যানিশে বলল, 'এই খচ্চরটা মুখ খুলবে না। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করো। কুত্তীটাও যদি কিছু না-বলে তা হলে ওর চোখের সামনে খুন করে ফেলবো ওর বাপকে। তারপর...। তখন দেখবো এত দেমাগ থাকে কি না।'

বেদির পুরু রেলিং-এ বসে ছিল ডন পেদ্রো। ছেলের কথা শুনে পিছলে নামল, সোজা হয়ে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল মেয়েটার দিকে। ওর দুই চোখের পাতা কেমন ভারী হয়ে আছে—ঘুম পাচ্ছে নাকি আবারও আকণ্ঠ মদ গিলেছে বুঝতে পারছি না।

'প্রিয়তমা,' মায়া ভাষায় মেয়েটাকে বলল সে, 'তোমার চোখের সামনে তোমার বুড়ো বাপটা মার খাচ্ছে। নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগছে তোমার। তুমি কি চাও আরও মার খাক সে? নাকি চাও এসব বন্ধ হোক? যদি চাও তোমার বাবার গায়ে আর হাত না-তুলি আমরা তা হলে বলো কোথায় লুকানো আছে এত সোনা।'

'একটা কথাও বলবি না, মা,' ভাঙা কণ্ঠে বলে উঠল যিব্যালবে, 'ওরা যদি তোর চোখের সামনে আমাকে খুন করে ফেলে তারপরও না।'

'চুপ কর্, কুত্তা!' ধমকে উঠল ডন হোসে। ঠাস্ করে চড় মারল বুড়োর গালে।

হাতের বাঁধন টানাটানি করল মেয়েটা, প্রাণপণে চেষ্টা করল দড়ি ছিঁড়ে ফেলার। কিন্তু কিছুই করতে পারল না। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'একটাবার যদি নাগালের মধ্যে পেতাম তোদেরকে!'

'ওরে আমার পিরিতের নাগরী!' বিদ্রূপের হাসি হাসল ডন হোসে, 'একটু ধৈর্য ধরো। নাগালের মধ্যেই পাবে আমাকে। তোমার বাপ তো টুঁ শব্দটাও করল না। কাজেই এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে গলা ফাটিয়ে সব বলতে বাধ্য হয় সে। এখনও ভালোমানুষের মতো বলছি, সে-পথে যেতে বাধ্য কোরো না আমাকে। সুন্দরী মেয়েমানুষ দেখলে আমার এমনিতেই হুঁশ থাকে না। তুমি তো আবার...' কথা শেষ না-করে বিশেষ দৃষ্টিতে মেয়েটাকে দেখল আপাদমস্তক।

কেঁপে উঠল মেয়েটা। দেখে মনে হচ্ছে ভয়ে আর ঘৃণায় ওর দম আটকে আসছে। কিছু না-বলে চুপ করে থাকল।

বাপের দিকে তাকাল ডন হোসে। 'এবার কী করবো? একটুকরো লোহা গরম করে আনবো? একটু একটু করে ছ্যাঁকা দেবো বুড়োকে, ব্যথায় আর্তনাদ করবে সে বার বার আর তা দেখে মুখ খুলবে ওর মেয়ে? তাড়াতাড়ি বলো। আমার আর এসব ভালো লাগছে না। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যদি তোমার মাথায় কোনো বুদ্ধিই

না-আসে তা হলে তলোয়ারটা দাও আমার হাতে। খেল্ খতম করে দিই।' যিব্যালবের দিকে তাকাল সে। 'শেষবারের মতো বলছি সোনায়-ঠাসা ওই মন্দির কোথায় আছে বলো। ভেবো না কিছুই জানি না আমরা ওই ব্যাপারে। ওই মন্দির নিয়ে তোমাদের আলোচনা নিজের কানে শুনেছে বাবা।'

বিষণ্ন কণ্ঠে জবাব দিল যিব্যালবে, 'ও-রকম কোনো মন্দির নেই কোথাও। ভুল শুনেছে তোমার বাবা।'

রাগে লাল হয়ে গেল হোসের চেহারা। 'তোমার সঙ্গে দেখা করে ওই ইণ্ডিয়ানটা যে-স্বর্ণমুদ্রাগুলো পেয়েছিল সেগুলো তুমি কোত্থেকে পেয়েছিলে? আর তোমার এই তলোয়ারটাই বা এল কোত্থেকে?' হাতে-ধরা তরবারিটা নাড়ল সে।

অস্ত্রটা সুন্দর। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ইস্পাতের বদলে তামা দিয়ে বানানো। খাঁটি সোনার হাতলে একটা নারীমূর্তি খোদাই-করা। দু'হাত দু'দিকে প্রসারিত করে আছে মূর্তিটা।

'আমার এক বন্ধু আমাকে দিয়েছে ওটা,' বলল যিব্যালবে। 'দয়া করে জিজ্ঞেস কোরো না সে কোত্থেকে পেল। বলতে পারবো না। কারণ উত্তরটা জানা নেই আমার।'

'খাঁটি কথা,' বুনো হাসি হাসল হোসে। তাকাল বাপের দিকে। 'বাবা, আগুনে ধরে তলোয়ারের প্রান্তটা গরম করো। এতক্ষণ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছি, ভালো লাগেনি এই বুড়ো আর ওর মেয়েটার। এবার দেখাচ্ছি স্প্যানিশ আতিথেয়তা কাকে বলে!'

মাথা ঝাঁকাল ডন পেদ্রো। তরবারিটা নিল হোসের হাত থেকে। জ্বলন্ত আগুনের শিখায় গরম করতে লাগল সুতীক্ষ্ণ প্রান্তভাগ। এদিকে হোসে ঝুঁকে পড়েছে যিব্যালবের উপরে, বুড়োর কানে কানে কী যেন বলছে। একটু পর পর হাত তুলে কী যেন ইঙ্গিত করছে মেয়েটার দিকে। আতঙ্কে জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা হয়েছে বেচারীর। শরীর কুঁকড়ে মাটিতে পড়ে আছে সে। লম্বা খোলা চুল

ছড়িয়ে আছে শরীরের চারপাশে।

'তোমরা সাদাচামড়ার লোকেরা কি মানুষ না শয়তান?' হোসের বাজে কথা সহ্য করতে না-পেরে অবশেষে বলে উঠল যিব্যালবে। 'তোমাদের মধ্যে কি আইন বা ন্যায়বিচার বলে কিছুই নেই? স্বার্থসিদ্ধির জন্য তোমরা যা খুশি তা-ই করো?'

'আরে না,' শয়তানী হাসি হাসল হোসে, 'আমরা যথেষ্ট ভদ্রলোক। কিন্তু সমস্যা হলো, এখন সময় খুব খারাপ। যদি নিজেকে বেঁচে থাকতে হয় তা হলে আরেকজনের টুঁটি কামড়ে ধরতে হবেই। ব্যাপারটা অনেকটা বাঘ-সিংহের মতো—শিকার করে খেতে না-পারলে জঙ্গলের এককোনায় মরে পড়ে থাকতে হবে। তা ছাড়া দেশের এই এলাকায় আইন নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামায়ও না কেউ। আরও বড় কথা, তোমার মতো অখ্রিস্টান ইণ্ডিয়ান কুত্তার জন্য আবার ন্যায়বিচার কীসের?' হাসি বিদায় নিল ওর চেহারা থেকে। 'শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করছি। ওই সোনার মোহরগুলো যেখান থেকে পেয়েছ সেখানে আমাদেরকে নিয়ে যাবে কি না?'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল যিব্যালবে। তারপর বলল, 'ধরো নিয়ে গেলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পর যদি আমার লোকদের ডেকে এনে শেষ করে দিই তোমাদেরকে তা হলে কী করবে?'

আবারও শয়তানি হাসি হাসল হোসে। 'এত বোকা ভাবলে কী করে আমাদেরকে? আমাদেরকে সেখানে নিয়ে যাবে তুমি, আর তোমার মেয়ে বন্দি হয়ে থাকবে এখানে। আমরা নিরাপদে ফিরে আসার পর মুক্তি পাবে সে।'

'জীবনেও না!' চেঁচিয়ে উঠল যিব্যালবে। 'আমাদের প্রাচীন গোপন ইতিহাস ফাঁস করে দেয়ার চেয়ে তোমাদের হাতে একশ'বার মরাও অনেক ভালো।'

'ও আচ্ছা,' সুর করে বলল হোসে। 'এতক্ষণে বুড়ো মিয়া স্বীকার করল তাঁদের প্রাচীন গোপন ইতিহাস আছে! ...বাবা, তলোয়ারটা গরম হয়েছে?'

'আর এক মিনিট,' জবাব দিল পেদ্রো। আগুনের শিখায় উল্টে ধরল তরবারির প্রান্ত।

এমন সময় নিচু গলায় বলে উঠলেন সিনর, 'এবার কিছু একটা করতে হবে আমাদেরকে।' হাত বাড়িয়ে রেলিংটা ধরলেন—লাফিয়ে নামবেন গির্জায়।

টেনে তাঁকে কিছুটা পিছনে নিয়ে এলাম আমি। বললাম, 'ডন পেদ্রো আর হোসে গির্জার ভিতরে। তারমানে দরজাটা সম্ভবত খোলা আছে।'

'অর্থাৎ, আপনারা কি...' প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না লুইসা, তার আগেই আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ওই বুড়ো আর ওর মেয়েকে উদ্ধার করতে হবে। যদি না-পারি তা হলে একসঙ্গে মরবো। কিন্তু ওদেরকে এভাবে ফেলে রেখে পালাবো না।'

'সেক্ষেত্রে বিদায় বলা ছাড়া আমার আর কিছু করার আছে বলে মনে হয় না,' বলল লুইসা। 'প্রার্থনা করি ঈশ্বর আপনাদের সহায় হোন। আপনাদের সঙ্গে আমাকে দেখলে ওরা বুঝে যাবে আপনাদেরকে সাহায্য করছি আমি। তখন নিঃসন্দেহে খুন করবে আমাকে। একটা বাচ্চা আছে আমার, ওর জন্য বেঁচে থাকতে হবে আমাকে। ...বিদায়,' ছায়ার মতো নিঃশব্দে উধাও হলো সে আমাদের সামনে থেকে।

দেরি না-করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম আমরা। শেষ ধাপের কাছে ছোট একটা দরজা। সেটা, যেমনটা আশা করেছিলাম, কিছুটা খোলা। থেমে দাঁড়ালাম আমরা। কানে কানে ফিসফিস করে শলাপরামর্শ করলাম কিছুক্ষণ। তারপর দরজা দিয়ে চুপিসারে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। যেহেতু শুধু বেদির কাছে আলো জ্বলছে এবং যেহেতু আমাদের আসার কথা কল্পনাও করেনি ডন পেদ্রো বা হোসে, আশা করা যায় আমাদেরকে দেখতে পাবে না শয়তান দুটো। এবং দেখতে পেলও না। আলো-আঁধারিতে গা ঢেকে বেদির কাছে পৌঁছে গেলাম আমরা। ততক্ষণে তপ্ত তরবারিটা হাতে নিয়েছে হোসে।

'দেখো, প্রিয়তমা, দেখো,' মেয়েটাকে উদ্দেশ্য করে বলছে সে, খালি হাতটা দিয়ে আলতো করে চড় দিচ্ছে মেয়েটার গালে, 'তোমার বাবাকে এখন খ্রিস্টান বানাবো আমি। কীভাবে জানো? এই তলোয়ারটা কমপক্ষে দু'বার এমনভাবে চেপে ধরবো ওর কপালে যাতে একটা ক্রসচিহ্ন তৈরি হয়।' চেহারাটা নিষ্ঠুর হয়ে উঠল ওর, তরবারিটা বাগিয়ে ধরে এগোচ্ছে সে যিব্যালবের দিকে।

আর দেরি করাটা ঠিক হবে না। একলাফে বেদির উপর উঠে পড়লাম আমরা তিনজন। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেল পেদ্রো আর হোসে। সুযোগটা কাজে লাগালাম আমরা। লাফিয়ে গিয়ে মোলাস পড়ল হোসের উপর। ওর ধাক্কা লেগে তরবারিটা ছুটে গেল হোসের হাত থেকে। ওকে এমনভাবে জাপটে ধরল মোলাস যে, হাজার মোচড়ামোচড়ি করেও কোনো ফায়দা হচ্ছে না হোসের। এদিকে আমি কায়দা করে পেঁচিয়ে ধরেছি পেদ্রোকে। ধস্তাধস্তি করছে পেদ্রো, কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না।

মেঝে থেকে তরবারিটা তুলে নিলেন সিনর। তপ্ত প্রান্তটা ঠেসে ধরলেন হোসের বুকে। নিচু কিন্তু ভয়ঙ্কর কণ্ঠে বললেন, 'টুঁ শব্দও যদি করো, সঙ্গে সঙ্গে খুন করে ফেলবো।' দেখতে পাচ্ছি, তরবারির আগুন-গরম প্রান্তটা হোসের জামা পুড়িয়ে দিচ্ছে।

'হুমকি দেয়ার দরকার কী?' নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মোলাস। 'আমাদেরকে হাতের নাগালে পেলে খুন করত ওরা। এবার ওদেরকে হাতের নাগালে পেয়েছি আমরা। আমাদেরও একই কাজ করা উচিত। যদি আপনার ইচ্ছা না-হয়, যিব্যালবের বাঁধন কেটে দিন। যা করার তিনিই করবেন।'

'তুমি কী বলো, ইগনাশিয়ো?' জিজ্ঞেস করলেন সিনর।

'অকারণে খুনখারাপি আমার পছন্দ না। কিন্তু আমরা যদি এই দুই শয়তানকে এখন না-মারি তা হলে আমাদেরকেই মরতে হবে। কাজেই আমাদের ভালোর জন্যই এদেরকে শেষ করে দেয়া উচিত।'

টের পাচ্ছি, মৃত্যুভয়ে কাঁপছে "দুর্ধর্ষ" ডন পেদ্রো। কী যেন

বলছে বিড়বিড় করে। ওদিকে কান্নায় ভেঙে পড়েছে হোসে। প্রাণভিক্ষা চাচ্ছে বার বার। গুঙিয়ে উঠছে থেকে থেকে। কিন্তু চেঁচাতে পারছে না। ওর চামড়া পুড়িয়ে ফেলেছে গরম তরবারিটা।

'তোমরা ইংরেজ,' কোঁকাতে কোঁকাতে বলল সে, 'তোমরা ভদ্রলোক। অসহায় কোনো লোককে এভাবে ধরে মেরে ফেলতে পারো না তোমরা। আমরা কি মানুষ না ষাঁড়? ইচ্ছা হলেই কি আমাদেরকে জবাই করে ফেলা যায়?'

'তোর মতো মানুষরূপী ষাঁড়কে ইচ্ছা না-হলেও জবাই করা যায়,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মোলাস।

'কেন, সব ভুলে গেছ?' হোসেকে জিজ্ঞেস করলেন সিনর। 'নিজেদের জীবন বাজি রেখে তোমার জীবন বাঁচিয়েছি আমরা। আর তুমিই কি না সাঙ্গপাঙ্গসহ ঢুকেছ আমাদের ঘরে, আমাদেরকে খুন করার উদ্দেশ্যে। তারপরও এভাবে ঠাণ্ডামাথায় তোমাকে খুন করা আমার পক্ষে সম্ভব না। কারণ আমি ভদ্রলোক। মোলাস, ওকে ছেড়ে দাও। কিন্তু যদি পালানোর চেষ্টা করে বা চেঁচায় তা হলে তোমার ছুরিটা সোজা ঢুকিয়ে দিয়ো ওর পেটে। হোসে মোরেনো, তোমার কোমরে একটা তলোয়ার আছে। আমার হাতেও আছে একটা। তোমার সঙ্গে আমার কিছু দেনাপাওনা আছে। সেগুলো এখনই এখানেই চুকিয়ে ফেলতে চাই আমি।'

'আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন, সিনর?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম। 'হোসেকে শেষ করে দেয়ার দরকার থাকলে আমাকে বলুন। আমি খতম করছি ওকে। কিন্তু আপনি এভাবে ঝুঁকি নিতে যাবেন কেন?'

আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না সিনর। হোসেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে যদি ছেড়ে দিই, আমার বিরুদ্ধে লড়বে? নাকি মোলাসকে বলবো তোমাকে পরকালে পাঠাতে?'

'লড়বো,' সংক্ষেপে জানিয়ে দিল হোসে।

'ভালো। মোলাস, ওকে ছেড়ে দাও। কিন্তু তোমার ছুরিটা নিয়ে

প্রস্তুত থেকো।'

বুঝতে পারছি সিনরকে ঠেকানো যাবে না। হোসের উপর প্রতিশোধ নেবেনই তিনি। মোলাস ছেড়ে দিল শয়তানটাকে। তামা দিয়ে বানানো সেই অদ্ভুত তরবারিটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন সিনর।

এগিয়ে আসার আগে এদিক-ওদিক তাকাল হোসে। পালানোর পথ খুঁজছে সম্ভবত। কিন্তু কোনো উপায় নেই। কারণ ওর সামনে তরবারি হাতে সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড, পিছনে ছুরি হাতে মোলাস। দশ সেকেণ্ড ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল সে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সিনরের দিকে। প্রতিপক্ষকে শেষ করে দেয়ার কার্যকরী কোনো কৌশল ভেবে নিচ্ছে বোধহয়। আলোর সেই বৃত্তের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে দু'জনে। ওদের মাথার উপর খেলা করছে জ্যোৎস্না। চারদিকে হঠাৎ করেই যেন নেমে এসেছে নীরবতা। ঝাঁকুনি দিয়ে চেহারার উপর থেকে একগুচ্ছ চুল সরাল ইণ্ডিয়ান মেয়েটা। মাথাটা যতখানি সম্ভব উঁচু করল যাতে লড়াইটা দেখতে পারে।

দৃশ্যটা আসলেই অদ্ভুত। এ-রকম একটা দ্বন্দ্বলড়াই অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য এই জায়গা আর সময়টাও অদ্ভুত। তরবারি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই দ্বন্দ্বযোদ্ধা, অপেক্ষা করছে প্রতিপক্ষের হামলার। তাদের পিছনে অর্ধ-আলোকিত খালি গির্জা, সামনে পবিত্র ক্রুসিফিক্স। পায়ের নীচে, দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা বন্দি-অত্যাচারের মাধ্যমে অপবিত্র হওয়া বেদি। আশপাশে, শুধু ঈশ্বর জানেন আমাদের মতো উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কত আত্মা—যারা কোনো-না-কোনো সময়ে কোনো-না-কোনোভাবে মারা গেছে এখানে।

শিরশির করে উঠল আমার সারা শরীর। টের পাচ্ছি অদ্ভুত এক শিহরণ জেগেছে রক্তে।

সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড ধীরস্থির। বিজয়ের অগ্রীম বার্তা যেন লেখা আছে তাঁর চেহারায়, নীল দু'চোখে। দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন প্রতিশোধপরায়ণ কোনো দেবদূত। ওদিকে দিশেহারা হয়ে গেছে

হোসে। ওর চেহারায় মৃত্যুভয়। সময় ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে বিচলিত হয়ে পড়েছে সে।

প্রথমে আঘাত করল সে-ই। আগে বাড়ল, সিনরের মাথা লক্ষ করে কোপ মারল। একলাফে সরে গিয়ে আঘাতটা এড়িয়ে গেলেন সিনর। মুহূর্তের মধ্যে তরবারি চালালেন। হোসের বাঁ বাহুতে বেশ বড় একটা ক্ষত তৈরি হলো। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল সে। সিনরের তরবারির নাগাল থেকে সরে গেল লাফ দিয়ে। নিজের ক্ষতের দিকে তাকিয়ে ক্রোধে বা আতঙ্কে মাথা খারাপ হয়ে গেল, আবার এগিয়ে এসে একের পর এক কোপ মারতে লাগল সিনরকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু বার বার সুকৌশলে ঠেকিয়ে দিচ্ছেন সিনর। এবং জবাবে একটা-দুটো খোঁচা মারছেন সুযোগ পেলেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, বেদির রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে হোসে। ওর পিঠ ঠেকে গেছে একদিকের পিলারের সঙ্গে। এই পিলারের সঙ্গেই বেঁধে রাখা হয়েছে ইণ্ডিয়ান মেয়েটাকে। অসহায় মেয়েটার দিকে শেষবারের মতো তাকাল সে। রাগে বিকৃত হয়ে গেল ওর চেহারা। এককোপে সিনরের ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে দেয়ার ইচ্ছায় তরবারিটা তুলল সে। ঠিক তখনই অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল।

আগেই বলেছি পিলারের গায়ে বিভিন্ন কারুকার্য খোদাই-করা। তরবারি তোলার সময় ব্যাপারটা খেয়াল ছিল না হোসের। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কাঠের কোনো এক ফাঁকে ঢুকে গিয়ে অতি মূল্যবান কয়েকটা মুহূর্তের জন্য আটকে গেল ওর তরবারিটা। ব্যাপারটা খেয়াল করেননি সিনর, হোসেকে ধোঁকা দেয়ার জন্য ততক্ষণে একটা নকল পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছেন তিনি। এক পা এগিয়ে এসেই দিক পাল্টে ফেলেছেন, আরেক পায়ে ভর দিয়ে সরে গেছেন হোসের কিছুটা বাঁয়ে। ততক্ষণে হ্যাঁচকা টানে পিলারের কারুকাজ থেকে তরবারি আলাদা করতে পেরেছে হোসে। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে অনেক। অস্ত্রটা আবারও তোলার আগে দ্রুত ওর

দিকে ছুটে গেলেন সিনর, সর্বশক্তিতে নিজের তরবারি ঢুকিয়ে দিলেন হোসের বুকে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল হোসে, কাত হয়ে পড়ে গেল বেদির উপরে। আর নড়ল না।

হোসেকে মরতে দেখে হোক অথবা এতক্ষণের এই রুদ্ধশ্বাস লড়াই দেখে হোক, অসতর্ক হয়ে পড়েছিলাম আমি। জাপ্টে ধরে রেখেছিলাম ডন পেদ্রোকে, কিন্তু কখন যেন নিজের অজান্তেই আলগা হয়ে গেছে আমার সেই বাঁধন। ব্যাপারটা টের পাওয়ামাত্র জোরে এক ঝাঁকুনি দিল পেদ্রো। আমি কিছু করার আগেই প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিল আমার বুকে। ছিটকে গিয়ে কয়েক হাত দূরে পড়লাম। চক্কর দিয়ে উঠল মাথাটা। উঠে বসার পর হতভম্ব হয়ে দেখি, ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেছে পেদ্রো। এদিকে-সেদিকে তাকালাম। না, গির্জার কোথাও ওর ছায়াও নেই।

একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে গেলাম দরজার দিকে। আমি নিশ্চিত এখান দিয়েই পালিয়েছে পেদ্রো। কারণ এই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢোকার সময় দরজাটা আধখোলা ছিল, এখন দেখছি সম্পূর্ণ বন্ধ। হাতল ধরে যে মোচড় দেবো সে-উপায়ও নেই। এই দরজায় গির্জার ভিতরের দিক থেকে না-আছে কোনো চাবির ব্যবস্থা, না-আছে কোনো হাতল।

'পালাও!' চেঁচিয়ে জানিয়ে দিলাম সবাইকে, একছুটে হাজির হয়েছি বেদির কাছে। 'পেদ্রো পালিয়ে গেছে। আমাদেরকে টুকরো টুকরো করতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাঙ্গপাঙ্গসহ এখানে হাজির হবে সে।'

পেদ্রো যে পালিয়ে গেছে তা ইতোমধ্যে দেখেছেন সিনর। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেছেন কী করতে হবে। নিজের তরবারি দিয়ে মেয়েটার বাঁধন কেটে দিয়েছেন। এদিকে মোলাস মুক্ত করেছে যিব্যালবেকে।

পালানোর একটাই উপায় আছে এখন। এবং সে-উপায় অবলম্বন করার জন্য ঈশ্বর ক্ষমা করুক আমাদেরকে। কারণ আমরা নিরুপায়।

গির্জার ভাঙা জানালার নীচে, বেদির একদিকে বসানো পাথরের মূর্তিটার দিকে এগিয়ে গেলাম একদৌড়ে। মূর্তিটাকে জাপ্টে ধরে উঠে গেলাম কিছুটা। আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল মোলাস। নীচ থেকে আমার বুটের তলায় হাত রেখে ধাক্কা দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চড়ে বসলাম জানালার গোবরাটে। ইচ্ছা করলেই লাফিয়ে পড়তে পারি গির্জার বাইরে, কিন্তু তা করা যাবে না। আগে আমার বন্ধুদেরকে সাহায্য করতে হবে। গোবরাটের উপর কায়দামতো বসলাম যাতে হ্যাঁচকা টান লাগলে সামলাতে পারি। তারপর হাত যতখানি সম্ভব বাড়িয়ে দিলাম নীচের দিকে। ততক্ষণে মূর্তি জাপ্টে ধরে মোলাসের সহায়তায় উঠে এসেছে যিব্যালবে। আমার বাড়ানো দু'হাত ধরতে পারল সে। কিন্তু বয়স হয়েছে বেচারার, নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়। কাজেই প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পর এবং আমার মনে হলো অনন্তকাল পর আমার পাশে এসে বসতে পারল সে।

ওকে বললাম, 'দেরি না-করে নীচে লাফিয়ে পড়ুন। উচ্চতাটা দশ ফুটের বেশি না।'

কিন্তু ইতস্তত কছে যিব্যালবে।

তাগাদা দিতে হলো আবার, 'দেরি করবেন না। নইলে আমরা সবাই মরবো।'

এবার লাফ দিল যিব্যালবে। সে ঠিকমতোই নামতে পেরেছে দেখার পর ঘাড় ঘুরালাম। এবার যে উঠে আসছে তাকে সাহায্য করতে হবে।

যিব্যালবের মেয়ে মায়া। তুলে আনলাম ওকে, সে-ও লাফিয়ে পড়ল। তারপর এলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। সবশেষে মোলাস।

ডন পেদ্রো পালিয়ে যাওয়ার মিনিট তিনেকের মধ্যে ওই ভাঙা জানালা দিয়ে বাইরে চলে এলাম আমরা। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে না-থেকে বাগানের বড় বড় ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম সবাই।

'এবার?' জিজ্ঞেস করলাম আমি, এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছি বার

বার। এই এলাকার প্রায় কিছুই চিনি না।

মায়াও চারদিকে দেখছিল। মাথা তুলে আকাশটা দেখে নিল সে। তারপর বলল, 'আমার সঙ্গে আসুন আপনারা। একটা রাস্তা চেনা আছে আমার।'

পিছু নিলাম ওর। ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হলাম এক মানুষের সমান উঁচু একটা দেয়ালের সামনে। দেয়ালের ওপাশে পেদ্রোর বাগানের সীমানা-নির্দেশক একসারি ঘৃতকুমারী গাছ। দেরি না-করে দেয়ালের উপর চড়ে বসলাম আমরা। লাফিয়ে নামলাম ওপাশে। এগিয়ে চললাম সারি সারি ঘৃতকুমারী গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে। এসব গাছে বড় বড় চোখা কাঁটা হয়; কাজেই তাড়াহুড়ো করে চলতে গিয়ে আমাদের হাত আর বাহুর জায়গায় জায়গায় কেটে গেল। খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গেল জামাকাপড়। শেষপর্যন্ত একটা শস্যক্ষেতে হাজির হতে পারলাম আমরা।

থেমে দাঁড়াল মায়া। আবারও তাকাল আকাশের দিকে। বুঝলাম তারা দেখে দিক নির্ণয়ের চেষ্টা করছে। ঠিক তখনই হইচইয়ের আওয়াজ ভেসে এল পিছন দিক থেকে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, যেখান থেকে এসেছি, অর্থাৎ গির্জার চারপাশ অনেক বেশি আলোকিত হয়ে আছে। অন্ধকারের পটভূমিতে যথেষ্ট উজ্জ্বল দেখাচ্ছে সে-আভা। তারমানে সাঙ্গপাঙ্গসহ গির্জাটা ঘেরাও করে ফেলেছে ডন পেদ্রো।

'এগিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে,' বললাম আমি, 'থামলেই মরণ। সব লোক নিয়ে এসে গেছে ডন পেদ্রো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল মায়া। শস্যক্ষেতের একদিক দিয়ে এগোতে শুরু করল। আগেরবারের মতোই আমরা চলেছি ওর পিছন পিছন। পথ বলতে কিছু নেই। আমাদের চারদিকে উঁচু উঁচু ভুট্টাগাছ। লতা ছড়িয়ে আছে মাটির উপর। কখনও পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে সে-সব পাতা। কখনও আবার ধাক্কা লেগে মাথার

উপরের পাতা থেকে বৃষ্টির-মতো ঝরে পড়ছে জমে-থাকা শিশির। ভিজতে ভিজতে শেষপর্যন্ত পানিতে-ভেজা স্পঞ্জের মতো হয়ে গেল আমাদের যার যার পোশাক। তারপরও থামলাম না আমরা, এগিয়ে চললাম। একলাইনে এগোচ্ছি—একজনের পিছনে আরেকজন। কাটল প্রায় পনেরো মিনিট। অবশেষে ক্ষেত পার হয়ে হাজির হলাম একটা জঙ্গলের ধারে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম আমি। 'যতদূর জানি এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা রাস্তা ডানদিকে বাঁক নিয়ে এগিয়ে গেছে। ওটা ধরে গেলে কোনো শহরে যেতে পারবো?'

'শহরে গেলে কোনো লাভ হবে?' জানতে চাইলেন সিনর। 'আমাদেরকে খুনি হিসেবে পাকড়াও করবে শহরবাসীরা। হোসে মোরেনো মারা পড়েছে আমার হাতে, মনে নেই? প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবেই ওর বাবা। লোক মারফত খবর পাঠিয়ে দেবে চারদিকে। আমাদেরকে যদি শেষ করতে না-ও পারে, অন্তত জেলখানায় যাতে বন্দি করে রাখা যায় সে-চেষ্টা করবে। কাজেই আমার মনে হয় জঙ্গলের ভিতরেই লুকিয়ে থাকা উচিত আমাদের।'

'যদি কিছু মনে না-করেন একটা কথা বলি,' মুখ খুলল যিব্যালবে, প্রথমবারের মতো কথা বলছে আমাদের সঙ্গে, 'এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা গোপন পথ চিনি আমি। ওখান দিয়ে গেলে প্রাচীন আর প্রায়-ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা মন্দির পাওয়া যাবে। চলুন, পরিস্থিতি ঠাণ্ডা না-হওয়া পর্যন্ত সেখানে লুকিয়ে থাকি আমরা। তবে তার আগে আপনাদের পরিচয় জানা দরকার। আপনারা কারা?'

মোলাস বলল, 'আমাকে না-চিনতে পারার কোনো কারণ নেই, মহান যিব্যালবে। লর্ড অভ দ্য হার্টকে খুঁজে বের করে আপনার কাছে নিয়ে যেতে বলেছিলেন, মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' যিব্যালবের গলায় ঔৎসুক্য। 'তাঁকে কি খুঁজে পেয়েছ?'

জবাব না-দিয়ে হাতের ইশারায় আমাকে দেখিয়ে দিল মোলাস।

আপাদমস্তক ভালোমতো আমাকে দেখল যিব্যালবে। 'আপনিই কি...'

'হ্যাঁ, আমিই,' বললাম। 'আমাকে খুঁজে বের করতে মোলাসের যত কষ্ট হয়েছে, আপনাকে খুঁজে বের করতে তারচেয়ে বেশি কষ্ট করতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু এখন বোধহয় সে-সব নিয়ে আলোচনা করার সময় না। এখন কালক্ষেপণ মানে প্রাণহানির সম্ভাবনা। দেরি না-করে আপনার সেই বাড়ির দিকে নিয়ে চলুন।'

মায়াকে কী যেন ইশারা করল যিব্যালবে। আবারও সবার সামনে হাঁটতে শুরু করল মেয়েটা। আবারও আমরা সবাই ওর পিছু নিলাম। খেয়াল করলাম, যত এগোচ্ছি তত ঘন হচ্ছে জঙ্গল। গাছগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে যেন। কোনো কোনোটার শিকড় মাটির উপর দিয়ে বিস্তৃত হয়েছে। অন্ধকারে দেখতে না-পেয়ে বার বার হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ছে আমাদের কেউ-না-কেউ।

অবশেষে ভোরের আলো যখন ফুটতে শুরু করেছে আকাশে, তখন দুটো জিনিস লক্ষ করে স্বস্তি লাগল—জঙ্গলের অনেক ভিতরে চলে এসেছি আমরা এবং ডন পেদ্রোর লোকদের চিৎকার-চেঁচামেচি স্তিমিত হয়ে গেছে পুরোপুরি।

দশ

মোলাসের মৃত্যু

কয়েক মিনিটের জন্য থামলাম আমরা। দম নেয়া দরকার। এরপর আবার চলতে শুরু করলাম। সবার সামনে আমাদের "গাইড"

মায়া। ওর ঠিক পিছনেই সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। সিনরের একটা হাত ধরে আছে মেয়েটা। পথশ্রমে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যিব্যালবে। ঠিকমতো হাঁটতে পারছে না। ওকে দু'দিক থেকে ধরে এগোচ্ছি আমি আর মোলাস। বার বার থামতে হচ্ছে আমাদেরকে। বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। কারণ মায়া আর যিব্যালবে দু'জনের জন্যই এই মাইলের পর মাইল হাঁটাটা বেশ কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। গত পাঁচ দিন ধরে প্রায় কিছুই খেতে দেয়া হয়নি ওদেরকে। ডন পেদ্রো চেয়েছিল ক্ষুধার কষ্ট দিয়ে বাপ-বেটির কাছ থেকে গোপন কথা আদায় করবে। কিন্তু হাজার অত্যাচারেও মুখ খোলেনি ওরা।

খেয়াল করলাম, এই জঙ্গলটা প্রকৃতপক্ষে গ্রীষ্মমণ্ডলীয়। এবং খুবই ঘন। আগে থেকে চেনা না-থাকলে, যে পথ ধরে এগিয়ে চলেছি সে-রকম কোনো পথ খুঁজে বের করা কঠিন। সকাল হয়েছে অনেকক্ষণ আগে, কিন্তু জড়াজড়ি-করে-থাকা গাছগুলোর ডালপালা আর ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে ঠিকমতো প্রবেশ করতে পারছে না রোদ। দেখে মনে হচ্ছে এখন সকাল না, গোধূলি। গাছগুলো যেমন বড় তেমন স্থূল। যেটা যেভাবে পেরেছে বেড়ে উঠেছে। গাছের ডালে লতিয়ে লতিয়ে বেড়ে উঠেছে অর্কিড। আবার কোনো কোনো গাছের শিকড়ের কাছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফার্ন। কখনও আবার দেখা মিলছে ধূসর স্প্যানিশ মসের। শেওলায় ভরা সবুজ ডালে সেগুলো দেখলে মনে হতে পারে প্রকৃতি বোধহয় খেয়ালের বশে ফেস্টুন সাজিয়ে রেখেছে। দেখতে কেমন অদ্ভুত আর কৃত্রিম মনে হয়। অথচ এই জঙ্গলের কোনোকিছুই কৃত্রিম না।

কোনো কোনো গাছের ডাল জড়িয়ে বেড়ে উঠেছে মানুষের উরুর সমান মোটা একজাতের লতানো গাছ। যেখানেই এ-রকম কোনো লতানো গাছ দেখছি, তার নীচেই চোখে পড়ছে নরম কাণ্ডবিশিষ্ট ছোট ছোট একজাতের ঝোপ। কোথাও আবার দশ-বারো ফুট উঁচু আরেকরকম গাছ; সিনর বললেন ইংল্যাণ্ডে নাকি এই গাছের চাষ হয়, নাম "ইণ্ডিয়ান শট"।

এসব ঝোপজঙ্গল পার হতে গিয়ে, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের গতি ধীর হয়ে গেছে এবং যথেষ্ট কসরত করতে হচ্ছে। কখনও টপকে পার হতে হচ্ছে মাটিতে পড়ে-থাকা এবং ফার্নে-আচ্ছাদিত কোনো মরা গাছের কাণ্ড। কখনও ঢুকে পড়তে হচ্ছে ইণ্ডিয়ান-শটের দেয়ালসদৃশ সারি সারি কাণ্ডের মধ্যখানে। এঁকেবেঁকে এক ফুট এক ফুট করে এগোচ্ছি তখন। আংটার মতো দেখতে কাঁটা কখনও পিছন থেকে টেনে ধরছে কাপড়। আবার কখনও বাধ্য হয়ে কাঁটাঝোপ ডিঙাতে গিয়ে চামড়া ছিলে যাচ্ছে। কখনও কখনও পা ঢুকে যাচ্ছে শিকড়ের ফাঁদে। টেনেহেঁচড়ে বের করে আনতে গিয়ে যথেষ্ট ব্যথা পাচ্ছি তখন। এত ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বাতাস চলাচল করে কি না, অথবা করলেও কীভাবে করে তা ভেবে আমার কাছে আশ্চর্য লাগছে। গুমোট আবহাওয়ার কারণে দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে। যতটা না ক্লান্ত হয়েছি তারচেয়ে বেশি ক্লান্ত মনে হচ্ছে। সারা শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম পড়ছে।

মাথার উপর ছাতার মতো ছড়িয়ে আছে সারি সারি গাছের সবুজ পর্ণরাজি। নীচে বিস্তার লাভ করেছে অটুট নৈঃশব্দ্য আর কেমন একটা বিষাদময় আধো-অন্ধকার। আমাদেরকে দেখে ঘোঁত ঘোঁত শব্দে বিরক্তি প্রকাশ করছে এই জঙ্গলের আপাতত একমাত্র বাসিন্দা একজাতের বানর। ওদের সেই শব্দই থেকে থেকে ভেঙে দিচ্ছে চারপাশের নীরবতা। কখনও আবার অনেক দূরে, একশ' বছর বা তারও বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে-থাকার পর বিশাল কোনো গাছ গুরুগম্ভীর বজ্রপাতের মতো আওয়াজ তুলে আছড়ে পড়ছে, মাটি কেঁপে উঠছে তখন।

বানর ছাড়া আর কোনো চতুষ্পদ প্রাণী বা কোনো পাখির দেখা পাইনি এখন পর্যন্ত। তবে পোকা আছে লক্ষ লক্ষ। বেশিরভাগই বিষাক্ত। গ্যারাপ্যাটাস, ছোট ছোট গ্রে-ফ্লাই, উড-ওয়াস্প, বড় বড় কালো আর লাল পিঁপড়া—কোনোটার কামড় খেতেই বাদ থাকল না। প্রথমে উহ্-আহ্, শেষে ব্যথায় রীতিমতো আর্তনাদ শুরু হলো

আমাদের একেকজনের। শব্দ করলে বিপদ হতে পারে, মনে পড়ল তখন; কাজেই দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে লাগলাম।

দু'ঘণ্টা বা তার বেশি কিছু সময় কাটল এভাবে। ছোট্ট একটা নদীর সামনে হাজির হলাম আমরা। গভীর কিন্তু সঙ্কীর্ণ একটা উপত্যকার দিকে এগিয়ে গেছে নদীটা। পানি খাওয়ার জন্য যাত্রাবিরতি করলাম তীরে। এই সুযোগে একটু জিরিয়ে নেয়া যাবে, আবার চেহারায় বা ঘাড়ে-গলায় পানির ছিটাও দেয়া যাবে।

তীরের পাশে, মাটিতেই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল যিব্যালবে। আমার সম্ব্রেরো হ্যাটের গম্বুজে করে নদী থেকে পানি নিয়ে এলাম ওর জন্য। নদীতে নেমে পড়ল মায়া। বড়সড় একটা পাথরের উপর বসে পা দুটো ডুবিয়ে দিল পানিতে। ওর গোড়ালির উপর দিয়ে স্রোত বয়ে যাচ্ছে। পিঁপড়ার কামড় খেয়ে খেয়ে বেচারীর দুই পা ফুলে গেছে। কাঁটার খোঁচায় আর শিকড়ের ফাঁদে পড়ে কেটে গেছে জায়গায় জায়গায়।

মুখ তুলে তাকাল সে আমাদের দিকে, বলা ভালো সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের দিকে। সিনর তখন আমার পাশে, মায়ার দিকে উল্টো ঘুরে দাঁড়িয়ে আছেন, কথা বলছেন আমার সঙ্গে।

তাঁকে ডাকল মায়া, 'এই যে, শুনছেন?'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন সিনর।

'এখানে, এই পাথরের উপর, আমার পাশে এসে একটু বসবেন?' কোমল কণ্ঠে বলল মায়া।

আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন সিনর। তারপর গিয়ে বসলেন মায়ার পাশে।

'আপনার নাম জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করল মায়া।

'জেমস স্ট্রিকল্যাণ্ড,' বললেন সিনর।

যথেষ্ট কৌতূহল নিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে আছি আমি, শুনছি ওদের দু'জনের কথাবার্তা।

'জেমস স্ট্রিকল্যাণ্ড,' উচ্চারণ করতে কষ্ট হলো মায়ার, ঠিকমতো

বলতেও পারল না। 'আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেবো জানি না। আমার আর আমার বাবার জীবন বাঁচিয়েছেন আপনি। হোসে নামের ওই শয়তানটা হয়তো...অনেক বড় ক্ষতি করতে পারত আমার। ওকে শেষ করে দিয়ে চরম লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন আমাকে। এত বড় উপকার করার জন্য, আমি মায়া, লেডি অভ দ্য হার্ট স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে বলছি, এতদিন অনেক লোক আমার সেবা করেছে, আজ থেকে আমি আপনার সেবিকা হয়ে গেলাম।'

লেডি অভ দ্য হার্ট? কথাটার মানে কী? কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। এই মেয়েও কি আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্য?

যা-হোক, তাকিয়ে দেখি কিছুটা লজ্জা পেয়েছেন সিনর। বিব্রত গলায় বললেন, 'দেখো লেডি, আমার কাজকর্ম খুব কঠিন আর একঘেয়ে। দিনের পর দিন ধরে সে-সব করতে করতে অভ্যাস হয়ে গেছে আমার। কারও কাছ থেকে সাহায্য বা সেবা নেয়ার দরকার পড়ে না। তারপরও তোমার বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। কখনও সে-রকম কোনো প্রয়োজন হলে জানাবো। আরেকটা কথা। যা করেছি তার কৃতিত্ব কিন্তু আমার একার না। আমার বন্ধু ডন ইগনাশিয়োকেও ধন্যবাদ দেয়া উচিত তোমার,' হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিলেন আমাকে।

টানা কয়েকটা মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকল মায়া, যেন আমার চেহারা দেখে কিছু মনে করার চেষ্টা করছে। তারপর বলল, 'তাঁকেও ধন্যবাদ দিই আমি। তবে আমার বেশিরভাগ ধন্যবাদ আপনার জন্য। যে-শয়তানটা আমার চরম ক্ষতি করতে চেয়েছিল তাকে উপযুক্ত সাজা দিয়েছেন আপনি, সে-জন্য।'

'ধন্যবাদ দেয়ার সময় পরে আরও পাওয়া যাবে, লেডি। এখনও বিপদমুক্ত হতে পারিনি আমরা।'

'আমার ভয় কিন্তু অনেকখানি কেটে গেছে। আমাদের সেই বাড়িটাও আর বেশি দূরে না। তা ছাড়া ওই ভীষণ জঙ্গল পার হয়ে আমাদেরকে খুঁজে বের করাটাও ওদের জন্য সহজ হবে না।

...আরে, শুনতে পাচ্ছেন? ওটা কীসের আওয়াজ?'

অস্পষ্ট একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। অনেক দূর থেকে আসছে শব্দটা। মনে হচ্ছে যেন ঘণ্টা বাজাচ্ছে কেউ।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সিনর। মায়াকে বললেন, 'আমাদেরকে খুঁজে বের করাটা ওদের জন্য যত কঠিনই হোক, কাজ শুরু করে দিয়েছে ওরা।'

'কীভাবে?' উঠে দাঁড়িয়েছে মায়াও, বিচলিত হয়ে পড়েছে।

'কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে আমাদের পিছনে। শুনতে পাচ্ছ, ইগনাশিয়ো? আমাদের ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে এগিয়ে আসছে পেদ্রোর কুকুরের-পাল।' মায়ার দিকে তাকালেন। 'জলদি বলো কোন্‌দিকে যেতে হবে।'

'নদীর তীর ধরে এগোতে হবে।'

'তা হলে একটাই বুদ্ধি আছে। পানিতে নেমে পড়তে হবে আমাদেরকে, তবে বেশি গভীরে না। তীর বরাবর এগিয়ে যেতে হবে। তা হলে কুকুরগুলো আমাদের ঘ্রাণ পাবে না আর।'

কাহিল হয়ে পড়েছে যিব্যালবে। কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়াল কষ্ট করে। আমাদের সবার মতো নেমে পড়ল পানিতে।

কপাল ভালো, নদীটা তেমন চওড়া না। আবার বেশি গভীরও না। তবে স্রোত বেশ জোরালো। পানি ঠেলে এগোতে কষ্ট হচ্ছে আমাদের। কখনও কখনও পানির ধাক্কায় ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারছি না। ইচ্ছা না-থাকলেও পানির গভীরে নামতে হলো দু'বার, সাঁতরে এগোতে হলো। মনে ভয়, এই বুঝি কোনো কুমির এসে কামড়ে ধরে!

এক ঘণ্টার মতো এভাবে কখনও হেঁটে কখনও সাঁতরে এগিয়ে চললাম আমরা। এক জায়গায় এসে হঠাৎ থামল মায়া। বলল, 'এবার পানি ছেড়ে উঠতে হবে আমাদেরকে। সামনে নতুন আরেকটা জঙ্গল। ঢুকতে হবে সেটার ভিতরে।'

ততক্ষণে ক্লান্তির শেষসীমায় পৌঁছে গেছি আমরা। যিব্যালবের কথা বাদ দিলাম, আমার নিজের অবস্থাই শোচনীয়। মনে হচ্ছে কারও কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটা ছাড়া আর এক পা-ও এগোনো সম্ভব না। কিন্তু কে বহন করতে যাবে আমার ভার? তা ছাড়া যত দেরি করবো আমাদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা তত বাড়বে। কাজেই যিব্যালবে যখন বলল দরকার হলে অতিক্লান্তিতে মরতে রাজি সে তারপরও এখানে একমুহূর্তও থাকতে চায় না, তখন বাধ্য হয়ে নিজের উপর জোর খাটাতে হলো। পানি ছেড়ে উঠলাম তীরে, যত দ্রুত সম্ভব ঢুকে পড়লাম জঙ্গলের ভিতরে।

শ' তিনেক কদম এগোনোর পরই থমকে দাঁড়াতে হলো। উঁচু একটা টিলার সামনে হাজির হয়ে গেছি অনেকটা হঠাৎ করেই। টিলার উপরে, দুই দিকের ঢালে, এমনকী চারপাশে ঘন গাছপালার বিস্তার। সারি সারি কাণ্ডের ফাঁক দিয়ে ভালোমতো তাকালে চোখে পড়ে খসে-পড়া অথবা পড়পড় করছে এমন কিছু পাথরের স্তূপ।

'এই সেই জায়গা,' বলল যিব্যালবে। 'ওই যে পাথরের স্তূপের মতো দেখা যাচ্ছে, ওটা আসলে একটা মন্দির। মানে এককালে মন্দির ছিল আর কী। উপরে ওঠার জন্য সিঁড়ি আছে—এই যে, এদিকে,' হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিল ধাপগুলো।

তাকালাম। সিঁড়ি না-বলে সিঁড়ির মতো করে কাটা মাটি বলা উচিত। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় থাকতে থাকতে গুচ্ছ গুচ্ছ ফার্ন আর ঝোপঝাড়ের নীচে চাপা পড়ে গেছে ধাপগুলো। এখান দিয়ে ওঠা, আর কোনো খাড়া পর্বতের চূড়া বেয়ে ওঠা, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সমান কথা।

যতদূর বুঝতে পারছি টিলাটা আসলে প্রাকৃতিক না। কিংবা প্রাকৃতিক হলেও কোনো এককালে পিরামিডের মতো করে কাটা হয়েছিল। এর চূড়ায় স্থাপন করা হয়েছিল মন্দিরটা। এখানে পূজা দিতে আসত ইণ্ডিয়ানরা।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলাম আমরা। নিজের চওড়া কাঁধের

উপর যিব্যালবেকে তুলে নিয়েছে মোলাস। এত কষ্ট করে এত দূর আসার পর বুড়োর পক্ষে এই বিপজ্জনক সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা এককথায় অসম্ভব।

সিঁড়ির উপরের দিকের ধাপগুলো এখন আর আস্ত নেই, ভেঙে প্রায় মিশেই গেছে মাটির সঙ্গে। হয়তো এককালে চওড়া আর চমৎকার টেরেসের মতো ছিল জায়গাটা। এখন সে-জায়গায় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে টুকরো টুকরো পাথর। টিলার গায়েও এখানে-সেখানে ফাটল ধরেছে। সে-সব জায়গা দিয়ে মাথা বের করে দিয়েছে সুযোগসন্ধানী ঝোপ বা বড় বড় গাছ। দেখতে পাচ্ছি, শেষ ধাপের কাছে এখনও দাঁড়িয়ে আছে একটা আর্চওয়ে। তাতে বিভিন্ন দেবদেবীর চেহারা আর জন্তুজানোয়ারের শরীর খোদাই-করা। পড় পড় করছে খিলানসদৃশ পাথরের-প্রবেশদ্বারটা। যে-কোনো সময়, হতে পারে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ধসে পড়বে।

আর্চওয়ের মাথায় বিশাল একটা পাথর আলগা হয়ে আছে। কমপক্ষে দু' শ' টন ওজন হবে পাথরটার। সময় আর বৃষ্টির কারণে ভিত্তি থেকে আলগা হয়ে গেছে সেটা। অথবা কখনও হয়তো প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল, তখন সরে এসেছে অনেকখানি। বেশ বড় একটা গাছের শক্ত একটা ডাল প্রকৃতির খেয়ালেই ওই পাথরের সামনে দিয়ে বেড়ে উঠেছে; সে-জন্যই হয়তো এতদিনে খসে পড়েনি পাথরটা।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে আবারও যতখানি সম্ভব দেখলাম চারদিকে। খিলান ছাড়িয়ে এখন চোখে পড়ছে একতলা মন্দিরটার কিছু অংশ। এটার অবস্থাও সুবিধার না। চ্যাপ্টা ছাদওয়ালা কেমন লম্বাটে একটা কাঠামো। চারদিকে গুল্ম আর ঝোপজঙ্গলের ছড়াছড়ি।

যা-হোক, যথেষ্ট কসরত করে টিলার উপরে হাজির হলাম আমরা একসময়। খিলান পার হয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম মন্দিরের দরজার কাছে। আরও একবার গাইডের ভূমিকা পালন করল মায়া,

আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল মন্দিরের ভিতরে। খেয়াল করলাম মোটামুটি বড় একটা কামরায় উপস্থিত হয়েছি। ঘরের চারদিকে ছোটবড় প্রস্তরখণ্ড। সেগুলোর বেশিরভাগে, জানি না কেন, শুধু সাপের ছবি খোদাই-করা। মেঝের এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে ছাই আর পোড়াকাঠ। এককোনায় স্তূপ হয়ে পড়ে আছে কিছু কাগজপত্র। একটা বহু-পুরনো আর শত-ছিদ্রযুক্ত আলখাল্লা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে সেগুলো। ত্রস্তপায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল মায়া। টান মেরে সরিয়ে দিল আলখাল্লাটা। ধুলোমাখা কাগজগুলো ছাড়াও দেখা যাচ্ছে একটা মাটির-কুকিংপট, একটা তামার-কুড়াল, কারুকার্যখচিত দুটো ব্লো-পাইপ আর বিষমাখানো কিছু ডার্ট এবং কয়েকটা ব্যাগ—সেগুলোতে শুকনো মাংস আর মটরশুঁটি। এককোনায় বড় একটা পাত্রে খাওয়ার পানি।

'সব ঠিক আছে,' বলল মায়া। 'চলুন ঝটপট খেয়ে নিই। শক্তি ফিরে পাবো, বিপদের মোকাবেলা করতে পারবো।'

বুঝতে পারছি, এই সেই মন্দির যার কথা বলেছিল মোলাস। প্রথমে এখানেই আস্তানা গেড়েছিল যিব্যালবে আর মায়া। ডন পেদ্রোর বাড়ি থেকে পালানোর পর, অন্য কোনো জায়গা চেনে না বলে আশ্রয় নেয়ার জন্য এই মন্দিরের কথা বলে যিব্যালবে। ভুল করেছে বেচারা, ভুল করেছি আমরাও—ধূর্ত ডন পেদ্রোর অনুমান করতে কষ্ট হয়নি কোন্‌দিকে যেতে পারি আমরা। আমাদের পিছনে হাউণ্ড লেলিয়ে দিয়ে বুঝে ফেলেছে সে ওর অনুমান ঠিক। এখন এগিয়ে আসছে অমোঘ নিয়তির মতো।

শুকনো মাংস চিবুচ্ছি, এমন সময় স্প্যানিশ ভাষায় আমাকে বললেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড, 'আমি ভেবেছিলাম আমাদেরকে না-পেয়ে হয়তো আশা ছেড়ে দেবে ডন পেদ্রো। পিছু ধাওয়া করবে না।'

'শুধু ছেলের হত্যার প্রতিশোধ নিতেই না, নিজের নিরাপত্তার খাতিরেও আমাদেরকে খুঁজে বের করে শেষ করতে চাইবে সে,' বললাম আমি। 'আশা করছি নদীর তীর পর্যন্ত এসে আমাদের ঘ্রাণ

হারিয়ে ফেলবে কুকুরগুলো।'

'তাতে কি আদৌ কিছু আসবে-যাবে? আমরা কোথায় আছি অনুমান করতে কি বেশি কষ্ট হবে পেদ্রোর?'

'সেক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে আমাদেরকে।'

'বিকল্প মানে? '

'সিনর, আমাদের তিনজনের পক্ষে পালানোটা যেমন সহজ, যিব্যালবে আর মায়াকে সঙ্গে নিয়ে কাজটা করা ঠিক ততটাই কঠিন। আমার ধারণা পেদ্রো বুঝে ফেলেছে কোথায় আছি আমরা। আজ বাদে কাল সে ঠিকই হাজির হয়ে যাবে এখানে। কিন্তু এই টিলার উপরে উঠে আসতে ওরও কষ্ট হবে। কথা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কী করবো আমরা? মোকাবেলা করবো শত্রুর? তেমন কোনো অস্ত্র নেই আমাদের কাছে। আবার একেবারে নিরস্ত্রও না আমরা। যদি যিব্যালবে আর মায়াকে ছেড়ে যেতে না-চান তা হলে আমার মনে হয় লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত আমাদের।'

'কিন্তু প্রস্তুতিটা নেবো কীভাবে? তলোয়ার, কুড়াল, ছুরি এবং কিছু ডার্টসহ দুটো ব্লো-পাইপ ছাড়া আর কী আছে আমাদের কাছে? পানিতে ভিজে অকেজো হয়ে গেছে আমার পিস্তলের বারুদ, কাজেই পিস্তল থাকা না-থাকা সমান কথা। তারমানে আক্রান্ত হলে আমাদের মৃত্যুর সম্ভাবনা শতকরা একশ' ভাগ।'

'আপাতদৃষ্টিতে তা-ই মনে হয়,' একমত হলাম আমি। 'সিনর, এখন অদৃষ্টবাদী হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। আমাদের সামর্থ্যে যতদূর কুলায় চেষ্টা করবো, তারপরও সবকিছু ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি আমি। তিনি চাইলে বেঁচে থাকবো, না-চাইলে মরবো। ...আশপাশে ছোটবড় অনেক পাথরের-টুকরো দেখলাম। চলুন খাওয়া শেষে সেগুলো তুলে নিয়ে জড়ো করি খিলানটার আশপাশে। শত্রুরা যদি সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসার চেষ্টা করে, একের পর এক পাথর গড়িয়ে দেবো ওদের দিকে। পাথরচাপা পড়ে যদি না-ও মরে, দু'-একজন যে গুরুতরভাবে আহত হবে

সন্দেহ নেই।'

খাওয়া শেষে পাথর কুড়ানোর কাজে লেগে গেলাম আমরা তিনজন। যিব্যালবেকে শুইয়ে দিয়ে বাইরে এসে আমাদের কাজ দেখছে মায়া। সব পাথর প্রায় জড়ো করে ফেলেছি, এমন সময় হঠাৎ করেই নদীর তীর থেকে ভেসে এল কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ। ঝোপ পেটাচ্ছে ঘোড়সওয়ারেরা, সে-শব্দও শুনতে পাচ্ছি।

'ওরা আসছে,' নিচু গলায় বলল মোলাস।

'যদি তা-ই হয় তা হলে আমি চাই তাড়াতাড়ি আসুক। বাঁচি বা মরি—যা ঘটার ঘটে যাক। এত উৎকণ্ঠা আর ভালো লাগে না।'

'কেন, সিনর? আপনার কি ভয় লাগছে?' জানতে চাইল মায়া।

'হ্যাঁ, লাগছে,' ভেবেছিলাম রেগে গেছেন, তার বদলে আশ্চর্য হয়ে দেখি সুন্দর করে হাসলেন সিনর। পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মায়ার দিকে। 'কারণ মরতে যদি হয়ই, এত যন্ত্রণা সহ্য করে মরবো কেন? কই, ডন হোসে তো আমার চেয়ে কত বড় পাপী; সে এত সহজে, মুহূর্তের মধ্যে মরে গেল, সেখানে আমাকে কেন তিলে তিলে মরতে হবে? আজ বাদে কাল তুমি মরে যাবে—এ-কথাটা ভাবলে তোমার ভয় হয় না?'

কাঁধ ঝাঁকাল মায়া, সিনরের চেয়েও সুন্দর করে হাসল। 'না, হয় না। বরং কিছুটা হলেও স্বস্তি পাই। পৃথিবী জঘন্য একটা জায়গা। এত দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ভাবলে খারাপ লাগে না। তা ছাড়া কার জন্য বাঁচবো?' করুণ হয়ে উঠল বেচারীর চেহারা। 'কে বা কী আছে আমার? যাওয়ার মতো একটাই জায়গা আছে—নিজের দেশ। কিন্তু সেখানে ফিরে যাওয়াটা যেমন কষ্টকর, থাকাটাও তেমন কষ্টকর। কাজেই আপনারা যদি মারা যান তা হলে কয়েক মিনিটের মধ্যে আমিও মরবো।'

'এত নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে?'

ব্লো-পাইপের একটা ডার্ট সিনরের চোখের সামনে ধরল মায়া। 'এই যে, এভাবে। এই ডার্টের মাথায় বিষ মাখানো আছে। যখন

বুঝবো সব শেষ, আমার গলার ভিতর ঢুকিয়ে দেবো এটা। এক মিনিটের মধ্যেই অচেতন হয়ে যাবো। দু'মিনিটের মধ্যে মৃত্যু সুনিশ্চিত।'

'বুঝলাম। কিন্তু তোমার কথা শুনে আশ্চর্য না-হয়ে পারছি না। তোমার বয়স কম, তা ছাড়া তুমি খুবই সুন্দরী। তোমার তো জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত।'

'একসময় করতাম, সিনর। কিন্তু বাস্তব জীবন এত রুক্ষ আর এত কঠিন যে, আমার সব চিন্তাভাবনা বদলে গেছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মায়া।

কিছু বলতে যাচ্ছিলেন সিনর, কিন্তু নীচের দিকে তাকিয়ে কিছুটা চমকে উঠলেন। জরুরি কণ্ঠে বললেন, 'দেখো, দেখো! ওই যে আসছে ওরা!'

তিনি যে-দিকে ইশারা করছেন তাকালাম সে-দিকে। ওরা সব মিলিয়ে সাত-আটজন হবে। চারজন ঘোড়সওয়ার। ধীর কিন্তু স্থির গতিতে এগিয়ে এসে টিলার পাদদেশে থামল লোকগুলো। ঘোড়সওয়ারেরা নামল ঘোড়ার পিঠ থেকে। গাছের সাথে বাঁধছে ঘোড়াগুলোকে।

সিনর বললেন, 'ভাবছি, আজ সূর্যাস্তের পর আমাদের এই পাঁচজনের কেউ জীবিত থাকবে কি না!'

শত্রুপক্ষের একজন ততক্ষণে পৌঁছে গেছে সিঁড়ির সবচেয়ে নীচের ধাপের কাছে। লোকটার হাতে চামড়া দিয়ে বানানো দড়ি, তাতে বিশাল একটা হাউণ্ড বাঁধা। আশপাশের পাথরগুলো কিছুক্ষণ শুঁকল কুকুরটা। তারপর মুখ তুলে উপরের দিকে তাকিয়ে গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। ঝোপের আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখি, খুশিতে হাসছে লোকগুলো। ওরা বুঝে গেছে শিকারের নাগাল পেয়ে গেছে এবং আমাদের পালানোর কোনো পথ নেই। ভেবেছিলাম দেরি না-করে বোধহয় উঠে আসতে শুরু করবে সিঁড়ি বেয়ে। কিন্তু তেমন কোনো তাড়াহুড়ো দেখা যাচ্ছে না ওদের মধ্যে।

আগের জায়গাতেই আছে ওরা। কীভাবে কী করবে সে-ব্যাপারে পরামর্শ করছে।

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। বুঝতে পারছি সময় হয়ে গেছে। পালানো সম্ভব না, পাঁচ-দশ মিনিটের বেশি লড়াই করাও সম্ভব না। এই খুনিদের হাতে আমাদের মরণ সুনিশ্চিত।

লোকগুলোর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ করেই বললেন সিনর, 'ওদের সঙ্গে কি আলোচনা করা যায়, ইগনাশিয়ো?'

'অসম্ভব,' এককথায় জানিয়ে দিলাম। 'এখানে আলোচনা করার কিছু নেই। আমাদেরকে খুন করার জন্য এসেছে ওরা। কাজেই আমাদের সঙ্গে কথা বলার কোনো দরকারই নেই ওদের।'

'তা হলে তো বীরের মতো লড়াই করতে করতে মরা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই। স্বর্ণশহরের খোঁজে বেরিয়েছিলাম, আজ এখানেই আমাদের সেই খোঁজ শেষ হলো। বেশিরভাগ অ্যাডভেঞ্চারের ফল ভালো হয় না, ইগনাশিয়ো।'

খোঁড়াতে খোঁড়াতে কখন যেন আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে যিব্যালবে, টের পাইনি। সিনরের মন্তব্য শুনে বলে উঠল, 'একটা কথা বুঝতে পারছি না। আপনারা পালিয়ে যাচ্ছেন না কেন? টিলার আরেকদিকের ঢাল বেয়ে নীচে নেমে যান। কাজটা করতে কষ্ট হবে, কিন্তু পালিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকতে পারলে বেঁচে যেতেও পারেন।'

'কীভাবে পালাবো? ওই ঢাল বেয়ে আমাদের সঙ্গে নামতে পারবেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন সিনর।

'আমার কথা বাদ দিন। অনেক বয়স হয়েছে আমার। এমনিতেও মরার সময় হয়ে গেছে। আমাকে এখানেই রেখে চলে যান আপনারা। নিশ্চিত থাকুন, আমাকে জ্যান্ত অবস্থায় কব্জা করতে পারবে না শয়তানগুলো। মায়া, তুইও চলে যা এঁদের সঙ্গে। পবিত্র প্রতীকটা নিয়ে যা সঙ্গে করে। যদি পালাতে পারিস, যদি ইগনাশিয়ো নামের এই লোকটাকে সৎ মনে হয় তা হলে ওঁদেরকে নিয়ে যাবি

আমাদের দেশে। এরপর যা হওয়ার হবে।'

'তোমাকে রেখে কোথাও যাবো না আমি, বাবা,' দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিল মায়া। 'বাঁচলে একসঙ্গে বাঁচবো, মরলে একসঙ্গে মরবো। ইচ্ছা হলে যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারেন এই সিনরেরা। কিন্তু আমি আছি তোমার সঙ্গে।'

'এবং আমিও আছি,' বলে উঠল মোলাস। 'কারণ পালাতে পালাতে আমি যার-পর-নাই ক্লান্ত। তা ছাড়া আমাদের পালানোর সময় শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। এখন টিলার যেদিক দিয়েই নামি না কেন, ওদের চোখে ধরা পড়ে যাবো। ...দেখুন! সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে ওরা আটজন। সবার সামনে ডন পেদ্রো আর ওই আমেরিকানটা।'

তাকালাম। ঠিকই বলেছে মোলাস। ইতোমধ্যেই অর্ধেকটা পথ ওঠা হয়ে গেছে ওদের।

'ইস্‌স্‌! একটা রাইফেল যদি থাকত আমার কাছে!' সিনরের কণ্ঠে আক্ষেপ।

কেউ কিছু বলল না।

'কিছু একটা করা দরকার,' আবারও মুখ খুললেন সিনর। 'আর কাছে আসতে দেয়া যায় না লোকগুলোকে। যে-পাথরগুলো কুড়িয়ে জড়ো করেছি আমরা, চলো সবচেয়ে ভারীটা প্রথমে গড়িয়ে দিই ওদের দিকে।'

একছুটে গিয়ে হাজির হলাম পাথরের স্তূপের কাছে। আমরা তিনজনে মিলে সবচেয়ে ভারী পাথরটা গড়িয়ে দিলাম পেদ্রোবাহিনীর দিকে। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। হুড়মুড় করে কিছুদূর নামার পরই বিশাল এক গাছের প্রকাণ্ড শিকড়ের সঙ্গে আটকে গেল পাথরটা। আলগা কিছু মাটি খসে পড়ল শত্রুদের উপর। আমাদের উদ্দেশ্য বুঝে গেল ওরা, সবাই সেঁটে গেল সিঁড়ির সঙ্গে।

ধুলো কেটে যাওয়ামাত্র সঙ্গে-করে-আনা রাইফেল হাতে নিল ওরা, গুলি করতে লাগল। আমাদের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে

যাচ্ছে বুলেট। কোনো ক্ষতি হলো না, কিন্তু বুঝতে পারছি এই জায়গায় এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে গুলি লাগবেই গায়ে। সরে আসতে বাধ্য হলাম। বিশালাকার সেই খিলানের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলাম তিনজনে।

আবার উঠে আসছে পেদ্রোবাহিনী। বুঝে গেছে পাথরের স্তূপের কাছ থেকে সরে গেছি আমরা। খুশিতে ঝকঝক করছে একেকজনের চেহারা। কিছুদূর উঠে থামল ওরা, দম নিচ্ছে। এই সুযোগে মোলাস একটা ব্লো-পাইপ নিয়ে ছুটে গেল টেরেসের দিকে। ওর পিছু পিছু ছুট লাগালেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডও। তিনি কেন গেলেন বুঝতে পারছি না। ব্লো-পাইপ কীভাবে ব্যবহার করতে হয় জানেন না তিনি, কখনও করেননি সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আজকের আগে কখনও দেখেছেন কি না তাতেও সন্দেহ আছে।

মোলাস বা সিনরের উপস্থিতি টের পায়নি পেদ্রোবাহিনীর কেউ। ব্লো-পাইপটা মুখের সঙ্গে ঠেসে ধরল মোলাস। ফুঁ দিল সর্বশক্তিতে। সৌভাগ্যক্রমেই হোক অথবা অলৌকিকভাবেই হোক, ডার্ট উড়ে গিয়ে ঢুকে গেল সেই আমেরিকান স্মিথের গলার অনেকখানি ভিতরে। এক্ষেত্রে অন্য সবাই যা করবে সে-ও তা-ই করল—গলার কাছে হাত তুলে খুলে ফেলার চেষ্টা করল ডার্টটা। খুলে হাতে নিয়েছে, এমন সময় হঠাৎ করেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে। কাটাগাছের মতো উল্টে পড়ল। সিঁড়ি বেয়ে ওর অচেতন দেহটা হুড়মুড় করে নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে।

শুরু হলো আরেক পশলা বুলেটবৃষ্টি। আবারও ছুট লাগালেন সিনর আর মোলাস। কিন্তু হঠাৎই পড়ে গেল মোলাস। থেমে গেলেন সিনর, কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে ধরাধরি করে তুললেন মোলাসকে। তারপর দু'জনে দৌড়াতে শুরু করলেন আবার। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আড়াল নিলেন সুবিধাজনক জায়গায়।

'কোনো সমস্যা?' সিনরকে জিজ্ঞেস করলাম উঁচু গলায়।

'তেমন কিছু না,' জবাব দিলেন তিনি। 'আমার গালে আঁচড়

দিয়ে বেরিয়ে গেছে একটা বুলেট। কিন্তু মোলাসের গায়ে গুলি লেগেছে।'

'কিছুই হয়নি আমার,' গলা শুনেই বোঝা গেল খারাপ কিছু হয়েছে মোলাসের।

নীরবতা। স্মিথকে হারিয়ে থমকে গেছে পেদ্রোবাহিনী। বাকি পথটুকু উঠে আসার সাহস হচ্ছে না কারও। পরের ডার্টটা কার গায়ে বিঁধবে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত না কেউই। কে যেন ফোঁপাচ্ছে। ঘাড়টা সামান্য ঘুরিয়ে দেখি, ঝোপের আড়ালে আড়ালে সিনরের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে মায়া। তাঁর ক্ষত দেখে কান্না চেপে রাখতে পারেনি সম্ভবত। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বাসা বেঁধেছে মাকড়সা, সেগুলোর জাল ছিঁড়ে নিয়ে একসঙ্গে করে সিনরের রক্ত মুছিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।

'খামোকা পরিশ্রম করে কী লাভ, লেডি?' বললেন সিনর, তাঁর ঠোঁটের কোনায় করুণ হাসি। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও বড় ক্ষত তৈরি হবে শরীরের আরও অনেক জায়গায়। তখন কী করবে?'

জবাব দিল না মায়া।

ঝোপের আড়াল থেকে সাবধানে উঁকি দিলাম নীচে।

একটা গাছের শিকড়ের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে সেখানেই আটকে গেছে স্মিথের লাশ। ওকে ঘিরে আছে পেদ্রোর দু'-চারজন চ্যালা। বাকিরা কাঁধে রাইফেল ঠেকিয়ে সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে উপরের দিকে। খুঁজছে আমাদেরকে, দেখামাত্র টান দেবে ট্রিগারে।

'কিছুই কি করার নেই?' হতাশ গলায় জিজ্ঞেস করলেন সিনর। 'কোনোভাবেই কি বাঁচতে পারি না আমরা?'

জবাব দিল না আমাদের কেউ।

বুকের যেদিকে গুলি লেগেছে সেদিকটা একহাতে চেপে ধরে এতক্ষণ মাটিতে শুয়ে ছিল মোলাস। খিলানের দিকে তাকিয়ে থেকে দেখছিল কী যেন। হঠাৎ একলাফে উঠে দাঁড়াল সে। পরমুহূর্তেই ছুট পাগাল মন্দিরের উদ্দেশে। ঢুকল ভিতরে, কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে

এল বাইরে, হাতে তামার কুড়ালটা। একটা কথাও বলল না, পেদ্রোবাহিনীর বুলেটবৃষ্টির তোয়াক্কা না-করে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় চড়ে বসল খিলানের উপর।

আগেও বলেছি, সেখানে বিশাল একটা পাথর আলগা হয়ে আছে; সামনে মোটা একটা ডাল। সুবিধাজনক জায়গায় বসে একের পর এক কোপ মারতে লাগল মোলাস, উদ্দেশ্য কেটে ফেলবে ডালটা। তারপর বাড়ি দিয়ে নীচে ফেলবে দু'শ' টন ওজনের পাথরটাকে। যে-পাথরটা আমরা গড়িয়ে দিয়েছিলাম পেদ্রোবাহিনীর দিকে তারচেয়ে অনেকগুণে ভারী এই পাথর; এটা ওদের উপর আছড়ে পড়লে কী হবে ভাবতে পারছি না।

'নামো মোলাস!' চিৎকার করে বললেন সিনর। 'পাথরটা খসে পড়লে খিলানটাও ধসে পড়বে। স্রেফ ভর্তা হয়ে যাবে তুমি।'

'এমনিতেও মরবো,' কাজ করতে করতে জবাব দিল মোলাস। 'আমার বুক ফুটো করে দিয়েছে বুলেট। টের পাচ্ছি রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়ছি একটু একটু করে। কাজেই মরতেই যদি হয়, বীরের মৃত্যুই ভালো। আমার জন্য প্রার্থনা করবেন আপনারা। বিদায়।'

আবারও নীচে তাকালাম আমি। প্রায় সত্তর ফুট নীচে আছে পেদ্রোবাহিনী। দ্বিধার মধ্যে পড়ে গেছে ওরা। কুড়ালের কোপের ভোঁতা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটা কী বুঝতে পারছে না। ডন পেদ্রোর সঙ্গে কী নিয়ে যেন তর্ক করছে বাকিরা। ওকে কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করছে সবাই মিলে। কিন্তু রাজি হচ্ছে না দুর্ধর্ষ লোকটা। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল ওরা, উপরে উঠবে। দখল করে নেবে মন্দির। খুন করবে আমাদের সবাইকে।

দুই মিনিট কাটল। কুপিয়ে চলেছে মোলাস। একটু একটু করে উঠে আসছে পেদ্রো আর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা।

'পঞ্চাশ ফুট,' বিড়বিড় করলাম আমি।

আর একটুখানি কোপ লাগলেই আলগা হয়ে যাবে গাছের ডাল, এমন সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ভেঙে গেল মোলাসের

কুড়ালটা। হাতল থেকে ফলা আলগা হয়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে।

শত্রুদের দিকে তাকালাম। ত্রিশ কি বেশি হলে পঁয়ত্রিশ ফুট নীচে আছে ওরা।

আবারও তাকালাম মোলাসের দিকে। কুড়ালের হাতল ফেলে দিয়ে এবার ওর বিশাল হান্টিং-নাইফ হাতে নিয়েছে সে। ওটা দিয়ে যতটা জোরে সম্ভব কোপ দিচ্ছে গাছের ডালে। শেষপর্যন্ত ভেঙে গেল ডালটা, কিন্তু আলগা হয়ে পড়ল না। কাটা অংশটা ঝুলে পড়ে কোনোরকমে লেগে থাকল মূল ডালের সঙ্গে।

'নেমে এসো, মোলাস!' চিৎকার করে উঠলেন সিনর। 'জলদি!'

কিন্তু কে শোনে কার কথা? মোলাস ভেবেছিল ডালটা সরে গেলেই হুড়মুড় করে খসে পড়বে বিশাল পাথরটা, কিন্তু তা হয়নি। ছুরিটা আর কোনো কাজে লাগবে না বুঝে সেটা ফেলে দিয়েছে সে। পা দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে দুই হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে খিলানের উপর শুয়ে পড়েছে উপুড় হয়ে। দু'শ' টন ওজনের আলগা পাথরটা ঠেলছে সর্বশক্তিতে।

ওর সেই ধাক্কাই যথেষ্ট ছিল। প্রথমে মনে হলো একচুল নড়ছে না পাথরটা। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরই দেখি বছরের-পর বছর-ধরে-জমা ধুলো খসে খসে পড়ছে পাথর আর খিলানের মাঝখানের ভাঙা অংশটা দিয়ে। আসলে ডাল আর ধুলোর কারণেই এতদিন স্থানচ্যুত হয়নি পাথরটা। এবার সব বাধা সরে গেছে; নীচের দিকে কাত-হয়ে-থাকা বিশাল পাথরটা আরও হেলে পড়ছে। যত হেলছে তত বাড়ছে ওটার গতি। শেষপর্যন্ত আছড়ে পড়ল সামনের ওই গাছটার গোড়ায়।

মাটি হঠাৎ বসে গেলে যে-রকম শব্দ হয় সে-রকম ত্রাসোদ্দীপক শব্দ শোনা গেল। মাছ টান দিলে ছিপ যেভাবে বেঁকে যায়, পাথরের ধাক্কায় সেভাবে বেঁকে গিয়ে শিকড়সহ উপড়ে পড়ল গাছটা। শেষবারের মতো চেষ্টা করল এতদিনের "সঙ্গী" পাথরটাকে আটকে রাখার, কিন্তু জায়গাটা ঢালু বলে পারল না। নিজের ওজনের সমান

তাল তাল মাটি আলগা করে নিয়ে নীচের দিকে গড়িয়ে নামছে জগদ্দল পাথরটা।

শেষবারের মতো তাকালাম শত্রুদের দিকে। ওরা বুঝে গেছে কী হচ্ছে। ভয়াবহ আর্তনাদ করে উঠল কেউ, এমনটা আর শুনিনি কখনও। বাকিরা কী করবে ভেবে না-পেয়ে মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছে। শুধু ডন পেদ্রো লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে।

ষাট ফুট লম্বা আর বিশ ফুট চওড়া পাথরটা খিলানের ভিত্তির কাছের প্রায় সব মাটি ধসিয়ে নিয়ে গেছে। আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই এবার কাত হতে শুরু করল খিলানটা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। যেন চুম্বকের টানে সিঁড়ির উপর কাত হয়ে পড়ল খিলানটা, সঙ্গে মোলাস। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে দু'টুকরো হয়ে গেল ধনুকাকৃতির খিলান। একটা স্তম্ভ আটকে গেল কীভাবে যেন, আরেকটা মোলাসকে নিয়ে গড়াতে গড়াতে নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে।

নামছে পাথর। নামছে খিলানের ভাঙা স্তম্ভ। সিঁড়ির প্রতিটা ধাপ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যতবার গড়াচ্ছে পাথরটা ততবার টন টন মাটি খসে পড়ছে নীচের দিকে। মেঘের গুড়গুড় ডাকের মতো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। নামার সময় যত গাছ পাচ্ছে সব যেন প্রচণ্ড আক্রোশে হ্যাঁচকা টানে তুলে নিয়ে যাচ্ছে দানবীয় পাথর।

এক মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে গেল সবকিছু। আওয়াজ থেমে গেছে। টিলার যেখানে আগে সিঁড়ি ছিল সেখানে এখন ধুলো উড়ছে। কতগুলো মানুষ, বলা উচিত ভর্তা হওয়া লাশ পড়ে আছে ঢালের উপর।

যা-হোক, ধুলো কেটে যাওয়ার পর সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড বললেন, 'চলো, ইগনাশিয়ো, নীচে গিয়ে মোলাসের লাশটা খুঁজে বের করি। ওকে যথাযথভাবে দাফন করা উচিত আমাদের।'

যিব্যালবেকে মন্দিরে রেখে আমরা তিনজনে নেমে এলাম নীচে।

কিন্তু মোলাসের লাশ খুঁজে পাওয়া গেল না। প্রকৃতিই নিজের হাতে টিলার কোথাও-না-কোথাও দাফন করে দিয়েছে এই মহান বীরকে। ওর লাশ পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে ক্ষান্ত দিলাম আমরা।

সিঁড়ির বেশিরভাগ ধাপই ভেঙে গেছে। এখন এটাকে সিঁড়ি না-বলে ঢাল বললেই মানায় বেশি। এখানে-সেখানে পড়ে আছে পেদ্রোর সাঙ্গপাঙ্গদের লাশ। এদের কাছ থেকে রাইফেল কিংবা কাজে লাগতে পারে এমন অন্যান্য জিনিস নিয়ে নিতে দ্বিধা বোধ করলাম না। তবে তেজী আর স্বাস্থ্যবান চারটা ঘোড়া পেয়ে আমাদের উপকার হলো সবচেয়ে বেশি। পেদ্রোবাহিনীর চার সদস্য এই ঘোড়াগুলোর পিঠে চেপে হাজির হয়েছিল এখানে। টিলার পাদদেশে, গাছের সঙ্গে জন্তুগুলোকে বেঁধে রেখে উপরে উঠেছিল ওরা।

একটা ঘোড়ার স্যাডলব্যাগে পাওয়া গেল বেশ কিছু বুলেট আর অন্যান্য রসদ। তারমানে আমাদেরকে খুঁজে বের করতে অনেকদিন সময় লাগতে পারে ধরে নিয়েই রওয়ানা হয়েছিল ডন পেদ্রো।

ঘোড়াগুলো তেজী হলেও বেয়াড়া না। ওগুলোকে পোষ মানাতে বেশি সময় লাগল না আমার আর সিনরের। টিলার কাছেই ঘাসে-ছাওয়া বিস্তৃত মাঠ, সেখানে নিয়ে গিয়ে ঘাস-পানি খাওয়ালাম। এরপর মন্দিরের পথ ধরলাম।

ঢাল বেয়ে উপরে উঠছি, এমন সময় উপড়ে-পড়ে-থাকা একটা গাছের আড়াল থেকে ক্ষীণ গলায় বলে উঠল কেউ, 'পানি!'

কাছে গিয়ে চমকে উঠতে হলো আমাদেরকে।

ডন পেদ্রো মোরেনো!

আশ্চর্য! অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে লোকটা!

লাফিয়ে নামতে শুরু করেছিল সে, সে-জন্য দু'শ' টন ওজনের পাথরটা সরাসরি আঘাত করতে পারেনি ওকে। বরং তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট অন্য একটা পাথর ছিটকে গিয়ে পড়ে ওর উপর। সম্ভবত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, ওর কিছু হাড়গোড়ও

ভেঙেছে বোধহয়। কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেছে শয়তানটা।

আরও কাছে গেলাম আমরা। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে আবারও ফরিয়াদ জানাল রক্তাক্ত ডন পেদ্রো, 'পানি! পানি!'

একটা ঘোড়ার স্যাডলব্যাগে এক ফ্ল্যাস্ক পানি আর একটা ব্র্যাণ্ডির বোতল পাওয়া গেছে, ফ্ল্যাস্কের কাপে পানি ঢেলে তার সঙ্গে কিছুটা ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে পেদ্রোকে খেতে দিলেন সিনর।

মায়া বলে উঠল, 'আপনার মনে দেখা যাচ্ছে অনেক দয়া। যে-লোক আপনাকে খুন করার জন্য দলবলসহ পিছু ধাওয়া করে এতদূর এসেছে, যার জন্য মোলাসের মতো এত বিশ্বস্ত একজন সঙ্গীকে হারালেন, তাকেই এখন পানি খেতে দিচ্ছেন? দয়া করে নিষ্ঠুর মনে করবেন না আমাকে, কিন্তু আপনার জায়গায় আমি থাকলে কখনোই করতাম না কাজটা। কারণ কুকুরের সঙ্গে কুকুরের মতোই ব্যবহার করা উচিত।'

মায়ার কষ্টটা বুঝতে পারলেন সিনর। নিচু গলায় বললেন, 'শত্রুকে দয়া করলাম, কারণ তাতে হয়তো আমাদের উপর দয়া করতে পারেন ঈশ্বর। এর বেশি কিছু না।'

'আমি মরে যাচ্ছি,' কোঁকাচ্ছে পেদ্রো। 'সবসময় যা ভয় করতাম তা-ই সত্য হলো—একটা পরিত্যক্ত অতি-প্রাচীন নিদর্শনের কাছে এসেই মরতে হচ্ছে আমাকে। কিন্তু...কিন্তু...আমার তো মৃত্যুকে ভয় পাওয়া উচিত না। আমি দুর্ধর্ষ পেদ্রো—ছেলেবেলা থেকেই যে একজন চোর, একজন খুনি!'

কাঁধ ঝাঁকালেন সিনর।

পাথরের বাড়ি খেয়ে পেদ্রোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে কি না ভাবছি আমি।

'আমাকে বাঁচাও!' পেদ্রোর কণ্ঠে আকুতি, 'যেভাবেই হোক বাঁচাও আমাকে!'

ওকে আপাদমস্তক আরেকবার দেখলাম। একটা পা ভেঙে গেছে বেচারার। কোমরেও বোধহয় অনেক জোরে ব্যথা পেয়েছে, কারণ

একচুল নড়তে পারছে না। হাতের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে পাথর, চামড়া কেটে গিয়ে রক্তাক্ত হয়ে আছে দু'হাত। গাছের শিকড়ের সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে ঠুকে গিয়ে ফেটে গেছে মাথা। সারা শরীর আর কাপড়ে লেগে আছে চাপ চাপ মাটি। পাথরের আঘাতে আরও দু'-এক জায়গার হাড়ও ভেঙেছে সম্ভবত।

'সম্ভব না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন সিনর। 'ডন পেদ্রো, তোমার সময় শেষ। আর যতক্ষণ বেঁচে আছো, সারাজীবনের সব পাপের জন্য ক্ষমা চাইতে থাকো ঈশ্বরের কাছে। ওটাই তোমার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে।'

'হারামি! কুত্তা!' কোঁকাতে কোঁকাতেই গাল দিল পেদ্রো। 'দূর হ আমার চোখের সামনে থেকে। তুইও মরবি, আমি অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি। তোর ঈশ্বর যেন তোর...'

আর কিছু শোনার প্রয়োজন বোধ করলাম না আমরা, সরে এলাম ওর সামনে থেকে। উঠতে শুরু করলাম ঢাল বেয়ে।

বিকেল পর্যন্ত কোঁকাল আর সমানে অভিশাপ দিয়ে গেল পেদ্রো। সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে থেমে গেল ওর সব আওয়াজ।

বুঝলাম, মারা গেছে শয়তানটা।

এগারো

যিব্যালবের মিশন

মন্দিরে ফেরার পর খেয়ে নিলাম আমরা। আজ রাতে কোথাও যাওয়া সম্ভব না। এখানেই থাকতে হবে। কাজেই জরুরি কিছু কথা সেরে নেয়ার উদ্দেশ্যে আমি বললাম, 'যিব্যালবে, মাস দু'-এক আগে

আমার সৎ ভাই মোলাসকে দিয়ে লর্ড অভ দ্য হার্টের কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন আপনি। দায়িত্ব ঠিকমতোই পালন করে মোলাস—যত দ্রুত সম্ভব হাজির হয় ওই লোকটার কাছে। আপনার মেসেজটা দেয় ওকে।'

'কে সেই লোক?' জিজ্ঞেস করল যিব্যালবে।

'আমি। আমাকে খুঁজে বের করার জন্যই গিয়েছিল মোলাস। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমার এই ভিনদেশী বন্ধুকে নিয়ে এত দূর থেকে এসেছি আমি। আসতে অনেক সমস্যা হয়েছে আমাদের। বড় বড় বিপদ মোকাবেলা করতে হয়েছে। বেশ কিছু খারাপ ঘটনাও ঘটেছে।'

'আপনিই যে সেই লোক তার কোনো প্রমাণ আছে?'

'কী প্রমাণ চান?'

আমাকে কতগুলো নির্দিষ্ট আর গোপন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল যিব্যালবে। সবগুলো প্রশ্নেরই সঠিক জবাব দিলাম।

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করা যায় আপনাকে,' শেষপর্যন্ত বলল যিব্যালবে। 'কিন্তু আরও একটা কাজ বাকি আছে। আপনি যদি সত্যিই লর্ড অভ দ্য হার্ট হয়ে থাকেন তা হলে সেই বিশেষ প্রতীকটা দেখান আমাকে।'

'না। আমাকে খুঁজে বের করার জন্য মোলাসকে পাঠিয়েছিলেন আপনি। আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এখানে এসেছি আমি। তারমানে আমার কাছে যে-প্রতীকটা আছে তা আপনাকে দেখানো আমার জন্য যতটা জরুরি, আপনার কাছে যে-প্রতীক আছে তা দেখা তারচেয়েও বেশি জরুরি। তা না হলে আমি জানবো কী করে আমার সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে না? তা ছাড়া মোলাস বলেছিল আপনার কাছে নাকি ওই বিশেষ প্রতীকটা আছে। যদি কথাটা সত্য হয়ে থাকে তা হলে তা দেখাতে অসুবিধা কী?'

চিন্তিত চেহারায় এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে যিব্যালবে। ইতস্তত করছে। শেষপর্যন্ত বলেই ফেলল, 'আপনার সঙ্গের এই সাদাচামড়ার

লোকটাকে প্রকৃতপক্ষে চিনি না আমরা। তাঁর সামনে কি ওটা দেখানো ঠিক হবে?'

'হবে,' জবাব দিলাম। 'কারণ এই সাদাচামড়ার লোকটা আমার ভাইয়ের মতো। আমরা একসঙ্গে আছি, থাকবো আমৃত্যু। তা ছাড়া আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের ব্যাপারে শপথ করেছেন তিনি। আরও বড় কথা, আমার কাছে যে-প্রতীকটা আছে তা কিছু সময়ের জন্য রেখেছিলেন তিনি; মানে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও তিনি লর্ড অভ দ্য হার্ট হয়েছিলেন। মারা যাচ্ছি ভেবে তাঁকে রাখতে দিয়েছিলাম আমি সেটা। আমাদের গোপন কথার অনেক কিছুই বলেছি তাঁকে। ধরে নিন আমাকে কোনোকিছু বলা আর তাঁকে কোনোকিছু বলা সমান। আর তিনি যদি কিছু বলেন তা হলে তা আমার কথা হিসেবেই বিবেচনা করবেন। অনুরোধ করছি, আমাদেরকে দু'জন মনে না-করে একজন মনে করুন এবং সব কথা জানান।'

তারপরও চুপ করে আছে যিব্যালবে। বার বার চোরাদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সিনরের দিকে।

আবার বললাম আমি, 'সাদাচামড়ার এই সিনরের বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপারে আমার বক্তব্য কি যথেষ্ট না আপনার কাছে?'

সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকে জিজ্ঞেস করল যিব্যালবে, 'লর্ড অভ দ্য হার্ট যা বলছেন তা কি সত্য, সিনর?' আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের বিশেষ একটা সংকেত দেখাল।

ওই সংকেতের জবাবে পাল্টা সংকেত দেখিয়ে সিনর বললেন, 'হ্যাঁ, সত্য।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল যিব্যালবে। 'ঠিক আছে। ...মায়া, এখানে আয়। তোর কাছে যা লুকানো আছে দে আমাকে।'

আগেও বলেছি বোধহয়, মেয়েটার চুল যেমন ঘন তেমন লম্বা। বাবার আদেশ শুনে মাথায় হাত রাখল সে। ঘন চুলের জঙ্গলে

বিশেষ কায়দায় লুকানো কিছু একটা বের করে এনে দিল যিব্যালবের হাতে।

অস্তায়মান সূর্যের আলোয় বিশেষ সেই কবচটা আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরল যিব্যালবে। 'এটাই দেখতে চাচ্ছেন আপনারা, তা-ই না?'

হ্যাঁ। এতদিন ধরে ওই কবচটাই দেখতে চেয়েছি আমি। বছরের পর বছর ধরে আমার পূর্বপুরুষেরা অত্যন্ত যত্ন করে যে-কবচ লুকিয়ে রেখেছে, সন্দেহ নেই যিব্যালবের হাতের রত্নপাথরটা তারই বাকি অংশ।

এবার আমি আমার কবচটা বের করলাম। 'দেখুন তো, আপনার কবচের সঙ্গে আমারটা মিলে নাকি?'

সামনের দিকে ঝুঁকে এল যিব্যালবে। ওর হাতেরটার সঙ্গে আমার কবচটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলিয়ে দেখছে। হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মহান দেবতা, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ! আমার জীবনের শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করেছ তুমি। ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছ আমাকে। চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে আমার চোখ যা দেখতে চেয়েছিল তা দেখিয়েছ।' মুখ নামিয়ে তাকাল আমার দিকে। 'এবার "দিবা" আর "নিশি" একসঙ্গে হয়েছে। আশা করি মেক্সিকোর আকাশে খুব শীঘ্রই স্বাধীনতার সূর্য উঠবে। আপনার কবচটা আপনার কাছেই রাখুন, আমারটা রাখছি আমার কাছে। তা ছাড়া "দিবা" আর "নিশিকে" এখানে জোড়া লাগিয়ে লাভও নেই। অনেক দূর যেতে হবে আমাদেরকে, সেখানে করতে হবে কাজটা। এবার যথাসম্ভব সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলি আপনাদেরকে। কারণ আজ বাদে কাল যেখানে যাবেন আপনারা সে-জায়গার ব্যাপারে আগে থেকেই কিছু-না-কিছু জেনে রাখা ভালো। আপনাদের কাজে লাগতে পারে তথ্যগুলো।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমি আর সিনর।

'হ্যাঁ,' আমাদের মনের কথা সম্ভবত পড়তে পেরেছে যিব্যালবে,

'প্রাচীন আর অনাবিষ্কৃত সেই স্বর্ণশহরের কথাই বলছি। আজ পর্যন্ত কোনো সাদাচামড়ার মানুষের পা পড়েনি যেখানে।'

'শহরটার ব্যাপারে অনেক কথাই শুনেছি আমরা,' বললাম আমি। 'এবং সেখানে যেতে চাই।'

'যাবেন,' মৃদু হাসল যিব্যালবে। 'সময় হলেই যাবেন। হয়তো আমরাই আপনাদেরকে নিয়ে যাবো সেখানে। বলে রাখি, আমি সেই শহরের সর্দার এবং বংশানুক্রমে প্রধান পুরোহিত। মায়া আমার একমাত্র সন্তান। দায়িত্বটা আমার পরে সে-ই গ্রহণ করবে। শুনতে আশ্চর্য লাগছে? ভাবছেন, এত সমৃদ্ধ একটা শহরের সর্দার তার মেয়েকে নিয়ে সাদামানুষদের দেশে এভাবে বিনা-পাহারায় ভিক্ষুকের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? শুনুন তা হলে। আমাদের শহর বা দেশ যা-ই বলুন না কেন তার আসল নাম "সিটি অভ দ্য হার্ট"। বেশিরভাগ লোক চেনে স্বর্ণশহর নামে। অনেক বছর আগে এই শহর ছিল একটা সাম্রাজ্যের রাজধানী। শহরটা কেন্দ্র করে ওই সাম্রাজ্যের অন্যান্য শহর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল দূরদূরান্তে। আজও সে-সব শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় কখনও কোনো জঙ্গলের ভিতরে, আবার কখনও মাটির নীচে।'

'কেন এ-রকম হলো?' যিব্যালবের কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন সিনর।

'কারণ দিন যত গেছে, এই সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের খবর তত ছড়িয়েছে। বিদেশ থেকে বর্বর ডাকাতের দল এসে লুটে নিয়েছে একেকটা শহর। কিন্তু বিশেষ এই শহরটা বেঁচে গেছে। কারণ এটার প্রতিরক্ষাব্যবস্থা খুবই উন্নত এবং পথ চিনে সেখানে গিয়ে হামলা করাটা সহজ না।'

'শহরটা ঠিক কোথায়, বলতে পারেন?'

হাসল যিব্যালবে। 'বললেও চিনবেন না। একটা হ্রদের মাঝখানে অবস্থিত এই সিটি অভ দ্য হার্ট। অনেকটা দ্বীপের মতো। এককালে শহরের অনেক বাসিন্দা থাকত মূল ভূখণ্ডে, মানে হ্রদের

পাড়ে। সেখানে তারা চাষবাস করে খেত। কখনও খনি থেকে সোনা বা অন্যান্য মূল্যবান রত্ন সংগ্রহ করত। এভাবে শহরটা সমৃদ্ধ হয়েছে। ধনী হয়েছে এর বাসিন্দারা।' থামল যিব্যালবে, কয়েক ঢোক পানি খেয়ে ভেজাল শুকিয়ে-আসা গলা। তারপর আবার বলতে লাগল, 'আজ থেকে বারো প্রজন্ম আগে তখনকার রাজার কাছে খবর এল, সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসে একদল সাদাচামড়ার লোক নাকি আমাদের দেশের অনেক জায়গা দখল করে নিয়েছে। যে বা যারা বাধা দিচ্ছে বা প্রতিবাদ করছে তাদেরকে গণহারে হত্যা করা হচ্ছে। সোনাদানা, টাকাপয়সা এবং অন্যান্য দামি দামি জিনিস যেখান থেকে পারছে লুটে নিচ্ছে। শোনা গেল, স্বর্ণশহরের খবরও নাকি পেয়ে গেছে অমানুষগুলো। ওরা জানতে পেরেছে, এই শহর সোনার অফুরন্ত ভাণ্ডার। কাজেই ওরা এই শহরের খোঁজে বের হয়েছে। যদি খুঁজে বের করতে পারে তা হলে কী করবে তা বাচ্চাছেলেও অনুমান করতে পারে।

'রাজা যখন নিশ্চিত হলেন খবরটা সত্য তখন মন্ত্রণাসভার সদস্যদের নিয়ে আলোচনায় বসলেন। সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরে আদেশ জারি করলেন, শহরের যেসব অধিবাসী হ্রদের ধারে বাস করে তাদেরকে শহরের ভিতরে ফিরে আসতে হবে যাতে সাদাচামড়ার ডাকাতেরা কাউকে গ্রেপ্তার করতে না-পারে। অত্যাচারের মাধ্যমে কাউকে বাধ্য করতে না-পারে শহরটা কোথায় চিনিয়ে দিতে। আদেশ পালিত হলো তৎক্ষণাৎ। ফলে যা হওয়ার তা-ই হলো। সাদাচামড়ার দস্যুরা বছরের পর বছর ধরে ওই হ্রদ খুঁজে বেড়াল, কিন্তু সন্ধান পেল না। একসময় হতাশ হয়ে চেষ্টা থামিয়ে দেয় ওরা। নিজেরাই বলাবলি করতে থাকে, স্বর্ণশহরের এই কাহিনি আসলে বানোয়াট একটা গল্প ছাড়া আর কিছুই না।

'এদিকে শহরের জনসংখ্যা তখন দিন দিন বাড়ছে। থাকার জায়গার অভাব দেখা দিয়েছে। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকতে থাকতে রোগজীবাণুর বিস্তার ঘটতে লাগল। শহরের অনেক বাসিন্দা

গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই অসুস্থতা আবার কেটেও যায় একসময়। কিন্তু ততদিনে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হয়ে পড়েছে অনেক বাবা-মা। ফলে শহরের জনসংখ্যা যেমন হঠাৎ করেই বেড়ে গিয়েছিল তেমন হঠাৎ করেই কমতে শুরু করে। বিশেষ করে হ্রদের ধারে যেসব লোক বাস করত, যাদেরকে রাজার হুকুমে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল শহরে, তারা প্রায় সবাই নির্বংশ হয়ে যায়। তখন শহরের নিরাপত্তার কথা ভেবে আরেক আইন জারি করা হলো—কোনো অধিবাসী ভিনদেশী স্বামী বা স্ত্রী খুঁজতে শহরের বাইরে যেতে পারবে না। যদি কেউ সে-চেষ্টা করে তা হলে তাকে কঠিনতম শাস্তি অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

'পর্বতের উপর জমে-থাকা তুষার গ্রীষ্মকালে যেভাবে গলে যায়, আমাদের শহরের জনসংখ্যা তখন সেভাবে কমছে। এই অবস্থায় আমি শহরের সর্দারের দায়িত্ব গ্রহণ করি। অনুমান করি, সিটি অভ দ্য হার্টে মোটামুটি পনেরো থেকে বিশ হাজারের মতো মানুষ আছে। ব্যাপারটা মানসিকভাবে পীড়া দিতে থাকে আমাকে। বুঝতে পারি, আর বেশি হলে একশ' বছরের মধ্যে এই সমৃদ্ধ শহর দেখভাল করার মতোও কেউ থাকবে না। লোকজনের মধ্যে ভবিষ্যৎভাবনা বলে কিছু নেই। একজায়গায় আটকে থাকতে থাকতে সবাই যেন কুয়ার ব্যাঙ হয়ে গেছে। সবার চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেছে।

'এই অবস্থায় একদিন হঠাৎ করেই অনেক পুরনো একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার। আমাদের শহরে নিয়ে গিয়ে প্রধান মন্দিরের বেদিতে, অন্যভাবে বললে "হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ডে" যদি "দিবা" আর "নিশিকে" একসঙ্গে রাখা যায় তা হলে নাকি সব সমস্যা দূর হবে। আমরা নাকি আমাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবো। শুরু করলাম প্রার্থনা। বছরের পর বছর কেটে গেল। মহান দেবতাকে বলতে লাগলাম তিনি যেন আমাকে পথ দেখান যাতে যা হারিয়ে গেছে তা ফিরে পেতে পারি। যাতে আমার লোকদেরকে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারি। এভাবে অনেক বছর পর একরাতে ঘুমের

মধ্যে শুনতে পাই, কে যেন আমাকে শহর ছেড়ে বের হতে বলছে। বলছে, বিশেষ একটা প্রাচীন পথ খুঁজে বের করতে যেটা ধরে পূর্বদিকে এলে দেশের এই প্রান্তে হাজির হওয়া যায়। এখানে এলে আমি নাকি যা খুঁজছি তা পাবো।

'মন্ত্রণাসভার সবাইকে ডেকে পাঠালাম। স্বপ্নের ব্যাপারটা বললাম। আমার মনের কথাগুলোও বললাম। জানালাম, যে-ই কথা বলে থাকুক আমার সঙ্গে, তাঁর আদেশ মান্য করতে চাই। ওরা তখন হাসিঠাট্টা করতে লাগল আমাকে নিয়ে। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল আমি পাগল হয়ে গেছি কি না। বলল, ইচ্ছা হলে যেখানে খুশি যাওয়ার ক্ষমতা আছে আমার। কারণ আমি সর্দার, ওদের ক্ষমতা নেই আমাকে আটকে রাখার। কিন্তু এ-ও জানিয়ে দিল, কাউকে সঙ্গে নেয়াটা উচিত হবে না। যদি নিই তা হলে আমাদের প্রাচীন সেই আইন ভঙ্গ করা হবে।

'আমি তখন বললাম, "ভালো। যেহেতু যেতেই হবে আমাকে, একাই যাবো।" মায়াও উপস্থিত ছিল তখন, সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বাবা, তোমাকে একা যেতে দেবো না। আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।"

'মায়ার এই কথাটা সহজভাবে নিতে পারল না অনেকেই। টিকাল, মানে আমার ভাতিজা আজেবাজে কথা শুনিয়ে দিল সুযোগ পেয়ে। ওর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা আছে মায়ার,' মেয়ের দিকে তাকাল যিব্যালবে।

কিছু না-বলে বিব্রত চেহারায় শুধু মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। যা বোঝার বুঝে নিলাম আমরা।

যিব্যালবে বলে চলল, 'আমি আর মায়া সিটি অভ দ্য হার্ট ছেড়ে চলে আসার আগে টিকালকে অস্থায়ী ভিত্তিতে সর্দার বানানো হয়েছে। কথা আছে আমরা ফিরে গেলে আমার কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবে সে। যা-হোক, মোটামুটি এ-ই হলো আমার গল্প। এবার আপনাদের কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন।'

মুখ খুললাম আমি। আমার জীবনের গল্প বললাম। স্বাধীন মেক্সিকো প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমার ইচ্ছার কথাও বললাম।

'একেবারে আমার মনের কথা বলেছেন,' খুশিতে চকচক করছে যিব্যালবের চোখ। 'কিন্তু কথা হচ্ছে, কাজটা করবেন কীভাবে?'

'আপনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব না,' বললাম আমি।

'মানে?'

'আপনার শহরে আপনার অধীনে যারা আছে তাদের সম্পদ আছে কিন্তু সাহস নেই। এদিকে যারা আমাকে মান্য করে তাদের সাহস আছে কিন্তু সম্পদ নেই। সুতরাং স্প্যানিয়ার্ডদের কাছ থেকে মেক্সিকোর স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হলে সিটি অভ দ্য হার্টের সম্পদ কাজে লাগতে হবে আমাদেরকে। আমার এই বন্ধুর সাহায্য নিয়ে কাজটা করতে চাই আমি। কীভাবে কী করতে হবে জানা আছে আমার, একটু আগেই বলেছি নিকট অতীতে করেছি কাজটা। সুতরাং স্বর্ণশহরের কিছু পরিমাণ সম্পদ খরচ করতে যদি রাজি থাকেন আপনি তা হলে নতুন করে সবকিছুর পরিকল্পনা করতে পারবো আমি।'

'ঠিক আছে, চলুন তা হলে আমাদের সঙ্গে স্বর্ণশহরে,' বলল যিব্যালবে। 'যা যা চান আশা করি তার সবই দিতে পারবো। আমাদের গন্তব্য এক। ভাগ্য আমাদেরকে একসঙ্গে করেছে যাতে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারি। আসুন, আমরা হাতে হাত রাখি এবং মহান দেবতা বা ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে শপথ করি, আজ থেকে জীবনের বাকি দিনগুলো পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো। মেক্সিকোর স্বাধীনতা অর্জিত না-হওয়া পর্যন্ত কাজ করে যাবো একসঙ্গে।'

শপথ করলাম আমরা।

মায়ার দিকে তাকাল যিব্যালবে। 'ধর্ আমাকে। নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দে। এবার একটু বিশ্রাম নিই। খুব ক্লান্ত লাগছে। ...মহান দেবতা, তোমাকে লক্ষ কোটি ধন্যবাদ!' কৃতজ্ঞতা স্বীকারের

ভঙ্গিতে মাথার উপর হাত তুলল সে। তারপর সময় নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ওকে ধরাধরি করে ওর ঘরে নিয়ে যাচ্ছে মায়া। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে দেখছি রহস্যময় মানুষটাকে। যতটা না হাঁটছে তারচেয়ে বেশি খোঁড়াচ্ছে বেচারা।

ওরা চলে যাওয়ার পর আমাকে বললেন সিনর, 'সবদিক দিয়ে ভালোই হলো, ইগনাশিয়ো। তবে কিছু মনে না-করলে একটা কথা বলি। যেহেতু তুমি বা যিব্যালবের কোনো একজন না-থাকলে মেক্সিকোর স্বাধীনতার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, সেহেতু আমার মনে হয় আগে তোমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা মাথায় রাখা উচিত।'

'মানে?'

'এখন যারা মরে পড়ে আছে এই টিলার সিঁড়ির উপর, তাদেরকে খুঁজতে আগামীকাল সকালে কেউ-না-কেউ আসবেই। তখন আমাদেরকে পেলে বিনা-বাক্যে গুলি করে মারবে। ভুল বললাম?'

না, ভুল বলেননি সিনর। আসলে এত তন্ময় হয়ে যিব্যালবের কথা শুনছিলাম যে, এই ব্যাপারটা ভাবিইনি!

'এবার বলো, সেক্ষেত্রে কী করবে?' জিজ্ঞেস করলেন সিনর।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে জবাব দিলাম, 'কাল যে বা যারা আসতে পারে তারা যাতে আমাদের সন্ধান না-পায় সে-জন্য চলুন ভোরের আলো ফোটামাত্র ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। সামনে ঘন জঙ্গল। আমাদেরকে খুঁজে বের করাটা সহজ হবে না। টানা দু'দিন চলতে পারলে সাদাচামড়ার মানুষদের নাগাল থেকে বের হয়ে যেতে পারবো।'

এমন সময় ফিরে এল মায়া। নতুন সমস্যার কথা ওকে সংক্ষেপে জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'লেডি, এখানকার পথঘাট চেনা আছে আপনার?'

'আছে,' বলল মায়া, 'কিন্তু রওনা হওয়ার আগে আমার মনে হয়

আপনাদেরকে দু'-একটা কথা বলা দরকার। কারণ তা না-করলে, আমাকে আর বাবাকে অপমান ও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে যে-মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন তার প্রতি অবিচার করা হবে।'

আরও একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমি আর সিনর।

'বাবার কথাগুলো শুনেছেন আপনারা,' বলে চলল মায়া, 'তিনি যা বলেছেন তার সবই সত্য। কিন্তু সব কথা আপনাদেরকে বলেননি তিনি। সিটি অভ দ্য হার্ট শাসন করেন বাবা, কিন্তু আমি জানি মন্ত্রণাসভার সদস্যরা তাঁর উপর...কী বলবো...সন্তুষ্ট না। বয়স হয়েছে বাবার। এই বয়সে দেশ পরিচালনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাঁকে মানায় না। শহরের বেশিরভাগ বাসিন্দা তাঁকে ভালোবাসে, কিন্তু ক্ষমতাবানদের কেউ কেউ আড়ালে-আবডালে নানা কথা বলে বেড়ায় তাঁর বিরুদ্ধে। সোজা কথায় বাবাকে সর্দারের পদ থেকে সরিয়ে দিতে চায় এরা। একটু আগেই তো শুনলেন, বাবা নিজেই বলেছে, তাঁর সেই স্বপ্নের কথা শুনে তাঁর সামনেই তাঁকে কীভাবে উপহাস করেছে লোকগুলো। ওরা বলে বাবা নাকি পাগল হয়ে গেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই লোকগুলো ধরেই নিয়েছে আর কোনোদিন শহরে ফিরে যেতে পারবেন না বাবা। ওদের পথের কাঁটা হয়ে থাকবেন না।'

'কিন্তু...' ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, 'তা হলে আপনাকে কেন আসতে দিল তাঁর সঙ্গে?'

'আসতে দিতে চায়নি। জোর করে এসেছি আমি। অথবা... হয়তো পুরো ব্যাপারটার পিছনে গভীর কোনো ষড়যন্ত্র আছে। আমি আসলে পুরোপুরি নিশ্চিত না।'

চুপ করে আছি আমি আর সিনর। বুঝতে পারছি আরও কিছু বলার আছে মায়ার।

'বাবাকে ভালোবাসি আমি। জানি তিনি পাগল না। তিনি মিথ্যা কথা বলেন না, মিথ্যা বলার দরকার নেই তাঁর। তিনি যখন বলেছেন ওই স্বপ্নটা দেখেছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আসলেই দেখেছেন। কিন্তু

এই বয়সের একটা লোককে বনেজঙ্গলে একা ছেড়ে দেয়াটা কি ঠিক? তাই জেদ করে চলে এসেছি। আমি চাই না তাঁর কোনো সিদ্ধান্তের কারণে চিরতরে হারিয়ে যাক মানুষটা। যদি মরতে হয়, দু'জনে একসঙ্গে মরবো। তা ছাড়া আরও একটা কারণ আছে। শুনলে হয়তো আশ্চর্য হবেন আপনারা, আমাকে খারাপ মনে করবেন। যে-শহরে জন্ম আমার, সেই সিটি অভ দ্য হার্টকে ঘৃণা করি আমি। ঘৃণা করি ওই শহরের এমন একজন মানুষকে যার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার কথা আছে। কাজেই আমি বলবো ওই শহর ছেড়ে চলে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সিনর জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই লোকটাও কি তোমাকে ঘৃণা করে, লেডি?'

'না,' মাথা নিচু করল মায়া, 'কিন্তু...আমার প্রতি ওর আবেগটাকে ঠিক ভালোবাসা বলা যায় না। আমি বলবো...আমার চেয়ে ক্ষমতা বেশি ভালোবাসে সে।'

'বুঝিয়ে বলবে?'

'আমি যদি না-আসতাম বাবার সঙ্গে তা হলে কী করতেন তিনি? সর্দারের পদটা সাময়িকভাবে দিয়ে আসতেন আমাকে। এক্ষেত্রে আমি ছেলে না মেয়ে তা কোনো ব্যাপার ছিল না। আমি আসতে চাই শুনে আমার চাচাতো ভাই টিকাল প্রথমে ক্ষেপে গেল। আজেবাজে কথা বলতে লাগল। কিন্তু পরে বুঝল আমি চলে এলেই ওর লাভ। কারণ আমাকে বিয়ে করলে রাজত্ব পাবে সে, কিন্তু আমি যদি রাজি না-হই? এদিকে বাবাও নেই, আমিও নেই, কাজেই উত্তরাধিকার সূত্রে সে-ই সিংহাসন পায় এবং পেয়েছেও। সুতরাং পরে আর বাধা দিল না। অন্তত সে-রকমই মনে হয় আমার।'

'বিষয়টা আসলেই জটিল,' মন্তব্য করলেন সিনর।

'আসলে মেক্সিকোর স্বাধীনতা নিয়ে সে-রকমভাবে কখনোই কিছু ভাবিনি আমি,' বলছে মায়া। 'মেয়েমানুষ তো সবসময়ই পরাধীন, তাই তাদের মাথায় স্বাধীনতার চিন্তাটা ছেলেদের মতো

করে আসে না হয়তো। আপনাদের কথা শুনে এখন অনেক বড় কিছু একটার আভাস পাচ্ছি। তবে আমার মনের কথা জানতে চাইলে বলবো, সিটি অভ দ্য হার্টে ফিরে না-গিয়ে যদি পৃথিবীর অন্য কোথাও চলে যেতে পারতাম তা হলে খুব খুশি হতাম।'

'আচ্ছা লেডি, তুমি কি "দিবা" আর "নিশির" গল্পটা বিশ্বাস করো?'

'ইচ্ছা করলে নাম ধরে আমাকে ডাকতে পারেন আপনি,' লাজুক দৃষ্টিতে সিনরের দিকে তাকিয়ে বলল মায়া। তারপর নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলতে লাগল, '"দিবা" আর "নিশির" গল্পটা আসলে ঠিক বিশ্বাসও করি না, আবার অবিশ্বাসও করি না। ভেবে দেখুন ব্যাপারটা। মানুষের হৃদপিণ্ডের আদলে কাটা একটা রত্নপাথরের দুটো টুকরো। অনেক বছর আগে দেশটা দু'ভাগ হওয়ার সময় দু'জন রাজা দুটো খণ্ড নিয়ে গেছে। এখন এই পাথরের এমন কী ক্ষমতা থাকতে পারে যে, একসঙ্গে হলেই দেশের স্বাধীনতা চলে আসবে? যদি কেউ উদ্যোগ না-নেয়, যদি দেশবাসী মরণের ভয় তুচ্ছ করে চেষ্টা না-করে তা হলে স্প্যানিয়ার্ডরা কি সবকিছু আমাদের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে নিজে থেকেই চলে যাবে? এই অভ্যুত্থান তো "দিবা" আর "নিশি" একসঙ্গে না-হলেও হতে পারে, তা-ই না? আবার দেখুন, বাবা যখন বিশ্বাস করছেন, আপনারা যখন বলছেন, সারা দেশের এত লোক যখন মানছে, তখন এর মধ্যে কিছু-না-কিছু না-থেকে পারে না। আরেকটা কথা। একটা স্বপ্ন দেখে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাবার এতদূর আসা, ভাগ্যক্রমে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাওয়া—সবই কেমন অদ্ভুত না? নিজের কথা যদি বলি, পুরোহিত, দেবতা, ধর্মীয় বিধিনিষেধ ইত্যাদির উপর কোনোকালেই তেমন কোনো ভক্তি বা বিশ্বাস ছিল না আমার, ভবিষ্যতে হবে বলেও মনে হয় না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার শহরের লোকদের ব্যাপারে কিছু বলো।'

'বাসিন্দাদের বেশিরভাগই, বিশেষ করে টিকাল আর মন্ত্রণাসভার সদস্যরা, হিংসুটে। এত বছর আমাদের ওখানে বাইরের কোনো লোক যায়নি। আপনাদেরকে দেখলে না-জানি কী করে ওরা! আসলে বাইরের কোনো লোক যায়নি বলাটা ঠিক হয়নি। কাউকে কাউকে হ্রদের কাছে ঘুরঘুর করতে দেখে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এক-আধবার। এদের দু'-একজন ছাড়া বাকিরা জ্যান্ত বের হতে পারেনি শহর থেকে।

'শহরের অধিবাসীরা নতুন কিছু চায় না। চায় না নতুন কিছু ঘটুক তাদের জীবনে। শহরের রক্ষাপ্রাচীরের বাইরের পৃথিবীটা কেমন সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই তাদের। ধারণা নিতে চায়ও না। বাপ-দাদাদের যেমনভাবে খেয়ে-পড়ে কোনোরকমে বাঁচতে দেখেছে, সে-রকমভাবে দিন কাটাতে পারলেই খুশি। ভবিষ্যতে কী হবে না-হবে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস বা রীতিনীতির বাইরে কেউ যদি কোনো কথা শোনাতে যায় ওদেরকে তা হলে আমার মনে হয় খারাপি আছে লোকটার কপালে।'

আবারও সিনরের দিকে তাকাতে বাধ্য হলাম আমি।

'সব শোনার পর এবার সিদ্ধান্ত নিন ঠিক ঠিকই যাবেন কি না স্বর্ণশহরে,' আমরা চুপ করে আছি দেখে বলল মায়া। 'নাকি মুখ ঘুরিয়ে নেবেন, নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে নিরাপদ কোথাও চলে যাবেন। ভুলে যাবেন যাযাবরদের মতো দেখতে এক বুড়ো ডাক্তার একটা গল্প শুনিয়েছিল আপনাদেরকে। যে-লোকটাকে তার শহরের অন্য লোকেরা পাগল বলে। যার অসহায় মেয়েটা রাজত্ব ফেলে একরকম পালিয়ে চলে এসেছে। এখন অনেক রকম বিপদের আশঙ্কা নিয়ে সেবাযত্ন করছে বুড়ো বাপের।'

মায়ার কথাগুলো ভেবে দেখছি। সত্যিই, আমাদের সিটি অভ দ্য হার্টে যাওয়া আর বাঘের গুহায় পা দেয়া সমান কথা। তারপরও ঝুঁকিটা নিতে হবে। কারণ মেক্সিকোর স্বাধীনতার জন্য দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। আর আমার কাছে এ-দেশের স্বাধীনতার চেয়ে

বড় কিছু নেই।

'লেডি,' বললাম কিছুক্ষণ পর, 'হয়তো ঠিকই বলেছেন—স্বর্ণশহরে গেলে মরণই হবে আমাদের পরিণতি। কিন্তু এই জীবনে এতবার মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে যে, এখন আর ভয় লাগে না। তা ছাড়া কার কোথায় কীভাবে মরণ লেখা আছে তা আমরা আগে থেকে বলতে পারি না, অনুমানও করতে পারি না। কাজেই ক্ষতি হতে পারে ভেবে যদি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে সবাই, পৃথিবীটা অচল হয়ে যাবে। মেক্সিকোর স্বাধীনতার খাতিরে ওখানে যেতে হবে আমাকে, নতুন করে শুরু করতে হবে সব। অন্তত চেষ্টা করতে হবে। পরে কী হবে তা পরে দেখা যাবে। আমি আপনার বাবার সঙ্গে আপনাদের শহরে যাবো, এটাই শেষ কথা। তবে সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের ব্যাপার আলাদা। কয়েক সপ্তাহ আগে তাঁকে বলেছিলাম, আমাদের এই অভিযান থেকে তাঁর কোনো লাভ হবে না। একই কথা আজ আবারও বলছি। তিনি আপনার কথা শুনেছেন, আমার কথাও শুনলেন। যদি নিজের ভালো চান তা হলে আমার মনে হয় আগামীকাল সকালে নিরাপদ গন্তব্যের সন্ধানে আমাদেরকে বিদায় জানিয়ে চলে যাবেন তিনি।'

আমার কথা শুনে সিনরের দিকে তাকাল মায়া। 'আপনি কী বলেন?'

কিছু বলার আগে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন সিনর। আমি তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে। জবাবের প্রত্যাশায় মায়াও তাকিয়ে আছে। জোর দিয়ে বলতে পারবো না, তবে কেন যেন মনে হচ্ছে বিশেষ একটা ভাব খেলা করছে মেয়েটার চোখে। হয়তো আমার চেয়ে বেশি আগ্রহ নিয়ে সিনরের দিকে তাকিয়ে আছে সে, সে-জন্য আমার কাছে অত্যুৎসাহী মনে হচ্ছে ওকে। হয়তো চাচ্ছে আমাদের সঙ্গে থাকুক সিনর। হয়তো...

'হ্যাঁ, মায়া,' খেয়াল করলাম মেয়েটাকে প্রথমবারের মতো নাম ধরে ডাকলেন সিনর, তাঁর ঠোঁটের কোনায় ভুবনভোলানো মিষ্টি

হাসি, 'সব শুনলাম আমি। মেক্সিকোর স্বাধীনতার ব্যাপারে, খোলাখুলিভাবে যদি বলি, প্রকৃতপক্ষে কিছু করার নেই আমার। তারপরও আমি যেতে চাই স্বর্ণশহরে। কারণ দেখতে চাই শহরটা। দেখতে চাই এত সমৃদ্ধ একটা শহরের বাসিন্দাদের। তা ছাড়া নিরাপদ গন্তব্য বলতে যা বোঝাতে চাচ্ছে ইগনাশিয়ো সেখানে যেতে হলে পিছু হটতে হবে আমাকে। তারমানে ডন পেদ্রোর এলাকা পার হতে হবে। সেটা কি ভালো হবে আমার জন্য? আরও বড় কথা হচ্ছে, তোমার বাবাকে নিয়ে ইগনাশিয়ো এতদূরের পথ একা পাড়ি দিক তা চাই না আমি। পথে হাজারটা বিপদ হতে পারে। একজনের জায়গায় দু'জন থাকলে বিপদের সময় কাজে লাগে, মনে সাহসও আসে।'

'আপনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন শুনে খুশি লাগছে,' সত্যিই চকচক করছে মায়ার দু'চোখ। 'প্রার্থনা করি আমাদের এই যাত্রা যেন সবার জন্যই মঙ্গলজনক হয়। ...সারাদিন খুব ধকল গেছে, খুব ক্লান্ত আপনারা। আর রাত না-জেগে শুয়ে পড়ুন। আমিও ঘুমাতে যাচ্ছি। ভোরের আলো ফোটামাত্র রওনা হতে হবে আমাদেরকে।'

ভোর হয়েছে কি হয়নি। ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি আমরা। একটা ঘোড়ায় চড়েছি আমি, একটাতে সিনর এবং একটার পিঠে যিব্যাল্লবে আর মায়া একসঙ্গে। চার নম্বর ঘোড়াটায় চাপিয়েছি আমাদের মালপত্র। মন্দিরটা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আর হয়তো কোনোদিনও ফেরা হবে না এখানে—ভাবতে খুশিই লাগছে। কবে কখন ধসে পড়ে এই অতিপ্রাচীন মন্দির কে জানে!

মোলাসের কথা ভেবে খারাপও লাগছে। আমাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করে গেল বেচারা, অথচ অনেক খুঁজেও ওর লাশটা বের করতে পারলাম না আমরা।

পারতপক্ষে কোনো গ্রামে না-যাওয়ার পরিকল্পনা করেছি আমরা। যথাসম্ভব জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে এগোনোর চেষ্টা করবো।

কারণ লোকজন দেখে ফেলতে পারে আমাদেরকে, চিনে ফেলতে পারে। তখন হয়তো ডন পেদ্রো আর ওর সাঙ্গপাঙ্গদের খুন করার অভিযোগে আমাদেরকে পাকড়াও করে তুলে দেবে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার হাতে।

যা-হোক, সিটি অভ দ্য হার্টের পথে শুরু হলো আমাদের যাত্রা। সঙ্গে রাইফেল আছে, বুলেটেরও অভাব নেই, তাই পাখি বা হরিণ শিকার করে খেতে অসুবিধা হয় না। জঙ্গল থেকে তাজা রসালো ফল কুড়িয়ে নিতেও কোনো বাধা নেই। বলতে গেলে এক কদমও হাঁটতে হয় না—কখনও ঘোড়া হাঁটিয়ে আবার কখনও দুলকি চালে এগোই আমরা। সুতরাং গত কয়েক দিনে যে-পরিমাণ শক্তি হারিয়েছি তা ফিরে পাচ্ছি ধীরে ধীরে। এমনকী যিব্যালবের শরীরেও মাংস লাগতে শুরু করেছে, পাণ্ডুর চেহারায় রঙ ফিরে আসছে।

এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে ইউক্যাটান রাজ্য পার হয়ে এলাম আমরা। এখন বলা যায় সাদাচামড়ার মানুষদের নাগালের মধ্যে নেই আমরা আর। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, সামনে খাড়া ঢালের দীর্ঘ পর্বতমালা। এই ঘন আর আপাতদৃষ্টিতে সীমাহীন বনের ভিতরে কোনো পথের সন্ধান পাওয়া এককথায় অসম্ভব। আমাকে অথবা সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকে কাজটা করতে বললে জীবনেও পারতাম কি না সন্দেহ। কিন্তু যিব্যালবে আর ওর বুদ্ধিমতী মেয়ে মায়া সঙ্গে থাকায় খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না। এর আগেরবার এই বনের ভিতর দিয়ে আসার সময় দিক আর বিভিন্ন চিহ্ন ভালোমতো চিনে নিয়েছে ওরা। তা ছাড়া অনেক পুরনো একটা ম্যাপও আছে ওদের সঙ্গে। ম্যাপটা দেখেছি আমি। বিভিন্ন রকম লাইন এঁকে পথের নির্দেশনা দেয়া আছে ওটাতে। আমার মনে হয় সিটি অভ দ্য হার্ট যখন পুরো সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল তখন তৈরি করা হয়েছিল এই ম্যাপটা। কারণ সারা মেক্সিকোর কোথায় কীভাবে যেতে হবে তার মোটামুটি ড্রইং পাওয়া যায় এই ম্যাপে।

যে-সব পথের নির্দেশনা দেয়া আছে সেগুলোর মধ্যে দীর্ঘতম

পথটা সিটি অভ দ্য হার্টকে ঘেরাও-করে-রাখা হ্রদের তীর থেকে শুরু হয়ে পর্বতমালার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে এই জঙ্গলের দিকে এসেছে। রাস্তাটা, বলা ভালো জলাভূমির উপর দিয়ে বানানো পায়েচলা পথটা, জায়গায় জায়গায় উঁচু গাছ আর ঝোপঝাড়ে ভরা। কোথাও ডুবে আছে জলাভূমির পানিতে, কোথাও আবার ছড়িয়েছিটিয়ে আছে ধুলোবালি। চলতে চলতে বেশ কয়েকবার দিশা হারিয়ে ফেললাম আমরা। ম্যাপটা খুব কাজে লাগল তখন। কখনও আবার কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর দেখতে পেয়ে পথের হদিস করতে পারল যিব্যালবে বা মায়া।

যত এগোচ্ছি, প্রাচীন শহর আর মন্দিরের সংখ্যা তত বাড়ছে। সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের জন্য একদিক দিয়ে ভালো হয়েছে—যাত্রার একঘেয়েমি সহজেই ভুলে যেতে পারছেন তিনি। তা ছাড়া যখন বুঝতে পারছেন সাদাচামড়ার মানুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম দেখছেন এসব নিদর্শন তখন তাঁর খুশি আরও বাড়ছে। চলতি পথে এসব নিয়ে টুকটাক কথাও বলছেন আমার সঙ্গে।

আমাদের এই নিরানন্দ যাত্রায় সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকে যেন নতুন করে চিনতে পারলাম। সত্যিই, আশ্চর্য এক লোক তিনি। যিব্যালবে বা মায়া না, ইদানীং বেশিরভাগ সময় তিনিই ঘোড়া নিয়ে সবার আগে থাকেন। হাতের বিশাল ভোজালি দিয়ে ঝোপজঙ্গল কেটে সাফ করতে করতে এগোন। এর ফলে ওই কষ্ট করা থেকে রেহাই পাই আমরা। সূর্যের খরতাপ উপেক্ষা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন এই কাজ করে যাচ্ছেন সিনর; সাহায্যের জন্য কোনোদিন কিছু বলেন না এমনকী আমাকেও। প্রায় রাতেই দেখা যায় জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে তাঁর, রীতিমতো কাঁপছেন। পোকামাকড়ের উৎপাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারেন না বেশিরভাগ সময়। কিন্তু এতেও কোনো আফসোস নেই মানুষটার। দিনে একটুখানি জিরানোর সুযোগ পেলে এটা-সেটা জিজ্ঞেস করেন যিব্যালবেকে। আমাদের যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকে বুড়ো লোকটা কেমন যেন চুপ মেরে গেছে।

দরকার না-পড়লে মুখই খোলে না। মেক্সিকোর ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোককাহিনি ইত্যাদি বিষয়ে সিনরের প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুনে সে বিরক্ত হয় কি না বুঝতে পারি না।

মায়ার সঙ্গেও এটা-সেটা নিয়ে আলোচনা করেন সিনর। বেশিরভাগ সময়ই জানতে চান সিটি অভ দ্য হার্ট সম্পর্কে। মায়াও বিভিন্ন প্রশ্ন করে সিনরকে। যেমন, সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের যে-দেশে সিনরের জন্ম সে-দেশটা কেমন। সে-দেশের মানুষগুলো কেমন। সে-দেশটা এত আধুনিক কেন।

মায়ার এসব প্রশ্ন শুনে মাঝেমধ্যে আমার মনে হয় মেয়েটা বুঝি পৃথিবীর এই প্রান্তের, এই শোষিত বঞ্চিত জনপদের বাসিন্দা না। মনে হয় সে যেন আধুনিক পৃথিবীর সন্তান—যার ভিতরে পৃথিবীটাকে জানার আগ্রহ প্রবল। মনে হয়, উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়ে কেউ যদি স্বর্ণশহরকে হারানো-সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারে তা হলে সে এই মায়া।

আমার স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার পর থেকে মেয়েদের উপর আমার সবরকমের আকর্ষণ বিদায় নিয়েছে। সুতরাং মায়া আমার কাছে স্বর্ণশহরের ভবিষ্যৎ নেতা ছাড়া আর কিছুই না। ওর দিকে বিশেষ কোনো দৃষ্টিতে তাকাই না আমি, বিশেষ কোনো বিষয় নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলি না। আমার জন্য যিব্যালবে যা, মায়াও তা। কিন্তু সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের ব্যাপারটা আলাদা। ইদানীং খেয়াল করছি, মায়ার প্রতি কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। ওর সঙ্গে কথা বলার, ওর সঙ্গে সময় কাটানোর ইচ্ছাটা যেন একটু বেশিই প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর ভাবভঙ্গিতে। এ-ব্যাপারে মায়াও পিছিয়ে নেই। প্রথম থেকেই দেখছি সিনরের সঙ্গে কথা বলার সময় ওর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অকৃত্রিম খুশিতে ভরে যায় অপূর্ব সুন্দর চেহারাটা। সিনরের জন্য কিছু করতে পারলে ওর সেই খুশি যেন আরও বাড়ে।

একদিন সিনরের সঙ্গে কথা বলছে মায়া, কাছেই বসে শুনছি আমি। মায়া বলল, 'আপনার একটা ব্যাপার খুব অদ্ভুত লাগে

আমার। কিছুই বুঝতে পারি না আমি। এই যে ইতিহাস, ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শন আর মরা মানুষদের গল্প—এসব দেখে বা জেনে কী লাভ হয় আপনার? আমি কিন্তু এসব দু'চোখে দেখতে পারি না। এই লোকগুলো যখন বেঁচে ছিল সন্দেহ নেই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে ছিল। কিন্তু এখন মরে গেছে। সব চুকেবুকে গেছে। এদেরকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কী হবে?'

জবাবে কিছু না-বলে মিষ্টি করে হাসলেন সিনর।

'আমাদের সেই শহরটা,' সিনরের হাসি দেখে মায়াও হাসল, 'যা নিয়ে আগ্রহের কোনো শেষ নেই আপনাদের, আসলে বিরাট এক কবরস্থান। আশ্চর্য হচ্ছেন আমার কথা শুনে? কিন্তু যা বলেছি ঠিকই বলেছি। স্বর্ণশহর আসলে একটা কবরস্থান। আর তার বাসিন্দারা হলো একেকটা জীবিত ভূত। তেমন কোনো কাজ করে না ওরা, এদিকে-সেদিকে অলসের মতো ঘুরে বেড়ায়, আর হাজার বছর আগে কত সমৃদ্ধ জাতি ছিল তা নিয়ে বাহাদুরি করে। প্রায় সবাই জাত চোগলখোর। কে কী করল আর কী করল না, কার কী করা উচিত ছিল, কে কোন্ কাজটা না-করলে কী হতো এসব নিয়ে কথা বলতে বলতেই দিন পার করে দেয় বেহায়া নিষ্কর্মা লোকগুলো। একজন আরেকজনকে কীভাবে ঠকাবে, একজনের বিরুদ্ধে আরেকজন কীভাবে ষড়যন্ত্র করবে এ-ই হলো তাদের দৈনন্দিন কর্মসূচী। পেট ভরে খায়, সময় হলে ঘুমায়, আর মাঝেমধ্যে এমন এক দেবতার পূজা করে যাকে ওরা আদৌ বিশ্বাস করে কি না সন্দেহ আছে আমার। বাবা ওদের চেয়ে অন্যরকম, তাই তিনি ওদের দৃষ্টিতে পাগল। এই লোকগুলোর স্বাধীনতার জন্য এত কষ্ট করে কী লাভ বলতে পারেন? ধরুন অলৌকিকভাবেই হোক আর চেষ্টার ফলেই হোক, এদেরকে কোনোভাবে স্বাধীনতা এনে দিতে পারলেন; এরা কি তা ধরে রাখতে পারবে? স্প্যানিয়ার্ডদের পরে আবার কোনো জাতি এসে যে এদেরকে দখল করবে না তার নিশ্চয়তা কী?'

মায়ার প্রশ্ন শুনে থমকে গেছেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। আমিও বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছি মেয়েটার দিকে। এত নির্জলা সত্য কথা কখনও শুনতে হবে ভাবতেই পারিনি। আর ভাবতে পারিনি বলেই মায়ার ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানি না।

'আপনাদের জায়গায় আমি থাকলে কী করতাম জানেন?' তিক্ত হাসি হাসল মায়া, 'নিজের খেয়েপরে বাঁচতে অসুবিধা হবে না এমন পরিমাণ সোনা হাতিয়ে নিতাম। তারপর পালাতাম শহর ছেড়ে। চলে যেতাম অনেক দূরের কোনো দেশে। যেখানে সোনার দাম আছে। যেখানকার লোকেরা কাজ করে খায়। যেখানকার লোকেদের শুধু সমৃদ্ধ অতীতই না, সমৃদ্ধ বর্তমান এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎও আছে। আমি নিশ্চিত সে-রকম কোনো দেশে যেতে পারলে সুখী হতে পারতাম।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম জঙ্গলের গভীরে। আসলেই, একটা কথাও ভুল বলেনি মায়া। যাদের জন্য এত পরিশ্রম করবো ভেবেছি, তারা কি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতার উপযুক্ত? যে-দেশের লোকেরা উপার্জনের চেষ্টা করে না সে-দেশ তো দারিদ্র্যের কাছে এমনিতেই পরাধীন।

স্প্যানিয়ার্ডরা আমাদের শাসক; ওদেরকে হটিয়ে দিলেই কি মেক্সিকানদের ভাগ্য বদলে যাবে? আমরা নিজেরা নিজেদের কুস্বভাবের কাছে বন্দি হয়ে আছি; এই পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাবো কবে?

বারো

মায়ার দুঃসাহস

এক সন্ধ্যার কথা। ততদিনে জঙ্গল পার হয়ে এসেছি আমরা। হাড়ভাঙা খাটুনি করে চড়তে পেরেছি খাড়া এক পাহাড়ি-ঢালে। আমাদের সামনে এখন বিশাল এক মরুভূমি। আপাতদৃষ্টিতে মরুভূমিটা সীমাহীন মনে হচ্ছে। পাথরে ভরা একটা পাহাড়ের পাদদেশে, কতগুলো ঘৃতকুমারী গাছের পাশে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করেছি আমরা। যিব্যালবের ম্যাপে এই পাহাড়টার উল্লেখ আছে। এখানে ক্যাম্প করার কারণ, এখানে অনেক পুরনো একটা কুয়া আছে। বহু বছর আগে ইণ্ডিয়ানরা যখন এই জায়গায় থাকত তখন শুকনো মৌসুমে এখান থেকে পানি সংগ্রহ করত। কুয়াটাকে কেন্দ্র করে বড় একটা শহরও গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন যে-রাস্তাটার কথা বলেছি তা যথেষ্ট স্পষ্ট এখন। এই শহরের মধ্য দিয়েই চলে গেছে রাস্তাটা।

আসলে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরে যাত্রাবিরতি করতাম না আমরা। গত কয়েকদিন থেকে একফোঁটাও বৃষ্টি হচ্ছে না। আমাদের পানি ফুরিয়ে এসেছে। বাধ্য হয়ে বড় একটা পাথরের পাশে থামতে হয়। ওই পাথরের প্রায় পুরোটা জুড়েই গর্ত, তাতে পানি জমে ছিল। পাথরটা দেখে যিব্যালবের মনে পড়ে যায় এই শহরের কথা, কুয়ার কথা। মায়াও সায় দেয়। আমাদের মশক, ফ্ল্যাস্ক ইত্যাদি পানিতে পূর্ণ করার জন্য এবং পিপাসার্ত ঘোড়াগুলোর তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এই শহরে আসার সিদ্ধান্ত নিই আমরা তখন।

পাথরে ভরা যে-পাহাড়টায় অবস্থান করছি আমরা তার ঢালে একটা গর্ত আছে, মুখটা পাথর দিয়ে বাঁধাই-করা। মাটি দিয়ে ঢেকে গেছে গর্তের মুখ, বলতে গেলে অদৃশ্য হয়ে গেছে কাঁটাঝোপের আড়ালে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে কুয়ায় যাওয়ার রাস্তা এটাই।

ঘৃতকুমারী গাছের মরা কাণ্ড কাজে লাগিয়ে বেশ কয়েকটা মশাল বানিয়ে নিয়েছি আমরা। চারটা মশাল জ্বাললাম। এবার আর মায়া না, সবার আগে আমি নেমে পড়লাম গর্তে। আমার পিছন পিছন আসছে বাকিরা।

অল্প কিছুদূর এগিয়েই হাজির হলাম অনেকটা গুহার মতো দেখতে একটা জায়গায়। আশ্চর্যের ব্যাপার, কোত্থেকে যেন জোরালো বাতাস বইছে! বাতাসের আচমকা ধাক্কায় হঠাৎ হঠাৎ নিভু নিভু হয়ে আসছে আমাদের মশালগুলো। সাবধানে এগোতে লাগলাম আমরা। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে থামলাম খনিকূপের মতো দেখতে একটা গর্তের সামনে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি সেই কুয়ার কাছাকাছি চলে এসেছি।

যেটাকে খনিকূপ বলছি তা আসলে কতখানি গভীর ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে এটা সেই কুয়া না; মূল কুয়া (অথবা প্রবাহমান জলধারা) আরও নীচে। কোথায় হাজির হয়েছি দেখার জন্য খনিকূপের কাছে দাঁড়িয়ে মশালের নিভু নিভু আলোয় ভালোমতো তাকালাম নীচের দিকে।

যাচ্ছেতাইভাবে বানানো হয়েছে খনিকূপটা। অথবা হয়তো ঠিকমতোই বানানো হয়েছিল, বছরের পর বছর ধরে অযত্নে-অবহেলায় পড়ে থাকতে থাকতে বিদঘুটে আকার নিয়েছে। খেয়াল করলাম, অন্য খনিকূপগুলো যেমন উল্লম্ব হয় এটা সে-রকম না। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, কূপের দেয়ালে আট থেকে দশ ইঞ্চি প্রশস্ত বেশ কয়েক ধাপ কুলুঙ্গি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই কুলুঙ্গি বেয়ে কত কষ্ট করে ওঠানামা করে পানি সংগ্রহ করতে হয়েছে ইণ্ডিয়ানদেরকে, ভাবতেও খারাপ লাগে। সিঁড়ির কোনো কোনো

ধাপে পায়ের দাগ বসে গেছে গভীর হয়ে।

এক টুকরো পাথর কুড়িয়ে নিলেন সিনর। কূপের মুখের কাছে এসে পাথরটা ছেড়ে দিলেন হাত থেকে। বেশ কয়েক মুহূর্ত পর নীচ থেকে অস্পষ্ট একটা শব্দ শোনা গেল, বুঝলাম মাটিতে পড়েছে পাথরটা।

'কী ভয়ঙ্কর জায়গা!' মন্তব্য করলেন তিনি, 'এ-রকম কুলুঙ্গি বেয়ে অত নীচে গিয়ে পানি নিয়ে আসার চেয়ে পিপাসায় গলা শুকিয়ে মরা ভালো!'

'তারপরও লোকজন কিন্তু নেমেছে কুলুঙ্গি বেয়ে, পানি যোগাড় করেছে নীচের ওই জায়গা থেকে,' বলল মায়া।

'হয়তো মাথায় কলস নিয়ে একহাতে সেটা ধরে রাখত ওরা,' বললাম আমি, 'আরেকহাতে আঁকড়ে ধরে থাকত উপর-থেকে-ঝুলন্ত কোনো দড়ি।'

'চলে আসুন,' পরামর্শ দিল যিব্যালবে, 'নীচে গিয়ে কাজ নেই। আমাদের কারও পক্ষেই এই কুলুঙ্গি বেয়ে নীচে নামা সম্ভব না। একবার পা পিছলালেই আর দেখতে হবে না। তারচেয়ে ভালো চলে যাই এখান থেকে। ঘোড়াগুলো আপাতত তৃষ্ণার্তই থাকুক। এখানকার পথঘাট চেনা আছে আমার, ঘণ্টা পাঁচেক টানা চললে একটা জলাশয় পাওয়া যাবে। এখন রওনা দিলে ভোর নাগাদ পৌঁছে যেতে পারবো সেখানে। তখন না-হয় পানি খেয়ে নিতে পারবে বেচারারা।'

আসলে কারোরই ইচ্ছা করছে না কুলুঙ্গি বেয়ে নীচে নামতে। তাই যিব্যালবের প্রস্তাবে সম্মতি জানালাম আমরা। চলে এলাম ওই "বাতাসের গুহার" বাইরে।

মুক্তবাতাসে দাঁড়িয়ে বেশ ভালো লাগছে। গুহার ভিতরে কেমন একটা অপবিত্র অপবিত্র ভাব ছিল। যতই বাতাস থাকুক, ভিতরটা ছিল বেশ গরম; মনে হচ্ছিল দম আটকে যাবে।

ক্যাম্পে ফিরে গেল যিব্যালবে। আমরা রয়ে গেলাম আগের

জায়গাতেই। ঘোড়াগুলোর জন্য দানাপানি যোগাড় করতে হবে। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে-না-যেতেই এই কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড আর লেডি মায়া। হঠাৎ চোখে পড়ল, কাজ ফেলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছেন দু'জনে, সেই সঙ্গে টুকটাক কথা বলছেন।

মায়া বলছে, 'ওই ফুলটা এনে দেবেন আমাকে? খোঁপায় পরবো।' অনতিদূরের কতগুলো বিক্ষিপ্ত পাথরের আড়ালে জন্মে আছে তুষারশুভ্র এক ক্যাকটাস-ফুল, আঙুলের ইশারায় সেটা দেখাচ্ছে সে।

দু'জনের সম্পর্ক কত দূর গড়িয়েছে বুঝতে অসুবিধা হলো না আমার।

দেরি না-করে ওই পাথরগুলোর কাছে গিয়ে হাজির হলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। ফুলটা ছেঁড়ার জন্য হাত বাড়ালেন। কিন্তু ছিঁড়তে পারলেন না। হঠাৎ চমকে উঠে 'উহ্' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

'কী হলো?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। 'হাতে কাঁটা লেগেছে? হাত কেটে গেছে আপনার?'

জবাব দিলেন না সিনর। ভালোমতো তাকিয়ে দেখি ভয়ে ছানাবড়া হয়ে গেছে তাঁর দু'চোখ। ধীরগতিতে এঁকেবেঁকে কিছু একটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পাথরগুলোর আড়ালে, হাত তুলে সেদিকে দেখাচ্ছেন তিনি। তাঁর কব্জির উপরে রক্ত!

মায়াও খেয়াল করল ব্যাপারটা। হাহাকার করে ওঠার মতো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে বলল, 'সাপ কামড় দিয়েছে!' ছুট লাগাল সিনরের দিকে।

হতভম্ব হয়ে গিয়ে আমি ভাবছি, ওখানে গিয়ে কী করবে মেয়েটা।

প্রশ্নটার জবাব পেতে একমুহূর্তও দেরি হলো না। একদৌড়ে সিনরের কাছে হাজির হয়েছে মায়া। তাঁর সাপেকাটা হাতটা তুলে নিয়েছে নিজের দু'হাতে। কব্জির যে-জায়গায় কামড় দিয়েছে সাপটা

সেখানে মুখ বসিয়ে দিয়েছে।

হাতটা ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছেন সিনর। কিন্তু জোর করে ধরে রেখেছে মায়া, ছাড়িয়ে নিতে দিচ্ছে না। প্রচণ্ড কোনো আবেগে যেন বাঘিনীর শক্তি ভর করেছে ওর দু'হাতে। চুষে চুষে বেশ কিছুটা রক্ত বের করে নিল সে সিনরের ক্ষতস্থান থেকে, তারপর থুতু ফেলার মতো করে ফেলে দিল। বেশ কয়েকবার করল কাজটা। এরপর সিনরের হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের আলখাল্লার প্রান্ত ছিঁড়ে আলগা করল বড় একটুকরো কাপড়। সিনরের কব্জির ক্ষতস্থানের কিছুটা উপরে খুব শক্ত করে বাঁধল টুকরোটা। কাজ করতে করতেই চেঁচিয়ে ডাকল আমাকে, ছোট কিন্তু শক্ত একটা ডাল যোগাড় করে নিয়ে যেতে বলল।

ডালটা নিয়ে গেলাম মায়ার কাছে। সিনরের হাতের বাঁধনের ফাঁকে জোরাজুরি করে ডালটা ঢুকিয়ে দিল সে। তারপর বিশেষ কায়দায় কয়েকবার মোচড় দিল ডালটাকে। খেয়াল করলাম, প্রচণ্ড চাপে নীল হয়ে যাচ্ছে সিনরের হাত।

'ভয় পাওয়ার কিছু নেই, মায়া,' মেয়েটাকে অভয় দেয়ার জন্য বললেন তিনি, 'সাপেকাটার চিকিৎসা জানা আছে আমার। ক্যাম্পে চলো, জলদি!'

দু'মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ক্যাম্পে। ধারালো একটা ছুরি আর বারুদের একটা ফ্ল্যাস্ক বের করলেন সিনর।

ছুরিটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'কোনো দ্বিধা করবে না। কব্জির উপরে ধমনী থাকে না, কাজেই ভয় পাওয়ার কিছু নেই। গভীর করে কাটবে।'

আমাদের কথাবার্তা শুনে উঠে এসেছে যিব্যালবে, সিনরের হাত দেখেই বুঝে গেছে কী হয়েছে। তাঁর হাতটা ধরল সে। দু'বার ছুরি চালালাম আমি। মূর্তির মতো স্থির হয়ে থাকলেন সিনর। কিন্তু মায়া গুঙিয়ে উঠল দু'বারই। সাপটা যে-জায়গায় কামড় দিয়েছে সেখান থেকে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত ঝরানোর পর, বিশ সেন্টের একটা মুদ্রার

উপর যতটুকু বারুদ রাখা যায় ততখানি বারুদ সেখানে ঢাললেন সিনর। তারপর আগুন লাগিয়ে দিলেন বারুদে। মুহূর্তেই দেখা দিল সাদা ধোঁয়া। পুড়ে কালো হয়ে গেল জায়গাটা।

হাসার চেষ্টা করলেন সিনর। 'যেহেতু আমাদের কাছে ব্র্যাণ্ডির কোনো বোতল নেই সেহেতু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার আছে বলে মনে হয় না।'

কথাটা শুনে সিনরের হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের মালসামান ঘাঁটতে শুরু করল যিব্যালবে। বিশেষ একজাতের গাছগাছড়ার রস থেকে বানানো একরকমের পেস্ট আছে ওর কাছে, সেটা বের করে এনে দিল সিনরকে। বলল, 'এটা খান। "আগুন-পানির" চেয়ে এই পেস্ট অনেক বেশি উপকারী।'

পেস্টটা নিলেন সিনর, খেতে শুরু করলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই দেখি, আর ঢোক গিলতে পারছেন না তিনি। দেখে মনে হচ্ছে তাঁর শরীর অবশ হয়ে আসছে। বোঝা যাচ্ছে গলা শুকিয়ে আসছে তাঁর। ঢুলু ঢুলু করছে দু'চোখের পাতা। চেষ্টা করেও ঘুম ঘুম ভাবটা ঠেকিয়ে রাখতে পারছেন না। দু'পাশ থেকে তাঁর দু'হাত ধরলাম আমি আর যিব্যালবে, একটু হাঁটাচলা করার জন্য ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছি তাঁকে।

'চেষ্টা তো করছি,' দুর্বল গলায় বললেন সিনর, 'কিন্তু পারছি না...' বলতে বলতে ঢলে পড়ে গেলেন মাটিতে। বন্ধ হয়ে গেল চোখের পাতা।

ভয়ে-আতঙ্কে আমার মাথা খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা। ধরেই নিয়েছি মারা যাচ্ছেন সিনর। আমার অক্ষমতার জন্য রাগও হচ্ছে নিজের উপর। এত ভালো একটা মানুষ চোখের সামনে এভাবে মারা যাবে আর আমি কিছুই করতে পারবো না? আতঙ্ক-ভয়-ক্রোধের সম্মিলিত বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার বুদ্ধি, সব রাগ গিয়ে পড়ল মায়ার উপর। হিংসায় জ্বলতে জ্বলতে তিক্ত গলায় বললাম, 'সব দোষ আপনার!'

'আমাকে ঘৃণা করেন বলেই এভাবে বলছেন আপনি,' মায়ার দু'চোখে পানি, আবেগে বুজে আসতে চাচ্ছে কণ্ঠ।

'আমার জায়গায় আপনি থাকলে আপনিও এভাবে বলতেন,' রাগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে আমার। 'আপনার বোকামির জন্যই আজ মরতে হচ্ছে আমার বন্ধুকে। এমন একজন বন্ধু যাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসি আমি।'

'তিনি কি আপনার একার বন্ধু?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল মায়া। 'তাঁকে কি আপনি একাই ভালোবাসেন?'

মায়ার প্রশ্ন শুনে থমকে গেলাম আমি।

'সাদা মানুষটার এই তন্দ্রা ভাঙাতে হবে আমাদেরকে,' বলল যিব্যালবে, মায়ার ফিসফিসানি শুনতে পেয়েছে বলে মনে হয় না। 'তা না-হলে বাঁচানো যাবে না তাঁকে।'

'ওহ্!' বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল মায়া। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সিনরের পাশে। তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'শুনুন! শুনতে পাচ্ছেন? উঠুন দয়া করে। ওরা বলছে আমার জন্যই নাকি মারা যাচ্ছেন আপনি!'

মেয়েটার চিৎকার মনে হয় শুনতে পেয়েছেন সিনর। তাঁর চোখ আগের মতোই বন্ধ আছে, কিন্তু ঠোঁটের কোনায় দেখা যাচ্ছে মৃদু হাসি। বিড়বিড় করে বললেন, 'চেষ্টা করে দেখি!'

কিছুক্ষণ পর, বোঝা গেল শুধু ইচ্ছার জোরে, চোখ খুললেন তিনি। আমাদের সহায়তায় উঠে দাঁড়ালেন। এক পা দু'পা করে হাঁটতে শুরু করলেন। মাতালের মতো টলমল পায়ে হাঁটছেন। খানিকটা হাঁটাচলা করে পড়ে গেলেন আবারও। এগিয়ে গিয়ে হাত রাখলাম তাঁর বুকে। না, বন্ধ হয়ে যায়নি হৃৎস্পন্দন। তবে ধীর থেকে আরও ধীর হচ্ছে ক্রমশ। একসময় মনে হলো থেমেই গেছে বুঝি। কিন্তু হঠাৎ, আমরা সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছি এমন সময়, আবার জোরে জোরে চলতে শুরু করল সিনরের হৃৎপিণ্ড। ভালোমতো তাকিয়ে দেখি রঙ ফিরতে শুরু করেছে তাঁর পাণ্ডুর

চেহারায়। উদীয়মান চাঁদের ক্ষীণ আলোতেও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না প্রাণ ফিরে পাচ্ছেন তিনি।

'আমার মনে হয় বিষের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছেন সাদামানুষটা,' বলল যিব্যালবে।

শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম ঈশ্বরকে।

সিনরকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে একটা ক্যাম্পবেডে শুইয়ে দিলাম আমরা। কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলাম তাঁর শরীর। খেয়াল করলাম, কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি।

টানা এক ঘণ্টার মতো ঘুমালেন সিনর। তারপর ভাঙল তাঁর ঘুম। উঠে বসে পানি খেতে চাইলেন দুর্বল গলায়। তাঁর কাছেই বসে ছিলাম আমরা, হতাশ চেহারায় একে-অপরের দিকে তাকালাম। কারণ আমাদের কাছে একফোঁটা পানি নেই। অপরাধীর মতো কথাটা জানালাম সিনরকে। শুনে গুঙিয়ে উঠলেন তিনি, চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'পিপাসায় আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এর চেয়ে সাপের কামড়ে মরলে অনেক ভালো হতো।'

যিব্যালবের দিকে তাকাল মায়া। 'ওই কুয়ায় যাবো?'

'গেলেও পানি নিয়ে ফিরতে পারবি না,' মাথা নেড়ে বলল যিব্যালবে। 'পা পিছলে গিয়ে ঘাড় মটকে...'

'হ্যাঁ,' সম্মতি জানালেন সিনর। 'দুই কি তিনজন মরার চেয়ে একজন মরা অনেক ভালো।'

মায়া বলল, 'বাবা, এক কাজ করলে হয় না? আগামীকাল যে-জলাশয়ের কাছে যাওয়ার কথা আমাদের, সবচেয়ে শক্তিশালী ঘোড়াটা নিয়ে তুমি না-হয় এখনই চলে যাও সেখানে। পানি নিয়ে ফিরে আসতে বড়জোর আট-ন'ঘণ্টা সময় লাগবে।'

'লাভ হবে না,' বিড়বিড় করে বললেন সিনর। 'ততক্ষণ আমি পানি না-খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবো বলে মনে হয় না। ...আমার

কী মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে, গলার ভিতরটা কয়লার মতো হয়ে গেছে।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল যিব্যালবে। সে-ও বুঝতে পারছে এত দেরি হলে শেষপর্যন্ত কোনো লাভই হবে না হয়তো।

'বাবা,' রীতিমতো মিনতি করছে মায়া, 'তুমি না-গেলে আমি যাই?'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল যিব্যালবে, ঠিকমতো শুনতে পেলাম না। মাথা ঝাঁকাল সে, নড়ে উঠল ওর লম্বা লম্বা দাড়ি। তবে উঠে রওয়ানা হয়ে গেল ঘোড়াগুলোর দিকে। কয়েক মিনিট পরই মরুভূমির বালিতে শোনা গেল ওর ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজ।

সিনরের দিকে তাকালাম আমি। 'ভয় পাবেন না। বিষের প্রতিক্রিয়ায় এ-রকম মনে হচ্ছে আপনার। কিন্তু পানি খেতে না-পারলে এই আট-ন'ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হবে না আপনার। পানি না-খেয়ে মানুষ অনেকদিন থাকতে পারে। মন হালকা করুন। দেখবেন আস্তে আস্তে কমে যাবে পিপাসা। ইস্‌স্‌, আমাদের সঙ্গে যদি ঘুমের ওষুধ থাকত! আপনাকে ওই ওষুধ খাইয়ে দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যেত তা হলে।'

জবাবে কিছু বললেন না সিনর। দেখলাম তাঁর কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। হাত কচলাচ্ছেন সমানে। বোঝা গেল দুশ্চিন্তায় ভুগছেন তিনি।

বেশ কিছুক্ষণ পর বললেন মায়াকে, 'একটুকরো ঠাণ্ডা পাথর খুঁজে নিয়ে আসতে পারবে? মুখের ভিতরে ভরে রাখি, তা হলে কিছুটা হলেও কমবে আমার কষ্ট।'

এখানে-সেখানে খুঁজে একটুকরো পাথর নিয়ে এল মায়া। টুকরোটা মুখে ভরে চুষতে লাগলেন সিনর। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সেটা পরে গেল তাঁর মুখ থেকে। তাকিয়ে দেখি, মায়া আনার সময় জিনিসটা যে-রকম শুকনো খটখটে ছিল সে-রকমই আছে। অর্থাৎ সিনরের লালাও শুকিয়ে গেছে সম্ভবত।

এরপর হঠাৎ করেই যেন মাথা খারাপ হয়ে গেল তাঁর। অর্থহীন প্রলাপ বকতে শুরু করলেন তিনি বিভিন্ন ভাষায়।

'তোমরা শয়তান,' আঙুল উঁচিয়ে আমাকে আর মায়াকে দেখাচ্ছেন তিনি, 'একেবারে জাত শয়তান। তা না-হলে এভাবে কেউ কাউকে পানির কষ্ট দিয়ে মারে? ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে উপহাস করছ কেন? দয়া করো, আমার উপর দয়া করো। এক ফোঁটা হলেও পানি খেতে দাও।'

দাঁতে দাঁত চেপে কিছুক্ষণ সহ্য করল মায়া। তারপর একসময় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখি, ছলছল করছে বেচারীর দু'চোখ। মনে হচ্ছে যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে কান্নায়।

আসলেই, সিনরের দিকে তাকালে বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। বিষের প্রভাবে বিবর্ণ হয়ে গেছে চেহারাটা। চোখের নীচে কালি পড়ে গেছে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই। ফুটকি ফুটকি রক্ত জমে আছে দুই ঠোঁটে।

'আমি আর সহ্য করতে পারছি না,' কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল মায়া, 'সিনর ইগনাশিয়ো, আপনার বন্ধুর খেয়াল রাখবেন।'

মাথা ঝাঁকালাম। 'এসব পরিস্থিতিতে মেয়েমানুষের না-থাকাই ভালো,' আমার কণ্ঠে তিরস্কার। 'যান, আড়ালে গিয়ে একটু ঘুমানোর চেষ্টা করুন। যদি দরকার পড়ে আপনাকে ডেকে তুলবো।'

ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল মায়া। কিন্তু কিছু না-বলে চলে গেল। গজ ত্রিশেক দূরে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসে পড়ল মাটিতে।

আপাতদৃষ্টিতে সে-রকমই মনে হলো আমার। কিন্তু আসল ঘটনা ছিল ভিন্ন। পরে আমাকে সব বলেছিল মেয়েটা। সেগুলো বরং এখানেই বর্ণনা করি।

আসলে ঝোপের আড়ালে বসে চিন্তা করতে শুরু করে মায়া। সে মোটামুটি নিশ্চিত ছিল, পানি ছাড়া ওই রাত পার করতে পারবেন না সিনর, তার আগেই মৃত্যু হবে তাঁর। মেয়েটা এই ব্যাপারেও নিশ্চিত,

দূরের ওই জলাশয় থেকে কাল সকালে পানি নিয়ে ফিরতে পারবে না ওর বাবা—দেরি হবে আরও।

মেয়েটার চোখের সামনে মারা যাচ্ছেন সিনর। মায়ার মনে হচ্ছে ওর জীবনও যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে একইসঙ্গে। কারণ ইতোমধ্যে সিনরকে মনেপ্রাণে ভালোবেসে ফেলেছে সে।

কিছু একটা করতেই হবে—শুধু এ-চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথায়—তা না-হলে বাঁচানো যাবে না ভালোবাসার মানুষটাকে। বাঁচানোর একটাই উপায় আছে—যে-কোনো জায়গা থেকে পানি নিয়ে আসতে হবে। কাছেই সেই ভয়ঙ্কর কুয়া, কুলুঙ্গি দিয়ে নীচে নামতে পারলে পানি পাওয়া যাবেই; কিন্তু কথা হলো কে যাবে সেখানে? অপ্রশস্ত ওই ধাপগুলো বেয়ে নামা কি আদৌ সম্ভব?

সম্ভব—মনে মনে নিজেকে সাহস দেয় মায়া। কারণ বহু বছর আগে এই মৃত শহরের অধিবাসীরা প্রতিদিন করত কাজটা। তা হলে সে চেষ্টা করলে কেন পারবে না? ওর বয়স কম, শারীরিক সক্ষমতা বেশি। ছোটবেলা থেকেই সিটি অভ দ্য হার্টের বিভিন্ন উঁচু উঁচু বিপজ্জনক দেয়াল আর পিরামিডে একা চড়ার অভ্যাস আছে। সে-সব দেয়াল বা পিরামিড যত উঁচুই হোক না কেন কোনোদিনও ভয় পায়নি সে। কোনোদিন একবারের জন্যও মাথা ঘুরিয়ে যায়নি। তা হলে আজ কেন পারবে না? তা-ও আবার যখন ওর স্বপ্নপুরুষ মরতে বসেছে তখন? তা ছাড়া যাকে এত ভালোবেসেছে তাকে চোখের সামনে এভাবে কষ্ট পেয়ে পেয়ে মরতে দেখার চেয়ে নিজের মরণ কি ভালো না?

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মায়া—পানি আনতে যাবে ওই ভয়ঙ্কর কুয়ায়।

দ্রুত কাজ শুরু করে দিল মেয়েটা। আমি তখন বসে আছি সিনরের ক্যাম্পবেডের পাশে। চোখ বন্ধ করে একমনে ঈশ্বরের কাছে আমার বন্ধুর জীবন ভিক্ষা চাচ্ছি। সিনর পড়ে আছেন বিছানায়। একটু পর পর গুঙিয়ে উঠছেন। বার বার এদিকে-সেদিকে

ছুঁড়ছেন দু'হাত। আক্ষেপ করছেন এক ফোঁটা পানির জন্য।

জানি না কেন, হঠাৎ মনে হলো কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। চোখ খুলে তাকালাম।

মায়া।

'খুব বড়াই করে তখন বললেন না আপনার বন্ধুকে ভালোবাসেন আপনি?' মেয়েটার গলা আগের মতোই কান্নাজড়িত, 'কিন্তু আমার মনে হয় ভালোবাসা কাকে বলে তা জানেন না আসলে। যদি বেঁচে থাকি তা হলে আমি মায়া, যাকে এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন, আপনার বন্ধুর এত বড় ক্ষতি করেছি বলে ঘৃণা করেন, প্রমাণ দেবো ভালোবাসা কী।'

এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিলাম ওর কথাগুলো। বলাই বাহুল্য, তখন ভেবেছিলাম অসারের তর্জন-গর্জনই সার—মুখে যত বড় বড় কথাই বলুক মেয়েটা আসলে কিছুই করতে পারবে না।

চোখ বন্ধ করলাম আবার। প্রার্থনা করতে লাগলাম।

আমি কিছু বললাম না দেখে মায়াও কিছু বলল না। নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল। ঘোড়াগুলো যেখানে রাখা আছে এগিয়ে গেল সেদিকে। যোগাড় করল চকমকি পাথর, ইস্পাতের টুকরো, কিছু শুকনো ন্যাকড়া যা স্ফুলিঙ্গের স্পর্শে সহজেই জ্বলে উঠবে এবং দড়ি। চামড়ার একটা মশক ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। তারপর মরুভূমির উপর দিয়ে ছুট লাগাল ওই কুয়ার উদ্দেশে।

কুয়ার প্রবেশপথের কাছে পৌঁছে থামল সে। ঘৃতকুমারী গাছের কাণ্ড দিয়ে যে-মশালগুলো বানিয়েছিলাম আমরা সেগুলো খুঁজে বের করল। চলে যাওয়ার আগে, আর কাজে লাগবে না ভেবে মশালগুলো এখানে ছুঁড়ে ফেলে গিয়েছিলাম। গর্তে ঢুকে পড়ার আগে পিছন ফিরে তাকাল, দেখে নিল রাতের আকাশটা। ভাবল, এই শেষবারের মতো দেখছে পৃথিবীর আলো-বাতাস, হয়তো আর কোনোদিনই ফেরা হবে না ওর। তারপর আর দেরি না-করে একটা মশাল

জ্বালল। ঢুকে পড়ল গর্তের ভিতরে।

আমরা সবাই মিলে যখন গিয়েছিলাম ওই জায়গায় তখনই কেমন গা ছমছম করছিল। এবার মায়া একা। ক্রমেই অজানা এক আতঙ্ক চেপে বসছে ওর মনে। সুড়ঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে সে। চারপাশ দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে বয়ে যাচ্ছে জোরালো বাতাস। কুয়ার খোলামুখ যেন গিলে খাচ্ছে সব বাতাস। অদ্ভুত এক আওয়াজ হচ্ছে তখন। মনে হচ্ছে, কে বা কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে নীচে। কখনও বাতাসের গতি তীব্র হলে সেই ফিসফিসানি পরিণত হচ্ছে মর্মপীড়িত ব্যক্তির ফোঁপানি কিংবা মুমূর্ষু ব্যক্তির গোঙানিতে।

কেঁপে উঠল মায়া। ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে না সে। কিন্তু এ-রকম একটা জায়গায় এত রাতে একা থাকলে অতি সাহসী লোকেরও বুকে কাঁপন ধরতে বাধ্য। মেয়েটার মনে হচ্ছে, পানি নিতে এসে কেউ-না-কেউ পা পিছলে গিয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে মরেছে; ওই লোকের অতৃপ্ত আত্মা আজও আর্তনাদ করে বেড়াচ্ছে এই অশুভ জায়গায়।

ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে মায়ার। কিন্তু সিনরের কথা মনে হচ্ছে বার বার। সে ফিরে গেলে পানি নেয়া হবে না, আর পানি নেয়া না-হলে বাঁচবেন না সিনর। সুতরাং সাহসে বুক বেঁধে একটু একটু করে এগিয়ে চলল মেয়েটা।

কুয়ার মুখের কাছে এসে থামল সে। লম্বা করে দম নিল। কেউ দেখছে না, তাই কাপড় খুলে ফেলল। এবার চলার সময় পায়ে আর আটকাবে না আলখাল্লার মতো ঢিলেঢালা পোশাক। কুয়ার অপ্রশস্ত ধাপগুলো বেয়ে উঠতে-নামতেও অসুবিধা হবে না। দড়িটা কোমরে পেঁচিয়ে নিল সে। মশকটা আড়াআড়িভাবে ঝুলাল কাঁধে। আরেক কাঁধে ঝুলাল চকমকি পাথর আর ইস্পাত। সঙ্গে যে-মশালগুলো আছে সেগুলো থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে বড় দুটো মশাল বের করল, আগুন ধরাল। পাথরে বাঁধাই-করা কুয়ামুখের একজায়গার ফাটলে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিল মশালের নীচের প্রান্ত যাতে বেশ কিছুটা হেলে থাকে দুটো মশালই। উঁকি দিয়ে দেখল, অনেকখানি

নীচ পর্যন্ত আলোকিত হয়ে আছে। সঙ্গের অন্য মশালগুলো নীচে ফেলে দিল। প্রথমে যে-মশালটা জ্বালিয়েছিল, কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সেটাও ফেলল। ভাবল, বাতাসের ধাক্কায় নিভে যাবে আগুন। কিন্তু নিভল না—আশ্চর্যই হলো মেয়েটা— জ্বলতে জ্বলতে নীচে গিয়ে পড়ল মশাল। আবারও উঁকি দিল মায়া। এক শ' পঞ্চাশ ফুট, কিংবা তারও বেশি নীচে পড়ে আছে মশালটা। জ্বলছে এখনও। শিখাটা অনেক ছোট দেখাচ্ছে এত উঁচু থেকে।

মায়ার সব প্রস্তুতি শেষ। এবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে হবে। আবারও দ্বিধা করল সে, আবারও উঁকি দিয়ে দেখল অনেক নীচের জ্বলন্ত মশালটা। কুয়ার পাথুরে দেয়াল কেটে কুলুঙ্গির মতো করে বানানো অপ্রশস্ত ধাপগুলোও দেখল আবার। বুঝতে পারল, এভাবে যত সময় নষ্ট করবে, ভয় তত বেশি করে চেপে বসবে ওর মনে। তারচেয়ে ভালো অনতিবিলম্বে রওয়ানা করা।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মায়া। কুয়ার পাথরনির্মিত মুখটা দু'হাতে শক্ত করে ধরে এক পা এক পা করে দু'পা-ই ঝুলিয়ে দিল কুয়ার ভিতরে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর প্রথম কুলুঙ্গিতে পা রাখতে পারল সে। একটু পর দ্বিতীয় পা-টাও রাখল সেখানে, শরীরের ভারসাম্য ঠিক করল। এবার আস্তে আস্তে, অত্যন্ত সাবধানে, প্রথমে বাঁ হাত পরে ডান হাত সরিয়ে এনে ধরল কুয়ামুখের ভিতরের প্রান্ত। বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে। টের পেল, ওর হৃৎস্পন্দন অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। মন বার বার চাচ্ছে নীচের দিকে তাকাতে। কিন্তু জোর করে নিজেকে সামলে রাখল সে।

কুলুঙ্গিগুলো যারাই বানিয়ে থাকুক বুঝেশুনেই বানিয়েছে। অল্প দূরত্ব পর পর কেটেছে প্রতিটা ধাপ। অভ্যাস থাকলে দশ-বারো বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীর পক্ষেও ওঠানামা করা অসম্ভব না। কাজেই কুয়ার ভিতরে প্রান্তটা ধরে রেখেই আবার পা নামাতে পারল মায়া। দ্বিতীয় কুলুঙ্গিতে নিজের ভর ঠিকমতো রাখতে পারার পর

আগেরবারের মতোই প্রথমে ছাড়ল বাঁ হাত, ধরল প্রথম কুলুঙ্গির একপ্রান্ত। বিপদ হবে না বুঝতে পেরে ডান হাতটাও ছাড়ল, প্রথম কুলুঙ্গির আরেকপ্রান্ত আঁকড়ে ধরল। আবারও বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ, টের পেল ওর বুকের ধুকপুকানি আস্তে আস্তে কমছে।

কুলুঙ্গিগুলো একরেখায় না-কেটে বরং আঁকাবাঁকাভাবে কাটা হয়েছে। যেমন প্রথম কুলুঙ্গির মাত্র দেড় ফুট নীচে আছে দ্বিতীয় কুলুঙ্গিটা, কিন্তু সরে গেছে ইঞ্চি দশেক বাঁয়ে। একরেখায় চিন্তা করলে প্রথমটার ঠিক নীচে আছে তৃতীয়টা, আবার দ্বিতীয়টার ঠিক নীচে আছে চতুর্থটা—এভাবে।

বুদ্ধিটা মায়ার মাথায় আসতে বেশি সময় লাগল না। সে দ্বিতীয় কুলুঙ্গিতে দুই পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে, ডান দিকে ঝুঁকে কিছুটা বাঁকা হয়ে আঁকড়ে ধরতে হয়েছে প্রথটাকে। কিন্তু প্রথম কুলুঙ্গিটা যদি দু'হাতে না-ধরে বাঁ হাতটা ছেড়ে দেয় এবং একইসঙ্গে ডান পা-টা ইঞ্চি দশেক ডান দিকে সরিয়ে তৃতীয় কুলুঙ্গিতে রাখে তা হলে নামার ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যায়। বাঁ হাতটা যখন ছেড়ে দেবে তখন ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য গাল-বুক-পেট সেঁটে রাখবে কুয়ার দেয়ালের সঙ্গে, শরীরের উপরের অংশের ভার বাঁ হাতের উপর ছেড়ে দিয়ে হাতটা চেপে ধরবে দেয়ালের সঙ্গে। ডান দিকে নামার সময় কাজে লাগবে এই পদ্ধতি। বাঁ দিকে নামার সময় ঠিক উল্টোটা করতে হবে।

নামছে মায়া। প্রথম কয়েক ধাপ কোনো সমস্যা ছাড়াই নামতে পারল সে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি। ভারসাম্য বজায় রাখার পদ্ধতিতে গণ্ডগোল বেধে গেল, যে-হাতে ভর দিয়ে ছিল পিছলে গেল সে-হাত। মেয়েটার বুকের খাঁচায় প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারল হৃৎপিণ্ড, মোচড় দিয়ে উঠল তলপেটে, একইসঙ্গে মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল শীতল একটা স্রোত। প্রাণপণ চেষ্টায় একহাতে একটা কুলুঙ্গি খামচে ধরল সে, যে পা-টা নামাবে বলে ঠিক করেছিল তা নামাতে গিয়েও শেষমুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল করল।

ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে, গাল-বুক-পেট ঠেসে ধরল কুয়ার দেয়ালের সঙ্গে। বিড় বিড় করে নিজেকে বোঝাচ্ছে, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তাড়াহুড়ো করে কিছু করা যাবে না। জলদি করতে গেলে চরম বিপদ হতে পারে। আর সে-রকম কিছু হলে কোনোদিনই পানি নিয়ে ফেরা হবে না সিনরের কাছে।

ভারসাম্য হারানোর ঘটনাটা যেখানে ঘটেছে সেখানকার দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে থাকল মায়া বেশ কিছুক্ষণ। একসময় ওর ধুকপুকানি কমল, শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হলো। ভয় দূর হলো মন থেকে। আবার নামতে শুরু করল সে।

যত নামছে মায়া, কুয়ামুখের কাছে জ্বলন্ত বড় মশাল দুটোর আলো তত কমছে। অন্যদিকে নীচের মশালটার আলো বাড়ছে। এখন মায়ার মনে একটাই ভয়, কোনো কুলুঙ্গি না আবার ভাঙা থাকে! কিন্তু সৌভাগ্যবশত সে-রকম কোনো ভাঙা কুলুঙ্গি নেই। তবে একেবারে নীচের দিকের কিছু কুলুঙ্গিতে অল্প অল্প শ্যাওলা জমায় দু'বার পা পিছলে গেল মেয়েটার। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল সে, বার বার এভাবে পা পিছলে নামার চেয়ে বরং লাফ দেয়াটা ভালো। আর পনেরো-বিশ ফুটের মতো বাকি আছে। তা ছাড়া নীচের মাটি পাথুরে না। বরং কেমন ভেজা ভেজা আর কর্দমাক্ত মনে হচ্ছে উপর-থেকে-ফেলা মশালের আলোয়। লম্বা করে দম নিয়ে দু'হাত ছেড়ে দিল মায়া, ছোট করে লাফ দিল। দু'-এক সেকেণ্ডের মধ্যেই পড়ল কুয়ার তলদেশের মাটিতে। নরম মাটিতে দেবে গেল ওর পা।

নিজেকে সামলে নেয়ার জন্য বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল জ্বলন্ত মশালটা। আশপাশে দেখা যাচ্ছে ঘৃতকুমারী গাছের বেশ কিছু শুকনো কাণ্ড, সেগুলোতে সাবধানে আগুন লাগিয়ে দিল। এবার কুয়ার তলদেশটা আলোকিত হয়ে উঠেছে।

এদিকে-সেদিকে তাকাল মায়া।

কুয়ার তলদেশটাকে আসলে বড়সড় প্রাকৃতিক গুহা বলা চলে।

তবে অন্যান্য গুহার মতো তেমন উঁচু না এটা। আবার গুহা বলেই অন্যান্য কুয়ার মতো পানি উঠে থাকে না। পানি আছে কাছাকাছিই কোথাও—ঠাণ্ডা বাতাসের কারণে টের পাওয়া যাচ্ছে। সে-পানি সম্ভবত বাড়ে-কমে। কারণ তা না-হলে যেখানে লাফিয়ে পড়েছে মায়া সে-জায়গার মাটি অতখানি নরম বা কর্দমাক্ত হতো না।

গুহাটা নীচের দিকে যত এগিয়েছে, দেখে মায়ার মনে হচ্ছে ছাদ তত নিচু হয়েছে। মেঝের দিকে তাকাল সে। এককালে যারা থাকত এই শহরে, যারা পানি নিতে আসত তাদের নিয়মিত চলাচলের কারণে মেঝেতে কেমন গর্তের মতো হয়ে গেছে। তবে অনেকদিন অব্যবহৃত থাকার কারণে প্রাকৃতিক নিয়মেই আবার চাপা পড়ে গেছে বালি আর ধুলোর নীচে। তারপরও পথটা আলাদা করে চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

ওই পথ ধরে পঞ্চাশ কদমের মতো এগোল মেয়েটা। ওর এক হাতে উঁচু-করে-ধরা জ্বলন্ত মশাল। বাকি মশালগুলো চেপে ধরে আছে আরেক বগলের নীচে। যত এগোচ্ছে বাতাস তত স্থির হচ্ছে। গরম বাড়ছে। মায়ার মনে হচ্ছে দম আটকে আসছে ওর। ফেলে-আসা কুয়ামুখের ভিতর দিয়ে নামার সময় পাক খাচ্ছে বাতাস। শোঁ শোঁ জাতীয় অদ্ভুত এক আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সরু থেকে আরও সরু হচ্ছে গুহাটা, নিচু থেকে আরও নিচু হচ্ছে সেটার ছাদ।

খানিকক্ষণ চলার পর যে-জায়গায় হাজির হলো মায়া, তা দেখে ওর মনে হলো ছোট্ট একটা প্যাসেজে এসে দাঁড়িয়েছে। হতাশ হয়ে জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েটা, সে-আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হলো চারপাশের দেয়ালে। ওর হতাশার কারণ, আমাকে এর আগে বলতে শুনেছে এ-রকম কুয়ায় কখনও কখনও পাঁচ-ছ' শ' ফুট নীচে নেমে যায় পানির স্তর; সেখানে বড়জোর মাত্র দু' শ' ফুট নামতে পেরেছে সে।

যা-হোক, আরও দশ-পনেরো কদম এগোনোর পর সব শঙ্কা দূর হলো ওর। হঠাৎ করেই বাঁক নিল প্যাসেজটা, সেটা পার হতেই

থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো মায়াকে। অদ্ভুত সুন্দর একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সে। এ-রকম কোনো জায়গা এর আগে কখনও দেখেনি, দেখার প্রশ্নই আসে না। অনতিদূরে মশালের আলোয় চকচক করছে কালো পানি, মৃদু ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ছোট ছোট ঢেউ এসে বাড়ি খাচ্ছে তীরে।

ছোট্ট প্যাসেজ ধরে যে-জায়গায় এসে হাজির হয়েছে মায়া তা আসলে কত বড় বোঝা কঠিন। মশালের অনুজ্জ্বল আলোয় মোটেও কাটছে না অন্ধকার। চারপাশে স্ট্যালাকটাইটের সাদা সাদা স্তম্ভ—নেমে এসেছে গুহার ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত। তবে ওগুলোর গঠনপ্রকৃতি দেখে অনুমান করা যায় কোনো এককালে পরিচর্যার উদ্দেশ্যে মানুষ হাত লাগিয়েছিল। এগুলোর প্রায় মাঝখানে ত্রিশ ফুটের মতো ব্যাসবিশিষ্ট একটা বৃত্তাকার মৃত্তিকাগহ্বর। সেখানে থই থই করছে পানি। আপাতদৃষ্টিতে স্ফটিকস্বচ্ছ মনে হচ্ছে। তবে কয়েক মুহূর্ত পর পর তিন-চার ফুট ব্যাসবিশিষ্ট বিরাট এক বুদ্‌বুদ্‌ উঠছে জলাশয়টার কেন্দ্রভাগে। বুদ্‌বুদ্‌টা ফটাস করে ফেটে যাওয়ার পর ছোট ছোট ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে জলাশয়ের চারপাশে। তরঙ্গহিল্লোল জাগছে প্রাকৃতিক এই পুকুরে। ছন্দবদ্ধ সুরের মতো অদ্ভুত এক ঐক্যতান যেন ছড়িয়ে পড়ছে পুরো গুহায়।

স্তব্ধ হয়ে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল মায়া। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সে বুদ্‌বুদের খেলা। কান পেতে শুনছে নৈঃশব্দ্যের মধ্যে তরঙ্গহিল্লোলের আওয়াজ। হঠাৎ মনে পড়ল, নষ্ট করার মতো সময় নেই ওর হাতে। পানি নেয়ার জন্য এগোল জলাশয়ের দিকে। তখন দেখা দিল নতুন এক বিপত্তি।

জলাশয়টার তীরে প্রাকৃতিকভাবেই পড়ে আছে সারি সারি পাথর। সে-সব পাথর এত মসৃণ আর এত খাড়াভাবে নীচের দিকে নেমে গেছে যে, তীরে দাঁড়িয়ে পানি নেয়া এককথায় অসম্ভব। যারা আগেরদিনে এই জায়গা থেকে পানি সংগ্রহ করত তারা এই সমস্যাটার মোকাবেলা করেছিল বিশেষ এক কায়দায়। কাঠের সিঁড়ি

বানিয়ে নিয়ে এসে তীর থেকে বসিয়ে দিয়েছিল জলাশয়ের ভিতরে, ধাপগুলো ক্রমশ নেমে গিয়েছিল পানিতে। কোনো কোনো জায়গায় কাঠের সেই সিঁড়িগুলো এখনও চোখে পড়ে, কিন্তু সেগুলো পানির সংস্পর্শে থাকতে থাকতে পচে গিয়ে ব্যবহার-অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

এ-রকম একটা সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল মায়া। পায়ের সামনে বড়সড় একটা পাথরের গায়ে দেখা যাচ্ছে কৃত্রিম একটা ফুটো। যারা পানি নিতে আসত তারা হয়তো এই গর্তের সঙ্গে দড়ি বেঁধে দড়ির আরেকপ্রান্ত আটকে রাখত কোমরের সঙ্গে, ভাবল মেয়েটা, যাতে হঠাৎ করে পিছলে গিয়ে পানিতে পড়লে বেশি গভীরে চলে না-যায়।

কথাটা মনে হওয়ামাত্র কোমরে পেঁচানো দড়ির বাণ্ডিলটা খুলল মায়া। একপ্রান্ত শক্ত করে বাঁধল পাথরের ফুটোর সঙ্গে। আরেকটা ফুটোর সঙ্গে কায়দা করে বসিয়ে দিল হাতের মশাল। চকমকি পাথর আর ইস্পাতের টুকরোটা কাঁধ থেকে খুলে রাখল তীরে। তারপর দড়ি ধরে রেখে তীর থেকে পিছলে নেমে পড়ল পানিতে।

প্রথমে একটু গভীরে চলে গেলেও সাঁতার কেটে বুকসমান পানিতে এসে থেমে দাঁড়াল মায়া। পানি আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা। গা জুড়িয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে গুহার ভিতরের সেই অস্বাভাবিক গরমের পর পানির এই শীতল স্পর্শ রীতিমতো স্বর্গীয় মনে হচ্ছে। তিন-চার বার ডুব দিল মায়া। ওর ঘন চুল ভিজে লেপ্টে গেল ঘাড়ে, কাঁধে। দু'হাতে কিছুটা পানি সরিয়ে পান করল যথেষ্ট পরিমাণে। তারপর কাঁধ থেকে খুলল মশকটা। ভালোমতো ধুয়ে নিল সেটা, পানিতে পূর্ণ করল। মশকটা জায়গামতো ঝুলিয়ে নিয়ে দড়ি ধরে উঠে এল তীরে। আগের মশালটা নিভু নিভু করছে, তাই নতুন একটা মশাল জ্বালল। চকমকি পাথর আর ইস্পাত কুড়িয়ে নিয়ে ফিরতি পথ ধরল।

সেই কুলুঙ্গিগুলোর কাছে ফিরে এসে থামল সে। বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ। টের পাচ্ছে, উচ্চতাভীতিটা আবার ধীরে ধীরে গ্রাস করে

নিচ্ছে ওকে। ঠিক এক শ' একটা ধাপ উঠতে হবে—নামার সময় গুনেছে সে। দেরি করা মানে ভয় বাড়িয়ে দেয়া, কাজেই উঠতে শুরু করল মায়া। উঠছে আর একেকটা ধাপ গুনছে সে।

নামার চেয়ে ওঠা অনেক কঠিন। পঞ্চাশটা কুলুঙ্গি পার হওয়ার পর ক্লান্তি চেপে বসল মায়ার শরীরে। দেয়ালের সঙ্গে গাল-বুক-পেট ঠেসে ধরে অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর আবার উঠতে শুরু করল বেচারী। শুধু ইচ্ছাশক্তির উপর ভর করে পার হলো পঁচাত্তরতম কুলুঙ্গি। কিন্তু না, আর পারছে না সে। মনে হচ্ছে দম আটকে মরবে এখনই। ব্যথায় টন টন করছে ডান পা—উঠতে গিয়ে বেশিরভাগ সময় ওই পায়ের উপরই শরীরের ভর রাখতে হয়েছে ওকে। হাতের আঙুলগুলোতে আর দু'কনুইয়ের কাছে মনে হচ্ছে কোনো সাড়া নেই। ইচ্ছা করছে লাফিয়ে নীচে পড়ে গিয়ে সব যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে দিতে। তখনই সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের কথা আরও একবার মনে পড়ল ওর, মনে জোর পেতে সিনরের নাম ধরে কয়েকবার ডাকল সে। আসলে নামটা শোনাল নিজেকেই—নিভন্ত প্রদীপে কিছু তেল দিলে তা যেভাবে হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে থাকে সেভাবে বাড়ল মেয়েটার ক্ষয়িষ্ণু ইচ্ছাশক্তি। উঠতে শুরু করল আবার।

উঠছে মায়া। একটা একটা করে কুলুঙ্গি পার হচ্ছে। উঠছে না-বলে শরীরটা টেনে টেনে উপরে তুলছে বললে মানায় বেশি। এবার শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে ওর, শব্দ করে হাঁপাচ্ছে। পানিভর্তি ভারী মশকের চামড়ানির্মিত শক্ত স্ট্র্যাপের কারণে ছিলে গেছে চামড়া, জ্বলছে কাঁধ আর পিঠের ক্ষতস্থান। ক্রমাগত ঘামছে হাতের তালু। প্রতিটা কুলুঙ্গি আঁকড়ে ধরার সময় বার বার মনে হচ্ছে ধরে রাখতে পারবে না, পিছলে যাবে হাত। মাথা ঘুরাচ্ছে।

আর দশ ধাপ বাকি আছে। মায়ার এত ক্লান্ত লাগছে যে, একবার ওর মনে হলো, সব বোঝা কাঁধ থেকে খসিয়ে ফেলে দিতে না-পারলে এই দশ ধাপ অতিক্রম করতে পারবে না। কিন্তু মরে

গেলেও এই কাজ করবে না সে।

আর তিন ধাপ বাকি। মায়ার চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে আসছে সবকিছু, কেউ যেন কালো একটা কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে ঢেকে দিচ্ছে ওর দু'চোখ। টের পাচ্ছে জ্ঞান হারাচ্ছে সে। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির জোরে নিজেকে সামলে রাখল, উঠল আরও এক ধাপ। তারপর আরেকটা। এরপর পা রাখল শেষের ধাপে। দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল কুয়ার মুখ। শরীরটা কোনোরকমে টেনে তুলল কুয়ামুখের উপরে। মনে হচ্ছে কেউ যেন প্রচণ্ড শক্তিতে টেনে ধরে রেখেছে ওকে নীচ থেকে—কিছুতেই উঠতে দেবে না উপরে। আবারও সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের নাম ধরে ডাকল সে, তারপর কুয়ামুখ টপকে কীভাবে নামল মাটিতে, বলতে পারবে না। কিন্তু নামামাত্রই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

জ্ঞান ফেরার পর দেখল, মাটিতে কাত হয়ে পড়ে আছে। একটা পা তখনও খসাতে পারেনি কুয়ামুখ থেকে। আতঙ্কে অস্পষ্ট গোঙানি বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে, একটানে পা-টা ছাড়িয়ে নিল। উঠে বসার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। খুব কাহিল লাগছে। মনে হচ্ছে একটুও শক্তি নেই শরীরে। সারা গায়ে, বিশেষ করে দু'হাত আর ডান পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। বেশিক্ষণ হয়নি পেট ভরে পানি খেয়েছে, তারপরও গলা শুকিয়ে কাঠ। একবার ইচ্ছা হলো মশকের মুখ খুলে সব পানি খেয়ে ফেলে। কিন্তু জোর করে সংযত করল নিজেকে। ঠিক করল যত পিপাসাই লাগুক একফোঁটাও খাবে না। তা হলে যার জন্য এত কষ্ট করে পানি সংগ্রহ করেছে সে বেচারা আগের মতোই তৃষ্ণার্ত থেকে যাবে।

কাছেই পড়ে আছে লিনিনের আলখাল্লাটা। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সেটা তুলে নিল মেয়েটা। সময় নিয়ে পরল। খেয়াল করল অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে সে। হাত-পা-পেটের মাংসপেশী কাঁপছে থেকে থেকে। কাঁধ আর পিঠের ক্ষতস্থান জ্বালা করছে আগের মতোই।

পানির মশক আর অন্যান্য জিনিসগুলো আবার কাঁধে ঝুলাল সে। এবার রওয়ানা হবে ক্যাম্পের উদ্দেশে। তবে চলতে শুরু করার আগে শেষবারের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কুয়ামুখের দিকে।

শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বয়ে যাচ্ছে একটু পর পর। অতৃপ্ত আত্মাদের আহাজারির মতো মনে হচ্ছে আওয়াজটা। কান পাতলে পানির ছলাৎ ছলাৎ শোনা যায় কি যায় না। কুয়ামুখের কাছে জ্বলন্ত মশাল দুটো নিভু নিভু হয়ে এসেছে। অপার্থিব এই জায়গাটা যেন নিঃশব্দে বিদায় জানাচ্ছে মায়াকে।

ক্যাম্পের উদ্দেশে পা বাড়াল সে। শরীর ভেঙে আসছে ক্লান্তিতে, কিন্তু মনে দারুণ পুলক ওর। ভালোবাসার মানুষটার জন্য মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে প্রায়-অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছে। এক ফোঁটা পানির জন্য কাতরাচ্ছিল যে-মানুষটা, তার জন্য এখন বড় এক মশকভর্তি পানি মেয়েটার কাঁধে।

এদিকে আমি ততক্ষণে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিয়েছি ক্যাম্পের আশপাশে, উদ্বিগ্ন হয়ে খুঁজছি মায়াকে। ওর নাম ধরে ডাকাডাকি করছি। কিন্তু কোনো সাড়া পাচ্ছি না।

'লেডি মায়া,' রীতিমতো চিৎকার করছি আমি, 'কোথায় গেলেন? লেডি মায়া...'

'এই যে এখানে,' হঠাৎ করেই চেঁচিয়ে সাড়া দিল মেয়েটা, 'কী হয়েছে? তিনি কি...তিনি কি মরে গেছেন?'

'না,' জবাব দিলাম। 'কিন্তু আমার মনে হয় আর এক ঘণ্টার মধ্যে পানি না-পেলে মারা যাবেন সিনর। শুনুন, আমাদের পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব না। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমি। ওই ভয়ঙ্কর গুহায় যাবো। যেভাবেই হোক পানি নিয়ে আসবো সিনরের জন্য। ততক্ষণে একটা কাজ করুন, সিনরের একটু দেখভাল করুন। আমি যদি আর ফিরে না-আসি তা হলে আপনার বাবাকে

জানাবেন সব। আমার সঙ্গে যে-কবচটা আছে তা কুয়ামুখের কাছে রেখে নীচে নামবো, যদি পরে ওই জায়গায় যান তা হলে পেয়ে যাবেন সেটা। তাঁকে বলবেন, আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করে গেছি তিনি যাতে ওই কবচটা নেন এবং সিটি অভ দ্য হার্ট থেকে যথেষ্ট পমিাণ সোনা নিয়ে মেক্সিকোয় ফিরে আসেন। যে-কাজ আমি শুরু করেছিলাম কিন্তু শেষ করতে পারিনি, তা যেন শেষ করার চেষ্টা করেন তিনি। ...বিদায়, লেডি মায়া।'

'থামুন, ডন ইগনাশিয়ো,' ভাঙা গলায় বলল মায়া, 'ওই কুয়ায় যাওয়ার দরকার নেই আপনার।'

'কেন?' আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলাম।

'কারণ সেখান থেকে পানি নিয়ে এসেছি আমি,' কাঁধে-ঝোলানো মশকটা দেখাল সে। এবং সঙ্গে সঙ্গে আবারও জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল বালির উপর।

কিছুই বললাম না। কাকে বলবো? তা ছাড়া কী-ই বা বলার আছে আমার? এত আশ্চর্য লাগছে যে, মনে হচ্ছে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। একইসঙ্গে চরম লজ্জিতও বোধ করছি। আমি পুরুষ হয়ে, সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যা করতে পারিনি, মেয়ে হয়ে তা করে দেখিয়েছে মায়া। সত্যিই, একেই বোধহয় বলে নিখাদ প্রেম—যাকে ভালোবাসি তার ভালোর জন্য প্রয়োজনে মরতেও পারি।

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম অজ্ঞান মায়ার দিকে। তারপর পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম ওকে। নিয়ে গেলাম ক্যাম্পে। আরেকটা ক্যাম্পবেড আছে, তাতে শুইয়ে দিলাম। ওর কাঁধ থেকে পানির-মশক আর অন্যান্য জিনিস খুলে নিলাম। একটা কাপ নিয়ে এসে তাতে কিছুটা পানি ঢাললাম মশক থেকে। কাপটা নিয়ে তাড়াহুড়ো করে হাজির হলাম আমার বন্ধুর কাছে। ইতোমধ্যে কোমায় চলে গেছেন তিনি। একেবারে স্থির হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়। কিছুক্ষণ পর পর গুঙিয়ে উঠছেন চরম যন্ত্রণায়।

প্রথমে পানির ছিটা দিলাম তাঁর চেহারায়। কাপের পানিতে আঙুল ভিজিয়ে আঙুলটা কয়েকবার বুলিয়ে দিলাম খটখটে শুকনো ঠোঁটে। আশ্চর্য ব্যাপার, অজ্ঞান অবস্থাতেই কীভাবে যেন বুঝতে পারলেন সিনর তাঁর ঠোঁট ভিজে গেছে। কিছুটা হলেও রঙ ফিরল তাঁর চেহারায়। মুমূর্ষু ব্যক্তি মরার আগে শেষবারের মতো যেভাবে চোখ খুলে তাকায় সেভাবে তাকালেন আমার দিকে।

'পানি,' অত্যন্ত দুর্বল গলায় বললেন কোনোরকমে, 'পানির স্বাদ পাচ্ছি আমি।'

আমার হাতে-ধরা কাপটা দেখলেন তিনি, বুঝতে পারলেন কাপে পানি আছে। এত কাহিল অবস্থাতেও উঠে বসলেন শরীরের শেষ শক্তিটুকু খরচ করে। কাপটা নেয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর হাতে দিলাম কাপটা। বলা ভালো আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন তিনি। একচুমুকে খালি করে ফেললেন।

'আরও,' শুধু গলাই না, সারা শরীর কাঁপছে সিনরের, 'আরও পানি দাও আমাকে।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পানি দিলাম না তাঁকে। একবারে এতখানি পানি খেয়ে ফেললে ক্ষতি হতে পারে। বেশ কিছুক্ষণ কাকুতি-মিনতি করলেন সিনর, তারপর আরেককাপ খেতে দিলাম তাঁকে। এভাবে এক ঘণ্টা ধরে একটু একটু করে পানি খাওয়ালাম। তাঁর তৃষ্ণা পুরোটা না-হলেও কিছুটা মিটল, শরীরের কাঁপুনি কমে এল অনেকখানি। খেয়াল করলাম কালো হয়ে-আসা ঠোঁটে রঙ ফিরতে শুরু করেছে। স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরে পেয়েছে দু'চোখ।

'পানি কে এনেছে?' অনেকখানি ধাতস্থ হওয়ার পর জানতে চাইলেন সিনর।

'যে-ই এনে থাকুক তার কাছে সারাজীবনের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে থাকলেন আপনি,' বললাম আমি।

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকালেন সিনর। 'কিন্তু এনেছে কে?'

'আগামীকাল বলি? আজ বরং আরাম করে ঘুমান। যদি একঘুমে

রাত পার করে দিতে পারেন তা হলে কাল সকালে উঠে দেখবেন আপনার শরীরটা আগের মতো তরতাজা হয়ে গেছে।'

আর কিছু না-বলে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন সিনর। চোখ বন্ধ করলেন।

করার মতো তেমন কিছু নেই। তাই আমিও শুয়ে পড়লাম। এতক্ষণের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কেটে যাওয়ার পর যেন হঠাৎ করেই জড়িয়ে আসছে দু'চোখের পাতা।

কখন ঘুমিয়ে পড়লাম নিজেও জানি না।

আজও খেয়াল আছে, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখেছিলাম সে-রাতে, আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি সুবিস্তৃত কোনো মাঠে। অনতিদূরে বসে আছে মায়া। ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। তিনি ঘুমিয়ে আছেন না মারা গেছেন বোঝা যাচ্ছে না। তাঁর এক হাতে তামার তরবারিটা যেটা দিয়ে হত্যা করেছেন ডন হোসেকে। মায়ার দু'চোখে বিষণ্ন দৃষ্টি। বোধহয় ছলছল করছে চোখ দুটো। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না বেচারী। অনেকদূরে, বোধহয় দিগন্তরেখার কাছে, ভোরের বাড়ন্ত আলোর পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে স্বর্ণশহরের রাজপ্রাসাদ। কে বা কারা যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে সেখানে। কিন্তু সে-আগুনে আর কিছু না, পুড়ে যাচ্ছে স্বাধীন মেক্সিকোর পতাকা—আমার সারাজীবনের আরাধনা।

তেরো

ইগনাশিয়োর শপথ

পরদিন সূর্যোদয়ের সময় ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম,

আগুন জ্বাললাম। সকালের নাস্তা হিসেবে সুপ বানাবো। এখনও ঘুমাচ্ছেন সিনর। মায়ার ঘুম ভেঙেছে সম্ভবত। কারণ ওকে বেশ কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করতে দেখেছি। শুয়ে শুয়েই কিছু ভাবছে হয়তো। অথবা...হয়তো তাকিয়ে আছে সিনরের দিকে।

কাজে ব্যস্ত আছি, এমন সময় পিছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি, মায়া এগিয়ে আসছে আমার দিকে। বেচারীর হাত ও পায়ের পাতা ফুলে গেছে।

'লেডি মায়া,' প্রথমবারের মতো বাউ করলাম মেয়েটাকে, 'আপনার সাহসের প্রশংসা না-করে পারছি না। কাল রাতে উত্তেজনায় মাথা ঠিক রাখতে না-পেরে উল্টোপাল্টা কিছু কথা বলে ফেলেছি আপনাকে। সে-জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আসলে দোষ আমারই—মেয়েদেরকে দু'চোখে দেখতে পারি না আমি। তবে আপনি যা করেছেন সিনরের জন্য...বলতে বাধ্য হচ্ছি, পৃথিবীর সব মেয়ে খারাপ না। হয়তো...হয়তো বেশিরভাগ মেয়েই ভালো; আমার কপালে এমন একজন জুটে গিয়েছিল যার কারণে বাধ্য হয়ে সবার বিরুদ্ধেই খারাপ ধারণা করে বসে আছি। যা-হোক, আবারও বলছি, গতরাতে যা বলেছি আপনাকে তার জন্য আমি লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। একইসঙ্গে এই কথাও বলতে চাই, সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের এত বড় উপকার করার কারণে আজ থেকে আমি আপনার কেনা গোলামের মতো। আমাকে শুধু আদেশ করবেন আপনি, সে-আদেশ যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করবো সবসময়।'

'ধন্যবাদ, ডন ইগনাশিয়ো। কাল রাতে কী কী বলেছেন আমাকে তা ইতোমধ্যেই ভুলে গেছি। সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড যেমন আমার বন্ধু, আপনাকেও তেমন বন্ধু হিসেবেই বিবেচনা করি আমি। ...কেনা গোলামের কথা বললেন; দেখুন, কোনো মানুষের কাছ থেকে কখনোই সে-রকমভাবে সেবা নেয়ার ইচ্ছা নেই আমার। আর আপনার কাছ থেকে তো নয়-ই। আপনি মহান গুয়াটেমকের বংশধর, লর্ড অভ দ্য হার্ট। তবে আমার কোনো উপকার করার ইচ্ছা

যদি আসলেই থাকে তা হলে মনে হয় আপনার ইচ্ছাই যথেষ্ট। যা-হোক, আমাদের দু'জনের মধ্যে আর কখনও যেন ভুল বোঝাবুঝি না-হয় সে-জন্য একটা কথা খোলাখুলিভাবে বলে রাখা দরকার। কথাটা শুনে আমাকে হয়তো বেহায়া মনে করতে পারেন, কিন্তু কথাটা সত্য। তা ছাড়া আমার মনে হয় ব্যাপারটা ইতোমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন আপনি। সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকে মনেপ্রাণে ভালোবেসে ফেলেছি আমি। তিনি এখন আমার সবকিছু। যদিও জানি আমি হয়তো তাঁর জন্য কিছুই না।' কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল মেয়েটা, তারপর অনেকটা হঠাৎ করেই বলল, 'আমার জন্য কিছু করার কথা বলছিলেন না? একটা কাজ করতে পারবেন?'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালাম ওর দিকে। 'কী?'

'আপনার বুকে যে-কবচটা আছে সেটা স্পর্শ করে একটা শপথ করতে পারবেন?'

'শপথ? কীসের?'

'প্রতিজ্ঞা করুন, আমার উপর বিরূপ হয়ে আমার থেকে যাতে মুখ ঘুরিয়ে নেন সিনর সে-জন্য কিছু করবেন না আপনি। বলুন, আমাকে যদি ভালোবেসে ফেলেন তিনি তা হলে আলাদা করার চেষ্টা করবেন না আমাদের দু'জনকে। বরং যদি সত্যিই সে-রকম কিছু ঘটে যায় তা হলে আপনার সাধ্যমতো সাহায্য করার চেষ্টা করবেন আমাদেরকে।'

ইতস্তত করছি আমি। প্রেম-ভালোবাসার ব্যাপারে আমার যে-অভিজ্ঞতা হয়েছে তারপর ওই বিষয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাইনি, ঘামানোর ইচ্ছাও নেই। সিনরকে একজন খাঁটি মানুষ হিসেবে জানি আমি। অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে সবসময় চাই তাঁর ভালো হোক। এ-ও জানি তিনি ভিনদেশী—কাজ ফুরালে, মেক্সিকো আর ভালো না-লাগলে ফিরে যাবেন ইংল্যাণ্ডে। কাজেই মায়া যত সুন্দরীই হোক না কেন, কোনো এক অনাবিষ্কৃত স্বর্ণশহরের রাজকুমারী বা ভবিষ্যৎ রানি যা-ই হোক না কেন, সে সিনরকে যত ভালোই বাসুক না কেন,

দু'জনের এই অসম প্রেমের মিলনাত্মক পরিণতি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

আমাকে নিরুত্তর দেখে মায়া বলল, 'খুব বেশি কিছু কি চেয়ে ফেলেছি আপনার কাছে?'

'আসলে...' এখনও দ্বিধা করছি, চোখ তুলে তাকাতে পারছি না মায়ার দিকে, 'এমন একটা বিষয়ে শপথ করতে বলেছেন আমাকে যে-বিষয়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে কোনো জ্ঞান নেই আমার। আমি ভবিষ্যতের কথা বলছি, বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। আজ থেকে একদিন পরেও কী হবে সে-ব্যাপারে কি জোর দিয়ে কিছু বলতে পারে কেউ?'

মাথা ঝাঁকাল মায়া। 'বুঝতে পেরেছি। একটা কথা ভেবে দেখুন। আমি যদি ওই কুয়ায় গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পানি না-আনতাম তা হলে আপনার বন্ধু, যে কি না এখনও বাচ্চাদের মতো ঘুমাচ্ছে, মরে লাশ হয়ে যেত এতক্ষণে। আরও একটা কথা ভেবে দেখুন। আমাদের শহরে যাচ্ছেন আপনারা, বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে। সেই উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব কি ভালো না আপনার জন্য? তারপরও বলবো, শপথ করা না-করা আপনার ইচ্ছা, আপনাকে বাধ্য করার অধিকার নেই আমার। তবে জেনে রাখুন, বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিলাম আপনার দিকে, সে-হাত যদি প্রত্যাখ্যান করেন তা হলে আপনাকে একজন গোপন শত্রু হিসেবেই বিবেচনা করবো আজ থেকে।'

'ভয় দেখাচ্ছেন?' মৃদু হাসলাম। 'আমি কিন্তু আপনার বন্ধুত্বের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিইনি। আমি আসলে এমন কিছু ভাবছিলাম যা হয়তো আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। যা-হোক, আপনাকে আশ্বস্ত করে বলতে চাই, আপনাদের দু'জনের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াবো না আমি কোনোদিন। আর হবোই বা কেন? সিনর যাকে ইচ্ছা ভালোবাসবেন, যাকে ইচ্ছা বাসবেন না। এ-ব্যাপারে কিছু বলার আমি কে?'

হাসল মায়া, কোনো মন্তব্য করল না।

'কথা দিচ্ছি, আপনার উপর যাতে বিরক্ত হন সিনর এ-রকম কোনো কথা তাঁকে বলবো না কখনও। সাধ্যমতো সাহায্য করার চেষ্টা করবো আপনাদেরকে। ...ওই যে, ঘুম ভেঙে উঠে বসেছেন তিনি। আর সুপটাও প্রস্তুত হয়ে গেছে।'

সুপের পাত্রটা চুলা থেকে নামাল মায়া। লাউয়ের শুকনো খোলস দিয়ে বানানো একটা পাত্রে ঢালল সুপটুকু। আমার দিকে তাকিয়ে কিছুটা লজ্জিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আমি নিয়ে যাবো, নাকি...?'

হাসলাম আমিও। 'আপনিই যান। আপনি গেলেই ভালো হয় সম্ভবত।'

পাত্রটা হাতে নিয়ে সিনরের ক্যাম্পবেডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মায়া। বলল, 'সিনর, আপনার সুপ।'

মাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন সিনর, তাই তাঁর চোখে শূন্য দৃষ্টি। মায়ার দিকে কিছুক্ষণ বোকার মতো তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তারপর বললেন, 'কী হয়েছে বলো তো। আমি তো কিছুই মনে করতে পারছি না।'

'গতকাল সন্ধ্যায় আমার জন্য ফুল আনতে গিয়েছিলেন আপনি। তখন একটা সাপ কামড় দেয় আপনাকে...'

'জানি,' বললেন সিনর। 'সন্দেহ নেই তুমি যদি সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষতস্থানের রক্ত চুষে ফেলে না-দিতে এবং কব্জিতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে না-দিতে তা হলে কাল রাতেই মরণ হতো আমার।'

'বিষের প্রভাব কেটে যাওয়ার পর আপনার খুব পিপাসা লাগে,' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল মায়া। 'কিন্তু আপনাকে খেতে দেয়ার মতো একফোঁটা পানিও ছিল না আমাদের সঙ্গে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন সিনর, 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি বাকি জীবনে আর কখনও যেন ওই ভয়াবহ যন্ত্রণা না দেন আমাকে। কিন্তু...পানি খেয়েছি আমি গত রাতে। কে কোত্থেকে নিয়ে এল?'

'যে-কুয়ায় গিয়ে পানি আনা সম্ভব না ভেবে ফিরে এসেছিলাম

আমরা, সেখান থেকে নিয়ে এসেছি আমি।'

'তুমি!' হাঁ হয়ে গেছেন সিনর। 'তুমি? অসম্ভব! দেখো, ঠাট্টা কোরো না। সত্য কথাটা বলো জলদি।'

'ঠাট্টা করছি না,' কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেল মনে কষ্ট পেয়েছে মায়া। 'কী ঘটেছিল বলছি, বিশ্বাস করা না-করা আপনার ইচ্ছা। আপনি তখন পানির অভাবে কাতরাচ্ছেন, আপনার প্রাণ যায় যায় এমন অবস্থা। এত কষ্ট সহ্য করা তো পরের কথা, দেখাও নিদারুণ যন্ত্রণার। আমি সহ্য করতে পারিনি। জানতাম যেখানে গেছেন বাবা সেখান থেকে রাত পোহানোর আগে ফিরে আসতে পারবেন না। কাজেই পানির মশক, কয়েকটা মশাল এবং আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস নিয়ে রওনা হয়ে যাই ওই কুয়ার উদ্দেশে। সিনর ইগনাশিয়োকে কিছু বলিনি, বলতে চাইনি আসলে। তিনি তখন আপনার বিছানার পাশে বসে একমনে প্রার্থনা করছেন। যা-হোক, কুয়ার কাছে পৌঁছাই আমি, এক শ' একটা কুলুঙ্গি বেয়ে নামি নীচে। সে এক অদ্ভুত অ্যাডভেঞ্চার, পরে বিস্তারিত বলবো আপনাকে। এদিকে অনেকক্ষণ আমার কোনো সাড়াশব্দ নেই দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন সিনর ইগনাশিয়ো, খুঁজতে শুরু করেন আমাকে। ঠিক তখনই পানিভর্তি মশক নিয়ে ফিরে আসি। ক্যাম্প থেকে কিছুটা দূরে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় আমার।'

মায়ার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সব শুনলেন সিনর। কিছু বললেন না। মেয়েটার ফোলা ফোলা আঙুল আর পায়ের পাতা দেখলেন। তারপর নিঃশব্দে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন ওর দিকে।

মায়াও নিঃশব্দে সেই বাড়ানো হাতটা ধরল।

এভাবে মরুভূমির মধ্যে অদ্ভুত এক পদ্ধতিতে বাগ্‌দান হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে, সাক্ষী হয়ে থাকলাম আমি।

'মনে রাখবেন আমি সামান্য এক ইণ্ডিয়ান মেয়ে ছাড়া আর কিছুই না,' বিড়বিড় করে বলল মায়া, 'আর আপনি ওই সাদামানুষদের একজন যারা পৃথিবী শাসন করে। আমাদের এই

সম্পর্ক কি শেষপর্যন্ত আমাদের জন্য সুখকর হবে?'

'হবে,' জোর গলায় বললেন সিনর। 'একটা কথা ঠিক বলেছ—তুমি ইণ্ডিয়ান। কিন্তু সামান্য না। তুমি অসামান্য। তুমি মহান। তোমার মহত্ত্বকে সম্মান করতে বাধ্য যে-কেউ। এবং তোমার মতো বড় মনের মানুষ আমি আর কখনও দেখিনি। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ।'

আর কিছু বলল না মায়া। প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সিনরের দিকে। সিনরও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন মেয়েটার দিকে।

খুক খুক করে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কাশলাম আমি। তাগাদা দিয়ে বললাম, 'শুধু কি কথা বললেই চলবে? সুপটা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে তা মাথায় রাখতে হবে না?'

একসঙ্গে হেসে ফেললেন সিনর আর মায়া।

দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পর পানি নিয়ে ফিরে এল যিব্যালবে। পানি এনেছে, কিন্তু একটা দুর্ঘটনাও ঘটেছে। জোরে দৌড়াতে গিয়ে মরুভূমির চোখা একটা পাথরে পা পড়েছে ওর ঘোড়ার, একটা পা খোঁড়া হয়ে গেছে বেচারার।

যিব্যালবে যখন ঢুকল ক্যাম্পে তখন সিনর বাইরে কোথাও গেছেন। তাঁকে দেখতে পেল না যিব্যালবে। প্রথমেই মায়ার সঙ্গে দেখা হলো ওর। মেয়েকে জিজ্ঞেস করল সে, 'তিনি কি বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'ভালো। লোকটার সহ্যশক্তির প্রশংসা করতে হয়। আর এদিকে তাড়াহুড়ো করে ঘোড়া ছোটাতে গিয়ে বেচারাকে খোঁড়া বানিয়ে ফেললাম, দেরি হয়ে গেল আরও। ফেরার পথে সারাটা সময় শুধু ভেবেছি পানি নিয়ে গিয়ে কোনো লাভ হবে না।'

'কেন লাভ হবে না? তবে কাল রাতে ওই কুয়ায় গিয়ে পানি

নিয়ে এসেছি আমি সিনরের জন্য।'

শুনে থমকে গেল যিব্যালবে। আশ্চর্য হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে সে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'কীভাবে করতে পারলি কাজটা? ওই ভয়ঙ্কর কুয়ায় নামার সাহস পেলি কোত্থেকে?'

'মানুষের মনে কোনো কাজ করার তীব্র ইচ্ছা যখন থাকে তখন সাহস আপনাআপনি চলে আসে, বাবা। সিনর আমার বন্ধু, তাঁকে বাঁচানোটা আমার কর্তব্য ছিল। তা ছাড়া...আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল সময়মতো ফিরে আসতে পারবে না তুমি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবল যিব্যালবে। তারপর বলল, 'একটা কথা বলি, মা, কিছু মনে করিস না। আমার মনে হয় এই সাদালোকটাকে না-বাঁচালেই ভালো করতি। কেন জানিস? এই লোক আমাদের দেশে গেলে তোর ব্যাপারে একের পর এক ঝামেলা ঘটাতে থাকবে। তাতে সে যতটা না ভুগবে তারচেয়ে বেশি ভুগতে হবে তোকে আর আমাকে। মানুষের ভালোমন্দ লেখেন যে-দেবতা তাঁর ইচ্ছায় সাপের কামড় খেয়েছেন তিনি। অর্থাৎ দেবতা চেয়েছিলেন মৃত্যু হোক লোকটার। তুই তা প্রাণপণ চেষ্টায় ঠেকিয়ে দিলি। মনে রাখিস যেখানে যাচ্ছি আমরা সেখানে এমন একজন অপেক্ষা করছে তোর জন্য, সাদালোকটার সঙ্গে তোর এই "বন্ধুত্ব" দেখলে যে-লোক কী থেকে কী বলবে আর কী থেকে কী করবে তার কোনো ঠিক নেই,' আর কিছু না-বলে আহত ঘোড়াটার পরিচর্যা করার জন্য ঘুরে চলে গেল সে।

সেদিন সন্ধ্যায় যিব্যালবের এই কথাগুলো নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা হলো মায়ার।

মেয়েটা আমাকে বলল, 'সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে এখন দেখছি আপনার উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হবে আমাকে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

'কারণ দুপুরে বাবা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি চান না

সিনরের সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠুক আমার। তিনি চান না এই ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করি আমি। কিন্তু আমি এখন যথেষ্ট বড় হয়েছি এবং আমার জীবনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আমার আছে। আরেকটা কথা। আমার জীবন আমার নিজের, বাবা যে-সব দেবতার পূজা করে তাদের না। কিছু মনে করবেন না, ওই দেবতাদের উপর তেমন একটা বিশ্বাস নেই আমার। সুতরাং তাঁরা কার ভাগ্যে কী নির্ধারণ করেছেন তা নিয়েও কোনো মাথাব্যথা নেই।'

'কখনও কখনও,' চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছি স্পষ্টবাদী মেয়েটার দিকে, 'এসব ব্যাপারে মাথাব্যথা থাকলে ভালো হয়। আরেকটা কথা। মনের কথা সবসময় সবার সামনে প্রকাশ না-করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। একটু আগে যা বললেন তা যদি আপনার বাবার কানে যায় তা হলে কি ভালো হবে আপনার জন্য?'

'যা খুশি তা হোক, পরোয়া করি না।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল মায়া, 'আপনি কি দেবতা বিশ্বাস করেন?'

'না, লেডি। ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক দিয়ে আমি একজন খ্রিস্টান। আমাদের ধর্মে দেবতা বা মূর্তিপূজা এসব কিছুই নেই।'

মাথা ঝাঁকাল মায়া, ওর ঠোঁটের কোনায় বিদ্রূপের হাসি। 'দেবতাদের বিশ্বাস করেন না, অথচ তারা আমাদের যে-সম্পদ দিয়েছেন তার সবটুকু অথবা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হাসিল করার জন্য যাচ্ছেন আমাদের শহরে। যা-হোক, আমার কী মনে হয় জানেন? আপনাদের মতো আমিও যদি খ্রিস্টান হতাম তা হলে অনেক ভালো হতো।'

'হয়তো। তবে আপনার একটা কথা ঠিক না। আপনাদের সম্পদ হাসিল করার জন্য সিটি অভ দ্য হার্টে যাচ্ছি না আমরা। আগেও বলেছি আবারও বলছি, যতটুকু সম্পদ অর্জন করতে পারবো তা মেক্সিকোর স্বাধীনতার পেছনে খরচ করবো, নিজের জন্য কিছুই

রাখবো না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল মায়া। তারপর বলল, 'দুঃখিত। ওভাবে বলা উচিত হয়নি আমার। আসলে বাবার কথাগুলো শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এখন যাই তা হলে। দেখি সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড কী করছেন। আশা করি আপনার শপথের কথাটা ভুলবেন না কখনও।'

আরও দুটো দিন ওই মরুভূমিতে, কুয়ার কাছের ক্যাম্পে থাকলাম আমরা। যাত্রার ধকল সহ্য করার মতো সুস্থতা ফিরে পেলেন সিনর। তখন আবার রওয়ানা হলাম। অতি পুরনো সেই ম্যাপের নির্দেশনা অনুযায়ী এগিয়ে চললাম মরুভূমির ভিতর দিয়ে।

জনবসতি বলতে কোথাও কিছু নেই। চলতি পথে কারও দেখা পাওয়া যায় না। যেদিকে তাকাই, একটা-দুটো ধ্বংসপ্রাপ্ত পিরামিড বা মন্দির ছাড়া মনুষ্যনির্মিত আর কিছু চোখে পড়ে না।

টানা দশদিন চললাম এভাবে। এগারোতম দিনে একটা সুউচ্চ পর্বতমালার ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। মরুভূমির শেষপ্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়েছে এই পর্বতমালার সানুদেশ।

বারোতম দিনে পৌঁছে গেলাম ঢালের মাথায়। খেয়াল করলাম, সমতলভূমি থেকে অনেক উপরে উঠে এসেছি। গরমের এলাকা থেকে হঠাৎই যেন হাজির হয়ে গেছি তুষারের রাজ্যে। চারপাশে, পথের জায়গায় জায়গায় জমাট তুষার। নিজেদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেরে নিলাম আমরা। এতগুলো ঘোড়া নিয়ে এগোনোটা উচিত হবে না। কারণ ঢাল বেয়ে যত উপরে উঠছি গাছপালার পরিমাণ তত কমছে, সামনে হয়তো কিছুই পাওয়া যাবে না। তখন না-খেতে পেয়ে মরবে ঘোড়াগুলো। একটা তো খোঁড়া হয়েছে আগেই, বাকি যে তিনটা আছে সেগুলোকে ছেড়ে দিলাম। ইচ্ছা হলে ঘুরে বেড়াবে ঢালের উপর, ইচ্ছা হলে নেমে যাবে নীচে। তা ছাড়া যতটা অনুমান করতে পারছি সামনে পথ অনেক খাড়া, ঘোড়া নিয়ে

সে-পথে যাত্রা করা যাবে কি না সন্দেহ।

আমাদের সঙ্গে খাবার তেমন একটা নেই, পানি আছে আরও কম। সুতরাং সে-রাতে একরকম ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কম্বল বা আলখাল্লা বলতে যার কাছে যা আছে তা-ই ভালোমতো জড়িয়ে নিয়েছি শরীরের সঙ্গে। কিন্তু শুয়ে থাকা পর্যন্তই, ঘুম আসছে না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সমানে কাঁপছি। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে, চেষ্টা করেও থামাতে পারছি না। আকাশ পরিষ্কার, কিন্তু কোত্থেকে যেন হু হু শব্দে বইছে তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস। দূরে, পর্বতের চূড়া থেকে কিছুক্ষণ পর পর ধসে পড়ছে জমাট তুষারের স্তূপ। চাপা গুম গুম শব্দে কাঁপন ধরে যাচ্ছে বুকের ভিতরে।

পরদিন সকালে আমি আর যিব্যালবে দাঁড়িয়ে আছি পাশাপাশি, ছাইয়ের মতো সাদা আকাশে ফুটছে ভোরের আলো। যিব্যালবেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই তুষারের রাজ্য পাড়ি দিয়ে আর কতদূর যেতে হবে?'

অনেক দূরের কালো একটা পর্বতের পিছনে দেখা দিয়েছে দিনের প্রথম সূর্যকিরণ, হাতের ইশারায় ওই পর্বতটা আমাকে দেখাল সে। 'ওটাই হচ্ছে এই এলাকার সবচেয়ে উঁচু পর্বত। ওই পর্বতটা পার হতে হবে আমাদেরকে।'

হতাশ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম পর্বতটার দিকে। 'ওটা পার হতে কতদিন লাগবে?'

হাসল যিব্যালবে। 'কোনো সমস্যা না-হলে আজ রাতের মধ্যেই ওখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা।'

হালকা নাস্তা খেয়েই আবার শুরু হলো আমাদের যাত্রা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছি আমরা। এবার সবার আগে যিব্যালবে। চলতে চলতে হঠাৎ করেই খেয়াল করলাম, ঝকঝকে ও অত্যুজ্জ্বল তুষারের কারণে ধাঁধাঁ লাগছে চোখে। ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছি না। এই অবস্থাকে বলে তুষার-অন্ধত্ব। বাকিদের কী অবস্থা জানি না, আমি বলতে গেলে কানার মতো

হাতড়ে হাতড়ে এগোচ্ছি। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উচ্চতাভীতি। তবে সৌভাগ্যবশত ঢালটা খুব বেশি খাড়া না। উঠতে কষ্ট হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সামলে নিতে পারছি। বিকেল চারটা নাগাদ কালো পর্বতটার পাদদেশে হাজির হতে পারলাম।

মায়ার দিকে তাকালেন সিনর। 'তোমার বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা। তুমি কি খুশি?'

'একটুও না,' গোমড়া মুখে বলল মেয়েটা। 'বরং এখানে, এই বনেবাদাড়ে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ আমি খুশি। জানি বাড়িতে ফিরলেই শুরু হবে আমার দুঃখ আর কষ্ট। ওহ্! আমাকে যদি সত্যিই পছন্দ করেন, চলুন পালিয়ে যাই। আপনার দেশে চলে যাই,' বলতে বলতে সিনরের হাত খামচে ধরল মায়া, উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

'কিন্তু তোমার বাবার কী হবে?' জানতে চাইলেন সিনর। 'ইগনাশিয়োর কী হবে? যে-গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে ওরা তা কীভাবে শেষ করবে?'

'বাবার চেয়ে আমি কি আপনার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ না? অবশ্য বন্ধুত্বের কথা যদি বলেন, আমি জানি ইগনাশিয়োকে আমার চেয়ে বেশি পছন্দ করেন আপনি।'

'না মায়া, কথাটা ঠিক না। আসলে এত কষ্ট করে এতদূর আসার পর তোমাদের শহরটা না-দেখে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না।'

'ঠিক আছে,' সিনরের হাত ছেড়ে দিল মেয়েটা, 'আপনার যা খুশি। চলুন, বাবা বোধহয় কোনো রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন। ডাকছেন আমাদেরকে।'

পর্বতের পাদদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ছোটবড় অসংখ্য বোল্ডার। সেগুলোর মধ্য দিয়ে একশ' কদমের মতো এগোলাম আমরা, গিয়ে দাঁড়ালাম যিব্যালবে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। পাহাড়ী দেয়ালে ভর দিয়েছে সে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে কোনো

ফাটল বা পথ নেই ওই দেয়ালের গায়ে।

'আপনাদেরকে বিশ্বাস করি আমি,' বলে উঠল যিব্যালবে, 'কিন্তু উপায় নেই আমার। আগেও বোধহয় বলেছি, বাইরের কোনো লোককে আমাদের শহরে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই। তারপরও নিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে। কিন্তু পথ যাতে চিনে ফেলতে না-পারেন সে-ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।' মেয়ের দিকে তাকাল সে। 'এদিকে আয়, মা। এই ভিনদেশীদের চোখ বেঁধে ফেল্।'

এগিয়ে এল মায়া। সিনরের চোখ বাঁধার সময় শুনলাম ফিসফিস করে বলছে, 'ভয় পাবেন না। আমি আছি।'

হাত ধরাধরি করে এগোতে শুরু করলাম আমরা। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদেরকে বুঝতে পারছি না। কিছুদূর এগোনোর পর থামতে বলা হলো। থামলাম। গুরুগম্ভীর একটা আওয়াজ শোনা গেল এমন সময়। বোঝা যাচ্ছে ভারী কিছু একটা সরাচ্ছে আমাদের পথপ্রদর্শকরা। কিছুক্ষণ পর আবার চলতে শুরু করলাম। এবার নামছি খাড়া একটা ঢাল বেয়ে, যথেষ্ট ধীরগতিতে। বুঝতে পারছি নিচু ছাদওয়ালা সরু একটা প্যাসেজের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদেরকে। প্যাসেজটা এত সরু যে, চলার সময় বার বার দেয়ালের সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে আমার কাঁধ। কখনও কখনও আমাদের পথপ্রদর্শকদের কথামতো থেমে দাঁড়াতে হচ্ছে, পাহাড়ী দেয়ালের সঙ্গে বুক লাগিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে হচ্ছে। কখনও আবার নোয়াতে হচ্ছে মাথা। কখনও তীক্ষ্ণ বাঁক পার হতে হচ্ছে হাত ধরাধরি করে। শেষপর্যন্ত টের পেলাম চওড়া হতে শুরু করেছে প্যাসেজটা। মাটিও আগের মতো পাথুরে না, বরং সমতলই বলা চলে।

'ওদের চোখের পট্টি খুলে দে,' মায়াকে বলল যিব্যালবে।

খুলে দিল মায়া। চোখে আলো সইয়ে নিতে সময় লাগল কিছুক্ষণ। কৌতূহলী দৃষ্টিতে এদিকে-সেদিকে তাকালাম।

যতদূর মনে হচ্ছে, অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পর্বতের পাদদেশে সৃষ্ট

গভীর কোনো ফাটলের পাদদেশে হাজির হয়েছি। আবার তাকালাম চারপাশে। নাহ্, এই ফাটল মনুষ্যনির্মিত হতে পারে না। আগুন আর পানি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা এ-রকম কোনো ফাটল বানানো সম্ভব না এবং কাজটা শুধু প্রকৃতিই করতে পারে।

আমাদের পায়ের নীচে চমৎকার একটা রাস্তা। চমৎকার বলছি, কারণ এ-ক'দিন যেসব পথ অতিক্রম করেছি তার তুলনায় এই রাস্তাটাকে বিশেষায়িত করার জন্য অন্য কোনো শব্দ মনে আসছে না। যথেষ্ট মজবুত করে বানানো হয়েছে রাস্তাটা। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, রাস্তার দু'ধারে, জায়গায় জায়গায়, অল্প কিছু জমাট তুষার। তবে তুষারের জন্য পথ চলতে কষ্ট হবে বলে মনে হয় না। দু'পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কালো কালো পাহাড়ি চূড়া। প্রতিটা চূড়ায় মৌচাকের মতো ছোট-বড় দরজা। মই ছাড়া ওসব দরজার কাছাকাছি যাওয়াও সম্ভব না।

'ওসব কী?' জিজ্ঞেস করলাম যিব্যালবেকে। 'কবরস্থান?'

'না,' জবাব দিল সে। 'থাকার জায়গা। সোজা কথায়, ঘরবাড়ি। শুনেছি এককালে এখানে মানুষ থাকত—আমাদের পূর্বপুরুষরা সিটি অভ দ্য হার্ট খুঁজে পাওয়ার আগে। আমরা ওদেরকে বলতাম গুহামানব। সবাই অসভ্য। ওরা নাকি অল্প খেত। ঠাণ্ডাও নাকি তেমন একটা লাগত না ওদের। আমাদের যেসব পূর্বপুরুষ স্বর্ণশহরের খোঁজ পেয়েছিলেন, তাঁরা নাকি এই গুহামানবদেরকে অনুসরণ করেই খুঁজে বের করেছিলেন এই প্যাসেজ। তারপর এটা ধরে আরও এগিয়ে প্রথমে ওই হ্রদ, পরে স্বর্ণশহরের খোঁজ পান। যে-কোনো কারণেই হোক, এই গুহামানবদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন আমাদের পূর্বপুরুষরা। তখন বাধ্য হয়ে নির্মমভাবে হত্যা করতে হয় বেচারাদেরকে। খালি হয়ে যায় এই প্যাসেজ। শীতকালটা আরামে কাটিয়ে দেয়ার মতো একটা জায়গায় পেয়ে যাই আমরা।

'আমি যখন ছোট তখন বন্ধুদেরকে নিয়ে মাঝেমধ্যে আসতাম

এই জায়গায়। দড়ি আর মইয়ের সাহায্যে গিয়ে ঢুকতাম মৌচাকের মতো দেখতে ওই গুহাগুলোর ভিতরে। আজব আজব অনেক জিনিস খুঁজে পেতাম আমরা। যেমন পাথরের কুড়াল। সোনা দিয়ে যেনতেনভাবে বানানো বিভিন্ন ধরনের গহনা। অদ্ভুত অদ্ভুত কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন। ...যা-হোক, চলুন আবার হাঁটতে শুরু করি। তা না হলে এই প্যাসেজ ছেড়ে বের হতে হতেই রাত হয়ে যাবে।'

আবারও এগোতে শুরু করলাম। যত এগোচ্ছি, পাহাড়ি প্যাসেজ তত চওড়া হচ্ছে একটু একটু করে। শেষপর্যন্ত রাস্তাটা গিয়ে শেষ হলো আরেকটা পাহাড়ি দেয়ালের সামনে।

দেয়ালটার পাদদেশে একটা বোল্ডার। সেটার আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে একটা সুড়ঙ্গপথ। আগে থেকে জানা না-থাকলে খুঁজে বের করা সহজ না। এগিয়ে গেল যিব্যালবে, আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ভয় পাবেন না। জায়গাটা অন্ধকার, কিন্তু তেমন কোনো সমস্যা নেই। সুড়ঙ্গটাও বেশি বড় না। আর গর্তটর্তও নেই বললেই চলে।'

সুড়ঙ্গে ঢুকে বুঝলাম কেন ভয় না-পেতে বলেছে সে। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিজের হাতটাও দেখা যায় না। ধীরগতিতে এগোচ্ছে যিব্যালবে। ওর পায়ের আওয়াজ শুনে ওকে অনুসরণ করছি আমরা—আক্ষরিক অর্থেই অন্ধের মতো। তবে দু'এক জায়গায় হোঁচট খাওয়া ছাড়া তেমন কোনো সমস্যা হলো না। শেষপর্যন্ত হাজির হতে পারলাম সুড়ঙ্গের শেষমাথায়।

আলোর দেখা পাওয়া যাচ্ছে। বুঝতে পারছি সামনে আরেকটা ফাটল। মিনিটখানেকের মধ্যেই ফাটলটা পার হয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম পাহাড়ের অপর পাশে। কিন্তু বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে এই উপত্যকায় গাঢ় ছায়া পড়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রাত ঘনিয়ে এসেছে এখানে।

কোথাও না-থেমে একটানা এগিয়ে যাচ্ছে যিব্যালবে। হঠাৎ ডানদিকে একটা মোড় ঘুরল সে। থেমে দাঁড়াল পাথর-কেটে-

বানানো একটা বাড়ির সামনে।

'ভিতরে ঢুকুন,' বলল সে, 'পিপ্‌ল্‌ অভ দ্য হার্টের দেশে স্বাগতম,' বলতে বলতে ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল দরজাটা।

আগুন জ্বলছে ভিতরে। এক ঝলক আলো যেন উড়ে এসে পড়ল আমাদের উপর। শোনা গেল অপরিচিত এক পুরুষের কণ্ঠ, 'কে?'

জবাব না-দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল যিব্যালবে। আমরাও ঢুকলাম পিছন পিছন। ঘরের ছাদটা নিচু। একটা ফায়ারপ্লেসের মতো করে বানিয়ে বড় করে আগুন জ্বালানো হয়েছে। তার পাশে বসে আছে একটা পুরুষ আর একটা মহিলা। রাতের খাবার খাচ্ছিল ওরা।

'বলে গিয়েছিলাম আমি ফিরে আসবো। বলে গিয়েছিলাম আমার জন্য অপেক্ষা করতে,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল যিব্যালবে, 'এই কি তোমাদের অপেক্ষা করার নমুনা? যা-হোক, জলদি করো এখন। ঠাণ্ডা আর ক্ষুধায় মরতে বসেছি আমরা। কিছু খেতে দাও আমাদেরকে।'

উঠে দাঁড়িয়েছে পুরুষ লোকটা। দ্বিধা করছে। কিন্তু মহিলাটাকে দেখি সেই প্রথম থেকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যিব্যালবের দিকে। হঠাৎ করেই যেন চিনতে পারল সে, স্বামীর হাত ধরে টান দিয়ে বলল, 'হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে যথাযথভাবে সম্মান দেখাও! আমাদের সর্দার ফিরে এসেছেন।'

'মাফ করবেন, লর্ড,' বলতে বলতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লোকটা, 'ভুল হয়ে গেছে আমার। চিনতে পারিনি প্রথমে। আসলে ফিরে আসতে এত দেরি করেছেন, আমরা ধরেই নিয়েছিলাম আপনারা মারা পড়েছেন বোধহয়। আপনাদের কণ্ঠ শুনে মনে হয়েছে আপনাদের ভূত হাজির হয়েছে! সিটি অভ দ্য হার্টের বাসিন্দাদেরও একই ধারণা।'

এ-ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করল না যিব্যালবে। জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের কিছু কাপড়চোপড় রেখে গিয়েছিলাম না এখানে? যাও,

আলাদা আলাদা স্লিপিংচেম্বারে গিয়ে গুছিয়ে দাও সব। তোমার বউ খাবারের ব্যবস্থা করুক।'

মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানাল লোকটা। কাছেই পাথরের একটা টেবিলের উপর একটা মাটির-প্রদীপ আছে, সোজা হয়ে সেটা নিল। জ্বালল প্রদীপটা। ঘরের একদিকে পর্দা ঝুলছে, অদৃশ্য হয়ে গেল সেটার আড়ালে। তাড়াহুড়ো করে এঁটো থালাবাসন সরাল ওর স্ত্রী। তারপর স্বামীর মতোই বাউ করে যিব্যালবে আর মায়াকে সম্মান জানিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ফায়ারপ্লেসের সামনে। কিছু লাকড়ি ফেলে উস্কে দিল আগুন। তারপর পর্দা সরিয়ে গিয়ে ঢুকল ভিতরে।

ওরা চলে যাওয়ার পর আমরা গিয়ে জড়ো হলাম ফায়ারপ্লেসের কাছে, আগুন পোহাতে লাগলাম।

'এটা কোন্ জায়গা?' জানতে চাইলেন সিনর।

প্রশ্নটা করা হয়েছিল যিব্যালবেকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু কিছু একটা ভাবছে বুড়ো; এত আত্মমগ্ন হয়ে আছে যে, সিনরের কথা শুনতে পায়নি। ওর বদলে মুখ খুলল মায়া, 'একরকম কুঁড়েঘর বলা চলে। তবে এটা আসলে ব্যবহৃত হয় রেস্টহাউস হিসেবে। এককালে আমাদের যেসব লোক শিকার করতে বের হতো তারা থাকত এসব জায়গায়। ...অজানার উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে ওই লোক আর ওর বউকে এই জায়গায় রেখে যান বাবা। বলেন ওরা যেন থাকে এখানে যাতে আমরা ফিরে এলে সবকিছু ঠিকমতো পাই। দেখা যাচ্ছে যা করতে বলা হয়েছিল তা করতে ব্যর্থ হয়েছে ওরা। যাই, ভিতরে গিয়ে দেখি কী করছে ওরা। ...বাবা,' যিব্যালবের হাত ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিল সে, 'শুনছ? চলো আমার সঙ্গে।'

চলে গেল ওরা। ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে থাকলাম আমি আর সিনর। জড়োসড়ো হয়ে বসে উত্তাপ উপভোগ করছি। কখন যেন তন্দ্রামতো চলে এল, খেয়াল করতে পারলাম না। হঠাৎ সিনরের ধাক্কায় সচকিত হয়ে দেখি, সেই অপরিচিত লোকটা দাঁড়িয়ে আছে

আমাদের সামনে। চোখে সম্ভ্রম আর বিস্ময় মিশ্রিত দৃষ্টি।

'কী ব্যাপার?' স্প্যানিশে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন সিনর। 'লোকটা কী চায়, ইগনাশিয়ো?'

'মনে হয় না কিছু চায়।'

'তা হলে কী দেখছে ওভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে?'

'আপনাকে।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ। আপনার সাদা চামড়া আর সোনালি চুল দেখছে। আপনার সঙ্গে কথা বলার সাহস নেই ওর।'

'কেন?'

'এই লোকগুলোর ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, সাদাচামড়ার লোকেরা নাকি শুধু স্বর্গে জন্ম নেয়। কাজেই এই লোক ধরেই নিয়েছে আপনি স্বর্গ থেকে এসেছেন।'

এমন সময় আমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলল লোকটা।

আমাকে জিজ্ঞেস করলেন সিনর, 'কী বলল সে?'

'বলল, আমরা যে-ঘরে থাকবো সেখানে পানি দেয়া হয়েছে। ইচ্ছা হলে হাতমুখ ধুয়ে নিতে পারি। পরিষ্কার কাপড়ও দেয়া হয়েছে পরার জন্য। চলুন ওর সঙ্গে যাই।'

উঠলাম আমরা। ইণ্ডিয়ানটার পিছু পিছু হাঁটতে লাগলাম। ছোট একটা প্যাসেজ ধরে ওই সিটিংচেম্বারের পিছনে এসে হাজির হলাম। তারপর ছোট একটা স্লিপিংরুমে। খেয়াল করলাম, পাশাপাশি এ-রকম আরও কয়েকটা স্লিপিংরুম আছে এই প্যাসেজের শেষপ্রান্তে। যে-ঘরটা বরাদ্দ করা হয়েছে আমাদের জন্য ঢুকলাম সেটাতে।

ভিতরে একটা প্রদীপ জ্বলছে। ঘরের দু'পাশে দুটো বিছানা, হরিণের চামড়া দিয়ে বানানো কম্বল দিয়ে ঢাকা। বিছানার উপর লিনিনের চমৎকার আলখাল্লা। লিনিনের উপর ধূসর-কালো পালক দিয়ে বানানো দুটো মজবুত আর পুরু কম্বলও দেখা যাচ্ছে। ঘরের এককোনায় কাঠের টুলের উপর গরম পানিভর্তি বেসিন। আশ্চর্যের

ব্যাপার, বেসিনগুলো পেটা রূপার।

'কাজ যা-ই করুক না কেন,' আমাদের ঘর দেখিয়ে দিয়ে জিম্মাদার লোকটা চলে যাওয়ামাত্র বললেন সিনর, 'এই লোকগুলোর পয়সা আছে। সামান্য এক ওয়াশবেসিন বানিয়েছে রূপা দিয়ে! ...একটা কথা কী, জানো ইগনাশিয়ো? সিটি অভ দ্য হার্টের কাহিনিটা সবসময়ই রূপকথার গল্প বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আসলে তা না। মনে হচ্ছে আর কিছুদিনের মধ্যেই সত্যি সত্যিই দেখতে পাবো গোপন শহরটা। এই জিম্মাদার লোকটার আচরণ দেখলে সে-রকমই মনে হয়। লোকটা যিব্যালবেকে কী-রকম সম্মান করল দেখেছ? যিব্যালবে সর্দার বা ওই জাতীয় কিছু না-হলে ওরকম করার কথা না।'

আমি কোনো মন্তব্য করলাম না ওই ব্যাপারে। কাপড় পাল্টে নিলাম, আলখাল্লা পরলাম। তবে যথেষ্ট কসরত করতে হলো। কারণ যে-অদ্ভুত কায়দায় বানানো হয়েছে এই পোশাক তা আমাদের জন্য একেবারেই নতুন। যা-হোক, কাপড় পাল্টানো হলে ফিরে এলাম ওই ডাইনিংরুমে—জিম্মাদার আর ওর বউ যেখানে বসে খাচ্ছিল। ঘরে ঢুকে দেখি পর্দাটা সরিয়ে রাখা হয়েছে একপাশে। মায়া বসে আছে এককোনায়। ওকে দেখে তাজ্জব হওয়ার মতো অবস্থা আমাদের।

চেনাই যাচ্ছে না মায়াকে। কে বলবে এই সে-মেয়ে যে দীন-হীনের মতো মলিন কাপড় পরে, পথশ্রমে যার-পর-নাই ক্লান্ত হয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে আমাদের সঙ্গে? এখন ওর পরনে তুষারসাদা একটা আলখাল্লা। সবুজ সুতোয় চমৎকার নকশির কাজ আলখাল্লাটার প্রান্তভাগে। সোনালি সুতো দিয়ে বুকের উপর হৃদপিণ্ডের প্রতীকচিহ্ন আঁকা। পায়ে সবুজ সুতোর কাজ করা স্যাণ্ডেল। গলায়, কব্জিতে, কোমরে, গোড়ালিতে খাঁটি সোনার বলয়। আগের মতো খুলে কাঁধ আর পিঠের উপর ছড়িয়ে রাখেনি সে লম্বা কালো চুল, বরং একটা সোনার-জাল দিয়ে খোঁপা

করে বেঁধেছে। লিনিনের উপর ধবধবে সাদা পালক দিয়ে বানানো একখণ্ড কাপড় শালের-মতো-করে জড়িয়ে রেখেছে দু'কাঁধে। সেটার জায়গায় জায়গায় আবার সারসপাখির বড় বড় হলুদাভ পালক।

'আপনাদের মতো আমিও কাপড় পাল্টিয়েছি,' মুচকি হেসে বলল সে। 'আমার দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছেন—পোশাকটা বোধহয় মানায়নি আমার গায়ে?'

'মানায়নি!' সিনরের কণ্ঠে নিখাদ বিস্ময়, 'এত চমৎকার পোশাক আর কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না।'

'এত...সামান্য পোশাকই দেখেননি!' এবার তাজ্জব হওয়ার পালা মায়ার। 'তা হলে আমার অন্য কাপড়গুলো দেখলে কী বলবেন?'

'মানে? সেগুলো আরও সুন্দর নাকি?'

'অবশ্যই। অন্তত আমার দৃষ্টিতে তো বটেই। এটা আমার সবচেয়ে সাধারণ পোশাক। একটু অপেক্ষা করুন, আমি যখন আমার রাজকীয় আলখাল্লা পরবো তখন দেখবেন আমাকে কেমন লাগে।'

'ওই আলখাল্লার বিশেষত্ব?'

'হৃৎপিণ্ডের আকৃতিতে কাটা বড় বড় পান্না বসানো আছে পোশাকটাতে। আলো পড়লে চকচক করতে থাকে পান্নাগুলো।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে ভ্রূ কোঁচকালেন সিনর। 'আমি কী ভাবছি জানো?'

'কী?' জানতে চাইল মায়া।

'তুমি নাকি তোমার পোশাক—কোন্‌টা বেশি সুন্দর?'

হেসে ফেলল মেয়েটা, লজ্জা পেয়েছে। 'চুপ করুন!' কপট শাসনের সুর ওর কণ্ঠে। 'এখন থেকে সবার সামনে এত খোলামেলাভাবে কথা বলবেন না আমার সঙ্গে। বনেবাদাড়ে যখন একসঙ্গে ছিলাম আমরা, আমি ছিলাম এক অসহায় ইণ্ডিয়ান মেয়ে আর আপনি সাহসী সহযাত্রী। কিন্তু এখানে আমি লেডি অভ দ্য হার্ট

আর আপনি আমার মেহমান।'

'তা হলে কি রাজত্বে পা দেয়ামাত্র অসহায় ইণ্ডিয়ান মেয়েটা হারিয়ে গেছে?' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন সিনর। 'নাকি আমার সঙ্গে মজা করছ?'

'মোটেও না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল মায়া। 'শুনুন। এখন থেকে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বা আচরণের দিক দিয়ে সতর্ক থাকতে হবে আপনাদেরকে। তা না হলে আমার বা আপনার অথবা আমাদের দু'জনেরই ক্ষতি হতে পারে। কারণ পদমর্যাদার দিক দিয়ে আমি এই অঞ্চলের সবচেয়ে সম্মানিত নারী। তা ছাড়া সন্দেহ নেই আমার চাচাতো ভাই টিকাল কড়া নজর রাখবে আমার উপর। ...ওই যে, বাবা আসছে!'

মায়ার কথা শেষ হতে-না-হতেই ভিতরে ঢুকল যিব্যালবে। পিছনে দুই ইণ্ডিয়ান, খাবার নিয়ে এসেছে। আগেরদিনের রোমানরা টোগা'র মতো যে-রকম বহির্বাস পরত, যিব্যালবের পরনে সে-রকম একটা সাধারণ আলখাল্লা—পরার জন্য আমাকে আর সিনরকে যে-রকম দেয়া হয়েছে অনেকটা সে-রকম। কালো পালক দিয়ে বানানো শালের মতো কিছু একটা জড়িয়ে রেখেছে কাঁধে। গলায় ঝুলছে বিশাল এক সোনার-চেইন। সে-চেইনের সঙ্গে কায়দা করে আটকানো আছে হৃৎপিণ্ডের বিশেষ প্রতীকচিহ্ন, এটাও খাঁটি সোনার।

খেয়াল করলাম, যিব্যালবে আসামাত্র মায়া বিশেষ কায়দায় অভিবাদন জানাল ওকে। মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে জবাব দিল যিব্যালবে। দুই ইণ্ডিয়ানের মধ্যেও আদব-কায়দার অভাব নেই এখন আর। যতবারই যিব্যালবের সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করছে ততবারই মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁটুর সঙ্গে লাগিয়ে ফেলছে প্রায়।

স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ডন পেদ্রো মোরেনোর বাড়িতে পরিচয় হওয়ার পর থেকে শুরু করে বনেবাদাড়ে একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানো পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যে-বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল যিব্যালবে আর ওর মেয়ে মায়ার তা শেষ। সেই যিব্যালবে এখন আর অসহায় এক

বুড়ো না। ওর মেয়ে মায়া সাধারণ কোনো মেয়ে না। একজন সম্পদশালী এক দেশের শাসক, আরেকজন রাজকন্যা। এদের সঙ্গে অন্তত আমার মতো সামান্য এক মেক্সিকানের অথবা সিনরের মতো কোনো সাদাচামড়ার মানুষের বন্ধুত্ব অসম্ভবই বলা যায়। কাজেই এদেরকে সম্মান না-করে আমাদের উপায় নেই।

মায়ার যেমন, যিব্যালবের চেহারাও তেমন বদলে গেছে। পোশাকের পরিবর্তন একই মানুষকে কতখানি পাল্টে দেয়! অসহায়ত্ব পুরোপুরি খসে গেছে যিব্যালবের চেহারা থেকে। এখন চেষ্টা করেও দম্ভ চেপে রাখতে পারছে না সে। গালভর্তি সাদা দাড়িতে আসলেই রাজকীয় দেখাচ্ছে ওকে। নিজের অজান্তেই সম্ভ্রম জাগল মনের ভিতরে। খেয়াল করলাম সে আমার দিকে তাকানোমাত্র সচকিত হয়ে উঠছি বার বার।

'খাবার প্রস্তুত,' বলল সে। 'দয়া করে বসে পড়ুন। ...না মায়া, আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই তোর। আমি মনে করি আমরা এখনও সহযাত্রী। সিটি অভ দ্য হার্টে পৌঁছানোর পর আনুষ্ঠানিকতা করিস।'

বসে পড়লাম আমরা। দুই ইণ্ডিয়ান এটা-সেটা এগিয়ে দিচ্ছে। দীর্ঘ সময় তেমন ভালো কিছু খাইনি, এমনকী সুপেয় পানিও জোটেনি কপালে। তাই ওই খাবার আর স্থানীয় কায়দায় প্রস্তুতকৃত মদ খেয়ে মনে হলো, এত ভালো কিছু খাইনি জীবনে।

পেট ভরল, কিন্তু সেই অস্বস্তিটা বিদায় নিল না। সিনরের দিকে লেডি মায়ার প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারছি এখনও সিনরকে ভালোবাসে সে। কিন্তু যিব্যালবের কথা আর কাজে যেন মিল পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের সঙ্গে তেমন একটা কথা বলছে না সে। যখন বলছে তখন সিনরকে "বন্ধু" বা "বিদেশি" বা "আগন্তুক" বলে সম্বোধন করছে। আর আমাকে সরাসরি নাম ধরে ডাকছে, সম্মানসূচক কোনো সম্বোধন ভুলেও উচ্চারণ করছে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনোযোগ অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টা করলাম

আমি।

ভবিষ্যতে কী হবে জানি না, তবে এখানে এসে এখন পর্যন্ত অন্তত একটা উপকার হয়েছে আমার। টানা ছ'সপ্তাহের বেশি ধূমপান করতে পারিনি, একরকম কাতরতা পেয়ে বসেছে আমাকে। এখানে এসে দেখি স্থানীয় কায়দায় সংগৃহীত তামাক সিগারেটের মতো রোল করে ধূমপানের কাজ চালিয়ে নিচ্ছে ইণ্ডিয়ান লোকটা।

আমি বার বার ওই "সিগারেটের" দিকে তাকাচ্ছি দেখে আমাকে বেশ কিছু সিগারেট দিল যিব্যালবে। ইণ্ডিয়ান লোকটাকে বলল, 'তোমাদের গ্রামে যাও। গিয়ে মোড়লকে বলবে, তোমাদের নেতা ফিরে এসেছে। আমার নামে আদেশ করবে—আমরা যাতে আরামে চলাচল করতে পারি সে-জন্য কয়েকটা পালকি যেন প্রস্তুত করে সে। আগামীকাল সূর্যোদয়ের পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে ওগুলো নিয়ে হাজির হবে এখানে। আরও বলবে, আমরা যাতে হ্রদ পাড়ি দিতে পারি সে-জন্য যেন নৌকা প্রস্তুত করে রাখে। আর ওর কাছে ওর জীবনের যদি কোনো দাম থাকে তা হলে আমাদের আসার খবর যেন ভুলেও পাচার না-করে সিটি অভ দ্য হার্টে। এবার যাও, জলদি!'

মাথা নুইয়ে যিব্যালবেকে সম্মান জানাল ইণ্ডিয়ান লোকটা। দরজার কাছেই দেয়ালের সঙ্গে গাঁথা কাঠের পেরেক থেকে থাবা দিয়ে একটা বল্লম আর পালক নির্মিত একটা আলখাল্লা তুলে নিল। তারপর একছুটে দরজা দিয়ে বের হয়ে মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। বাইরে অবিরাম তুষারপাত হচ্ছে, একটানা শোঁ শোঁ আওয়াজে ঘরের ছাদে আছড়ে পড়ছে রাতের বাতাস; সে-সবের কোনো পরোয়াই যেন নেই তার।

'গ্রামটা এখান থেকে কত দূরে?' জিজ্ঞেস করলেন সিনর।

'দশ লিগের মতো,' জবাব দিল যিব্যালবে। 'রাস্তাও ভালো না। লোকটা যদি পাহাড় থেকে পড়ে অথবা তুষারঝড়ের কবলে পড়ে না-মরে তা হলে ছ'ঘণ্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছতে পারবে।' মেয়ের দিকে তাকাল সে। 'চল্ মা, ঘুমানোর সময় হয়েছে। সামনে লম্বা

একটা যাত্রা পড়ে আছে। ...সম্মানিত দুই ভিনদেশী, শুভরাত্রি। আশা করি আগামীকাল আরও ভালো কোনো বাসায় থাকতে দিতে পারবো আপনাদেরকে,' আমাদের উদ্দেশ্যে বাউ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

মায়াও উঠে দাঁড়িয়েছে। সিনরের দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল, হাত বাড়িয়ে দিল। হাতটা ধরলেন সিনর, আলতো করে চুমু খেলেন।

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর আমাকে বললেন তিনি, 'এতদিন পর তামাকের স্বাদ পেয়ে কী ভালোই না লাগছে। ...না ইগনাশিয়ো, একটু দাঁড়াও। এখনই ঘুমাতে যেয়ো না। আরেকটা সিগারেট ধরাও, আরেক গ্লাস মদ নাও। এসো কিছুক্ষণ কথা বলি দু'জনে। ...আমার কী মনে হচ্ছে জানো? মনে হচ্ছে, অনেক পাল্টে গেছে যিব্যালবে। ওর সম্বন্ধে কখনোই তেমন উঁচু কোনো ধারণা ছিল না আমার, তারপরও কেন যেন ওর চালচলন ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছেন না, তাই তো? কিন্তু আমার মনে হয় আমি পারছি। কিছু কিছু খ্রিস্টান যাজক যেমন হয়, এই লোকও তেমন অতিমাত্রায় গোঁড়া। এবং আমার মতো কল্পনাবিলাসী। কোনো নির্দিষ্ট ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে লোকটার। এবং যতদূর মনে হয় সে স্বৈরাচারী। এ-ধরনের লোক বিনিময় ছাড়া কখনোই কোনো ত্যাগ স্বীকার করে না। অথচ এই লোকটাকে কত সাহসী আর সৎ মনে করেছিলাম প্রথম দেখায়! ভেবেছিলাম এই বয়সে একমাত্র সন্তান তা-ও আবার মেয়েকে নিয়ে এতদূর গিয়েছে কত মহৎ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। শত শত লিগ পাড়ি দিয়েছে খেয়ে না-খেয়ে; যে-কাজ ওর আগে, ওর জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কেউ কয়েক প্রজন্মেও করতে পারেনি। একবার ভেবে দেখুন ব্যাপারটা। ওর দেশের লোকেরা ওকে বলতে গেলে দেবতার মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করত। সব ছেড়ে সামান্য এক কবিরাজের ছদ্মবেশে কোত্থেকে কোন্ পর্যন্ত গিয়েছে সে! এমনকী একদল জঘন্য দুর্বৃত্ত আরেকটু হলেই ওর

মেয়ের চরমতম সর্বনাশ করে দিত, তবুও মুখ খোলেনি। এত কিছু সে কেন করেছে জানেন? কারণ সে বিশ্বাস করে যা অর্জন করার জন্য এত কষ্ট করেছে সে তা পেয়ে গেছে।'

'কী অর্জন করার জন্য এত কষ্ট করেছে যিব্যালবে? আর ওর সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটাই বা কোথায়?'

'যদি ভুল বুঝে না-থাকি তা হলে আমার মনে হয় যিব্যালবের জীবনের একটাই উদ্দেশ্য: সিটি অভ দ্য হার্টের হারানো সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এদিকে আমিও চাই মেক্সিকো স্বাধীন হোক। খেয়াল করুন, দু'জনের চাওয়া প্রায় এক, কিন্তু পুরোপুরি এক না। তবে এই কথাও সত্য, আমরা একজন আরেকজনকে ছাড়া সফল হতে পারবো না।'

'কেন?'

'কারণ আমি চাই টাকা। আর যিব্যালবে চায় লোকবল, সোজা কথায় যোদ্ধা। এখন সে যদি আমাকে টাকা দিতে পারে তা হলে আমি তাকে হাজার হাজার সৈনিক দিতে পারবো।'

'আমার কী মনে হয় জানো? তুমি বা তোমরা যতটা সহজ ভাবছ ব্যাপারটা এত সহজ না। দেখে নিয়ো, অনেক সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে তোমাদেরকে। কিন্তু আমি যে-বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করছিলাম তা রাজনীতির মারপ্যাঁচের মতো এত গুরুতর না।'

'কী বিষয়?' ভ্রূ কুঁচকে তাকালাম সিনরের দিকে।

'ভাবছিলাম, এই যে রাজনীতির খেলা, এই খেলায় আমার বা মায়ার ভূমিকাটা কী? আমরা তো কোনো দেশের স্বাধীনতা চাই না। ঐতিহ্য-হারানো কোনো জাতি তার গৌরব ফিরে পাক তা-ও চাই না। তা হলে কি আমরা এই খেলার নীরব দর্শক?'

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলাম, কেন যেন তিক্ততায় ছেয়ে গেছে মন। 'সিনর, আমার সঙ্গে যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ চেষ্টা করলেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারবেন না। আর লেডি মায়ার কথা যদি বলি, তিনি সিটি অভ দ্য হার্টের রাজকন্যা এবং সিংহাসনের

উত্তরাধিকারী। তাঁর জনগণ যদি কোনো বিপ্লবের দাবি জানায়, চাইলেও কি তখন মুখ বুজে থাকতে পারবেন তিনি? তা ছাড়া এখন তো আর এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছে তাঁর?'

মন্তব্যটা শুনে লজ্জা পেলেন সিনর। তিনিও নিচু গলায় বললেন, 'তুমি যে আড়ালে-আবডালে থেকে সবসময় নজর রেখেছ আমাদের উপর তা কখনও চিন্তাও করিনি। যা-হোক, যখন তুললেই প্রসঙ্গটা তখন বলছি, আরও আগেই কথাটা জানাতাম তোমাকে। কিন্তু জানাইনি। কারণ তুমি মেয়েদেরকে দু'চোখে দেখতে পারো না। ভেবেছিলাম আমার কথা শুনে কী না কী মনে করবে।'

'আড়ালে-আবডালে থেকে নজর রেখেছি কথাটা ঠিক না। কিন্তু আমি তো অন্ধ না। কিছু কথা আছে যা মানুষ কখনোই মুখে বলে না। কিন্তু ওই কথাটা তার চোখে পড়া যায়। ঠিক না?'

কিছু বললেন না সিনর।

আমি বলে চললাম, 'আপনি এবং লেডি মায়া মেক্সিকোর স্বাধীনতার মধ্যে এতখানি ঢুকে গেছেন যে, আপনাদের পক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা সম্ভব না। তবে কোন্ ভূমিকাটা আপনারা পালন করবেন তা-ও আমি নিশ্চিত করে বলতে পারবো না।'

সিনর চুপ।

'যিব্যালবে আপনাকে বলেছে কি না জানি না। কিংবা বললেও কতখানি বলেছে জানি না। তবে আমি একটা কথা বলে রাখি। যতদূর জানি, সিটি অভ দ্য হার্টের অধিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী, কুইটযাল বা মহান দেবতা বা ঈশ্বরের কোনো প্রতিনিধি একদিন নাকি আসবে ওদের দেশে—ওদেরকে উদ্ধার করতে। আমার মনে হয় এই বিশ্বাসটা কমবেশি আছে যিব্যালবের ভিতরে। এজন্যই লেডি মায়ার সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা দেখেও না-দেখার ভান করছে সে। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন যেদিন সে জানতে পারবে আপনি

কুইটযালের প্রতিনিধি না সেদিন কী করবে? লোকে যেভাবে মাছি তাড়ায় সেভাবে তাড়িয়ে দেবে আপনাকে। আর সেদিনই লেডি মায়ার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে আপনার।'

'কোনোদিনও হবে না,' বললেন বটে, কিন্তু সিনরের গলায় জোর নেই। 'আমি বেঁচে থাকতে আমার কাছ থেকে মায়াকে আলাদা করতে পারবে না কেউ।'

মাথা ঝাঁকালাম। 'হ্যাঁ, আপনি বেঁচে থাকলে আপনার কাছ থেকে লেডি মায়াকে আলাদা করাটা কঠিনই হবে। কারণ ইতিহাস বলে, গোঁড়া যাজক আর স্বৈরাচারী রাজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে বা যারা কিছু করেছে তাদের বেশিরভাগেরই পরিণতি ভালো হয়নি। তারপরও আপনার বন্ধু হিসেবে বলবো, সতর্ক হোন কিন্তু সাহস হারাবেন না। মনে রাখবেন আমি সবসময় আছি আপনার পাশে। তা ছাড়া লেডি মায়ার কাছেও প্রতিজ্ঞা করেছি আপনাদেরকে যথাসম্ভব সাহায্য করার।'

'আমিও সবসময় তোমার পাশে আছি,' হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরলেন সিনর, চাপ দিলেন। 'অনেক কথা হলো, রাতও হয়েছে অনেক। চলো এবার ঘুমিয়ে পড়ি। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো, যদি আমি না-মরি, অথবা যদি মায়ার মরণ না-হয়, তা হলে ওকে বিয়ে করবোই।'

আর কিছু না-বলে উঠে দাঁড়ালাম আমি।

চোদ্দ

সিটি অভ দ্য হার্ট

পরদিন ভোরে যিব্যালবের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল আমাদের। বাইরে তখনও অন্ধকার।

'উঠুন,' উঁচু কণ্ঠে বলছে সে, 'রওনা হওয়ার সময় হয়ে গেছে।'

'পালকি এসে গেছে?' ওকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না, আসেনি। আরও কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে। আজ রাতের মধ্যেই সিটি অভ দ্য হার্টে পৌঁছতে চাই আমি। তাই পায়ে হেঁটে রওনা হবো আমরা এখন। পথে যেখানেই দেখা হোক না কেন বেহারাদের সঙ্গে, উঠে পড়বো পালকিতে। সময় বাঁচবে।'

অগত্যা বিছানা ছাড়তে হলো। আমাদের পোশাকগুলো বলতে গেলে ন্যাতাকানি হয়ে গেছে; এই আজব দেশের যেসব আজব কাপড় দেয়া হয়েছে আমাদেরকে, সেগুলো গায়ে দিয়েই যথাসম্ভব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি নিজেদেরকে। তা ছাড়া সবার সামনে মলিন আর ছেঁড়া জামা পরে ঘুরতেও লজ্জা লাগে।

কমনরুমে দেখা হলো যিব্যালবে আর মায়ার সঙ্গে। 'খেয়ে নিন,' আমাদেরকে বলল বুড়ো, ইঙ্গিতে খাবারের প্লেটগুলো দেখাচ্ছে। 'তারপর চলুন রওনা হয়ে যাই।'

দশ মিনিট পর বেরিয়ে পড়লাম আমরা। ঝোড়ো বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল রাতে, এখন থেমে গেছে। কিন্তু সমতলভূমি থেকে অনেক উঁচুতে আছি আমরা, তাই বাতাস খুব ঠাণ্ডা। থেকে থেকে যেন হাড় পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে উঠছে আমাদের। পালক দিয়ে বানানো

শালের মতো কাপড়টা গায়ের সঙ্গে ভালোমতো জড়িয়ে নিলাম। আরামই লাগছে। দ্রুত হাঁটছি সবাই। এতে ঠাণ্ডা কম লাগবে। সবার আগে আছে যিব্যালবে।

এতক্ষণ ধূসর একটা অস্পষ্টতা যেন রাজত্ব করছিল আমাদের আশপাশে। এবার আস্তে আস্তে ফর্সা হচ্ছে চারদিক। তুষারে-ঢাকা পর্বতশৃঙ্গগুলো ঝলমল করছে। এখনও সূর্য ওঠেনি, তবে একটা লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে। আমাদের নীচে পাহাড়ি খাদগুলোয় লেপ্টে আছে রাতের আঁধার। একটু একটু করে বাড়ন্ত আলোয় খেয়াল করে দেখলাম, পর্বতের পাদদেশটা দেখতে অনেকটা গামলার মতো। এই "গামলার" বুক চিরে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে বেশ কয়েকটা নদী। বেশিরভাগেরই উৎপত্তি হয়েছে পর্বতের তুষারগলা পানি থেকে। সমতলভূমির একদিকে বিশেষ সেই হ্রদ, যা এই এলাকার মানুষের কাছে "পবিত্র হ্রদ" নামে পরিচিত।

এতকিছু দেখছি, তারপরও বলতে গেলে কিছুই চোখে পড়ছে না, কারণ গর্তেভরা পাহাড়ি ঢালগুলো ধরে যেন ঝুলে আছে সাগরের-ঢেউয়ের-মতো-সঞ্চারণশীল কুয়াশা। আলো যত বাড়ছে, আকাশের সেই লাল আভাটা তত বাড়ছে; আমাদের চারপাশে এবং পায়ের নীচের পাক-খেয়ে-খেয়ে-ভাসন্ত কুয়াশাও যেন তত বাহারি রঙে রঞ্জিত হচ্ছে। অদ্ভুত এই দৃশ্য দেখে আমার মনে হচ্ছে, আমাদের সামনে যেন কেউ বিছিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর মানচিত্র—কোথাও মহাদেশ, কোথাও সাগর, কোথাও দ্বীপ, আবার কোথাও জাঁকজমকপূর্ণ নামিদামি শহর। কিন্তু রঙের খেলার সঙ্গে এই মানচিত্র পরিবর্তনশীল—আকার পাল্টাচ্ছে একটু পর পর।

'সুন্দর, তা-ই না?' জিজ্ঞেস করল মায়া। 'কুয়াশা কেটে গেলে কী হয় দেখুন!'

যেন ওর বলার অপেক্ষাতেই ছিল—কথাটা শেষ হতে না হতেই এক ঝলক বাতাস বইল, কুয়াশার চাদরের একটা অংশ যেন ছিঁড়ে

আলাদা হয়ে গেল। আমার কাছে মনে হলো যেন শূন্যের মাঝে খুলে গেল কোনো দরজা। সেই "খোলা দরজা" দিয়ে তাকালে চোখে পড়ে সারি সারি পিরামিড আর মন্দিরের চূড়া—সিটি অভ দ্য হার্টের বিস্তৃত দৃশ্যপট। এত দূর থেকে মনে হচ্ছে হ্রদের ঠিক উপরেই যেন ভাসছে শহরটা।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে পুরো শহরটাকে ঘিরে আছে উঁচু একটা দেয়াল। মার্বেল অথবা কোনো একজাতের তুষারসাদা পাথর দিয়ে বানানো হয়েছে দেয়ালটা। সকালের প্রথম রোদের প্রতিফলনে চকচক করছে পাথরগুলো। খেয়াল করলাম, শহরটা প্রকৃতপক্ষে একটা দ্বীপ। পাদদেশের চারদিকে সুবিশাল সেই হ্রদ। দ্বীপটা, আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, অনেকটা হৃদপিণ্ড আকারের। হ্রদের শান্ত নীল পানি ওই দ্বীপের বেলাভূমিতে তরল আঠার মতো আটকে আছে যেন, সকালের রোদে ঝলমল করছে।

কুয়াশার চাদরটা পাহাড়ি দেয়াল বেয়ে একটু একটু করে উপরে উঠছে এবং বাড়ন্ত সূর্যালোকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। গামলার মতো দেখতে উপত্যকাটা দখল করে নিচ্ছে সোনালি রোদ। হ্রদের এই পাড় দেখতে পাচ্ছি এখন। সবুজ নলখাগড়ার জঙ্গলে এসে শেষ হয়েছে পানির বিস্তার, এরপর শুরু হয়েছে তৃণভূমির রাজ্য। এর ভিতরে কোথাও জলাভূমি, আবার কোথাও, আগেও যেমন বলেছি, আঁকাবাঁকা রূপালি নদী। পুরো তৃণভূমি বাঁধা পড়েছে বিস্তৃত একটা উপত্যকার ভিতরে। সেই উপত্যকার সীমানা গড়ে দিয়েছে সারি সারি পাহাড় একের পর এক ঢালে বিস্তার লাভ করেছে ওক আর সিডার গাছের জঙ্গল। আমাদের ডানে-বাঁয়ে নীল দিগন্তের পটভূমিতে রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা তুলে নিজেদের দাপট জাহির করছে উঁচু উঁচু পর্বত। মাঝেমধ্যে একটা-দুটো তুষারাবৃত পাহাড়। এককোনায় নিঃসঙ্গ এক পাহারাদারের মতো দাঁড়িয়ে আছে মৃত এক আগ্নেয়গিরি।

'এই আমাদের দেশ,' গর্বিত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল মায়া,

বিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সিনরের দিকে। 'দেখে কী মনে হচ্ছে?'

'ভালো লাগছে,' বললেন সিনর। 'কিন্তু রহস্যটা যেন আরও জট পাকিয়ে গেছে আমার মনের ভিতরে।'

'রহস্য?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে মায়ার। 'কীসের রহস্য?'

'এত সুন্দর একটা দেশ ছেড়ে পালাতে চাও কেন তুমি?'

'কারণ আমাদের দেশে বিশাল হ্রদ, সারি সারি পর্বত আর প্রাচুর্য আছে ঠিকই, কিন্তু সুখ নেই। দেশের নাগরিকরা...যেন কেমন। আপনি দেখলেই বুঝবেন।'

'হুঁ,' আনমনে মাথা ঝাঁকালেন সিনর। 'সুখের সংজ্ঞা একেক জনের কাছে একেকরকম। তবে আমার মনে হয় এ-রকম একটা দেশে, প্রাচুর্যে ভরা এ-রকম একটা শহরে আমি ঠিকই সুখে থাকতে পারবো।'

'এখন এ-রকম মনে হচ্ছে, শহরে গেলে হয়তো অন্যকিছু মনে হবে। আমাদের জন্য অনেকগুলো বড় বড় ঝামেলা অপেক্ষা করছে। সবচেয়ে বড় ঝামেলার নাম কী জানেন? টিকাল।'

'লোকটা কী চায়?' জিজ্ঞেস করলেন সিনর।

'আমাকে বিয়ে করতে চায়। যার ফলে সে ওই শহরের সর্দার হতে পারবে। ওর আসল উদ্দেশ্য সর্দার হওয়া, আমাকে বিয়ে করাটা এক্ষেত্রে উপলক্ষ মাত্র। ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবেই হোক, সিংহাসন তার চাই। কাজেই আমার উপর নিজের "দাবি" কিছুতেই ছাড়তে চাইবে না সে। ওর পর আছে আমার বাবা। দেবতা আর দেশের জন্য যিনি যে-কোনো কিছু করতে প্রস্তুত। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দরকার হলে আমাকেও দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহার করতে বাধবে না তাঁর, জানি আমি। এবং জেনে রাখুন, একই কথা আপনাদের জন্যও প্রযোজ্য,' করুণ হাসি হাসল মায়া। 'আমাদের সুখের দিন শেষ। এবার সামনে খারাপ দিন আসছে। দেখাসাক্ষাৎ তো পরের কথা, ভবিষ্যতে কথা বলার সুযোগও পাওয়া যাবে কি না

সন্দেহ। এক দল চাকরানি আর সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা বলতে গেলে সবসময় ঘেরাও করে রাখবে আমাকে। আমি কী করি না-করি, কোথায় যাই না-যাই সব দেখবে ওরা। আমার সব কথা শুনবে। আরেকটা কথা, বাবাও কিন্তু আমার উপর চোখ রাখবেন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সিনর বললেন, 'তোমার কথা শুনে এখন খারাপই লাগছে। তোমার আশঙ্কাকে অমূলক মনে করে পাত্তা দিইনি আগে, এখন বুঝতে পারছি কত বড় ভুল করেছি। আসলে এখানে না-এলেই বোধহয় ভালো করতাম। এখান থেকে পালানো সম্ভব?'

'না, অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন পালালে আমাদের পিছু নেবে ওরা। অনুসরণ করে ঠিকই ধরে ফেলবে। এগিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। কপালে যা লেখা আছে তা হবেই, চেষ্টা করলেও ঠেকাতে পারবো না। ...শুনুন, একটা অনুরোধ করি আপনাকে, যদি সত্যিই ভালোবাসেন আমাকে কথাটা রাখুন। আপনার ঈশ্বরের নামে শপথ করুন, আমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত আমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন। আমিও আপনার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো,' হাত বাড়িয়ে সিনরের হাত নিজের হাতে তুলে নিল মায়া, আবেদনপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সিনরের দিকে।

দূরে অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল যিব্যালবে, হঠাৎ করেই ওর খেয়াল হলো, কিছু একটা ঘটছে সিনর আর মায়ার মধ্যে। তাকাল সে আমাদের দিকে, সিনর আর মায়াকে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জলদগম্ভীর কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'এখানে আয়, মায়া। সাদাচামড়ার ভিনদেশী, আপনিও আসুন।'

ধীর পায়ে যিব্যালবের দিকে এগিয়ে গেলেন সিনর আর মায়া।

'শুনুন,' বলতে লাগল যিব্যালবে, 'যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার। তারপরও আমি আগের মতোই দেখতে পাই, আগের মতোই শুনতে পাই। বনেবাদাড়ে যখন একসঙ্গে ছিলাম আমরা, আপনাদের দু'জনের খোলামেলা সম্পর্ক দেখেও না-দেখার ভান করেছি। কিন্তু

এটা আমার নিজের দেশ, মনে রাখতে হবে এখানকার হিসাব সম্পূর্ণ আলাদা। ...ভিনদেশী, জেনে রাখুন, লেডি অভ দ্য হার্টের সঙ্গে আপনার যোজন যোজন দূরত্ব ছিল, আছে এবং থাকবে। আমার কথার মানে বুঝতে কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে?'

'একটুও না,' স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে জবাব দেয়ার চেষ্টা করছেন সিনর, খেয়াল করলাম রাগ চেপে রাখতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। 'কিন্তু সর্দার, বিনীতভাবে একটা কথা আপনাকে না-বলে পারছি না। ধরে নিলাম আপনার দৃষ্টিশক্তি আর শ্রবণশক্তি ঠিক আছে, কিন্তু বাকশক্তিতে যে সমস্যা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তা না-হলে যে-কথা অনেক আগেই জানিয়ে দিয়ে আমাদেরকে সতর্ক করতে পারতেন তা এতদিন পর বলছেন কেন? নিজেদের জীবন বাজি রেখে আমরা যদি না-বাঁচাতাম আপনাকে তা হলে এতদিনে কোন্ জঙ্গলে আপনার হাড়মাংস পচত তার খবর রাখেন? বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর কেন বলেননি আপনার মেয়ের সঙ্গে মেশার যোগ্যতা নেই আমার?'

'কারণ আমাদেরকে বাঁচানোর জন্যই দেবতারা পাঠিয়েছিলেন আপনাদেরকে। এবং আমাদের দেশ পর্যন্ত নিরাপদে ফিরে আসার জন্য আপনাদের সাহায্যের দরকার ছিল। আবারও আপনাদের সাহায্যের দরকার হতে পারে আমার। যদি সে-রকম মনে না-করতাম তা হলে কবেই আলাদা হয়ে যেতাম! আপনাকে মনে রাখতে হবে তখন পরিস্থিতি ছিল এক রকম আর এখন আরেকরকম। তখন আপনি ছিলেন দলনেতা আর এখন আপনারা সবাই আমার মুঠোর ভিতরে। কথাটা যদি মনে না-থাকে তা হলে খুব বড় ভুল হবে—এখন আমার ইচ্ছার উপর আপনার জীবন নির্ভরশীল। আমি চাইলে আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলাতে পারি অথবা জ্যান্ত দাফন দিতে পারি। ...না, পেছনে তাকিয়ে লাভ নেই—পালানো সম্ভব না। নিজেকে এবং নিজের সবকিছু আমার কাছে সমর্পণ করে দিন, কথা দিচ্ছি আরামে থাকতে পারবেন কিন্তু

যদি আমার বিরুদ্ধাচরণ করেন তা হলে আপনাকে শেষ করে দেবো। যা বলার বলে দিয়েছি, এবার আমার সামনে থেকে চলে যান। আরা মায়া, এখন থেকে তুই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবি।'

রাগে লাল হয়ে গেছে সিনরের চেহারা। বুঝতে পারছি যিব্যালবের চেয়েও কড়া কিছু কথা বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছেন তিনি। তাঁকে সাবধান করার জন্য হাত তুললাম। খেয়াল করলাম, মুখে কিছু না-বললেও অনুনয়ের দৃষ্টিতে সিনরের দিকে তাকিয়ে আছে মায়া। মেয়েটার সঙ্গে চোখাচোখি হলো তাঁর, বিশেষ সেই দৃষ্টির মানে বুঝতে পারলেন, সংযত করলেন নিজেকে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বললেন, 'আপনার কথা শুনলাম, সর্দার। ঠিকই বলেছেন আপনি। আমি আপনার মুঠোর ভিতরে। কাজেই আপনার কথার প্রতিবাদে কিছু বলার কোনো মানে হয় না,' কথা শেষ করে মাথা নিচু করে সরে এলেন তিনি।

পরে যিব্যালবের পাশাপাশি হাঁটার সময় ওকে বললাম, 'সর্দার, যাকে সাদাচামড়ার ভিনদেশী বলে সম্বোধন করছেন তিনি আমার ভাইয়ের মতো। কিছুক্ষণ আগে তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন আপনি। এর মানে কি আমার সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করা না?'

'ও-রকম ব্যবহার না-করে উপায় ছিল না,' শীতল কণ্ঠে বলল যিব্যালবে। 'শহরে পৌঁছানোর পর দেখবেন একটার পর একটা ঝামেলা শুরু হবে। আমার ভাতিজা টিকাল আমার বদলে শাসন করছে। কথা আছে মায়ার সঙ্গে বিয়ে হবে ওর। এই বিয়ে আসলেই হবে কি না জানি না, কিন্তু যে-কোনো উপায়ে সিংহাসনে পাকাপাকিভাবে বসার চেষ্টা করবে টিকাল। শাসনক্ষমতা হচ্ছে মানুষের মাংসের মতো, আর শাসকরা হচ্ছে ক্ষুধার্ত বাঘ। বাঘ যেমন মানুষের রক্তমাংসের স্বাদ পেলে আর ছাড়তে পারে না, শাসকেরা তেমনি একবার সিংহাসনে বসতে পারলে তা আর ছাড়তে চায় না। এই অবস্থায় টিকাল আর ওর অনুসারীরা যদি দেখে মায়ার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক ভিনদেশী, একজন আরেকজনের সঙ্গে

ফিসফিস করে কথা বলছে তা হলে কেমন হবে? ইগনাশিয়ো, টিকাল যে-স্বভাবের মানুষ তাতে নিশ্চিত করে বলা যায়, ও-রকম কোনো কিছু দেখামাত্র আমার আর মায়ার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেবে। এজন্য সময় থাকতেই সতর্ক করেছি আপনার বন্ধুকে। তা ছাড়া আমার মনে হয় আপনার মাথায় দেশের কথা যদি সত্যিই থেকে থাকে তা হলে আপনার বন্ধুর আবেগকে প্রাধান্য না-দিয়ে আমার আর মায়ার ভালোমন্দের ব্যাপারটা গুরুত্ব দেয়া উচিত।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম যিব্যালবের দিকে।

'বুঝতে পারলেন না? যদি আমার বা মায়ার কিছু হয়ে যায় তা হলে সিটি অভ দ্য হার্টের কোন্ লোকটা আপনাকে এত সোনাদানা দেবে বলতে পারেন? মনে রাখবেন, আমাকে আর মায়াকে শেষ করে দিতে পারলে আমাদের শত্রুরা আপনাদেরকেও শেষ করে দেবে।'

জবাব দিলাম না। জবাব দিতে পারলাম না আসলে। কারণ একটা মোড় ঘুরতেই দেখি, কতগুলো পালকি নিয়ে বেশ কয়েকজন বেহারা দাঁড়িয়ে আছে আমাদের মুখোমুখি।

ওরা মোট চল্লিশজনের মতো এসেছে। বেশিরভাগই লম্বা, শক্তসমর্থ গড়নের। কারও চেহারাতেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তেমন কিছু নেই। তবে চামড়া সাধারণ ইণ্ডিয়ানদের মতো বাদামি না, বরং যিব্যালবে বা মায়ার মতো অনেক উজ্জ্বল। এ-রকম লোকদের চোখেমুখে বোকাটে বা বুনো একটা ভাব থাকে, এদের কারও মধ্যে সে-রকম কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বরং সবার চেহারাতেই দুশ্চিন্তার ছাপ। সবার চেয়ে কমবয়সী লোকটার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান হওয়ার পরও যেন কয়েক যুগের তিক্ত অভিজ্ঞতা চেপে বসেছে ওর মনে এবং চোখের ভাষায় তা প্রকাশ পাচ্ছে। যিব্যালবে একবার কথাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিল, ওর দেশের লোকেদের নাকি দিন

ফুরিয়েছে; সিটি অভ দ্য হার্টের অধিবাসীদের চোখের সামনে দেখে এতদিনে কথাটার মানে বুঝতে পারছি যেন। সিনরের মতো সাদাচামড়ার এক ভিনদেশীকে দেখতে পাচ্ছে ওরা, তারপরও কারও চেহারাতেই বিস্ময় বা ওই জাতীয় কোনো আবেগের বহিঃপ্রকাশ নেই। শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, কেউ কেউ ফিসফিস করে কী যেন বলাবলি করছে। কেউ আবার নিচু কণ্ঠে সিনরের দাড়ির রঙ নিয়ে মন্তব্য করছে—এই পর্যন্তই।

তবে যিব্যালবেকে দেখে সবাই একযোগে চাপা-কণ্ঠে বলে উঠল, 'পিতা, আপনাকে প্রণাম।'

তারপর ষাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে সম্মান জানাল সিটি অভ দ্য হার্টের সর্দারকে।

খেয়াল করলাম, দু'হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে মাথা আর হাঁটু মাটির সঙ্গে লাগিয়ে পড়েই আছে লোকগুলো, কেউ উঠে দাঁড়াচ্ছে না।

'ওঠো, আমার সন্তানেরা,' শেষপর্যন্ত বলল যিব্যালবে। তারপর বেহারাদের নেতাকে ডাকল কাছে।

দু'জনে কথা বলছে, এই সুযোগে সঙ্গে-করে-আনা খাবার খেয়ে নিল বেহারারা। ওদের খাওয়া শেষ হওয়ার পর আমাদেরকে যার যার পালকিতে চড়ার নির্দেশ দিল যিব্যালবে।

পালকিগুলো খুব সাধারণ। পালকি না-বলে পর্দাছাড়া চেয়ার বললে মানায় বেশি। চেয়ারের হাতলের সঙ্গে দুটো কাঠের-দণ্ড কষে বাঁধা হয়েছে। পথ খুবই খাড়া আর বাজে, তাই প্রতিটা চেয়ার বহন করছে আট জন করে বেহারা।

পাহাড়ি পথ ধরে আবারও যাত্রা শুরু হলো আমাদের। এক ঘণ্টার মধ্যে তুষারে-ঢাকা ওই এলাকা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম আরও সামনে, প্রবেশ করলাম সিডার-জঙ্গলের ভিতরে। দলবদ্ধভাবে জন্মে আছে বিশালাকারের গাছগুলো। সারি সারি গাছের মাঝখানে এখানে-সেখানে তৃণাচ্ছাদিত ফাঁকা জায়গা—একজাতের হরিণের

আবাসস্থল। প্রায় জড়াজড়ি করে জন্মানো সিডারের ডালপালা আর পাতা এত ঘন যে, গোধূলির ম্লান আলো ঠিকমতো পৌঁছাতে পারছে না নীচে। প্রায় প্রতিটা গাছের মোটা কাণ্ড থেকে ঝুলে আছে ঝালরসদৃশ ধূসর স্প্যানিশ শেওলা। পাহাড়ি মৃদুমন্দ বাতাসে দোল খাচ্ছে শেওলার "ঝালরগুলো"। সন্ধ্যার মুমূর্ষু-আলোয়-ভরা সঙ্কীর্ণ বৃক্ষশোভিত পথটা দেখে কেন যেন মেক্সিকোর সেই বড় গির্জাটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আমার।

সিডারের পর শুরু হলো ওক গাছের জঙ্গল। এরপর কয়েক মাইল বিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত পাহাড়ি ঢাল। পুরো এলাকাটাই রসালো ঘাসে ভরা, এখানে-সেখানে তারার মতো ফুটে আছে ঘাসফুল। এই দেশটা আসলেই সুন্দর।

আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, এমন সময় শেষ ঢালটা বেয়ে নামলাম আমরা, হাজির হলাম হ্রদের তীরবর্তী পলিমাটিসমৃদ্ধ একটা এলাকায়। এখানকার আবহাওয়া আগের চেয়ে বেশ গরম। সেচকাজের জন্য গর্ত খোঁড়া হয়েছে এখানে-সেখানে, আধো অন্ধকারেও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। এখানে যারা থাকে তারা যে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে তা-ও বুঝতে পারবে যে-কেউ। এখানে যেসব শস্য আর সব্জি উৎপাদিত হয় তা-ই সরবরাহ করা হয় সিটি অভ দ্য হার্টে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেই চোখে পড়ছে আখের বড় বড় ক্ষেত আর কোকোর ঘন ঝোপ। আলাদা আলাদা বাগানে চাষ করা হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন জাতের ফল। পরিমাণে এত বেশি যে, যে ক'জন শ্রমিক কাজ করে ক্ষেতে বা বাগানে তারা বোধহয় কুলিয়ে উঠতে পারে না, কারণ বেশ কিছু বাগানের ফল পচে নষ্ট হচ্ছে। আবার এমনও হতে পারে, সিটি অভ দ্য হার্টে এত শস্য, সব্জি আর ফলের চাহিদা নেই।

ক্ষেতে-বাগানে যেসব মজুর কাজ করে তাদের এক বা একাধিক গ্রাম আছে এদিকে; আঁধার ঘনিয়েছে এমন সময় এ-রকম একটা গ্রামে ঢুকলাম আমরা। গ্রাম না-বলে ধ্বংসস্তূপ বললেই বোধহয়

মানায় বেশি। শ্রী হারিয়েছে প্রতিটা কুঁড়েঘর। কাদামাটি পুড়িয়ে বানানো ইঁট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ঘরগুলো। সাদা চুনাপাথরের কংক্রিট দিয়ে বানানো হয়েছে ঘরের ছাদ।

গ্রামের মাঝখানে বেশ বড় একটা খোলা চত্বর, সম্ভবত বাজার। এটাকে গোল করে ঘিরে লাগানো হয়েছে বিভিন্ন জাতের গাছ। চত্বরের মধ্যস্থলে একটা কৃত্রিম ঝরনা। এটার কাছেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সাধারণ একটা বেদি। এর উপর স্তূপ করে রাখা আছে অনেক ফল আর ফুল। বেদির আশপাশে জড়ো হয়েছে একশ'র বেশি গ্রামবাসী। আমাদেরকে বরণ করে নেয়ার জন্য এসেছে এরা। জ্বলন্ত মশালের আলোয় কেমন চকচক করছে সবার চেহারা। পুরুষদের বেশিরভাগই বোধহয় কাজ করছিল ক্ষেতে বা বাগানে, কারণ এখনও ওদের পোশাকে আর হাতে-পায়ে লেগে আছে কাদামাটির দাগ। কারও হাতে তামার নিড়ানি, কারও হাতে কাস্তে।

এদের বেশিরভাগেরই চেহারা চকচক করছে। কিন্তু তা উত্তেজনায় না, বরং ঘামে ভেজা থাকার কারণে। যে-বেহারারা নিয়ে এসেছে আমাদেরকে তাদের চেহারায় যে-রকম সন্ত্রস্ত ভাব দেখেছি, যারা আমাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য জড়ো হয়েছে তাদের চেহারার অবস্থাও একই। কেমন একটা বিরক্তিতে ভরে উঠল আমার মন, একঘেয়েমি কাটাতে তাকালাম বেদির-আরেকপাশে-জড়ো-হওয়া মহিলাদের দিকে। স্বামী বা ভাইদের মতো, এই মহিলারাও যথেষ্ট ফর্সা। কেউ কেউ বেশ সুন্দরী। কিন্তু সবারই চেহারা ঝুলে আছে—কে কার চেয়ে বেশি বিষণ্ন থাকতে পারে সে-প্রতিযোগিতা চলছে যেন সারা গ্রামে।

সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের সাদা চামড়া বা বাদামি দাড়ি দেখে কারও মধ্যে তেমন একটা ভাবান্তর হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রথম প্রথম উৎসুক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়েছে সবাই, কিন্তু তারপর আগেরমতোই মনমরা হয়ে গেছে। নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা

বলছে মহিলারা, কেউ কেউ ঘাগড়ার-সঙ্গে-বাঁধা ফুল খুলে নিয়ে একটা একটা করে পাপড়ি ছিঁড়ছে আনমনে।

যিব্যালবে পালকি থেকে নামার পর ষাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে ওকে সম্মান জানাল গ্রামবাসীরা। আমাদেরকে কিছু না-বলে একটা কুঁড়েঘরের দিকে এগিয়ে গেল যিব্যালবে, বোঝা যাচ্ছে ওর থাকার উপযোগী করা হয়েছে ঘরটাকে। সে না-যাওয়া পর্যন্ত মাটিতে পড়েই থাকল গ্রামবাসীরা।

'সবার হয়েছেটা কী?,' মায়াকে জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আজ বাদে কাল ফাঁসি দেয়া হবে ওদেরকে।'

'অনেকটা সে-রকমই,' মায়ার কণ্ঠে প্রাণের ছোঁয়া নেই। 'আমাদের এই দেশে যারা কাজ করে খায়, সোজা কথায় শ্রমিক, তাদের অবস্থা এ-রকমই। কিন্তু যারা সম্ভ্রান্ত বংশের তাদের কথা আলাদা। এই দেশের মানুষদেরকে আসলে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—শাসক আর শাসিত। শাসকরা এখানে সুখেই আছে, যত কষ্ট শাসিত মানে সাধারণ জনগণের। শ্রমিকদেরকে বছরে তিন মাস বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করতে হয়। বাকি ন'মাস তারা শুয়ে-বসে থেকে অলসভাবে সময় কাটিয়ে দেয়। এদের পরিশ্রমের ফসল জমা হয় শাসকদের গুদামে, পরে তা অসমভাবে বণ্টন করে দেয়া হয় দেশের জনগণের মাঝে। যারা এই ফসল উৎপাদন করার জন্য খেটে মরে তারা খেয়ে-পরে চলার জন্য যতটুকু দরকার তার বেশি পায় না। অথচ যারা কোনো খাটুনিই করে না তাদের গুদামে এত ফসল জমে যে, বেশিরভাগই পচে নষ্ট হয়। এদেশের শাসক সম্প্রদায় থাকে সিটি অভ দ্য হার্টের প্রাসাদে, মন্দিরে, রাজদরবারে, বড় বড় দোকানে। বাকিরা তাদের ভূমিদাস হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে।'

'এই ভূমিদাসরা যদি কাজ না-করে তা হলে কী হবে?' জিজ্ঞেস করলেন সিনর।

'না-খেয়ে মরবে। একটু আগেই বললাম, এদের উৎপাদিত সব

শস্য চলে যায় শাসকদের গুদামে। এখন এই ভূমিদাসরা যদি কাজ না-করে তা হলে তাদেরকে শস্যের কোনো ভাগই দেবে না শাসকরা। উল্টো কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করবে।'

এতক্ষণে বোঝা গেল কেন এই লোকগুলোকে এত উদ্বিগ্ন, এত হতোদ্যম দেখাচ্ছে। যাদের জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই, যারা শুধু বেঁচে থাকার জন্য দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে তারা যে নিরানন্দ হবে তাতে আর আশ্চর্য কী? যাদের এত পরিশ্রমের ফসল ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে জমা করে রাখা হয় সম্পদশালীদের গুদামে তারা কষ্ট করার উৎসাহ পাবে কোত্থেকে?

মায়ার সঙ্গে এসব বিষয়ে কথা বলছি, এমন সময় যিব্যালবের পক্ষ থেকে একজন দূত এল। জানাল, আমাদেরকে ডাকছে যিব্যালবে। যে-বাড়িতে আছে সে সেখানে আমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গিয়ে দেখি খাবারের তালিকায় আছে হ্রদ-থেকে-ধরা মাছ, ঝলসানো বনমোরগ আর বিভিন্ন রকমের ফল। খাওয়া শেষে চকোলেট খেলাম। পেটা রূপার পাত্রে সেগুলো পরিবেশন করা হলো আমাদের জন্য।

ইতোমধ্যে রাত ঘনিয়েছে। যিব্যালবেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আজ রাতে কি এখানেই থাকবো?'

জবাবে সে বলল, 'না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার রওনা হবো আমরা।'

ঠিকই, চাঁদ ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার রওয়ানা হতে হলো। হ্রদের তীরে ছোট্ট একটা বন্দর আছে, সেখানে হাজির হলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই। বেশ কয়েকটা বড় বড় নৌকা প্রস্তুত করে রাখা আছে। সেগুলো আক্ষরিক অর্থেই বেশ বড়, কারণ প্রতি নৌকায় মাস্তুল আছে আর তাতে খাটানো হয়েছে পাল। কমপক্ষে দশজন করে দাঁড়ি আছে একেকটাতে। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে ওরা।

নৌকায় উঠলাম আমরা। পাল খাটিয়ে দেয়া হলো। সিটি অভ

দ্য হার্টের উদ্দেশে শুরু হলো আমাদের যাত্রা। অনুমান করলাম, তীর থেকে পনেরো মাইলের মতো দূরে হবে শহরটা।

বাতাস তেমন জোরালো না। তবে পাহাড়ি এলাকা দিয়ে আসার সময় যে-ঝোড়ো বাতাসের বিরুদ্ধে যুঝতে হয়েছে তার সঙ্গে তুলনা করলে বেশ স্নিগ্ধ। আমাদের এগোনোর গতি ধীর। নৌকার কেউ কোনো কথা বলছে না। মনে হচ্ছে প্রত্যেকে যার যার নিজের চিন্তায় মগ্ন। যিব্যালবে আমাদের সঙ্গে একই নৌকায় উঠেছে; সে আছে বলে ইণ্ডিয়ানরাও চুপ মেরে গেছে। তবে যিব্যালবেকে দেখে মনে হচ্ছে অস্থিরতায় ভুগছে। একটু পর পর দাড়ি ধরে টানছে, বিড়বিড় করে কথা বলছে নিজের সঙ্গে।

নীলাভ পানির হ্রদটার বুক চিরে এগিয়ে চলেছি আমরা। চারদিক নিস্তব্ধ, নিথর। মাঝেমধ্যে ডানা ঝাপ্টে উড়ে যাচ্ছে একটা-দুটো বুনোপাখি, শিস দেয়ার মতো সেই আওয়াজ রাতের নীরবতা ভেঙে দিচ্ছে। হ্রদের কোনো কোনো জায়গায় উড়ে বেড়াচ্ছে নিশাচর পতঙ্গের ঝাঁক। তাদের পিছু ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে বড় বড় মাছ। কখনও কখনও শোনা যাচ্ছে ওই মাছগুলোর লেজ ঝাপ্টানোর আওয়াজ। কখনও আবার ঢেউ এসে নৌকার গায়ে আছড়ে পড়ছে, শোনা যাচ্ছে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। মাথার উপর ঝকঝক করছে চাঁদ। চারদিকে হলদেটে আলোর বন্যা। কেমন অপার্থিব লাগছে সবকিছু। দূরে দেখা যাচ্ছে রহস্যময় স্বর্ণশহরের সীমানাপ্রাচীর আর উঁচু উঁচু মন্দির। চাঁদের আলোয় চকচক করছে ওগুলোও।

ভাবতে কেমন আশ্চর্য লাগছে আমার, ওই ছোট্ট শহরটায় পৌঁছানোর জন্য এত দূর থেকে এত কষ্ট করে এসেছি! যত এগোচ্ছি, ওই সীমানাপ্রাচীর আর মন্দিরগুলো যেন তত বড় হচ্ছে। ওগুলো যতবার দেখছি, অদ্ভুত এক আশা আর ভয় যেন একইসঙ্গে তত বেশি করে চেপে বসছে মনে। জানি এটা কোনো স্বপ্ন না; এতদিন যা ছিল পৌরাণিক কাহিনির মতো, আজ তা-ই সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের চোখের সামনে—একটু একটু করে আরও

কাছিয়ে আসছে স্বর্ণশহর। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই শহরে পা রাখতে যাচ্ছি আমরা, প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছি মেক্সিকোর সুপ্রাচীন আরেক সভ্যতা।

'আমাদের কপালে কী আছে বলো তো?' ফিসফিস করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন সিনর, খেয়াল করলাম আড়চোখে মায়ার দিকে তাকাচ্ছেন বার বার।

আমি কিছু বললাম না। সিনরের কথাটা শুনতে পেয়েছে মায়া, কিন্তু সে-ও কোনো জবাব দিল না। শুধু বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে হোঁচট খেলাম। হতাশ হয়ে পড়েছে সে, দু'চোখ ভরে গেছে পানিতে।

হয়তো সান্ত্বনা পাওয়ার আশায় আমার দিকে তাকালেন সিনর।

আমি তখন বললাম, 'ভয় পাবেন না। আমরা ঠিক পথেই আছি। সব সমস্যা, সব বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারবো। স্বর্ণশহরের অকেজো সম্পদ একদিন আমাদেরই হবে। শাসকরূপী যে-নরপিশাচরা যুগের পর যুগ ধরে আমার দেশের মানুষদের শোষণ করে যাচ্ছে, ওই সম্পদ কাজে লাগিয়ে তাদের জন্য সঞ্চিত জিঘাংসা চরিতার্থ করবো। প্রতিষ্ঠা করবো ইণ্ডিয়ানদের একটা সতন্ত্র সাম্রাজ্য। দরকার হলে এই স্বর্ণশহরকেই রাজধানী বানাবো।'

আমার কথা শুনে হাসলেন সিনর। বললেন, 'তা-ই যেন হয়। কিন্তু মুশকিলের কথা কী জানো? মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক।'

এগিয়ে চললাম আমরা। সিটি অভ দ্য হার্ট আরও কাছিয়ে এসেছে। শহর থেকে এখন পর্যন্ত তেমন কোনো আওয়াজ ভেসে আসেনি আমাদের কানে। প্রহরীরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, মাঝেমধ্যে উঁচু গলায় প্রহর ঘোষণা করছে, সে-আওয়াজ শোনা যাচ্ছে রাতের নীরবতার কারণে

শেষপর্যন্ত স্বর্ণশহরের ছায়ায় প্রবেশ করল আমাদের নৌকা। বাতাস পড়ে গিয়েছিল, তাই এতক্ষণ দাঁড় টানা হচ্ছিল; খেয়াল

করলাম যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে আমাদের নৌকাটাকে সরু একটা খালের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খালের দু'তীর পাথরে বাঁধাই-করা। শেষমাথায় একটা ওয়াটারগেট বা স্লুইসগেট, ওটার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি আমরা।

দরজাটার সামনে নৌকা থামানো হলো। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নৌকার সারেংকে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল যিব্যালবে, 'কী ব্যাপার? দরজা আটকে দিয়ে প্রহরীরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? ডাকো ওদেরকে।'

সারেঙের উঁচু কণ্ঠের ডাক শুনে একটা লোক হাই তুলতে তুলতে দরজার পার্শ্ববর্তী সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। জিজ্ঞেস করল, 'কে? এত রাতে কী চাই?'

নিজের পরিচয় দিয়ে যিব্যালবে বলল, 'আমি তোমাদের সর্দার। দরজা খোলো।'

'তা-ই নাকি? আশ্চর্যের ব্যাপার তো!' লোকটা আসলেই আশ্চর্য হয়েছে না ভান করছে বুঝতে পারলাম না। 'আজ রাতে প্রাসাদে নিজের শুভকাজ মানে বিয়ে সেরে ফেললেন আমাদের সর্দার। এখন হয়তো সবাইকে নিয়ে ফুর্তিফার্তি করে পেট ভরে খাচ্ছেন। আর আপনি বলছেন আপনি আমাদের সর্দার? যতদূর জানি সিটি অভ দ্য হার্টের সর্দার মাত্র একজন। যান, যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে যান। মাতলামির আর জায়গা পান না?'

রাগে ভয়ঙ্কর গলায় ধমক দিয়ে উঠল যিব্যালবে। কিন্তু মায়ার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখি, খুশিতে চকচক করছে ওর চোখ।

'আবারও বলছি আমি যিব্যালবে, তোমাদের সর্দার। কিছুদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম, ফিরে এসেছি নিজের দেশে। আমি তোমাদের প্রভু। আমি ছাড়া আর কোনো সর্দার নেই এই শহরে। যা বলছি তা করো। না-হলে পরে পস্তাবে।'

ইতস্তত করছে পাহারাদার লোকটা। সারেং তখন মুখ খুলল, 'বোকা, অকালে মরতে চাও? শিয়াল-শকুনের খাবার হয়ে পড়ে

থাকতে চাও বনেবাদাড়ে? ইনি আমাদের সর্দার যিব্যালবে, ফিরে এসেছেন।'

আর দেরি করল না পাহারাদার লোকটা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুলে দিল দরজা।

'ক্ষমা করুন, দয়া করে ক্ষমা করুন,' চিৎকার করে বলছে সে, ষাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের ভঙ্গিতে প্রায় শুয়ে পড়েছে যিব্যালবের পায়ের কাছে, 'আমার কোনো দোষ নেই। আপনার বদলে যিনি শাসনকাজ পরিচালনা করছেন, অর্থাৎ মহামান্য টিকাল ঘোষণা করেছেন আপনি নাকি বিদেশে বেড়াতে গিয়ে মারা পড়েছেন। এবং এই আদেশ জারি করেছেন, সিটি অভ দ্য হার্টে আপনার নাম যেন আর কখনও উচ্চারিতও না-হয়।'

এমনিতেই রেগে ছিল যিব্যালবে, এই কথাটা শুনে ওর রাগ আরও বাড়ল। লাথি মেরে সরিয়ে দিল লোকটাকে। দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল উপরে। কিছুটা উঠে থামল, সারেঙের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই লোকটাকে আগামীকাল দুপুরে বাজারে নিয়ে গিয়ে সবার সামনে চাবুক মারবে। পাহারা দিতে গিয়ে ঘুমানোর শাস্তি কী তা টের পাবে হারামজাদা।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম আমরাও। ভিতরে প্রথমেই পাহারাদার বা সৈন্যদের জন্য ছোটখাট একটা দুর্গ। সেটার একপাশ থেকে শুরু হয়েছে প্রশস্ত একটা রাস্তা। দু'ধারে সাদা পাথরে নির্মিত চমৎকার কিছু বাড়ি। খেয়াল করলাম, শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তবে মায়াকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল এখনও মাইলখানেকের মতো দূরে আছি।

ভেবেছিলাম রাস্তাটা হয়তো পুরোপুরি পাকা, কিন্তু দেখে আশ্চর্যই লাগছে, জায়গায় জায়গায় বড় বড় ঘাস জন্মে আছে। আগেই বলেছি দু'ধারে বড় বড় বাড়ি, কিন্তু সেগুলোর বেশিরভাগে কেউ থাকে বলে মনে হয় না। কোনো কোনো বাড়ির জাফরি-কাটা জানালা দিয়ে আলো আসছে। আমরা ছাড়া চারপাশে জনমানুষের

চিহ্ন নেই।

'শহরে এলাম বটে,' ফিসফিস করে আমাকে বললেন সিনর, 'কিন্তু লোকজন কোথায়?'

'মনে হয়,' এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম, 'শহরের মাঝখানের বিশাল যে-খোলা জায়গাটার কথা বলা হয়েছে সেখানে গিয়ে জড়ো হয়েছে সবাই।'

'উপলক্ষ?'

'কেন, শোনেননি তখন? টিকাল বিয়ে করেছে, ভোজ খেতে গেছে প্রজারা।' কান পাতলাম, অস্পষ্ট কিছু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। 'শুনুন,' আপনাথেকেই গলা খাদে নেমে গেছে আমার, 'কিছু শুনতে পাচ্ছেন?'

বাতাস কিছুটা জোরালো হয়েছে, শহরের কেন্দ্রভাগ থেকে আমাদের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। বয়ে আনছে অস্পষ্ট কিছু শব্দ। কে বা কারা যেন গান গাইছে। কিছুদূর এগোনোর পর সে-আওয়াজ আরও জোরালো হলো। মিনিট পাঁচেক পর শহরের কেন্দ্রস্থলের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম আমরা।

জায়গাটা আসলেই অনেক বড়—আনুমানিক ত্রিশ একর। ঠিক মাঝখানে তিনশ' ফুট উঁচু একটা পিরামিড—টেম্পল অভ দ্য হার্ট। এটাও বোধহয় সাদা পাথর দিয়ে বিশেষ কোনো পদ্ধতিতে বানানো হয়েছে। কারণ অল্প আলোতেও কেমন ঝকঝক করছে। একেবারে চূড়ায় তারার মতো জ্বলছে "অগ্নি চিরন্তন"—অর্থাৎ প্রজ্বলনের পর আর কখনও নেভানো হয়নি আগুনটা। পিরামিডের পাদদেশে জড়ো হয়েছে শহরবাসীদের অনেকেই। উদ্দেশ্য, সর্দারের বিয়ে উপলক্ষে আয়োজিত ভোজে অংশ নেয়া। বেশিরভাগেরই পরনে সাদা আলখাল্লা। কারও কারও মাথায় দেখা যাচ্ছে পালকের টুপি। কারও গলায় ফুলের মালা। কেউ নাচছে, কেউ গাইছে। একধারে খেলা দেখাচ্ছে বাজিকরেরা। হাস্যকর কসরতে মেতে উঠেছে কয়েকজন বামন। বাজিকরদের খেলা অথবা বামনদের কসরত দেখছে অনেকে

গাদাগাদি করে। কিন্তু বেশিরভাগ লোক বসে আছে মন্দিরের-পাদদেশে সারি-করে-লাগানো শ'খানেক টেবিল জুড়ে। কেউ খাচ্ছে, কেউ পান করছে, কেউ সিগারেট ফুঁকছে, কেউ আবার খুনসুটি করছে প্রেমিকা বা স্ত্রীর সঙ্গে। খেয়াল করলাম, বাচ্চাদের বিশেষ যত্ন করা হচ্ছে এখানে—যেন ওরা সম্মানিত অতিথি।

দেখে মনে হচ্ছে এই অনুষ্ঠানের চেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আর পবিত্র কোনো অনুষ্ঠান হতে পারে না। মাথার উপর পূর্ণিমার চাঁদের আলো, আবহাওয়া মনোরম, জনগণের মনে প্রশান্তি। কিন্তু যিব্যালবের দিকে তাকিয়ে দেখি, চোখমুখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে সে তার প্রজাদের দিকে। যেন ওদের এই উৎসব, এই আনন্দ পছন্দ হচ্ছে না ওর।

"গ্রেটস্কয়ারের" একপাশে তরুবীথি। থোকায় থোকায় একজাতের সাদা ফুল ফুটে আছে বেশিরভাগ গাছে। মিষ্টি ঘ্রাণে ভারী হয়ে আছে বাতাস। আমাদেরকে ইশারা করল যিব্যালবে, ওর পিছু নিয়ে এগোতে লাগলাম ওই গাছগুলোর ছায়ায় ছায়ায়। আগেই বলেছি, প্রজাদের খাওয়ার সুবিধার্থে সারি করে টেবিল বসানো হয়েছে; কিন্তু স্থান সংকুলান না হওয়ায় বেশ কিছু টেবিল এই তরুবীথির কাছেও দেয়া হয়েছে। পানভোজে মত্ত জনতা আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করছে না। আমার আর সিনরের কথা বাদ দিলাম, যিব্যালবে বা মায়াকেও কেউ চিনতে পেরেছে বলে মনে হয় না। সবাই ধরেই নিয়েছে মারা গেছে ওরা দু'জন। নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মশগুল শহরবাসীরা।

এ-রকম একটা টেবিলের থেকে কিছুটা দূরে থেমে দাঁড়াল যিব্যালবে। থামলাম আমরাও। টেবিলে বসে আছে মধ্যবয়স্ক একটা লোক আর সুন্দরী এক যুবতী। এতদিন মায়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওদের অনেক শব্দই আয়ত্ত করে ফেলেছি আমি আর সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড, তাই ওই লোক আর ওর সঙ্গিনী কী বলছে বুঝতে অসুবিধা হলো না।

'অনেকদিন পর এত স্বতঃস্ফূর্ত কোনো ঘটনা ঘটছে আমাদের শহরে, তা-ই না?' বলল লোকটা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মেয়েটা, এরা স্বামী-স্ত্রী হবে সম্ভবত, 'এ-রকম হওয়াই উচিত। গতকাল আমাদের মন্ত্রীসভা লর্ড টিকালকে সর্দার নির্বাচিত করেছে। আজ তিনি আমাদের সবার সামনে বিয়ে করলেন লর্ড মাটাইয়ের মেয়ে নাহুয়াকে, রূপ আর গুণের কারণে যিনি একনামে পরিচিত।'

'বিয়ে করে ভালোই করেছেন তিনি। একটা পুরুষমানুষ কতদিন একা একা থাকতে পারে? থাকাটা উচিতও না। কিন্তু কথা হচ্ছে লর্ড টিকালকে এত তাড়াহুড়ো করে সর্দার নির্বাচিত করাটা কি ঠিক হলো?'

'কেন?'

'যিব্যালবে ফিরে আসতে পারে যে-কোনো সময়। তখন অবস্থা কী হবে ভেবে দেখেছ?'

'যিব্যালবে আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না। ফিরে আসবে না তার মেয়ে লেডি মায়াও। লর্ড টিকাল কী বলেছেন ভুলে গেছ? বাপ-বেটি দু'জনই নাকি বনেজঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে অনেক আগেই মারা পড়েছে। মেয়েটার কথা চিন্তা করলে আসলেই খারাপ লাগে আমার। কী সুন্দর ফুটফুটে একটা মেয়ে! এত উঁচুঘরের, তা-ও কোনো দেমাগ নেই। কিন্তু যিব্যালবের জন্য তেমন কোনো আক্ষেপ নেই আমার। লোকটা স্বৈরাচারী ছিল। তা ছাড়া এক নম্বরের হাড়কিপ্টা। গত দশ মাসে টিকাল আমাদেরকে যত সুযোগসুবিধা দিয়েছে, যিব্যালবে কয়েক বছরেও দিতে পারেনি। তা ছাড়া লর্ড টিকাল কিছু আইনকানুনও শিথিল করে দিয়েছেন। এখন আমরা যার যার ইচ্ছামতো গহনা পরতে পারি,' বলতে বলতে কব্জিতে বাঁধা সোনার ব্রেসলেটের দিকে সস্নেহে তাকাল মেয়েটা।

'সুযোগসুবিধা আর কী-বা দিয়েছেন লর্ড টিকাল?' গলা খাদে নামিয়েছে লোকটা। 'আমাদের জন্য খাবারের বরাদ্দ কিছুটা

বাড়িয়েছেন। কিন্তু যা বাড়িয়েছেন তা কি এমনিতেই আমাদের প্রাপ্য না? খেয়াল করো, আমাদের অধিকার, আমাদেরকেই কিছুটা দিয়ে জনপ্রিয়তা কামিয়ে নিচ্ছেন তিনি আসলে। বরং আমি বলবো যিব্যালবে যা করত ঠিকই করত। দুর্দিনের কথা ভেবে মৌমাছির মতো সঞ্চয় করে রাখত সে, অল্প অল্প করে খরচ করত। আরও অনেকেই ওকে কিপ্টা বলে, কিন্তু ওর এই কিপ্টামির দরকার আছে। দিন দিন আমাদের চাষীভাইরা উৎপাদন কমিয়ে দিচ্ছে; লর্ড টিকাল যেভাবে খরচ করছেন, বছর শেষ হওয়ার পর কী হবে ভেবে দেখেছ? ওই যে বললাম—যিব্যালবে যদি হয় মৌমাছি তা হলে লর্ড টিকাল বোলতা। সব খেয়ে শেষ করে ফেলছেন।'

কিছু বলল না মেয়েটা, চিন্তিত ভঙ্গিতে এখনও তাকিয়ে আছে ব্রেসলেটটার দিকে।

'অনেকে বলে বয়সের ভারে যিব্যালবে নাকি পাগল হয়ে গিয়েছিল,' বলে চলল লোকটা, 'কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না কথাটা। আমার মনে হয় তার চিন্তাভাবনা কথাবার্তা আমাদের সবার চেয়ে আলাদা। তার ইচ্ছা ছিল দেশের লোকের জন্য কিছু করার। তাই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সম্পদ, বিশেষ করে খাবার মজুদ করে আমাদের অপচয় করার মনোভাব বদলানোর চেষ্টা করেছিল,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'কিন্তু পারল না শেষপর্যন্ত।'

'ওই বুড়োটা অবশ্যই পাগল,' যেন খেঁকিয়ে উঠল মেয়েটা। 'শহরে না-থেকে সে যদি নিজের যুবতী মেয়েকে নিয়ে বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় তা হলে আমাদের অভ্যাস কীভাবে বদলাবে? দেখো গিয়ে খেতে না-পেয়ে কোথায় মরে পড়ে আছে দু'জনে! ওরা যেখানে গেছে সে-জায়গা কত ভয়ঙ্কর শোনোনি? সাদাচামড়ার মানুষরূপী কিছু শয়তান নাকি ঘুরে বেড়ায় ওসব জায়গায়। ইণ্ডিয়ানদেরকে দেখলেই খুন করে ওরা। অথবা ধরে নিয়ে গিয়ে দাস বানায়। টাকাপয়সা সোনাদানা যা পায় লুট করে নেয়। ইস্‌স্! ওই লোকগুলো যদি একবার হাজির হতে পারে আমাদের শহরে তা হলে

কী হবে বলো তো?'

জবাব দিল না লোকটা। খেয়াল করলাম কেমন আনমনা হয়ে পড়েছে সে।

আমাদেরকে ইশারা করল যিব্যালবে, আবার হাঁটতে শুরু করলাম আমরা।

'বাবার চেহারাটা দেখেছেন?' ফিসফিস করে বলল মায়া। 'তাঁকে এত রাগতে আর কখনও দেখিনি আমি। লোকে যা বলাবলি করছে তা কিন্তু তাচ্ছিল্য করার মতো না,' সিনরের দিকে তাকাল সে।

আমি তাকালাম যিব্যালবের দিকে। দ্রুত হাঁটছে বেচারা। দাড়ি ধরে টানছে। বিড়বিড় করে কথা বলছে নিজের সঙ্গে। আমার মনে হলো, লোকে যে ওকে পাগল বলে এমনিতে বলে না।

কিছুক্ষণ পর হাজির হলাম খিলানসদৃশ এক তোরণের সামনে। সেখানে তামার বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে দুই পাহারাদার। তোরণের কাছেই জড়ো-হওয়া একদল মহিলার সঙ্গে খোশগল্প জুড়ে দিয়েছে দু'জনই। মহিলাদের কেউ কেউ এটা-সেটা খেতে দিচ্ছে ওদেরকে। আগ্রহ নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে ওরা। তারপর খাবারটা নির্দ্বিধায় চালান করে দিচ্ছে মুখের ভিতরে।

আলখাল্লার প্রান্ত দিয়ে নিজের চেহারা ঢেকে নিল যিব্যালবে। একই কাজ করতে ইশারা করল আমাদেরকেও। তোরণের নীচ দিয়ে হেঁটে এগোনোর চেষ্টা করল। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল দুই পাহারাদার, বর্শা উঁচিয়ে ধরে পথ রোধ করল ওর।

পাহারাদারদের একজন জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? ভিতরে যাওয়ার এত শখ কেন? কোত্থেকে এসেছ? নাম কী?'

'কার আদেশে আমাকে এত প্রশ্ন করছ?' হুমকির সুরে বলল যিব্যালবে।

'আমাদের সর্দার লর্ড টিকালের আদেশে,' জবাব দিল লোকটা। 'আজ তিনি বিয়ে করেছেন।' তোরণের নীচ দিয়ে যে-রাস্তাটা

ভিতরের দিকে গেছে সেদিকে ইঙ্গিত করল সে। 'গণ্যমান্য অতিথিদের নিয়ে আছেন তিনি, হয়তো হাসিতামাশা করছেন সবার সঙ্গে। কাজেই কাউকেই ভিতরে যেতে দেয়া যাবে না।'

'এই লোকটার সঙ্গে এত কথা বলছ কেন?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল আরেক পাহারাদার, 'ঘাড় ধরে সোজা বের করে দাও।'

চেহারা থেকে আলখাল্লার প্রান্তটা সরাল যিব্যালবে। বলল, 'ভালোমতো তাকিয়ে দেখো তো চিনতে পারো কি না। আমি কি যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিলাম, ফেরার পর আমার মুখের উপর আমার প্রাসাদের দরজা বন্ধ করে দিয়ো?'

ভালোমতো দেখতে হলো না, একবার দেখেই ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা হলো দুই পাহারাদারের। সভয়ে কয়েক কদম দূরে সরে গেছে ওরা, বর্শা ফেলে দিয়ে দু'হাত জড়ো করে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। তোতলাতে তোতলাতে বলছে, 'স...সর্দার! আমাদের... আগের সর্দার! আপনি ফিরে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, ফিরে এসেছি,' দাম্ভিক গলায় জবাব দিল যিব্যালবে। 'এবার বলো, কোন্ সর্দারের হুকুমে প্রাসাদে যাওয়ার দরজা এভাবে আটকে রেখেছ? একটা শহরে কি দু'জন সর্দার থাকতে পারে?'

জবাব দিল না দুই পাহারাদারের কেউই। ভয়ে রীতিমতো কাঁপছে ওরা। আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছে, চেষ্টা করছে দূরে চলে যাওয়ার।

ওদের দিকে আর তাকাল না যিব্যালবে। হাঁটতে শুরু করল আবার। আমরা তিনজন আছি ওর পিছনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাসাদের চত্বরে এসে হাজির হলাম। বেশ কয়েকটা কৃত্রিম ঝরনা বা ফোয়ারা দেখা যাচ্ছে। সরু ধারায় পানি পড়ছে সবগুলো থেকে, ভিজিয়ে দিচ্ছে মার্বেলের ফুটপাত।

সামনে কয়েক সারি পিলার। এরপর দেখা যাচ্ছে একটা খোলা দরজা। ভিতর থেকে আলো আসছে। দরজাটা পার হয়ে দেখি বেশ বড় আর সুসজ্জিত একটা হলরুমে হাজির হয়েছি। ঘরটা দৈর্ঘ্যে

একশ' ফুটের বেশি। ছাদ প্যানেল-করা সিডার কাঠের। চমৎকার কারুকার্যখচিত দু'সারি কাঠের স্তম্ভ মেঝে থেকে উঠে গেছে ছাদের দিকে। স্তম্ভগুলোর মাঝখানে কয়েক সারি টেবিল পাতা। সেগুলোতে দেখা যাচ্ছে ফলমূল, পানপাত্র এবং সোনার বিভিন্ন উপকরণ। চারদিকের দেয়ালও প্যানেল-করা সিডার কাঠের। রূপার পাতলা পাতের উপর অভিনব নকশাখচিত চমৎকার কিছু ট্যাপেস্ট্রি ঝুলছে বিভিন্ন দেয়ালে। এদিকে-সেদিকে দাঁড়িয়ে আছে খাঁটি সোনায় নির্মিত বামন আর বানরের কিছু কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি। ঘরের সৌন্দর্যের সঙ্গে মানায়নি ওগুলো। প্রতিটা মূর্তির একটা হাত সামনের দিকে বাড়ানো। বাড়ানো হাতটায় কায়দা করে বসিয়ে দেয়া হয়েছে রূপার লণ্ঠন। সবগুলো লণ্ঠন জ্বলছে। ঘরের শেষপ্রান্তে ছোট একটা টেবিল, তাতে মুখোমুখি সিংহাসনের-মতো-চেয়ারে বসে আছে একটা পুরুষ আর এক যুবতী। দু'জনের পাশে একজন করে সশস্ত্র পাহারাদার।

পুরুষ লোকটার পোশাক জাঁকজমকপূর্ণ। সাদা কিন্তু ঝলমলে একটা আলখাল্লা পরেছে সে। সুঁই-সুতোর জমকালো কারুকাজে হৃদয়ের প্রতীকচিহ্ন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আলখাল্লাটার জায়গায় জায়গায়। পালকনির্মিত শালের মতো চমৎকার পোশাকটাও দেখা যাচ্ছে। তার কপালে সোনার একটা বলয়, তাতে বেশ বড় একটা সবুজ পালক বসানো। ওর হাতে সোনার-রাজদণ্ড, মাথায় বেশ বড় একটা পান্না। অনুমান করলাম লোকটা মধ্যম উচ্চতার। তবে দেখে বোঝা যাচ্ছে গড়ন বলিষ্ঠ। বয়স পঁয়ত্রিশের মতো। মাথার লম্বা কালো চুল চলে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। চেহারা সুদর্শন, কিন্তু কেমন একটা উগ্রতা আছে। ঝুলেপড়া লোমশ ভ্রূর নীচে কালো দুই চোখে যেন আগুন জ্বলছে। চাপা গোমড়া ভাব তার পুরো চেহারায়, হাসলেও যা দূর হয় কি না সন্দেহ।

ওর সঙ্গে বসে-থাকা যুবতীটা বেশ সুন্দরী। বিয়ের সাজে সেজেছে সে। রূপার সুতো দিয়ে সুন্দর কারুকাজ করা চমৎকার

সাদা আলখাল্লা পরেছে। পোশাকটার বুকের উপর হৃৎপিণ্ডের রাজকীয় প্রতীক। মেয়েটার কপালে, দু'বাহুতে, গলায় পান্নার অলঙ্কার। বেশ হালকাপাতলা সে, দেখলে মনে হয় পুরুষটার চেয়েও লম্বা। তা ছাড়া বসে আছে পিঠ সোজা করে। একজোড়া চমৎকার চোখ তার, গর্বিত চেহারা। এই অপ্রয়োজনীয় গর্ব ওর সৌন্দর্য কিছুটা হলেও নষ্ট করেছে বলে মনে হচ্ছে। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আছে সে।

আমাদের এবং এই "রাজকীয় দম্পতির" মাঝখানে আরও অনেক লোক। বেশিরভাগেরই খাওয়া শেষ, তাই টেবিল ছেড়ে উঠে ইতস্তত হাঁটাহাঁটি করছে। সবার পরনে জমকালো পোশাক, গায়ে বহুমূল্য রত্নপাথর আর সোনার অলঙ্কার। লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলো সে-সব গহনায় বার বার প্রতিফলিত হয়ে অদ্ভুত এক আভা তৈরি করছে ঘরের দেয়ালগুলোতে। নির্দিষ্ট কারও দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না—আলোর ঝলকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। অনুমান করলাম, দু'-তিনশ'র মতো লোক আছে হলরুমে।

আমাদের দিকে উল্টো ঘুরে আছে অনেকেই। তাই খেয়াল করতে পারছে না। তা ছাড়া যেদিকে দাঁড়িয়ে আছি আমরা সেদিকটা তেমন আলোকিত না বলে কেউ তেমন মনোযোগও দিচ্ছে না।

ঘরের আরেক প্রান্ত তুলনামূলকভাবে ফাঁকা। সেখানে দেখা যাচ্ছে কিছু সংখ্যক সুন্দরী মহিলাকে। এদের পরনে রেশমী আলখাল্লা। গলায় ফুলের মালা। গায়ে ফিরোজা-রত্নের বাহুল্য। এদের সঙ্গে আছে একদল বাদক। এরা বাঁশি বাজাচ্ছে, মহিলাদের একদল সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচছে, আরেক দল সমবেত কণ্ঠে বিয়ের গান গাইছে।

দূরে বসে-থাকা ওই পুরুষ আর সুন্দরী যুবতীটার দিকে আরও একবার তাকালাম আমি।

পনেরো

যিব্যালবের প্রত্যাবর্তন

এত জমকালো আয়োজন দেখে আসলে থমকে গেছি আমরা। এখনও দাঁড়িয়ে আছি দরজার কাছে। কী করবো ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাদেরকে কেউ দেখেছে কি না, দেখলেও কোনো গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছে কি না জানি না।

শেষপর্যন্ত আগে বাড়ার সিদ্ধান্ত নিল যিব্যালবে। কিন্তু আবারও থামতে হলো বেচারাকে, কারণ হাতের রাজদণ্ডটা উঁচু করেছে টিকাল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেছে নাচ, গান, কোলাহল। ওই রাজদণ্ড দেখে এক পা পিছিয়ে এল যিব্যালবে, দরজার কাছে আরও অন্ধকার একটা কোনায় সরে গেল। আমাদেরকেও ইশারা করল ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে।

এমন সময় মুখ খুলল টিকাল, ভরাট গলায় বলতে শুরু করল, 'আমার রাজ্যের মন্ত্রণাসভার সদস্যরা, সমাজপতিরা এবং তাদের সহধর্মিণীরা, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আপনারা জানেন গতকাল আমাকে আপনাদের সর্দার নির্বাচিত করা হয়েছে। উপযুক্ত কারণেই করা হয়েছে কাজটা। আমার বাপ-দাদারা অনেক আগে থেকেই এই দেশের শাসনকাজ পরিচালনা করছেন, এখন উত্তরাধিকারসূত্রে সে-ক্ষমতা আর সিংহাসন পাওয়ার অধিকার আমার আছে। তবে এক্ষেত্রে জোর-জবরদস্তি হয়েছে এমন অভিযোগ কেউ করতে পারবে না। কারণ আপনারা সবাই মিলে স্বেচ্ছায় আমাকে নির্বাচিত করেছেন। সিংহাসনে

বসেই শুভকাজ সারতে দেরি করিনি আমি। আর আমার এই অনুষ্ঠানে দাওয়াত করেছি আপনাদের সবাইকে যাতে আপনারা আমার নবপরিণীতা স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন, আমাদের শুভ দাম্পত্য জীবনের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন।

'আমার স্ত্রীর নাম—হয়তো আপনারা সবাই জানেন তারপরও বলছি—নাহুয়া। রূপ আর গুণের কারণে ওকে একনামে চেনে সবাই। ওর বাবা আমাদের সমাজে খুবই সম্মানিত একজন মানুষ, শীর্ষস্থানীয় সমাজপতিদের একজন—লর্ড মাটাই। আমাদের এই শহরে যতজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী আছে তিনি তাঁদের গুরু। আমাদের মন্দিরগুলোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। মন্ত্রণাসভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য।

'আপনাদের সবার উপস্থিতিতে আমার প্রথম এবং আইনসঙ্গত স্ত্রীকে আমার পরে এই শহরের ও রাজ্যের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করছি। মনে রাখবেন, ওর আদেশই আমার আদেশ, ওর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। এবার আপনারা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে ওকে কুর্নিশ করুন।'

সবাই কুর্নিশ করছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দেখছি আমরা। খুশিতে আর অহঙ্কারে ঝকঝক করছে নাহুয়ার চেহারা।

'উপস্থিত সম্মানিত অতিথিরা,' কুর্নিশ করা শেষ হলে আবার বলতে শুরু করল টিকাল, 'দুঃখজনক কিছু কথা আমার কানে এসেছে। কেউ কেউ নাকি আমার বিরুদ্ধে কী সব আবোলতাবোল বলছে। যেমন, আজ রাতে আমার হাতে যে-রাজদণ্ড আছে সেটার উপর আমার নাকি কোনো অধিকার নেই। এ-ব্যাপারে আমার যুক্তিগুলো উপস্থাপন করছি, শুনে আপনারাই বিচার করুন অভিযোগটা ঠিক না ভুল।

'আমার চাচা যিব্যালবে কী এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে দেশ ছেড়ে কোথায় গেছেন, আগামীকাল এক বছর পূর্ণ হবে। তাঁর একমাত্র সন্তান ছিল লেডি মায়া। সিংহাসনের উপর আমার মতোই

ন্যায্য হিস্যা ছিল মেয়েটার। আমার সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়ার কথাও ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাবার হাত ধরেই দেশ ছেড়েছে সে এবং আজ পর্যন্ত আর ফিরে আসেনি। ওরা চলে যাওয়ার আগে মন্ত্রণাসভার সদস্যদের উপস্থিতিতে যিব্যালবে আর মায়ার সঙ্গে আমার কথা হয়, ওদের অনুপস্থিতিতে আমিই শাসনকাজ চালাবো। এ-ও কথা হয়, ওরা যদি দু'বছরের মধ্যে না-ফেরে তা হলে সিংহাসনের একচ্ছত্র অধিকার শুধু আমার হবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও এই চুক্তিতে রাজি হতে হয় আমাকে। কারণ তখন চাচা এই শহরের সর্দার। এখনও যেমন আমার বদ্ধমূল ধারণা, তখনও বিশ্বাস করতাম তিনি পাগল। কারণ তা না-হলে মায়ার মতো একটা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কেউ বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াবে না। কিন্তু চাচার মুখের উপরে কিছু বলা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে।

'শাসনকাজ পরিচালনা করতে গিয়ে প্রথমেই দেখি, কিছু সংখ্যক বিপথগামী লোক শুধু বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আমাকে সর্দার মানতে তারা নারাজ। তাদের এক কথা: আগে যিব্যালবে ফিরুক, এ-বিষয়ে একটা ফয়সালা হোক, ওর মুখ থেকে শুনি সব, তারপর কে সর্দার আর কে প্রজা বোঝা যাবে।

'কিছুটা বেকায়দার মধ্যেই পড়ে গেলাম আমি তখন। মন্দিরে এমন কোনো প্রধান পুরোহিত নেই যাঁর কথা শুনবে লোকে, মান্য করবে। এদিকে সিংহাসন বেশিদিন খালি থাকার নিয়ম নেই। কারণ আমাদের ধর্ম বলে এতে দেবতারা ক্রুদ্ধ হন—তাঁদের পূজা ঠিকমতো করানো যায় না। তখন দেশ ও জাতির মঙ্গলের কথা ভেবে অনেকেই আমাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। তারপরও ওদেরকে তখন সাফ জানিয়ে দিই, চাচা আর মায়ার সঙ্গে যে-চুক্তি হয়েছে আমার তা ভঙ্গ করতে পারবো না—দু'বছর হওয়ার একদিন আগেও বসতে পারবো না সিংহাসনে।

'তিন দিন আগের কথা। একটা কাজে মূল-ভূখণ্ডে গেছি আমি।

গিয়ে দেখি, মন্দিরের জন্য, আপনাদের সবার ভালোর জন্য যে-সব ভূমিদাসদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে তারা কোনো কাজ না-করে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। ব্যাপার কী জানতে চাইলাম। সন্তোষজনক জবাব দিতে পারল না কেউ। লোক মারফত বলে পাঠালাম চাষীরা যেন আর দেরি না-করে কাজ শুরু করে, তা না-হলে এ-বছরের ফসল নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে আমাদেরকে। কিন্তু কারও মধ্যে তেমন কোনো গরজ দেখলাম না। ওরা বলল, ওদেরকে আদেশ দিয়ে মাঠে পাঠানোর ক্ষমতা নাকি শুধু প্রধান পুরোহিত বা শহরের সর্দারের আছে। মেজাজ খুব খারাপ হলো আমার, কিন্তু জোর করে সামলে রাখলাম নিজেকে। ভেবে দেখলাম, ভুল বলেনি চাষাগুলো। আসলেই, শহরে কোনো সর্দার নেই, কাজেই সবার মধ্যে একটা গা-ছাড়া ভাব, যে যেভাবে পারে কাজে ফাঁকি দিচ্ছে।

'সঙ্গে সঙ্গে শহরে ফিরে এলাম আমি। দেখা করলাম লর্ড মাটাইয়ের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসলাম। সব বললাম তাঁকে।

'আপনারা জানেন তিনি একজন জ্যোতির্বিদ। আমার কথা শুনে সারারাত আকাশের তারাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করলেন। তিনি একজন পুরোহিতও, কাজেই দেবতাদের সঙ্গেও কথা হলো তাঁর। জানতে পারলেন, মিথ্যা এক স্বপ্নের অজুহাত দিয়ে দেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গ করেছেন আমার চাচা যিব্যালবে। আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন আমাদের প্রাচীন আইনে বলা আছে, দেশ ত্যাগ করে কেউ বিদেশে গিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে না—সে যে-ই হোক না কেন। অথচ দেখুন, চাচা যিব্যালবে তাঁর মেয়ে মায়াকে নিয়ে কীভাবে আমাদের সবাইকে ফেলে চলে গেলেন!

'দেবতারা বললেন লর্ড মাটাইকে, এই মূর্খতাপূর্ণ পাপের জন্য শাস্তি পেতে হয়েছে চাচাকে। বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে গিয়েছিলেন তিনি, সেখানেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। মারা গেছে মায়াও। অথচ

দেখুন, এখানে থাকলে আমার স্ত্রী হতে পারত মেয়েটা।' লর্ড মাটাইয়ের দিকে তাকাল সে। 'ঠিক বলেছি না?'

যাকে সম্বোধন করা হয়েছে তার দিকে তাকিয়েছে অনেকেই, আমিও। বয়স হলেও এখনও বেশ শক্তপোক্ত গড়ন লোকটার। সারা মাথা জুড়ে টাক। চঞ্চল, ধূর্ত দৃষ্টি চোখে। গালভর্তি ঘন দাড়ি। টিকালের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল সে, ওর কথা শুনে এক পা আগে এসে কুর্নিশ করে বলল, 'লর্ড, আমার এতদিনের সঞ্চিত জ্ঞান যদি মিথ্যা না-হয়, দেবতাদের কথা বুঝতে যদি আমার ভুল হয়ে না-থাকে, তা হলে আপনি যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন।'

'প্রিয় দেশবাসী,' যেন বিশ্বজয় করেছে এমন ভঙ্গিতে বলে চলল টিকাল, 'আমার বিবৃতি শুনলেন আপনারা। শুনলেন লর্ড মাটাইয়ের কথাও। তাঁর ব্যাপারে সবাই বলে, তিনি যা বলেন সত্য বলেন। আর তাঁর এই সত্য কথাটাই আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে এই ক'টা দিন। কেন জানেন? কারণ বার বার ভেবেছি, দেশবাসীর উপকার করতে গিয়ে যদি সিংহাসনে বসি তা হলে যিব্যালবে আর মায়ার সঙ্গে করা চুক্তি ভঙ্গ হবে। কিন্তু যদি না-করি কাজটা তা হলে আমার দেশ আর দেশের এতগুলো লোক নষ্ট হয়ে যাবে।

'তখন ভাবলাম চুক্তি ভঙ্গ হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবো আমি একা, আর ভঙ্গ না-হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এতগুলো লোক। আপনারাই বলুন, আমার জায়গায় আপনারা থাকলে, আপনাদের মনে আমার মতো দেশপ্রেম থাকলে কী করতেন? হাত-পা গুটিয়ে বসে বসে দেশের ধ্বংস দেখতেন? তা ছাড়া, আগেও বলেছি আবারও বলছি, সিংহাসনের উপর ন্যায্য অধিকার আছে আমার।

'অনেকে হয়তো বলবেন, মায়াকে বিয়ে করার কথা থাকার পরও কেন নাহুয়াকে বিয়ে করলাম। আপনারাই বলুন, চাচা যদি মরে গিয়ে থাকে তা হলে মায়ার কি জীবিত থাকার অথবা এই দেশে ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা আছে? এবং আমার কি অধিকার নেই সমাজস্বীকৃত উপায়ে জীবনটা উপভোগ করার? তা হলে

সারাজীবনের জন্য নিখোঁজ হয়ে যাওয়া একটা মেয়ের কথা ভেবে কেন নিজেকে বঞ্চিত রাখবো? এ-জন্যই লর্ড মাটাইয়ের মেয়ে নাহুয়াকে বিয়ে করেছি। বলুন, আমি কি ভুল করেছি?'

এই প্রশ্নের জবাবে কেউ কেউ চুপ করে থাকল বটে, কিন্তু বেশিরভাগই হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে চেঁচিয়ে জানাল, 'না, না, লর্ড টিকাল, আপনি ভুল করেননি। আপনাকে এবং আপনার স্ত্রীকে স্বীকার করে নিয়েছি আমরা। প্রার্থনা করি, আজীবন আমাদেরকে শাসন করুন আপনি। এবং আপনার পরে আপনার বংশধরেরা যেন সিংহাসনের উত্তরাধিকার পায়।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' টিকালের কণ্ঠে আর চেহারায় সন্তুষ্টির বন্যা, 'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই অনুষ্ঠান শেষ করবো আমরা। তবে তার আগে আমার আর নাহুয়ার স্বাস্থ্য কামনা করে পান করবেন আপনারা। ...আপনাদের কারও কি কিছু বলার আছে?'

'হ্যাঁ, আছে,' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল যিব্যালবে।

ওর চিৎকার শুনে উপস্থিত সমাজপতিদের অনেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছে আমাদের দিকে। কিন্তু এখনও আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি আমরা, তাই মনে হয় না কেউ বুঝতে পেরেছে কে বলেছে কথাটা।

কিন্তু যিব্যালবের কণ্ঠ সম্ভবত ভালোমতোই চেনে টিকাল। কারণ হঠাৎ করেই ওর চেহারা থেকে রক্ত সরে গেছে, ভয়ে রীতিমতো কাঁপছে সে, উঠে দাঁড়াচ্ছে আস্তে আস্তে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তুমি যে-ই হও অন্ধকার থেকে বের হয়ে এসো। সামনে এসে দাঁড়াও যাতে সবাই তোমাকে দেখতে পারে। তারপর বলো কী বলতে চাও।'

আমাদের দিকে তাকাল যিব্যালবে। ওকে অনুসরণ করার ইশারা করল। তবে তার আগে আলখাল্লার একটা প্রান্ত দিয়ে চেহারাটা ঢেকে নিল। ওর দেখাদেখি আমরাও।

এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। উপস্থিত সমাজপতিরা আর তাদের

পত্নীরা দু'পাশে সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে আমাদেরকে যাতে টিকাল আর ওর ঘনিষ্ঠজনেরা ভালোমতো দেখতে পারে আমাদেরকে।

কিন্তু বেশিদূর এগোতে হলো না যিব্যালবেকে। প্রথমে ফিসফিস, তারপর অস্পষ্ট গুঞ্জন, শেষে আঁতকে ওঠার স্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলাম। টিকালের হাত থেকে রাজদণ্ডটা আপনাআপনি খসে পড়ল মেঝেতে। ধাতব আওয়াজ তুলে সেটা গড়িয়ে সরে গেল কিছুটা দূরে।

'যিব্যালবে!' যেন ভূত দেখছে এমন ভঙ্গিতে বলছে কেউ কেউ, 'ফিরে এসেছে লোকটা! নাকি যা দেখছি ভুল দেখছি? মরার পর ভূত হয়ে চলে এসেছে দেশের মায়া ছাড়তে না-পেরে? সঙ্গে লেডি মায়াও আছে!'

'জী, জী, ঠিকই বলেছেন আপনারা,' শ্লেষের সুরে বলল যিব্যালবে, আর দরকার নেই বলে আলখাল্লার প্রান্তটা চেহারার উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছে, 'আমি যিব্যালবে-ই। রক্তমাংসের মানুষ, ভূত না। আমিই আপনাদের সর্দার। দেশের কাজেই বাইরে গিয়েছিলাম, কাজ শেষে বড় কোনো ক্ষতি ছাড়াই ফিরে আসতে পেরেছি।' টিকালের দিকে তাকাল। 'কী ব্যাপার, টিকাল? দু'বছরের জন্যে চুক্তি করলে আমাদের সঙ্গে, কিন্তু এক বছর হওয়ার আগেই দখল করে ফেললে সিংহাসনটা? ক্ষমতার লোভ ছাড়তে পারলে না? আর মাটাই, তোমারই বা এই অবস্থা কেন? কোথায় গেল তোমার সত্যবাদিতা? নাকি এখন বলবে দেবতারা মিথ্যা বলেছেন তোমার সঙ্গে? নাকি গণনা করার সময় আকাশে ভুল তারা উঠেছিল? যদি বলি তুমি আর টিকাল মিলে জঘন্য এক ষড়যন্ত্র করে সিংহাসন দখল করার পরিকল্পনা করেছ তা হলে কি ভুল হবে? অনেক আগে থেকেই ক্ষমতার জন্য লালায়িত ছিল টিকাল, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি গিয়ে যোগ দিয়েছ ওর সঙ্গে। ভেবে দেখেছ এতে তোমার লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। টিকালকে যদি সিংহাসনে বসানো যায় আর তোমার

মেয়েকে যদি ওর বউ বানানো যায় তা হলেই বাজিমাত, নাকি? ...না, থামো, মনগড়া কোনো কিছু বলতে যেয়ো না। তোমরা যে কত বড় প্রতারক তা আজ ফাঁস হয়ে গেছে সবার সামনে। অনেক আগে থেকেই এই হলরুমে আছি আমি। ওই অন্ধকার কোনায় দাঁড়িয়ে তোমাদের সব কথা শুনেছি। ...টিকাল, তুমি একজন আত্মস্বীকৃত বিশ্বাসঘাতক। আর মাটাই, তুমি আসলে গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারদের মতো—যা জানো ভুল জানো, যা বলো ভুল বলো। তুমি তোমার এতদিনের জ্ঞান নিজের এবং নিজের পরিবারের স্বার্থে ব্যবহার করেছ। তোমাদের দু'জনেরই শাস্তির ব্যবস্থা করবো আমি। শুধু তোমাদের দু'জনেরই না, যে বা যারা তোমাদের এই কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে তাদের সবারই একই অবস্থা হবে। প্রহরীরা! এই দুই বিশ্বাসঘাতককে এখনই গ্রেপ্তার করো! তারপর টানতে টানতে আমার চোখের সামনে থেকে নিয়ে গিয়ে বন্দি করো পাতাল কারাগারে!'

সিংহাসনের মতো যে-চেয়ারে বসে ছিল টিকাল তার পাশে-দাঁড়ানো দুই রক্ষী যেন অবশ হয়ে গেছে। একবার তাকাচ্ছে যিব্যালবের দিকে, আরেকবার টিকালের দিকে। কী করবে বুঝতে পারছে না। কিছুক্ষণ পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা, ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল টিকালের দিকে—সম্ভবত ওকে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে।

এমন সময় হঠাৎ লাফিয়ে উঠল নাহুয়া। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল দুই প্রহরীকে। চিৎকার করে বলল, 'কী! এত বড় সাহস তোমাদের? কোথাকার কোন্ পাগল বুড়ো এসে বলল আর অমনি তোমাদের সর্দারকে পাকড়াও করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছ? সরো! আমি লেডি অভ দ্য হার্ট হুকুম করছি, আরও এক পা-ও কাছে আসবে না। তা না-হলে দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হবে তোমাদেরকে। ...যিব্যালবে বেঁচে থাকুক বা মরে যাক, সিটি অভ দ্য হার্টে ওর রাজত্ব শেষ। কারণ শহরের মন্ত্রণাসভা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে

মুকুট পরিয়েছে টিকালের মাথায়। রাজদণ্ড তুলে দিয়েছে তাঁর হাতে। এবার ভালো হোক বা মন্দ, ওদের এই সিদ্ধান্ত আর বদলানো যাবে না।'

'হ্যাঁ,' জোর গলায় স্ত্রীকে সমর্থন করল টিকাল, দেখে মনে হচ্ছে ওর সাহস ফিরে এসেছে, 'নাহুয়া ঠিক কথাই বলেছে। যদি পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখার ইচ্ছা থেকে থাকে তা হলে আমাকে স্পর্শও কোরো না কেউ।'

খেয়াল করলাম, মায়ার উপর থেকে একবারের জন্যও দৃষ্টি ফেরায়নি সে। সে-দৃষ্টিতে আছে প্রণয়, আছে অনুরাগ। যেন অনেকদিন পর মায়াকে দেখতে পেয়ে পুরনো ভালোবাসা নতুন করে জেগেছে ওর মনে।

কিছু বলতে যাচ্ছিল যিব্যালবে, এমন সময় ওকে কুর্নিশ করে সম্মান জানিয়ে মাটাই বলল, 'রাগ না-করে আমার কয়েকটা কথা শুনুন, মাই লর্ড। অনেক দূর থেকে এসেছেন আপনি, স্বাভাবিকভাবেই পথশ্রমে ক্লান্ত। আর ক্লান্ত মানুষের রাগ এমনিতেই একটু বেশি হয়। আপনার মনে হচ্ছে আপনার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। কিন্তু তা না। আসলে আপনি চলে যাওয়ার পর এমন অনেক কিছু ঘটেছে দেশে, এমন অনেক পরিবর্তন এসেছে যার কারণে আপনার মনে হতেই পারে সব বদলে গেছে। কিন্তু সে-সব নিয়ে কথা বলার সময় এখন না। আমার কথা শুনুন—বিশ্রাম নিন। আগামীকাল পিরামিডে যাবো আমরা। কথা দিচ্ছি সবার উপস্থিতিতে সবকিছু খুলে বলা হবে আপনাকে। ন্যায়বিচার করা হবে সবার সঙ্গে। যা-হোক, আপনি সুস্থ দেহে ফিরে এসেছেন আমাদের মাঝে, আপনাকে স্বাগতম। এবং "চাইল্ড অভ দ্য হার্ট" মায়া, আপনাকেও স্বাগতম। আমি শুধু বিনীতভাবে একটা প্রশ্নই জিজ্ঞেস করবো আপনাদেরকে। দয়া করে বলবেন কি, প্রচলিত আইন ভঙ্গ করে ভিনদেশ থেকে কাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন?'

থমকে গেছে যিব্যালবে। বাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে মাটাইয়ের

দিকে। ফাঁদে পড়লে নেকড়ের যে-অবস্থা হয়, যিব্যালবের হয়েছে সে-রকম। মাটাইয়ের প্রশ্নের জবাবে কিছু বললে উপস্থিত "সমাজপতিদের" মনোভাব কী-রকম হবে বুঝতে পারছে না। তবে এটা বুঝতে পারছে, এখানে যারা আছে তাদের খুব কম সংখ্যকই সাহায্য করবে ওকে প্রয়োজনের মুহূর্তে। কাজেই ফণা তুলে লাভ নেই এখন।

ওর চেহারা থেকে রাগ মুছে গেল আস্তে আস্তে। খেয়াল করলাম, শান্ত-সৌম্য ভাবটা ফিরে আসছে। মাথা তুলে সরাসরি তাকাল সে মাটাইয়ের দিকে। বলল, 'ঠিকই বলেছ, মাটাই। আমি আসলেই ক্লান্ত—বয়সের ভারে, পথশ্রমে এবং আমার চারপাশের লোকদের বিশ্বাসঘাতকতা দেখে। তোমার প্রস্তাবটা খারাপ না। আমাদের মধ্যে যে-বিবাদ তৈরি হয়েছে তার ফয়সালা হবে আগামীকাল, শহরের বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে। তখন দেখা যাবে কী রায় দেয় জনতা—আমি সর্দার, না টিকাল সর্দার। ...আমার সঙ্গের এই আগন্তুকদের পরিচয় জানতে চেয়েছ তুমি। জবাবে বলছি, ওরা কারা তা এখনই বলবো না। আগামীকাল সবার সামনেই জানানো হবে কোত্থেকে এবং কেন এদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার তত্ত্বাবধানে রাখলাম এদেরকে। আশা করি নিজের ভালোর জন্যই এদের খাতিরযত্ন করবে তুমি। ...না, এখানে কিছুই খাবো না আমি। একফোঁটা পানিও না। কাজেই ও-ব্যাপারে কিছু বোলো না আমাকে।' নাম ধরে ডাকল সে কয়েকজনকে, সম্ভবত এদেরকে সবার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করে। 'তোমরা কি আমার সঙ্গে আসবে?'

"সমাজপতিদের" কেউ কেউ তখন পিছু নিল যিব্যালবের। কিন্তু দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে-কাজ করছে তারা তা করা উচিত হচ্ছে কি হচ্ছে না সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে তাদের মনে।

ওই লোকগুলোকে সঙ্গে নিয়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল যিব্যালবে।

সে চলে যাওয়ার পর অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হেসে মায়া বলল, 'বাবা মনে হয় আমার কথা ভুলে গেছে—আমাকে ফেলেই চলে গেল। যা-হোক,' সমবেত জনতার দিকে তাকাল সে, 'আপনাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে অভিনন্দন।' এরপর তাকাল টিকালের দিকে। 'তোমাকেও অভিনন্দন, টিকাল। অভিনন্দন নাহুয়াকেও। একদিন তুমি ছিলে আমার চাকরানি, আর আজ ভাগ্যের উদারতায় হয়ে গেছ লেডি অভ দ্য হার্ট। দখল করেছ আমার পদ, আমার উপাধি। যা-হোক, প্রার্থনা করি তোমরা দু'জনই সুখী হও।'

আসন ছেড়ে উঠে এসে মায়ার সামনে দাঁড়াল টিকাল। কুর্নিশ করল ওকে। মাথা তুলে কিছু বলতে যাবে এমন সময় হাতের ইশারায় ওকে থামিয়ে দিয়ে মায়া বলল, 'কিছু বোলো না। আমার কিছু শুনতে ইচ্ছা করছে না এখন। যদি পারো তা হলে কিছু খেতে দাও আমাকে আর আমার বন্ধুদেরকে। আমরা ক্ষুধার্ত। ...দেখো, একটাবার তাকিয়ে দেখো নাহুয়ার দিকে। কী সুন্দর আলখাল্লা পরেছে সে! সারা গায়ে ঝলমল করছে পান্নার অলঙ্কার। জোর দিয়ে বলতে পারি ওগুলো একদিন আমার ছিল। যখন বিনা-অনুমতিতে পরেই ফেলেছে তখন আর কী বলার আছে? ওগুলো দিয়ে দিলাম ওকে বিয়ের উপহার হিসেবে। ...আমার জন্য একটু কষ্ট করবে টিকাল? এখানে যে-ভদ্রমহিলারা উপস্থিত আছে তাদেরকে কি বলবে আমার সঙ্গে দেখা করে যাতে কুশল বিনিময় করে? আমি জানি এদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাদেরকে দেখলে আমার ভালো লাগবে। ওদের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি, কিছুক্ষণ কথা বলতে চাই।'

একটা টেবিল ছেড়ে দেয়া হলো আমাদের জন্য, সেখানে খেতে বসলাম আমরা। খাচ্ছি না-বলে খাওয়ার ভান করছি বলাটাই উচিত হবে বোধহয়। কারণ কেউই তেমন কিছু খেতে পারছি না। নিজের কথা যদি বলি, অদ্ভুত এক দুর্ভাবনা পেয়ে বসেছে আমাকে। বার বার মনে হচ্ছে খারাপ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। উদরপূর্তির চেয়ে

গলা ভেজানোটাই তাই বেশি জরুরি মনে হচ্ছে আমার কাছে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি চারপাশে জড়ো-হওয়া লোকগুলোকে। দেখছি মায়া যাদের সঙ্গে কথা বলছে তাদেরকে। ওরাও দেখছে আমাদেরকে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। আজব কোনো প্রাণী মনে করছে কি না কে জানে! সন্দেহ নেই আজকের আগে সাদাচামড়ার কোনো মানুষ ওরা দেখেনি কখনও, তাই সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের দিকেই ওদের বেশি মনোযোগ। আসলেই, লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করার মতোই চেহারা হয়েছে সিনরের—লালচে-বাদামি চুল, বড় বড় দাড়ি, ফ্যাকাসে সাদা চামড়া। তাঁকে গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়েছে দর্শকেরা। কেউ একদৃষ্টিতে আবার কেউ বড় বড় চোখে দেখছে। ভুলে গেছে সাধারণ ভদ্রতা।

তবে দু'জনের কথা আলাদা। একজন টিকাল, আরেকজন নাহুয়া। আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না অথবা তাকানোর প্রয়োজন বোধ করছে না দু'জনের কেউই। টিকাল দাঁড়িয়ে আছে মায়ার চেয়ারের পিছনে। এটা-সেটা এগিয়ে দিচ্ছে ওকে। দেখে মনে হচ্ছে সে শহরের সদ্য-নির্বাচিত সর্দার না, সাধারণ কোনো ভৃত্য। এদিকে নাহুয়া গম্ভীর মুখে বসে আছে নিজের চেয়ারে, যথেষ্ট বিরক্তি নিয়ে দেখছে স্বামীর কাজ। মায়াকে দেখামাত্র কীভাবে বদলে গেছে ওর স্বামীর আচরণ তা-ও ওর নজর এড়ায়নি। মায়ার সঙ্গে রসিকতা করার চেষ্টা করছে টিকাল, মনোযোগ দিয়ে শুনছে সে। শেষপর্যন্ত স্বামীর এই আকস্মিক পরিবর্তন আর সহ্য করতে পারল না বেচারী। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নীরবে হেঁটে বের হয়ে গেল হলরুম ছেড়ে।

নাহুয়াকে চলে যেতে দেখে উঁচু গলায় বলল মায়া, 'নতুন বউকে যাওয়ার সুযোগ করে দিন আপনারা, একটু সরে দাঁড়ান। ...টিকাল, তোমারও আর থাকার দরকার নেই এখানে। গুডনাইট। যাও, তোমার স্ত্রী অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল টিকাল, ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে প্রতিবাদ করল না মায়ার কথার। সুবোধ বালকের মতো পিছু নিল নাহুয়ার। খানিকটা দৌড়ে গিয়ে স্ত্রীর পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য অনুসরণ করল দু'জনকে।

'এবার একটু বিশ্রাম নেয়া দরকার,' আবারও বলল মায়া। 'বন্ধুরা, গুডনাইট। মাটাই, আমার সঙ্গের এই আগন্তুকদেরকে আপনার জিম্মায় রেখে গেলাম। আগামীকাল সকালে নাস্তা খাওয়ার পর ওদেরকে নিয়ে যাবেন আমার কাছে। দুপুরে মন্দিরে যাওয়ার আগে কিছুটা সময় ওদের সঙ্গে কাটাতে চাই আমি। এই শহরের কয়েকটা জায়গায় নিয়ে যাবো ওদেরকে,' বলে আর দেরি করল না মায়া, উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল।

আমাদের দিকে তাকাল মাটাই। যথেষ্ট সম্মান করে কুর্নিশ করল। ওর সঙ্গে যাওয়ার অনুরোধ করল।

পিছু নিলাম ওর। ঘর ছেড়ে প্রথমেই বের হলাম চত্বরে। তারপর বেশ কিছু প্যাসেজ পার হতে হলো। হাজির হলাম খুব সুন্দর আরেকটা ঘরে। এই ঘরেও রূপার কয়েকটা লণ্ঠন জ্বলছে। তবে আলো কমিয়ে রাখা হয়েছে। বোঝা গেল ঘরটা রাজকীয় অতিথিকক্ষ—সম্মানিত কোনো মেহমান এলে এখানে থাকতে দেয়া হয়।

আমাদের জন্য বিছানা প্রস্তুত করা হয়েছে। রেশমী চাদর বিছানো হয়েছে। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। তাতে বেশকিছু ফলমূল আর ঠাণ্ডা মদ। কিন্তু এত কাহিল লাগছে যে, এসবের দিকে তাকাতেও ইচ্ছা করছে না।

সম্ভবত আমাদের অবস্থা অনুমান করতে পারছে মাটাই। তাই কথা তেমন একটা বলেনি এতক্ষণ। তবে কৌতূহলী দৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। গুডনাইট জানিয়ে চলে যাওয়ার আগে বলল, 'আগামীকাল পারলে একটু সকাল সকাল উঠবেন। আপনাদেরকে নিতে আসবো আমি।'

সে চলে যাওয়ার পর দরজাটা আটকে দিলাম ভালোমতো, তামার হুড়কো টেনে দিলাম। তারপর বলতে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম বিছানায়।

খুব ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু অদ্ভুত এই জায়গায় ঘুমাতে পারছি না। ঘুম আসছে না আসলে। থেকে থেকে বন্ধ হয়ে আসছে চোখ, কিন্তু দরজার বাইরে কারও পায়ের আওয়াজ পাওয়ামাত্র লাফিয়ে উঠে বসছি বিছানায়। টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সৈন্যরা। আর এ-ব্যাপারটাই আতঙ্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে আমার কাছে।

বার বার মনে হচ্ছে বড় কোনো ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছি। নিজের দেশে ফিরে এল যিব্যালবে, অথচ তেমন কোনো খাতির করা হলো না ওকে। সবার মধ্যে কেমন গা-ছাড়া ভাব। যেন সে চলে গেলেই ভালো হয়। বোধহয় কেউই চাচ্ছে না সে থাকুক নিজের শহরে। পিরামিড বা মন্দির যেখানেই নিয়ে যাওয়া হোক আমাদেরকে আগামীকাল, নিজের কাহিনি বলবে সে সবার সামনে। ঈশ্বরই জানেন তখন কী হবে! চক্রান্ত করে হোক বা যেভাবেই হোক আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে বসেছে টিকাল, এত সহজে দাবি ছেড়ে দেবে বলে মনে হয় না।

কিছু কিছু লোক থাকে নরখাদক বাঘের মতো—ক্ষমতা তাদের কাছে মানুষের রক্তমাংসের মতো। এরা যদি একবার ক্ষমতার স্বাদ পায় তা হলে আর ছাড়তে পারে না। টিকালকে প্রথমবার দেখেই বুঝেছি সে ওই জাতের। তা ছাড়া ওর বন্ধুবান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী আর অনুসারীদের সংখ্যাও নেহাত কম না।

সন্দেহ নেই বাইরে যাদের পায়ের আওয়াজ শুনছি তাদের বেশিরভাগই টিকালের অনুসারী। মাটাই হয়তো কাছাকাছিই কোথাও আছে। কী করা যায় তা নিয়ে জরুরি আলোচনায় বসেছে সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে।

কী লেখা আছে আমাদের ভাগ্যে? সিটি অভ দ্য হার্টের অধিবাসীদের ব্যাপারে শুনেছি, ভিনদেশীদের পছন্দ করে না ওরা।

কাজেই যিব্যালবে বা মায়া যদি না-থাকে তা হলে আমাদের কী অবস্থা হতে পারে অনুমান করতে গিয়েও শিহরিত হয়ে উঠছি বার বার।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুম ভাঙল সিনরের ডাকে। চোখ মেলে দেখি, নিজের বিছানার একপ্রান্তে বসে আছেন তিনি। গুনগুন করে গান গাইছেন! ঘাড় ঘুরিয়ে বার বার এদিকে-সেদিকে তাকাচ্ছেন। ঘরের কোথায় কী আছে না-আছে দেখে নিচ্ছেন সম্ভবত। এককোনায় একটা জানালা আছে, সেখান দিয়ে ভিতরে ঢুকছে দিনের আলো; মনে হচ্ছে রাতে যে-ঘরে শুয়েছিলাম সে-ঘরের বদলে অন্য কোথাও হাজির হয়েছি যেন!

সিনরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'গান গাইছেন কেন?'

'কারণ আমি খুশি,' চটপট জবাব দিলেন তিনি। 'শেষপর্যন্ত স্বর্ণশহরে পৌঁছতে পেরেছি। সাদাচামড়ার মানুষদের মধ্যে আমিই প্রথম পা রাখলাম এখানে। যতটা ভেবেছিলাম তারচেয়েও বেশি সুন্দর এই শহর। তা ছাড়া এসেই দেখি আরেক মেয়েকে বিয়ে করে বসে আছে টিকাল। নাহুয়া মোটেও সহজসরল পাত্রী না। এখন থেকে মায়ার সঙ্গে বুঝেশুনে চলতে হবে টিকালকে, তা না হলে ওকে নাচিয়ে ছেড়ে দেবে নাহুয়া। কাজেই অন্তত মায়ার ব্যাপারে টিকালের পক্ষ থেকে যে-ঝামেলার আশঙ্কা করেছিলাম, তা শেষ। গেল এক আর দুই নম্বর কারণ। এবার শোনো আমার গান গাওয়ার তিন নম্বর কারণটা কী। গতরাতে যা দেখেছি তা যদি উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করি তা হলে নিঃসন্দেহে বলা যায় এই শহরে অনেক সোনাদানা আছে। সব সম্পদ কাজে লাগাতে পারলে একটা কেন, আমার মনে হয় তিনটা ইণ্ডিয়ান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে তুমি। যদি যিব্যালবে আবার সিংহাসনে বসতে পারে, যদি সত্যিই ওর সে-রকম ইচ্ছা থাকে, তুমি যত চাও তত সম্পদ দেবে তোমাকে। কাজেই বন্ধু ইগনাশিয়ো, চেহারাটা ও-রকম গোমড়া করে না-রেখে আমার মনে হয় তোমারও গান গাওয়া উচিত। তোমাকে দেখে কী মনে হচ্ছে

জানো? মনে হচ্ছে তুমি একটা মুমূর্ষু লোক, কফিন আনা হয়েছে তোমার বাড়ির দরজায়, তাকিয়ে তাকিয়ে সে-দৃশ্য দেখছ। আর সে-কারণেই তোমার চেহারার এই অবস্থা।'

মাথা নেড়ে আমি বললাম, 'কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলি। আমার মনে হয় পুরো ব্যাপারটা খুব হালকাভাবে নিয়েছেন আপনি। আমার মন বলছে আজ না-হোক কাল, কোনো না কোনো বিষয়ে বড় রকমের সমস্যা হবেই এ-শহরে। এবং তাতে জড়িয়ে পড়তে হবে আমাদেরকেও। রক্তপাত হবে, এমনকী মারাও যেতে পারে টিকাল বা যিব্যালবের যে-কোনো একজন। আর লেডি মায়ার কথা যদি বলেন, আমি নিশ্চিত, বিয়ে করতে পারুক বা না-পারুক তাঁকে এখনও ভালোবাসে টিকাল। কাজেই যে-কোনো উপায়ে হোক তাঁকে দখল করার চেষ্টা করবেই লোকটা। গতরাতে ওর চোখে সে-দৃষ্টি দেখেছি আমি। এবার শেষ কথাটা বলি। সন্দেহ নেই এ-শহরে অনেক অনেক সম্পদ আছে। কিন্তু লেডি মায়া কী বলেছিল মনে নেই? এই শহরের লোকেরা স্বার্থপর প্রকৃতির, নিজেরা খেয়ে-পরে বাঁচতে পারলেই খুশি। দেশের কী হলো না-হলো তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, খোঁজও রাখে না। কাজেই এদের কাছে গিয়ে যদি মেক্সিকোর দোহাই দিয়ে কিছু সোনাদানা চাই, কী মনে হয় আপনার—অকাতরে দিয়ে দেবে? যে লোক সম্পদের পাহাড় গড়ে সে কিন্তু সঞ্চয়ের স্বার্থেই করে কাজটা। বিলিয়ে দেয়ার জন্য না।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন সিনর, দরজায় করাঘাতের আওয়াজ শুনে থেমে গেলেন। আমার দিকে তাকালেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম আমি। সকালের নাস্তা নিয়ে এসেছে একদল ভৃত্য। প্রথমে আমাকে কুর্নিশ করল ওরা, তারপর একসারিতে ভিতরে ঢুকল। ট্রে-তে করে পানপাত্র নিয়ে এসেছে ওরা। তাতে গরম চকোলেট। একজাতের ছোট ছোট কেকও দেখা যাচ্ছে।

আর কথা না-বলে খেয়ে নিলাম আমরা। এরপর আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো স্নানঘরে। বিশাল ঘরের পুরোটাই বানানো হয়েছে মার্বেল দিয়ে, দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে। একধারে বসানো আছে একটা ফোয়ারা। সেখান থেকে কৃত্রিম উপায়ে ঈষদুষ্ণ পানি পড়ছে বাথটাবের ভিতরে।

একে একে গোসল সেরে নিলাম আমি আর সিনর। ঘরে ফিরে নতুন পোশাকে সজ্জিত করছি নিজেদেরকে, এমন সময় দেখা করতে এল মাটাই। খেয়াল করলাম ওর দু'চোখ লাল হয়ে আছে, ঢুলুঢুলু করছে। তারমানে সারারাত ঘুমায়নি।

'আশা করি রাতে ভালো ঘুম হয়েছে আপনাদের,' যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বলল সে।

'জী, লর্ড,' বিনয় করলাম আমিও।

'নাস্তা খেয়েছেন?' জানে খেয়েছি, তারপরও জিজ্ঞেস করল ধূর্ত লোকটা।

'জী,' সংক্ষেপে জবাব দিলাম আবার। মাটাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে অস্বস্তি লাগছে।

'তা হলে চলুন, আর দেরি না-করে রওনা হয়ে যাই? আমার উপর আদেশ আছে, লেডি মায়ার কক্ষে নিয়ে যেতে হবে আপনাদেরকে। এ-শহরের বিশেষ কিছু নিদর্শন আপনাদেরকে দেখাতে চান তিনি। আপনারা নতুন এসেছেন এখানে, ওগুলো দেখলে হয়তো ভালো লাগবে।'

কিছু বললাম না আমি। সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডও চুপ করে আছেন। ইতস্তত করছে মাটাই, আরও কিছু বলবে সম্ভবত।

শেষপর্যন্ত বলেই ফেলল, 'কিছু মনে করবেন না...আসলে একটা কথা জিজ্ঞেস না-করে পারছি না। আপনারা কোত্থেকে এসেছেন? মানে, কোন্ জাতির অন্তর্গত?' সিনরের দিকে তাকিয়ে কুর্নিশ করল। 'কখনও না-দেখলেও সাদাচামড়ার মানুষদের ব্যাপারে শুনেছি আমরা। কিন্তু যা শুনেছি তা ভালো না। ইতিহাস বলে

আমাদের প্রথম শাসক কুকুমাট্‌য নাকি সাদাচামড়ার লোক ছিলেন। আপনি কি তাঁর বংশধর?'

হেসে ফেললেন সিনর। বললেন, 'জানি না। আমি এসেছি অনেক দূর থেকে। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে। আমার দেশে অনেক ঠাণ্ডা। আর সবাই দেখতে আমার মতো সাদা।'

চুপ করে আছে মাটাই, বোঝা যাচ্ছে যা বলেছেন সিনর তার কিছুই বুঝতে পারেনি সে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'যে-দেশ থেকেই এসে থাকুন না কেন, আশা করি আপনার দেশের মানুষরা ভালো। আপনার নাম জানি না, তাই আমিই একটা নাম দিচ্ছি—সমুদ্রপুত্র। যেহেতু বললেন সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছেন তাই ওই নাম দিলাম। আসার পর থেকে এ-পর্যন্ত যথেষ্ট ভদ্র আচরণ করেছেন, সে-জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। একটা কথা বলি। শুধু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করিনি আমি প্রশ্নটা, বরং আরও কারণ আছে। আমাদের এই দেশে ভিনদেশীরা কখনোই আসে না, কাজেই ওদেরকে ভালো চোখে দেখে না কেউই। সত্য কথা বলতে কী, ভয় পায়। আপনাদের ব্যাপারে যা আমাদের কানে আসে তা ভয় পাওয়ার জন্য যথেষ্টর চেয়েও বেশি।'

আমি বললাম, 'না, এত ভয় পাবেন না। সাদাচামড়ার সব মানুষ খারাপ না। তা ছাড়া আমাদের ব্যাপারে বন্ধু যিব্যালবেরও কিছু বলার আছে। আশা করি তাঁর কথা শুনলে আপনাদের ভয় কেটে যাবে।'

'ভালো। এবার আসুন, দয়া করে অনুসরণ করুন আমাকে,' বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল মাটাই। ওর পিছু নিলাম আমরা দু'জনে।

খেয়াল করলাম, প্রাসাদের আরও ভিতরে প্রবেশ করছি। বড় একটা চত্বর পার হলাম প্রথমে। তারপর গোলকধাঁধার মতো কয়েকটা প্যাসেজ। শেষে হাজির হলাম ছোট একটা ঘরে। ভিতরে প্রাচীন কিছু আসবাব। তাজা ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে

পুরো ঘর। অল্পবয়সী কয়েকটা মেয়ে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছে এককোনায়।

'লেডি মায়াকে গিয়ে বলো তাঁর অতিথিরা এসেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছেন,' মেয়েগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলল মাটাই। এরপর চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল, কিন্তু গেল না। বরং আমাদের দিকে আরেকটু এগিয়ে এসে নিচু গলায় বলল, 'আশা করি দুপুরে পিরামিডে দেখা হবে আবার। হয়তো আমাকে সন্দেহ করছেন আপনারা, তারপরও বলছি আমার উপর ভরসা করতে পারেন। যদি কোনো সমস্যা হয় সেখানে, আপনাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করবো আমি। বিদায়।'

ঘরের একদিকে একটা দরজা, সেখান দিয়ে ইতোমধ্যেই ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে একটা মেয়ে। অন্যরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আমাদেরকে নিয়ে। বসার আসন দেখিয়ে দিচ্ছে কেউ, কেউ আবার হাতপাখা নিয়ে এসে বাতাস করছে। কেউ কাছেই দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে দেখছে আমাদেরকে।

কিছুক্ষণ পর খুলে গেল দরজাটা। যে-ঘরে বসে আছি আমরা সে-ঘরে ঢুকল মায়া। হুডওয়ালা একটা রেশমী আলখাল্লা পরেছে সে। হুড তুলে দিয়েছে, তাই ঢাকা পড়ে গেছে কাঁধ আর মাথা। ঘরের কোমল আলোয় ওকে আরও বেশি সুন্দর, আরও বেশি কমনীয় মনে হচ্ছে।

'গুড মর্নিং,' আমাদের কুর্নিশের জবাবে আমাদেরকে অভিনন্দন জানাল মায়া, 'গতরাতে বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। তাঁকে বলেছি আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে শহরের বিশেষ কিছু জায়গা দেখাতে চাই। অনুমতি দিয়েছেন তিনি। এই মেয়েগুলো আমাদের সঙ্গে যাবে। কয়েকজন প্রহরীও যাবে। তবে পালকি বা ওই জাতীয় কিছু নেবো না ঠিক করেছি। আমার এত আনুষ্ঠানিকতা ভালো লাগে না। তা ছাড়া এসবে করে গেলে সময়ও লাগে বেশি। আমি আপনাদেরকে নিয়ে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে চাই। নির্ধারিত

সময়ের আগেই হাজির হতে চাই মন্দিরে। এত উপর থেকে এই শহরটা দেখতে কেমন লাগে জানতে পারবেন তখন। ...আপনারা প্রস্তুত তো? তা হলে চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

রওয়ানা হলাম আমরা। আমি আর সিনর দু'পাশে, মাঝখানে মায়া। প্রহরীরা আর ওই মেয়েগুলো আসছে পিছন পিছন।

প্রাসাদ ছেড়ে বের হলাম। গতরাতে যে-স্কয়ারে ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল, উপস্থিত হলাম সেখানে। কাল রাতে কী অবস্থা ছিল! অথচ এখন এই সকালবেলায় বলতে গেলে খাঁ খাঁ করছে।

পিরামিড বলতে যা বুঝিয়েছে যিব্যালবে বা মাটাই, সেখানে হাজির হতে বেশি সময় লাগল না। সিনরের কাছে শুনেছি মিশর নামের একটা দেশে এ-রকম পিরামিড আছে। জানি না দুই দেশের পিরামিড একরকম কি না। এটার দেয়াল চুনাপাথরের। আদিবাসীদের শিকার করার ছবি খোদাই করা আছে। কুণ্ডলী আকারে বসে আছে সাপ, সে-ছবিও আছে। নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর হৃদপিণ্ডের প্রতীকচিহ্ন।

পিরামিডে ঢোকার সদর দরজার কাছে কিছুক্ষণের জন্য থামলাম। তাকালাম উপরের দিকে। অতিকায় কোনো ভবনের মতো দাঁড়িয়ে আছে পিরামিডটা। আকারে মনে হয় মিশরীয় পিরামিডের চেয়েও বড় হবে। তবে সিনর পরে বলেছিলেন, এটার সৌন্দর্য নাকি আরও বেশি। কারণ এটা বানানোর সময় চুনাপাথরের সঙ্গে বিশেষ কিছু ব্যবহার করা হয়েছে, যার কারণে সামান্য আলোতেই জ্বলজ্বল করে।

পিরামিডটার পুবদিকে অনেকগুলো ধাপে সিঁড়ি বানানো আছে। ধাপগুলো নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত উঠে গেছে, তারপর প্রশস্ত চাতালের মতো আছে। এরপর আবার শুরু হয়েছে সমানসংখ্যক ধাপ। এভাবে চলে গেছে পাদদেশ থেকে চূড়া পর্যন্ত।

'সুন্দর, তা-ই না?' আমরা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে বলল মায়া। 'এখন আর এ-রকম কোনো পিরামিড বানানো সম্ভব

না। ইতিহাস বলে, পঞ্চাশ বছর ধরে পঁচিশ হাজার শ্রমিককে কাজ করতে হয়েছে এই পিরামিডটা বানানোর জন্য। শুধু পাথর কাটা আর বহন করে আনার জন্যই নিয়োজিত ছিল বিশ হাজার শ্রমিক। বাকি পাঁচ হাজারের কাজ ছিল পাথরের ব্লকগুলো জায়গামতো বসানো।'

'এত বড় বড় পাথরের ব্লক এল কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করলেন সিনর।

'পিরামিড বা মন্দির যা-ই বলুন না কেন, এটার ভিত্তির নীচের মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে বেশ কিছু পাথর। তবে বেশিরভাগ আনা হয়েছে মূল ভূখণ্ড থেকে, বড় বড় নৌকায় করে। যেসব জায়গা থেকে যোগাড় করা হয়েছে পাথরগুলো, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে সেগুলো রয়ে গেছে আজও।'

'পিরামিডের ভিতরটা কি ফাঁপা?' জানতে চাইলাম আমি।

'হ্যাঁ। ভিতরে অনেকগুলো চেম্বার আছে। বেশিরভাগই গুদাম। কোনো কোনোটা আবার রত্নভাণ্ডার। মাটির নীচেও কিছু ঘর বানানো আছে, এগুলোকে সমাধিকক্ষ বলা যায়। আগের দিনের সর্দার, তাদের স্ত্রী-ছেলেমেয়েদেরকে কবর দেয়া হয়েছে ওখানে। উপরে একটা মন্দিরও আছে। এজন্যই আমরা এই পিরামিডকে মন্দিরও বলি। শহরের প্রধান মন্দির এটাই।' আমার দিকে তাকাল মায়া। 'আপনি যেহেতু আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্য সেহেতু আপনাকে ওই মন্দির পরিদর্শনের অনুমতি দেয়া হতে পারে। ...চলুন, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করি।'

সদর-দরজা পার হয়ে পিরামিড-চত্বরে পা রাখলাম আমরা। তারপর হাজির হলাম সিঁড়ির প্রথম ধাপটার কাছে। পিরামিডের পাদদেশ থেকে এ-রকম ছ'টা ধাপ উঠে গেছে উপরের দিকে। প্রতিটা ধাপে পঞ্চাশটা করে সিঁড়ি। একেকটা সিঁড়ি চল্লিশ ফুটের মতো চওড়া। প্রতিটা ধাপ শেষ হওয়ার পর, আগেও বলেছি বোধহয়, বিশ্রাম নেয়ার জন্য অথবা অন্য যে-কোনো উদ্দেশ্যেই

হোক, সুপ্রশস্ত চাতাল।

ধীরেসুস্থে উঠতে শুরু করলাম আমরা। মায়ার চাকরানি আর প্রহরীরা আমাদের পিছন পিছন আসছে। উঠতে উঠতে হাজির হলাম বেশ উঁচুতে। এখান থেকে নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে উঠে।

আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সে-জায়গাটাকে একটা মঞ্চ বা প্ল্যাটফর্ম বলা যায়। নিচু সীমানাপ্রাচীর দেয়া আছে জায়গাটা ঘিরে। কয়েক হাজার লোক অনায়াসে দাঁড়াতে পারবে এখানে। প্ল্যাটফর্মের পশ্চিমদিকে দেখা যাচ্ছে মার্বেল-পাথরে-বানানো ছোট একটা ঘর। মনে হয় জ্বালানি সঞ্চয় করে রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় ঘরটা। কয়েকজন পুরোহিতও থাকে সেখানে সম্ভবত, রাতদিন পাহারা দেয়। ঘরটার ছাদে বসানো আছে ঝুড়ির মতো দেখতে পা-ওয়ালা বহনযোগ্য একটা পিতলের-পাত্র। তাতে জ্বলন্ত কয়লার সাহায্যে সবসময়ের জন্য জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে পবিত্র আগুন "অগ্নি চিরন্তন"। ঘরটার একদিকে একটা বেদি। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে বেদিটা। চারদিকে তাকালাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। পুরোহিতরা কোনো কাজে কোথাও গেছে সম্ভবত।

'দেখুন,' নীচের দিকে ইশারা করছে মায়া।

তাকালাম। সিটি অভ দ্য হার্টের প্রায় পুরোটাই দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। অনেকটা হৃদপিণ্ড আকারের একটা দ্বীপের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই শহর। কেন্দ্রস্থল অনেকখানি ফাঁকা। দেখলে মনে হয় কোনো এক কালে কোনো এক আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ ছিল। অথবা ভূমির দুই দিকের ঢালু অংশ নিছক প্রাকৃতিক খেয়ালে একত্রিত হয়ে একটা লেগুনের মতো তৈরি করেছে। আন্দাজ করলাম, দ্বীপটা দৈর্ঘ্যে দশ মাইল, প্রস্থে ছ'মাইল। এত উপর থেকে দেখলে মনে হয়, বিশাল সেই হ্রদের উপর বড় সবুজ পানপাতার মতো ভাসছে।

হ্রদটা আক্ষরিক অর্থেই বিশাল। এত উপর থেকে দেখছি, তারপরও একটা-দুটো ক্ষুদ্রাকার দ্বীপ ছাড়া এটার বুকে অন্য কিছু

চোখে পড়ছে না। যেদিকে চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। মূল ভূখণ্ডটা আছে আমাদের উত্তরদিকে, গতরাতে যেখান থেকে যাত্রা করে এসেছি এই শহরে। উত্তরে তাকালে ওই ভূখণ্ডের একটুখানি চোখে পড়ে।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় হ্রদটা অসীম ও নিঃসঙ্গ। এর বুক চিরে এগোচ্ছে না কোনো জাহাজ, দেখা যাচ্ছে না একটা নৌকাও। প্রাণের কোনো চিহ্নই নেই এর কোথাও। সোনার বলয়ের উপর একটা পান্না বসিয়ে দিলে যে-রকম দেখায়, হ্রদের বুকে এই দ্বীপটাকে সে-রকম দেখাচ্ছে।

শহরের জায়গায় জায়গায় দেখা যাচ্ছে ফুলের বাগান। সেগুলোতে থোকায় থোকায় ফুটে আছে বাহারি রঙের ফুল। দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে। সারি সারি তাল আর উইলোগাছও দেখা যাচ্ছে। তীরে ঘন হয়ে জন্মে আছে সবুজ নলখাগড়া।

সকালের কোমল রোদে সিটি অভ দ্য হার্টের এই সমাহিত রূপ দেখে আমার মনে হলো, কোনো নিরবচ্ছিন্ন শান্তির দেশে হাজির হয়েছি যেন।

আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করলাম। হ্রদের ঠিক প্রান্তেই শহরের রক্ষাপ্রাচীর শুরু হয়নি। বরং তীরবর্তী মাটিতে প্রথমে নির্মাণ করা হয়েছে সুরক্ষাপ্রাচীর, তারপর গড়খাই, তারপর আরেকটা সুরক্ষাপ্রাচীর। বাইরের ভিতরের চকচকে চুনাপাথরে বানানো দু'দিকের প্রাচীরই প্রায় গোল করে ঘিরে আছে দ্বীপটাকে। হ্রদ থেকে বিশেষ কোনো ব্যবস্থায় পানি আনা হচ্ছে গড়খাইয়ে। ভিতরের প্রাচীরটা উচ্চতায় পঞ্চাশ ফুটের বেশি হবে। পৌরাণিক কাহিনির বিভিন্ন রকমের ভাস্কর্য খোদাই করা আছে দেয়ালটার বিভিন্ন প্রান্তে। কোথাও আবার দেখা যাচ্ছে কোনো দেবতার দানবীয় মূর্তি।

এই দেয়ালের ভিতরে শহরটা। দেখা যাচ্ছে সারি সারি প্রাসাদ, কিছু পিরামিড আর মন্দির। এগুলোর বেশিরভাগই অনেক আগে বানানো, তাই ভগ্নদশা হয়েছে। করুণ অবস্থায় উপনীত হয়েছে

শহরের বেশিরভাগ রাস্তা আর গলি। অযত্নে-অবহেলায় পড়ে থাকতে থাকতে কোনো কোনো বাড়ি ঘেরাও হয়ে গেছে তালগাছের ছোটখাট জঙ্গল দিয়ে। বেশিরভাগ রাস্তাঘাট, এমনকী কোনো কোনো মন্দিরের চাতাল ছেয়ে গেছে সবুজ ঘাস আর ফার্নে। যেসব রাস্তা বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলোর ঘাসের উপর পথিকদের পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

যে বিশাল খোলা জায়গা বা গ্রেটস্কয়ারের কথা উল্লেখ করেছি তা এখনও প্রায় খালি পড়ে আছে। অল্প কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে হেঁটে বেড়াচ্ছে এখানে-সেখানে। নলখাগড়া দিয়ে বানানো ঝুড়ি কোলে নিয়ে অলস পায়ে এ-দোকানে সে-দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকজন যুবতী। হ্রদ থেকে ধরা মাছ বণ্টন করা হয় শহরের সাধারণ জনগণের মাঝে, পরিবারের জন্য হয়তো সে-সবই যোগাড় করছে ওরা। কাউকে দেখলাম গিয়ে ঢুকছে শুকনো ফল বা কোকোর দোকানে। একদল মালি যাচ্ছে বাগানের দিকে, কিন্তু পথে বার বার থামছে। কখনও ধূমপান করছে, কখনও পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলে কুশল বিনিময় করছে। দেখে মনে হচ্ছে কারও কাছেই সময়ের কোনো দাম নেই। প্রাসাদ, সৈন্যদের ব্যারাক বা গুদামের ছায়ায় গুটিকয়েক শিশু খেলা করছে। খেলার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে বাসি ফুল। শহরের বাকিটা বলতে গেলে জনশূন্য। মনে হয় বেশিরভাগ লোক ঘুম থেকেই ওঠেনি এখনও।

ষোলো

পিরামিডের চূড়ায়

'মনে হচ্ছে পানির ঠিক উপরেই ভাসছে এ-শহর,' চারদিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলাম আমি।

চোখে পড়ছে না। যেদিকে চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। মূল ভূখণ্ডটা আছে আমাদের উত্তরদিকে, গতরাতে যেখান থেকে যাত্রা করে এসেছি এই শহরে। উত্তরে তাকালে ওই ভূখণ্ডের একটুখানি চোখে পড়ে।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় হ্রদটা অসীম ও নিঃসঙ্গ। এর বুক চিরে এগোচ্ছে না কোনো জাহাজ, দেখা যাচ্ছে না একটা নৌকাও। প্রাণের কোনো চিহ্নই নেই এর কোথাও। সোনার বলয়ের উপর একটা পান্না বসিয়ে দিলে যে-রকম দেখায়, হ্রদের বুকে এই দ্বীপটাকে সে-রকম দেখাচ্ছে।

শহরের জায়গায় জায়গায় দেখা যাচ্ছে ফুলের বাগান। সেগুলোতে থোকায় থোকায় ফুটে আছে বাহারি রঙের ফুল। দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে। সারি সারি তাল আর উইলোগাছও দেখা যাচ্ছে। তীরে ঘন হয়ে জন্মে আছে সবুজ নলখাগড়া।

সকালের কোমল রোদে সিটি অভ দ্য হার্টের এই সমাহিত রূপ দেখে আমার মনে হলো, কোনো নিরবচ্ছিন্ন শান্তির দেশে হাজির হয়েছি যেন।

আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করলাম। হ্রদের ঠিক প্রান্তেই শহরের রক্ষাপ্রাচীর শুরু হয়নি। বরং তীরবর্তী মাটিতে প্রথমে নির্মাণ করা হয়েছে সুরক্ষাপ্রাচীর, তারপর গড়খাই, তারপর আরেকটা সুরক্ষাপ্রাচীর। বাইরের ভিতরের চকচকে চুনাপাথরে বানানো দু'দিকের প্রাচীরই প্রায় গোল করে ঘিরে আছে দ্বীপটাকে। হ্রদ থেকে বিশেষ কোনো ব্যবস্থায় পানি আনা হচ্ছে গড়খাইয়ে। ভিতরের প্রাচীরটা উচ্চতায় পঞ্চাশ ফুটের বেশি হবে। পৌরাণিক কাহিনির বিভিন্ন রকমের ভাস্কর্য খোদাই করা আছে দেয়ালটার বিভিন্ন প্রান্তে। কোথাও আবার দেখা যাচ্ছে কোনো দেবতার দানবীয় মূর্তি।

এই দেয়ালের ভিতরে শহরটা। দেখা যাচ্ছে সারি সারি প্রাসাদ, কিছু পিরামিড আর মন্দির। এগুলোর বেশিরভাগই অনেক আগে বানানো, তাই ভগ্নদশা হয়েছে। করুণ অবস্থায় উপনীত হয়েছে

শহরের বেশিরভাগ রাস্তা আর গলি। অযত্নে-অবহেলায় পড়ে থাকতে থাকতে কোনো কোনো বাড়ি ঘেরাও হয়ে গেছে তালগাছের ছোটখাট জঙ্গল দিয়ে। বেশিরভাগ রাস্তাঘাট, এমনকী কোনো কোনো মন্দিরের চাতাল ছেয়ে গেছে সবুজ ঘাস আর ফার্নে। যেসব রাস্তা বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলোর ঘাসের উপর পথিকদের পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

যে বিশাল খোলা জায়গা বা গ্রেটস্কয়ারের কথা উল্লেখ করেছি তা এখনও প্রায় খালি পড়ে আছে। অল্প কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে হেঁটে বেড়াচ্ছে এখানে-সেখানে। নলখাগড়া দিয়ে বানানো ঝুড়ি কোলে নিয়ে অলস পায়ে এ-দোকানে সে-দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকজন যুবতী। হ্রদ থেকে ধরা মাছ বণ্টন করা হয় শহরের সাধারণ জনগণের মাঝে, পরিবারের জন্য হয়তো সে-সবই যোগাড় করছে ওরা। কাউকে দেখলাম গিয়ে ঢুকছে শুকনো ফল বা কোকোর দোকানে। একদল মালি যাচ্ছে বাগানের দিকে, কিন্তু পথে বার বার থামছে। কখনও ধূমপান করছে, কখনও পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলে কুশল বিনিময় করছে। দেখে মনে হচ্ছে কারও কাছেই সময়ের কোনো দাম নেই। প্রাসাদ, সৈন্যদের ব্যারাক বা গুদামের ছায়ায় গুটিকয়েক শিশু খেলা করছে। খেলার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে বাসি ফুল। শহরের বাকিটা বলতে গেলে জনশূন্য। মনে হয় বেশিরভাগ লোক ঘুম থেকেই ওঠেনি এখনও।

ষোলো

পিরামিডের চূড়ায়

'মনে হচ্ছে পানির ঠিক উপরেই ভাসছে এ-শহর,' চারদিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলাম আমি।

'আমারও তা-ই মনে হয়,' বলল মায়া। 'আগামী দু'-তিন মাসে দেখবেন হ্রদের পানির উচ্চতা কয়েক ফুট বেড়ে যাবে। পানি চলে আসবে দেয়ালের কাছাকাছি। স্লুইসগেট খোলা থাকলে শহরের কিছু অংশ তলিয়েও যেতে পারে।'

'তারমানে বন্যা হতে পারে?' জিজ্ঞেস করলেন সিনর। 'শহরের ভিতরে পানি ঢুকে পড়লে বাড়তেই থাকবে এবং তখন একজনও বাঁচতে পারবে না।'

'হ্যাঁ। কিন্তু হ্রদের পানি কখনোই একটা নির্দিষ্ট উচ্চতার বেশি বাড়ে না। আর বাড়লেও শহর যাতে ভাসিয়ে নিয়ে না-যায় সে-জন্য স্লুইসগেট আছে। বন্যার সময় যদি ওই গেট খুলে দেয়া হয় তা হলে আমরা সবাই মরবো। কিন্তু ওই মাসগুলোতে সবসময়ের জন্য বন্ধ করে রাখা হয় গেটটা। তখন কেউ যদি শহরে ঢুকতে বা বের হতে চায় তা হলে মই ব্যবহার করতে হয়। গড়খাইয়ের পানিতে তখন বসানো হয় অস্থায়ী ল্যাণ্ডিংস্টেজ বা জেটি। দিনরাত পাহারার ব্যবস্থা করা হয় গেটে। তা ছাড়া গেটটা খোলার বিশেষ একটা কায়দা আছে; সেটা জানে হাতেগোনা কয়েকজন।'

'আজব এক জায়গায় শহর বানিয়েছ তোমরা,' হালকা গলায় বলল সিনর। 'এ-রকম কোনো জায়গায় বন্যার সময়ে নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে কি না সন্দেহ। সারারাত ভয় হতে থাকবে এই বুঝি গেট ভেঙে গেল পানির চাপে, হুড়মুড় করে পানি ঢুকে পড়ল শহরে...'

'তারপরও হাজার বছর ধরে লোকজন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে এখানে,' মৃদু হেসে বলল মায়া। 'ইতিহাস কী বলে জানেন? আমাদের পূর্বপুরুষেরা ইচ্ছা করেই এখানে এসেছিল, বসত গড়েছিল। তখন চরম দুর্দশা চলছে দেশে, হানাহানি-কাটাকাটি লেগেই আছে। উপকূলবর্তী এলাকা থেকে এখানে এল ওরা, সবকিছু দেখেশুনে আস্তে আস্তে গড়ে তুলল এই শহর। ইচ্ছা করেই বানাল ওই স্লুইসগেট, যাতে বন্যার সময়ে পানির অবাধ প্রবেশে বাধা দেয়া

যায়, আবার যদি কখনও শত্রু আক্রমণ করে, যদি নিশ্চিত পরাজয়ের মুখোমুখি হয় তখন গেট খুলে দিয়ে হ্রদের পানিতে ভাসিয়ে দেয়া যায় সব। এই পিরামিডের নীচটাও ফাঁপা রাখা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবেই। তাতে সঞ্চিত আছে শহরের বেশিরভাগ সোনাদানা। গেট দিয়ে পানি ঢুকে পড়লে ওগুলো চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে লোকচক্ষুর আড়ালে। আমরাও মরবো, আমাদের সঙ্গে আমাদের সব সম্পদও উধাও হয়ে যাবে। শত্রুরা হাজার খুঁজলেও পাবে না কিছুই।'

কিছু বললেন না সিনর। চুপ করে আছি আমিও।

'এখানে আর কিছু দেখার আছে বলে মনে হয় না,' বলে চলল মায়া, 'চলুন অন্য কোথাও নিয়ে যাই আপনাদেরকে। কয়েকটা কারখানা দেখাবো।'

'কীসের কারখানা?' জানতে চাইলাম আমি।

'হ্রদ থেকে ধরা মাছ শুকানোর কারখানা। তারপর লিনিনের আলখাল্লা তৈরির কারখানা। আমাদের কাজে লাগছে এ-রকম আরও টুকটাক কিছুও দেখানোর ইচ্ছা আছে,' ঘুরল মায়া, সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওর চাকরানি আর সৈন্যরা যাচ্ছে ওর পিছন পিছন। ঘুরলাম আমরাও।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেছি, এমন সময় অচেনা দুই লোককে সঙ্গে নিয়ে উদয় হলো টিকাল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে, হাঁপাচ্ছে কিছুটা। মায়াকে দেখে এগিয়ে গেল ওর সামনে, বাউ করল। বলল, 'শুনলাম দুই ভিনদেশীর সঙ্গে এখানে আছেন আপনি। জরুরি কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে, তাই চলে এলাম। কয়েকটা মিনিট একা কথা বলতে চাই।'

'সম্ভব না,' নিরুৎসুক গলায় সাফ জানিয়ে দিল মায়া। 'কারণ আমার কথায় রঙ মাখিয়ে পরে কী বানানো হবে তা কে জানে! তোমার যদি কিছু বলার থাকে তা হলে এখানেই আমাদের সবার সামনে বলো।'

মাথা নাড়ল টিকাল। 'অসম্ভব। কারণ আমি আপনাকে যা বলতে চাই তা গোপন, সবার সামনে বলার মতো না। বুঝতে পারছি আমার কথা শুনতে চাচ্ছেন না আপনি। তারপরও বলছি আপনার বাবা এবং আপনার ভালোর জন্য কথাগুলো শোনা উচিত আপনার।'

'একজন সাক্ষী ছাড়া আমি তোমার সঙ্গে কোনো কথা বলবো না, টিকাল।'

'তা হলে বিদায় বলা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমার,' চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল টিকাল।

'দাঁড়াও,' পিছু ডাকল মায়া। 'তুমি যদি আমাদের সবার সামনে কথা বলতে দ্বিধা বোধ করো তা হলে,' আমার দিকে ইঙ্গিত করল সে, 'শুধু এই ভদ্রলোকের উপস্থিতিতে কথা হতে পারে তোমার সঙ্গে।'

ঘুরল টিকাল। এমনভাবে তাকাল আমার দিকে যেন মানুষ না, তেলাপোকা দেখছে। 'কে এই লোক?'

'তিনি আমাদের খুব কাছের মানুষ,' আন্তরিক কণ্ঠেই বলল মায়া। 'বলা যায় আমাদের আপন রক্ত। তিনি আমাদের ভাষা বোঝেন এবং বিচক্ষণ। তারচেয়েও বড় কথা, আমাদের ভ্রাতৃসংঘের সদস্য।'

'ভ্রাতৃসংঘের সদস্য? একজন আগন্তুক কীভাবে আমাদের ভাই হতে পারে?' আমার দিকে তাকাল টিকাল। 'প্রমাণ দিতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকালাম আমি।

আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল টিকাল। আমাদের পিছু পিছু এল মায়াও। আমার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কিছু শব্দ উচ্চারণ করল টিকাল, সেগুলোর যথাযথ জবাব দিলাম। নির্দিষ্ট কিছু সংকেত দেখাল সে হাতের ইশারায়, প্রত্যুত্তরে আমিও কিছু সংকেত দেখালাম ওকে।

'সন্তুষ্ট?' জানতে চাইল মায়া।

'হ্যাঁ,' দেখে মনে হচ্ছে কিছুটা চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছে টিকাল।

'সন্তুষ্ট না-হয়ে উপায় নেই। তারপরও একজন আগন্তুকের সামনে এত কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। চলুন, আরেকটু সরে যাই,' প্ল্যাটফর্মের এককোনায় গিয়ে দাঁড়াল সে।

আমি আর মায়াও গিয়ে দাঁড়ালাম সেখানে।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে মুখ খুলল টিকাল, 'আসলে...আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কের হিসাবটা জটিল একটা পর্যায়ে চলে গেছে। শহরের লোকে অনেক আগে থেকেই জানে আমার সঙ্গে বিয়ে হবে আপনার। আপনারা, মানে আপনার বাবা আর আপনি, বাইরে যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিলেন ফিরে এসেই সম্পন্ন করবেন শুভকাজটা...'

'আমাদের বিয়ের ব্যাপারে কথা বললে কোনো লাভ হবে এখন?' তিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মায়া।

'হয়তো হবে। জানি হাজারবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও কম হয়ে যায়, তারপরও আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। মায়া, আপনি জানেন আপনাকে কত ভালোবাসি আমি। এ-জীবনে আপনার চেয়ে বেশি ভালো আর কাউকে বাসিনি।'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল মায়া। 'নাহুয়া নামের এক সুন্দরী মেয়ের স্বামীর মুখে এ-সব কথা শোভা পায় না।'

চেহারা কালো হয়ে গেল টিকালের। 'সম্ভবত। নাহুয়াকে বিয়ে করেছি, কিন্তু ওকে একফোঁটাও ভালোবাসি না। যদিও সে আমাকে ভালোবাসে। আমি শুধু আপনাকে ভালোবাসি। গতরাতে আপনাকে দেখামাত্র...আমার কী যে হলো বুঝিয়ে বলতে পারবো না। তারপর থেকে আর সহ্যই করতে পারছি না নাহুয়াকে—সে যত সুন্দরীই হোক না কেন।'

'সহ্য করতে না-পারলে, একফোঁটাও ভালো না-বাসলে মেয়েটাকে বিয়ে করলে কেন?'

'কারণ কোনো উপায় ছিল না। তা ছাড়া আমি ধরেই নিয়েছিলাম আপনি মারা গেছেন, আপনার বাবাও বেঁচে নেই। আর

শুধু আমিই না, শহরের প্রত্যেকটা লোক একই কথা জানত। এখন আপনিই বলুন, সারা শহর জানে আপনারা মারা গেছেন, ষড়যন্ত্রকারীরা জানে সিংহাসন খালি পড়ে আছে—যে-কোনো সময় একটা অভ্যুত্থান হতে পারত, ঠিক না? সেটা হতে দেয়া কি ঠিক হতো? কাজেই মাটাইয়ের সঙ্গে হাত মেলাতে হলো আমাকে। সে এই শহরের খুবই গণ্যমান্য একজন লোক। মাথায় বুদ্ধিও আছে অনেক। আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, কোনো সমস্যা হবে না। সব সামলাবে সে। তবে বিনিময়ে মূল্য দিতে হবে ওকে। জিজ্ঞেস করলাম কী চায়। বলল ওর মেয়ে নাহুয়াকে বিয়ে করতে হবে। চিন্তাভাবনা করে রাজি হয়ে গেলাম। নাহুয়াকে বিয়ে করতে পারলে আমি সিংহাসনে বসতে পারবো, আবার মাটাইয়ের মতো এত প্রভাবশালী এক লোক আমার দলে থাকবে সবসময়। এ-কারণে নাহুয়াকেই আমার কাছে উপযুক্ত মনে হয়েছিল।'

'খুব ভালো কথা। এখন তো বিয়ে হয়েই গেছে। সব চুকেবুকে গেছে। একটু আগে বললে হাজারবার আমার কাছে ক্ষমা চাইলেও নাকি কম হয়ে যাবে। না...কম হবে কেন? তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। কারণ যা হয়েছে ভালো হয়েছে—এমনিতেও তোমাকে বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল না আমার। তা ছাড়া নাহুয়ার ব্যাপারটা নিয়ে হিংসায় জ্বলার মতো মেয়ে আমি না। তবে অস্বীকার করবো না কিছুটা হলেও খারাপ লেগেছে, তবে তা অন্য কারণে। আশা করি আস্তে আস্তে এই খারাপ লাগাটাও কেটে যাবে।'

'কোনোকিছুই চুকেবুকে যায়নি,' টিকালের কণ্ঠে একগুঁয়েমি, 'এবং সে-জন্যই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমি চাই আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন—বিয়ে করুন আমাকে।'

'কী! তুমি নিজে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বসে আছো, আর আমাকে বলছ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে? কী চাও তুমি খোলাসা করে বলো তো? আমাকে নাহুয়ার সতীন বানাতে চাও?'

'না। আমি চাই নাহুয়া যখন থাকবে না তখন আপনি আবার

লেডি অভ দ্য হার্টের মর্যাদা পান।'

'থাকবে না মানে? যাকে লেডি অভ দ্য হার্ট উপাধি দেয়া হয় তার স্বামী তাকে তালাক দিতে পারে না, জানো না?'

ক্রূর হাসি হাসল টিকাল, দেখে গা শিউরে উঠল আমার। বলল, 'ভালোবাসা আর যুদ্ধের কোনো আইন নেই, মায়া। আপনি রাজি থাকলে কোনো-না-কোনো উপায় বের করে ফেলবোই।'

'না, আমি রাজি না। কারণ তোমার উপায় বের করে ফেলার মানে হচ্ছে নাহুয়াকে খুন করে লাশ গুম করে ফেলা। মরে গেলেও এতে রাজি হবো না আমি। তা ছাড়া যারা বলে ভালোবাসা আর যুদ্ধের কোনো আইন নেই তাদেরকে ঘৃণা করি আমি। জোর করে সবকিছু দখল করা যায় না, আর দখল করলেও আয়ত্তে রাখা যায় না। মানুষের মন সিংহাসন না যে, উত্তরাধিকার সূত্রের দোহাই দিয়ে ষড়যন্ত্র করে তা কব্জা করে নেয়া যাবে। কথাটা মনে রেখো। যাও, তোমার স্ত্রীর কাছে ফিরে যাও। হয়তো তোমার জন্য অপেক্ষা করছে সে। আর প্রার্থনা কোরো আজ যা বললে আমার কাছে তা যেন কোনোদিন ওর কানে না-যায়। তা হলে...'

'এই কি আপনার শেষ কথা?' ক্ষিপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল টিকাল।

'আবারও কেন জিজ্ঞেস করছ? তুমি কি দুধের বাচ্চা? বুঝিয়ে না-দিলে কোনোকিছুই কি বোঝো না?'

এবার অপমানে লাল হয়ে গেল টিকালের চেহারা। 'কেন বার বার জিজ্ঞেস করছি খুলেই বলি তা হলে। আপনার সিদ্ধান্তের উপর অনেককিছু নির্ভর করছে। আজ দুপুরে শহরের অনেক লোক আপনার বাবার ভাষণ শোনার জন্য হাজির হবে এখানে। ওরা তখন সিদ্ধান্ত নেবে সিটি অভ দ্য হার্ট শাসন করবে কে—আমি না আপনার বাবা। তাকিয়ে দেখুন, দু'-চারজন ইতোমধ্যেই জড়ো হয়েছে গ্রেটস্কোয়ারে। যদি প্রতিজ্ঞা করেন আমাকে বিয়ে করবেন, আমিও প্রতিজ্ঞা করবো ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াবো। আপনার বাবাই হবেন

শহরের সর্দার, জীবনের বাকি দিনগুলো সর্দার হিসেবেই কাটাবেন তিনি। আর যদি কথা না-দেন আমাকে,' ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে টিকালের চেহারা, 'আমিও জানি ক্ষমতা কীভাবে খামচে ধরে রাখতে হয়। তখন আপনার বাবার, আপনার এবং আপনার এই দুই ভিনদেশী বন্ধুর অবস্থা কিন্তু খারাপ হবে, আগেই বলে রাখছি।'

'দেখো টিকাল, শুধু শুধু হুমকি দিচ্ছ। আমাকে ভালোমতোই চেনো তুমি। তোমার ধমক শুনে কেঁদে ফেলার মতো মেয়ে আমি না। বাবা তোমাকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছে, সেই সুযোগ তাঁর বিরুদ্ধেই কাজে লাগিয়েছ তুমি। ষড়যন্ত্র করেছ একটা বুড়ো লোকের বিরুদ্ধে, তাঁর জীবদ্দশাতেই সিংহাসন কেড়ে নিয়েছ তাঁর কাছ থেকে। তোমার আর যা যা ইচ্ছা হয় করতে থাকো। সময় এলে উপযুক্ত প্রতিদান পাবে ভাগ্যের পক্ষ থেকে। নিজের ব্যাপারে আগেও বলেছি আবারও বলছি, তোমাকে কোনোদিনও বিয়ে করবো না।'

'দেখা যাবে,' বলে মায়াকে বাউ করল টিকাল, তারপর ঘুরে চলে গেল দুই সঙ্গীকে নিয়ে।

'আজ থেকে টিকাল আপনার সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রুতে পরিণত হলো,' মন্তব্য করলাম আমি।

'ওকে ভয় পাই না আমি, ইগনাশিয়ো।'

'সাহসী হওয়া ভালো। কিন্তু তার সঙ্গে সাবধানতারও দরকার আছে বলে মনে করি আমি। আমার কী মনে হয় জানেন? আপনি বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হবেন না তা আগে থেকেই জানত টিকাল। তারপরও আপনার কাছ থেকে শুনে নিশ্চিত হয়ে গেছে। সে কী করবে না-করবে তা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে। আপনার সঙ্গে কথা বলে গেল, এবার কাজ শুরু করবে। এবার একের পর এক বিপদ হবে আমাদের। ...আগামীকাল সকাল পর্যন্তও যদি বেঁচে থাকি, ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেবো আমি।'

কথা বাড়ালাম না আর, দু'জনে হেঁটে হাজির হলাম অন্যদের

কাছে।

সিনরকে জিজ্ঞেস করল মায়া, 'অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বুঝি?' মায়াবী দৃষ্টিতে তাকাল সিনরের দিকে। 'শয়তান টিকালের সঙ্গে না-থেকে এতক্ষণ আপনার সঙ্গে থাকতে পারলেই ভালো লাগত আমার।' হাত বাড়িয়ে দিল। 'চলুন, পাশাপাশি হেঁটে নামি সিঁড়ি বেয়ে। ক্লান্ত লাগছে। ...আপনি হয়তো কোনোদিন জানতেও পারবেন না আপনার জন্য কত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছি আমি।'

'কীসের ত্যাগ?' মায়ার বাড়ানো হাতটা ধরতে ধরতে জিজ্ঞেস করলেন সিনর।

'যথাসময়ে জানতে পারবেন,' মায়ার কণ্ঠে হেঁয়ালি। 'আফসোস! এই শহরে যদি কখনও না-আসতাম আমরা তা হলে কত ভালোই না হতো!'

দু'ঘণ্টা পর।

যিব্যালবের পিছন পিছন হেঁটে আমরা এসে উপস্থিত হয়েছি পিরামিডের চূড়ায়, যেখানে টিকালের সঙ্গে কথোপকথন হয়েছিল মায়ার। জায়গাটা এখন আর সকালের মতো খালি না, বরং কয়েক হাজার লোক জড়ো হয়েছে। বেশিরভাগই শহরের পূর্ণবয়স্ক পুরুষ। বেদিটার একপাশে বসে আছে টিকাল, ওর স্ত্রী নাহুয়া এবং শহরের কয়েক শ' গণ্যমান্য ব্যক্তি। খেয়াল করলাম, এরা সবাই সশস্ত্র এবং একদল বলিষ্ঠ সৈন্য পাহারা দিচ্ছে এদেরকে। বেদির আরেকপাশ খালি। যে-ক'জন সমর্থক যোগাড় করতে পেরেছে যিব্যালবে, তাদেরকে নিয়ে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। আমরাও যাচ্ছি ওদের সঙ্গে। যিব্যালবেকে দেখামাত্র উঠে দাঁড়াল টিকাল আর ওর সঙ্গীরা, মস্তকাবরণ সরিয়ে দিয়ে বাউ করল যিব্যালবের উদ্দেশ্যে।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর বেদির পিছনের ওয়াচ-হাউস থেকে বেরিয়ে এল দু'জন যাজক, নাম-না-জানা কোনো দেবতার

উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করল বেদিতে টাটকা ফুল দিয়ে। দু'জনের মধ্যে যার বয়স বেশি সে সাদা লিনিনের আলখাল্লা পরে আছে। ওই দেবতার উদ্দেশ্যে বিড়বিড় করে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করল লোকটা।

এরপর উঠে দাঁড়াল যিব্যালবে। খেয়াল করলাম ওর চেহারায় আগের সেই ধার নেই, বরং কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে কোনো কারণে যথেষ্ট বিচলিত সে। ওর হাত কাঁপছে। তবে দু'চোখ আগের মতোই জ্বলছে।

সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করল সে, 'সিটি অভ দ্য হার্টের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ জনতা, ঠিক এক বছর আগে এই দিনে আমি, তোমাদের সর্দার এবং মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, বিশেষ একটা কাজে শহর ছেড়ে বাইরে গিয়েছিলাম। কাজটা কী বলার আগে সংক্ষেপে জানিয়ে রাখি, আমাদের এই মন্দিরের কোনো এক গোপন প্রকোষ্ঠে এককালে বেশ বড় আকারের একটা পান্না ছিল। রত্নপাথরটা দেখতে মানুষের হৃদপিণ্ডের মতো, দু'ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের নাম "দিবা"। অনেক বছর আগে হারিয়ে যায় সেটা। ওই হারানো পান্নাটা খুঁজতেই বের হয়েছিলাম আমি। এখন কথা হচ্ছে, কেন করতে গেলাম কাজটা।

'তোমরা জানো অতীতকাল থেকেই অনেক ঝড়ঝাপ্টা সহ্য করতে হয়েছে আমাদেরকে, সংখ্যায় দিন দিন আমরা কেবল কমছিই। এভাবে চলতে থাকলে একদিন-না-একদিন চিরতরে হারিয়ে যাবো সবাই। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বিচলিত হয়ে উঠি আমি। কী করা যায় ভাবতে থাকি। অনেক আগে আমাদের বাপ-দাদারা একটা কথা প্রায়ই বলত: হৃদপিণ্ড আকারের ওই পান্নাটার দুটো খণ্ড, অর্থাৎ "দিবা" আর "নিশিকে" এই মন্দিরে একসঙ্গে করতে পারলে আমাদের সমৃদ্ধি ফিরে আসবে। সবরকমের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবো আমরা। কথাটা মনে পড়ে যায় আমার। প্রার্থনা শুরু করি। ঘোরের মধ্যে শুনতে পাই একটা কণ্ঠ আমাকে নাম ধরে ডেকে বলছে এই শহর ছেড়ে বের হতে, "দিবাকে" খুঁজে নিয়ে

আসতে।

'তখন মন্ত্রণাসভার সদস্যদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে মিলিত হই আমি। তাদের পরামর্শ ও অনুমোদন নিই। তারপর আমার মেয়ে মায়াকে সঙ্গে নিয়ে বের হই। অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আমাদেরকে, অনেক বিপদের মোকাবেলা করতে হয়েছে। শেষপর্যন্ত খুঁজে পেয়েছি "দিবাকে"। দেখো তোমরা সবাই, যাকে ভিনদেশী বলে অবজ্ঞা করা হচ্ছে, ইগনাশিয়ো নামের সেই লোকটার গলায় একটা কবচের ভিতরে আছে পান্নার টুকরোটা। মাঠঘাট, পথপ্রান্তর, জঙ্গল-মরুভূমি—সব জায়গায় ছায়ার মতো আমার সঙ্গে থেকে তিনি এসেছেন এখানে।'

দম নেয়ার জন্য থামল যিব্যালবে। গুঞ্জন উঠল সমবেত জনতার মধ্যে। এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে দেখি বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে অনেকে।

'এই "দিবা" খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে উপযুক্ত সময়ে বিস্তারিতভাবে বলবো আমি,' বলে চলল যিব্যালবে, 'বিশেষ করে শহরের মন্ত্রণাসভার কাছে, কারণ এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার অধিকার আছে তাদের। তবে আজ না। তোমরা জানো বছরের বিশেষ একটা সময়ে এই মন্দিরে আলোচনায় মিলিত হতেই হয় মন্ত্রণাসভার সদস্যদের—হ্রদের পানি যখন বাড়তে শুরু করে। আমি ঠিক করেছি তখন সবকিছু পরিষ্কার জানিয়ে দেবো ওদেরকে। এখন অন্য একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই।

'শহর ছেড়ে বাইরে যাওয়ার সময় আমার ভাতিজা টিকালকে সিংহাসনের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলাম। মন্ত্রণাসভার সদস্যদের সামনে আমাদের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল, আমি যদি দু'বছরের মধ্যে ফিরে না-আসি তা হলে সর্দার হবে সে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, মাত্র এক বছরের মধ্যেই ফিরে এসে দেখি, নিজেকে সর্দার ঘোষণা করে সিংহাসন দখল করে ফেলেছে টিকাল। আমার মেয়ের বদলে বিয়ে করেছে আরেকজনকে। গতকাল আত্মপ্রকাশ করি আমি,

তারপর থেকে গ্রেপ্তার আর নির্যাতনের ভয় দেখানো হচ্ছে আমাকে। এখন তোমরাই বলো, কোন্ অপরাধে গ্রেপ্তার করা হবে আমাকে? আমি কি কারও সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি? আমি কি কাউকে কথা দিয়ে তা ভঙ্গ করেছি?'

থামল যিব্যালবে। ওর অনুচরেরা গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'না...না...'

কিন্তু টিকালের পাশে বসে-থাকা "গণ্যমান্য" ব্যক্তিদের কেউই একটা কথা বলল না। ওরা আড়চোখে বার বার তাকাচ্ছে টিকালের দিকে। সমবেত জনতাও নিশ্চুপ। কার পক্ষ নিলে ওদের লাভ হবে যাচাই-বাছাই করছে সম্ভবত।

এমন সময় টিকালের পিছন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মাটাই বলল, 'মহামান্য টিকালকে যারা সর্দার বানিয়েছে আমি তাদের মধ্যে একজন। আমরা ধরে নিয়েছিলাম আপনি এবং লেডি মায়া মারা গেছেন, সুতরাং দেশের কথা ভেবে করতে হয়েছে কাজটা। লর্ড যিব্যালবে, যদি কিছু মনে না-করেন, সবার সামনে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে। আপনি জানেন আমাদের এই শহরে একটা আইন আছে—কেউ যদি কোনো ভিনদেশীকে নিয়ে এখানে আসে তা হলে যাকে আনা হলো এবং যে আনল দু'জনকেই মরতে হবে। আইনটা জানা থাকা সত্ত্বেও কেন আপনি ইগনাশিয়ো আর সমুদ্রপুত্র নামের দুই ভিনদেশীকে নিয়ে এলেন?'

যিব্যালবে বুঝতে পারল, চতুর মাটাই ওকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। ভয় পেল না সে, বরং সরাসরি বলল, 'তুমি আমাকে প্রশ্ন করছ, মাটাই? আমাকে প্রশ্ন করার মতো যোগ্যতা কি তোমার আছে? এইমাত্র বললে যারা টিকালকে সর্দার বানিয়েছে তুমি তাদের মধ্যে একজন। তারমানে তুমি ষড়যন্ত্রকারীদের একজন। একজন ষড়যন্ত্রকারী হয়ে কোন্ অধিকারে জেরা করছ আমাকে? বললে, তোমরা নাকি ধরে নিয়েছিলে আমি আর মায়া মারা গেছি। কেন ধরে নিলে? কারণ তুমি গণনা করে বলেছ। এত বছর ধরে কী গণনা

করতে শিখেছ? একজন মানুষ বেঁচে আছে না মরে গেছে তা-ও তো দেখি ঠিকমতো বলতে পারো না। তারমানে তুমি একজন মিথ্যাবাদী। একজন মিথ্যাবাদী হয়ে কোন্ অধিকারে আমাকে জেরা করছ? তারপরও যখন জিজ্ঞেস করেছ, বলছি। প্রথম কথা, যে-আইনের কথা বললে আমাকে তা আমার মনে ছিল না। বয়স হলে এ-রকম হয় মানুষের—গুরুত্বপূর্ণ অনেক কথা ভুলে যায়, পরে যখন মনে পড়ে তখন আর কিছু করার থাকে না। আর যাদেরকে ভিনদেশী বলছ তাঁদের সম্বন্ধে আসলে কিছু জানোই না তোমরা। লর্ড ইগনাশিয়ো সাধারণ কোনো লোক না, তিনি রাজবংশের সন্তান। "দিবার" কথা বললাম একটু আগে, তা তাঁর কাছেই আছে এবং রত্নপাথরটা উত্তরাধিকারসূত্রেই বহন করছেন তিনি, কারও কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে না। আর সমুদ্রপুত্র, মানে সাদাচামড়ার যে-লোকটার কথা বলছ তিনি লর্ড ইগনাশিয়োর ভাইয়ের মতো। তোমরা যারা টিকালকে ঘিরে বসে আছো, তোমরা যারা নিজেদেরকে শহরের গণ্যমান্য লোক বলে দাবি করো, ইগনাশিয়ো কিন্তু তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম না, যদিও তাঁর পোশাক বা ব্যবহারে সে-রকম কিছু প্রকাশ পায় না। যা-হোক, যে-দেশে কোনোদিন যাওনি তোমরা সে-দেশে গিয়ে ভীষণ মুশকিলে পড়ি আমি, তখন লোক পাঠাই ইগনাশিয়োর কাছে। ওই লোক তাঁর কাছে গিয়ে আমার কথা বলামাত্র আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য রওনা দেন তিনি। এর মধ্যে সাদাচামড়ার একদল ডাকাত হামলা চালায় আমাদের উপর, আমি আর মায়া বন্দি হই ওদের হাতে। হয়তো চরম লজ্জা জুটত মায়ার কপালে, এমনকী মারাও যেতে পারতাম আমরা; যাঁদেরকে ভিনদেশী বলে অপমান করছ তাঁরাই কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঁচিয়েছেন আমাদেরকে। তারপর সেখান থেকে পালাই আমরা। সাদাচামড়ার মানুষদের দেশের দিকে গিয়ে কোনো লাভ নেই জেনে এ-দেশের পথ ধরি। বনেবাদাড়ে একসঙ্গে অনেকগুলো দিন কাটিয়েছি, একরকম আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আমাদের মধ্যে।

ইগনাশিয়োর "দিবা" আর আমার "নিশি" একসঙ্গে করে দেখেছি তখন। বললে বিশ্বাস করবে কি না জানি না, ও দুটো যে একই রত্নপাথরের দুটো অংশ তা কানা ছাড়া অন্য যে-কেউ বুঝতে পারবে। আমি তখন আমার গল্প বলি ইগনাশিয়োকে—কেন তাঁর খোঁজে বেরিয়েছি, তিনিও তাঁর উদ্দেশ্য খোলাসা করেন আমার কাছে।

'তাঁর উদ্দেশ্য আমার চেয়েও মহৎ। আমরা, সিটি অভ দ্য হার্টের বাসিন্দারা আসলে এই দেশের বিচ্ছিন্ন একটা জনপদ। আমাদের থেকে অনেক অনেক দূরে বাস করে স্বজাতীয় ইণ্ডিয়ান ভাইরা। তাঁদের কাঁধে দাসত্বের জোয়াল বসিয়ে দিয়েছে সাদাচামড়ার কিছু অসাধু লোক। ওই অসহায় মানুষগুলোর পায়ে আছে শোষণের শিকল। ইগনাশিয়ো ওই জোয়াল সরিয়ে দিতে চান, ভাঙতে চান ওই শিকল। তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চান একটা ইণ্ডিয়ান সাম্রাজ্য যা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। ওই সাম্রাজ্যের রাজধানী হবে আমাদের এই সিটি অভ দ্য হার্ট। তাঁর এই কথা শোনার পর পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে একটা চুক্তি করি আমরা যা এখন কিছুতেই ভাঙা সম্ভব না। চুক্তিটা হলো: সমুদ্রপুত্র নামের এই সাদাচামড়ার লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে আর মায়াকে নিরাপদে সিটি অভ দ্য হার্টে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন ইগনাশিয়ো। শহরের নির্দিষ্ট জায়গায় অর্থাৎ এই মন্দিরে একসঙ্গে করা হবে তাঁর সেই "দিবা" আর আমার "নিশি"। এর ফলে আমাদের সৌভাগ্য আবার ফিরে আসবে। বিনিময়ে আমাদের রাজকীয়-গুদামে-সংরক্ষিত কিছু ধনসম্পদ দেয়া হবে তাঁকে যা আপাতত কোনো কাজেই লাগছে না আমাদের। এই সম্পদ কাজে লাগিয়ে তিনি সেনাবাহিনী গঠন করবেন, বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে স্বাধীনতা আনবেন। তখন এই ছোট্ট শহরের ভিতরে বন্দি হয়ে না-থেকে সারা দেশে ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে পারবো আমরা, সাধারণ ইণ্ডিয়ানদেরকে স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে বংশবৃদ্ধি ঘটাতে পারবো দ্রুত যাতে আমাদের

এই জাতি বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায়।

'তোমরা বুঝতে পারছ কি না জানি না, আমি কিন্তু আমাদের এই চুক্তির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবো না, তোমাদের কথা ভেবেই চুক্তিটা করতে রাজি হয়েছি। আমি জানি ব্যাপারটা তোমাদের জন্য নতুন। সিটি অভ দ্য হার্টের মন্ত্রণাসভার অনুমতি না-নিয়েই কাজটা করতে হয়েছে আমাকে। তারপরও করেছি। কারণ আমি ভবিষ্যতের কথা ভেবেছি, দেশের স্বাধীনতার কথা ভেবেছি। এবার তোমরা ভেবে দেখো। যদি ইচ্ছা হয় আমার সঙ্গে যোগ দাও, অথবা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো। বলে রাখি, যদি দ্বিতীয় পথটা বেছে নাও তোমরা তা হলে শীঘ্রই এমন একটা দিন আসবে যেদিন এই শহরে স্মৃতি হিসেবে তোমাদের ঘরবাড়ি রয়ে যাবে, কিন্তু তোমরা থাকবে না। হয় সাদাচামড়ার মানুষরা দখল করে নেবে সব, না-হয় সংখ্যায় দিন দিন কমতে কমতে তোমরা হারিয়ে যাবে কালের গর্ভে। আমার কথা শোনো, দেবতাদের ইচ্ছা মেনে নাও, বিজয়ী জাতি হিসেবে সারা পৃথিবীতে তোমাদের নাম ছড়িয়ে পড়বে। যা বলার বললাম আমি, এবার সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তোমাদের।'

থামল যিব্যালবে। চুপ করে আছে সবাই। আসলে যিব্যালবের কথাগুলো শুনে হকচকিয়ে গেছে। "গণ্যমান্য" লোকেরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। উপস্থিত জনতার অনেকেরই মুখ হাঁ হয়ে গেছে। এই লোকগুলো খেয়ে-পরে কোনোরকমে বাঁচতে পারলেই খুশি, দেশ ও দশের কথা চিন্তা করার ইচ্ছাও এদের নেই।

নীরবতা ভাঙল অবশেষে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টিকাল। চিৎকার করে বলল, 'লোকে যে বলে যিব্যালবে পাগল ঠিকই বলে। সিটি অভ দ্য হার্টের সাধারণ জনগণ, আপনারা শুনলেন কী বলল লোকটা? প্রথম কথা, ওকে ওর সিংহাসন আর সব ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে আমাকে হয় বন্দি করতে হবে নয়তো মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। আর এদিকে সে নিজে যে

আইন ভঙ্গ করে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছে তার কোনো বিচার করা যাবে না। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের বাপ-দাদাদের সম্পদ যার মালিক কেউ একা না, তুলে দিতে হবে দু'জন ভিনদেশী ভবঘুরে চোরের হাতে যাদেরকে সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। সবশেষে, এই শহরটাকে রাজধানী বানানোর নাম করে শহরের দরজা খুলে দিতে হবে নীচ প্রকৃতির ইণ্ডিয়ানদের জন্য যাতে তারা এখানে পা দিয়েই লুটতরাজ শুরু করতে পারে। নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য হাজার বছর ধরে কঠোর গোপনীয়তা বজায় রেখে চলেছি আমরা, আজ তা দেশের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে বিসর্জন দিতে হবে। আমি জানতে চাই, কীসের স্বাধীনতা? শাসক-শোষক শ্রেণীর গায়ের রঙ বদলে গেলেই কি তাদের কাছ থেকে শোষিত শ্রেণী মুক্তি পায়? আমি জানতে চাই, কীসের বংশবৃদ্ধি? চোর-বাটপাড় প্রকৃতির ইণ্ডিয়ানদের কাছে আমরা আমাদের কুমারী মেয়েদেরকে বিয়ে দেবো—এত সহজ? ...বলুন ভাইয়েরা, আপনারা এসব জঘন্য কাজ করতে রাজি আছেন?'

টিকালের পিছনে সমবেত "গণ্যমান্য" লোকেরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, 'না! কখনো না!'

একই কথা বজ্রপাতের আওয়াজের মতো ধ্বনিত হলো উপস্থিত জনতার কণ্ঠে।

হাত তুলল টিকাল, নীরবতা নামল আবার। 'আমি জানতাম এ-রকমই বলবেন আপনারা। জানতাম এসব জঘন্য কাজ করতে রাজি হবেন না কেউই। তা হলে এখন কথা হচ্ছে, কী করবেন আপনারা? কী করা উচিত? প্রথমে বলুন, কাকে আপনাদের সর্দার হিসেবে দেখতে চান? আমার চাচা যিব্যালবেকে যে কিনা বার্ধক্যে জর্জরিত এবং বদ্ধ উন্মাদ? যার বুদ্ধিমতো চললে লজ্জা আর ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই জুটবে না আমাদের কপালে? নাকি আমাকে যে প্রাচীন এই শহরটাকে এবং এই শহরের সব আইনকানুনকে যে-কোনো মূল্যে রক্ষা করতে বদ্ধ পরিকর?'

'আমরা আপনাকেই চাই, মহামান্য টিকাল!' সমবেত কণ্ঠে জানিয়ে দিল জনতা।

'ধন্যবাদ,' চেঁচিয়ে বলল টিকালও, 'তা হলে বলুন এখন এই বুড়ো উন্মাদ আর ওর সঙ্গে-আসা দুই ভিনদেশী চোরের কী করবো? ওরা আমাদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করতে চায়, আমাদের সম্পদ লুটে নিয়ে পাচার করতে চায়। কী শাস্তি হওয়া উচিত ওদের?'

'হত্যা করুন!' রায় জানিয়ে দিল জনতা, 'এখনই এই বেদির সামনেই কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলুন!' দেখলাম তরবারি বের করে ফেলেছে অনেকেই, বিপজ্জনক ভঙ্গিতে নাড়াচ্ছে।

একমুহূর্ত কী যেন ভাবল টিকাল, তারপর আমাদের দিকে আঙুল তুলে সৈন্যদেরকে বলল, 'গ্রেপ্তার করো ওদেরকে।'

কথাটা শোনামাত্র শ'খানেক লোক ছুটে এল আমাদের দিকে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, কোমরের বেল্টে হাত দিয়ে ফেলেছেন সিনর। চিৎকার করে বললাম, 'ঈশ্বরের দোহাই! উল্টোপাল্টা কিছু করবেন না। একজনের গায়ে হাত দেবেন তো আমাদের সবাইকে ওরা নিশ্চিতভাবে খুন করবে!'

'আমাদেরকে এমনিতেও খুন করবে ওরা। ঠিক আছে,' হাত সরিয়ে নিলেন তিনি, 'কিছু করবো না আপাতত।'

এতক্ষণ যারা ছিল যিব্যালবের সঙ্গে, টিকালের অনুগত সৈন্যদেরকে ছুটে আসতে দেখে পিছুটান দিয়েছে ওরা। ফাঁকার মধ্যে এখন আমরা শুধু চারজন।

'কাপুরুষ!' চিৎকার করে নিজের লোকদেরকে গাল দিল যিব্যালবে, কোমরের খাপ থেকে একটানে বের করে ফেলেছে ভোজালি। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল টিকালের সৈন্যরা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি আমাকে, সিনরকে আর যিব্যালবেকে বেদির দিকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। মায়ার গায়ে হাত দেয়নি কেউ। আমাদের পিছন পিছন স্বেচ্ছায় আসছে সে।

আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করানো হলো বেদির সামনে। চিৎকার করে জনতার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করল টিকাল, 'বলো, কী শাস্তি দেয়া যায় এই লোকগুলোকে?'

'মৃত্যুদণ্ড! মৃত্যুদণ্ড!' সম্মিলিত কণ্ঠে চিৎকার করে জানিয়ে দিল জনতা।

সঙ্গে সঙ্গে কারা যেন প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিল আমাদের তিনজনকে। ছিটকে গিয়ে বেদির সামনে লুটিয়ে পড়লাম আমরা। মাথা তুলেই দেখি, আমাদের ভবলীলা সাঙ্গ করার জন্য নগ্ন তরবারি নিয়ে এগিয়ে আসছে বেশ কয়েকজন লোক। হয়তো তখনই মরতে হতো আমাদেরকে, কিন্তু হঠাৎ একলাফে সামনে এসে দাঁড়াল মায়া। ভূপাতিত সিনরের পাশে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'থামো!'

ওর অগ্নিমূর্তি দেখে থমকে যেতে বাধ্য হলো তরবারিধারীরা।

'তোমাদের সবার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে?' চিৎকার করে জানতে চাইল মায়া। 'তোমাদের পবিত্র বেদিকে নিরপরাধ লোকের রক্ত দিয়ে অপবিত্র করতে চাচ্ছ? আইন ভঙ্গ করার অভিযোগ করছ তোমরা এই লোকগুলোর বিরুদ্ধে। এবার শোনো আমি বলি আইন কী বলে। সর্দার আর মন্ত্রণাসভার সদস্যদের সামনে আনুষ্ঠানিক বিচার ছাড়া আমাদের এই শহরে কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না—জানো না তোমরা? এই লোকগুলোর কি বিচার হয়েছে? হয়ে থাকলে কে করল? আমার বাবা আইনসঙ্গতভাবে এখনও তোমাদের সর্দার, অথচ তোমরা বলছ তাঁকে অপসারিত করা হয়েছে। যদি তা-ই হয়ে থাকে তা হলে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে বলো সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী কে? টিকাল না আমি? কোনো দেশের রাজা মারা গেলে অথবা দেশ পরিচালনায় অক্ষম হয়ে পড়লে কে সিংহাসনে বসে—তাঁর সন্তান না ভাতিজা? আমি মরিনি, তাকিয়ে দেখো এখনও বেঁচে আছি। যাদেরকে খুন করতে উদ্যত হয়েছ তোমরা তাদের কারও বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ পর্যন্ত করিনি, মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করা তো পরের কথা। তা হলে কেন এই পাগলামি করছ

সবাই মিলে?'

চুপ করে আছে সবাই, যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। বেশিরভাগই দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মতো। বাকিরা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। মায়ার যুক্তি খণ্ডন করার মতো কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

শেষপর্যন্ত মুখ খুলল টিকাল, 'লেডি মায়া, আপনি যে-আইনের কথা বললেন তা এই শহরের প্রত্যেক অধিবাসীর বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু যারা ভিনদেশী, সোজাসুজি বললে আপনার পায়ের কাছে পড়ে-থাকা ওই লোক দুটো, তারা কি ওই আইনের মধ্যে পড়ে? ভবঘুরে আগন্তুক আর গুপ্তচরদের বেলায় কি ওই আইন প্রযোজ্য হওয়া উচিত? ন্যায়বিচারের কোনো দাবিই করতে পারে না তারা। সুতরাং ওদেরকে সর্বসমক্ষে খুন করাই উচিত।'

'ওরা আগন্তুক বটে,' আবেগে গলা কাঁপছে মায়ার, 'কিন্তু ভবঘুরে তার প্রমাণ কী? ওরা ভিনদেশী, কিন্তু গুপ্তচর তার প্রমাণ কী? টিকাল, বাবাকে অন্যায়ভাবে সরিয়ে দিয়ে সিংহাসন দখল করেছ তুমি, এবার মানুষ খুন করে সর্দারি শুরু করতে চাও? আমি জোর দিয়ে বার বার বলছি এই লোকগুলো কোনো অন্যায় করেনি—এটা কি যথেষ্ট না তোমার কাছে? দোষ যদি কারও হয়ে থাকে তা হলে হয়েছে আমার আর বাবার, কারণ আমরা ওদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি এখানে। তারপরও যদি এদের গায়ে হাত দাও তোমরা,' মায়ার চোখ যেন জ্বলছে, 'কসম খেয়ে বলছি এদেরকে বাঁচাতে গিয়ে আমিও মরবো। কেন জানো? কারণ এখানে নিয়ে আসার আগে ওদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি এই শহরে কোনো ক্ষতি হবে না ওদের। টিকাল, আমি যদি মরি তা হলে আমার রক্তের অভিশাপ থাকবে তোমার আর তোমার অনুসারীদের উপর, বলে রাখলাম,' রত্নখচিত কোমরবন্ধনীর ভিতর থেকে একটা ছুরি বের করল সে। সূর্যের আলোয় ঝিক্ করে উঠল ফলাটা।

মায়াকে দেখতে ভয়ঙ্কর সুন্দর লাগছে এখন। ওর এই রূপ

সম্ভবত আগে কখনোই দেখেনি কেউ, তাই তরবারিধারী সৈন্যরা আস্তে আস্তে পিছু হটে যাচ্ছে। গুঞ্জন শুরু হয়েছে জনতার মধ্যে। অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছি, 'লেডি মায়া ঠিক বলেছেন! তিনিই আমাদের সর্দার। তাঁকেই মান্য করা উচিত আমাদের।'

উঠে দাঁড়াল যিব্যালবে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিকই বলেছিস, মায়া। আমরা যদি আমাদের অতিথিদের রক্ষা করতে না-পারি তা হলে তাদের সঙ্গেই মরণ হওয়া উচিত আমাদের।'

আবারও শুরু হলো গুঞ্জন আর ফিসফিস। উঠে বসলাম আমি। টিকালের দিকে তাকিয়ে দেখি ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নাহুয়া। নিচু গলায় বলল টিকালকে, 'মেয়েটার রক্তের অভিশাপ যদি আমাদের উপর থাকে তা হলে কারও জন্যই ভালো হবে না। ওর বুড়ো বাপটাকে আসলেই পছন্দ করে না শহরের লোকেরা, কিন্তু ওকে এখনও আগের মতোই সম্মান করে। ওর কোনো ক্ষতি হলে আজ-বাদে কাল আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যেতে পারে।'

'কিন্তু...' নিচু গলায় বলছে টিকালও, যদিও একটা শব্দও আমার কান এড়াচ্ছে না, 'সামান্য একটা ভিনদেশী আগন্তুকের জন্য নিজেকে এভাবে শেষ করে দিতে চাচ্ছে কেন সে?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল নাহুয়া, ওর ঠোঁটের কোনায় বাঁকা হাসি। বলল, 'কে জানে কেন! ভিনদেশী লোকটা ওর বন্ধু। একটা পুরুষলোকের সঙ্গে একটা কুমারী মেয়ের সম্পর্ক কোন্ পর্যন্ত গেলে লোকটার জন্য নিজের জীবন দিতেও দ্বিধা করে না মেয়েটা, বোঝো না? ...তোমার যা ইচ্ছা করো, কিন্তু মায়া যদি কোনো কারণে মারা যায় তা হলে আমার মনে হয় দু'-একদিনের মধ্যে আমাদেরকেও একই পরিণতি বরণ করে নিতে হবে,' সরে গিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল সে।

সিনরের দিকে তাকাল টিকাল। এখনও মাটিতে পড়ে আছেন সিনর। টিকালের দৃষ্টিতে তীব্র ঘৃণা। শিউরে উঠলাম আমি। আশঙ্কা হলো এই বুঝি সিনরের প্রাণসংহারের আদেশ দেয় টিকাল নিজের

সৈন্যদেরকে। কিন্তু না, সে-রকম কিছু বলল না সে। নিজেকে সংযত করে নিয়ে তাকাল লেডি মায়ার দিকে। বলল, 'আপনি আইনের আশ্রয় চেয়েছেন। ঠিক আছে, যথাযথভাবেই বিচার হবে আপনাদের, কথা দিচ্ছি। বিচারকাজ পরিচালনা করবেন কারা তা নির্ধারিত হবে আগামীকাল। ঠিক এখানেই, সবার সামনে অনুষ্ঠিত হবে সে-বিচার।'

'না, তা হতে পারে না,' অবিচল কণ্ঠে জানিয়ে দিল মায়া। 'আমরা চারজনই আমাদের গোপন ভ্রাতৃসংঘের সদস্য। সুতরাং যদি আমাদের বিচার করতে হয়, মন্ত্রণাসভার সব সদস্যের উপস্থিতিতে এই মন্দিরে করতে হবে। এবং আগামীকাল করা যাবে না কাজটা। আজ থেকে ঠিক আট দিন পর যখন পানি বাড়তে শুরু করবে হ্রদে তখন করতে হবে। ঠিক কি না?'

'আপনারা চারজনই যদি ভ্রাতৃসংঘের সদস্য হন,' চেহারা কালো হয়ে গেছে টিকালের, 'তা হলে ঠিক। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত দেশ ও জাতির নিরাপত্তার কথা ভেবে আপনাদেরকে সুরক্ষিত জায়গায় কয়েদ করে রাখতে বাধ্য হচ্ছি আমি।' মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল সে নিজের সৈন্যদের দিকে। 'যাও, এঁদেরকে উপযুক্ত জায়গায় নিয়ে যাও। পরে দেখা করতে যাবো আমি।'

জনতার দিকে তাকাল মায়া। পরিষ্কার গলায় বলল, 'বিদায়। আমাদেরকে যদি আর না-দেখো, বুঝে নিয়ো টিকালের কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে আমাদেরকে। যে-সিংহাসনের উপর আমার ন্যায্য অধিকার আছে তা জোর করে দখল করে নেয়ার এবং তারপর আমাদেরকে অন্যায়ভাবে খুন করার বদলা নেয়ার দায়িত্ব তোমাদের উপর দিয়ে গেলাম।'

সতেরো

যিব্যালবের অভিশাপ

উঠে দাঁড়ালেন সিনর। 'আরেকটু হলেই...' বাকিটা শেষ করতে পারলেন না তিনি, হাসি বা ফোঁপানি জাতীয় কিছু একটার আড়ালে চাপা পড়ে গেল অবশিষ্ট কথাগুলো।

একটু আগে "উপযুক্ত জায়গা" বলতে কি গার্ড হাউস বুঝিয়েছে টিকাল? খেয়াল করলাম, যিব্যালবে আর মায়ার পিছু পিছু সেদিকেই যাচ্ছি আমরা।

চলতে চলতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি আমি। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। নিচু গলায় বললাম সিনরকে, 'আমরা বেঁচে গেছি সে-কথা ভাববার কোনো উপায় কিন্তু নেই। কপালে কী আছে এখনও জানি না আমরা।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালেন সিনর। 'যদি না মত বদলায় টিকাল।'

'মত বদলানোর কোনো সম্ভাবনা আছে কি?'

সরাসরি জবাব না-দিয়ে সিনর বললেন, 'কয়েকটা দিন হাতে পাওয়া গেল আর কী।' মায়ার দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'মেয়েটাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত আমাদের। সময়মতো সামনে এসে না-দাঁড়ালে...'

কথা বলতে বলতে প্রবেশ করলাম গার্ডহাউসে। ঘরটা ছোট কুঠুরির মতো। দরজাটা বিশাল এবং খুব মজবুত। ভিতরটা যাচ্ছেতাইভাবে সাজানো।

আমরা ঘরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই পিছন থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল প্রহরীরা। খেয়াল করলাম আমরা চারজন ছাড়া আর কেউ নেই ভিতরে। এককোনায় বসে পড়ল যিব্যালবে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে। সে-দৃষ্টিতে প্রাণ নেই। জেগে থাকলে চোখ খোলা রাখতে হয় বলে খুলে রেখেছে, আসলে কিছুই দেখছে না। আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে আছি দরজার কাছে। পুরু দরজা ভেদ করে শোনা যাচ্ছে বাইরের কোলাহল, তা-ই শুনছি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে জনতা, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কারও কণ্ঠ ক্ষুব্ধ, কেউ আবার চেঁচাচ্ছে। দৌড়াদৌড়ি করছে কেউ কেউ—হঠাৎ হঠাৎ শোনা যাচ্ছে ছুটন্ত পায়ের-আওয়াজ। তবে খেয়াল করে শুনলে বোঝা যায় আস্তে আস্তে কমে আসছে কোলাহল। তারমানে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে লোকজন।

মায়ার দিকে তাকালেন সিনর। 'কয়েকটা দিনের জন্য হলেও আমাদের জীবন বাঁচিয়েছ তুমি। সে-জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু একটা কথা বলো তো, এবার কী করবে ওরা?'

'জানি না,' সোজাসুজি জবাব দিল মায়া, 'পাতাল কারাগার আছে, সেখানে বন্দি করে রাখবে হয়তো। যতদূর ধারণা করছি, বিচারের আগে সাধারণ জনগণের সঙ্গে আর দেখা হবে না আমাদের। মানে দেখা করতে দেয়া হবে না আর কী। অনেকেই ক্ষেপেছে টিকালের উপর। যদি ওদের সঙ্গে আবার কথা বলার সুযোগ পাই তা হলে আর সর্দারি করতে হবে না ওকে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই আমাদেরকে কয়েদ করেছে শয়তানটা।'

দরজাটা খুলে গেল এমন সময়। টিকাল, মাটাই এবং আরও কয়েকজন গণ্যমান্য লোক ভিতরে ঢুকল যাদের সঙ্গে শত্রুতা আছে যিব্যালবের।

'কী চাই?' আমরা কেউ কিছু বলার আগেই জিজ্ঞেস করল যিব্যালবে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখছে টিকালকে, কিছুক্ষণ আগের সেই নিষ্প্রাণ দৃষ্টি উধাও হয়েছে ওর চোখ থেকে।

'আসুন আমার সঙ্গে,' একগুঁয়ের মতো বলল টিকাল, 'শুধু আপনিই না, আপনারা সবাই।' মায়ার দিকে তাকাল, ছোট করে বাউ করল। 'ক্ষমা করবেন। আপনার আর আপনার বাবার সঙ্গে এ-রকম আচরণ করার ইচ্ছা ছিল না আমার। বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে। জনতা ক্ষেপেছে আপনাদের উপর। আপনাদেরকে বাঁচানোর জন্যই...'

'জনতা ক্ষেপেছে?' কথাটা ধরল মায়া। 'নাকি তুমি ক্ষেপেছ?'

চোয়াল শক্ত করল টিকাল। কিছু বলল না। বোঝা যাচ্ছে রাগ সামলানোর চেষ্টা করছে।

মায়া বলল, 'ঠিক আছে, চলো কোথায় যেতে হবে। আমাদেরকে নিয়ে পাতাল কারাগারে বন্দি করবে তো? চলো, সেখানেই যাই।'

টিকালের পিছন পিছন ওই ঘর থেকে বের হলাম আমরা। গার্ডহাউস ছাড়িয়ে কিছুদূর এগিয়ে হাজির হলাম পুরোহিতদের শয়নকক্ষের সামনে। ঢুকলাম ভিতরে। একদিকের দেয়ালের সামনে পর্দা ঝুলছে, গিয়ে দাঁড়ালাম সেটার সামনে।

উঠানো হলো পর্দাটা। কয়েকটা লণ্ঠন জ্বালল মাটাই। সেগুলোর আলোয় দেখি, সামনে পাথরের দেয়াল। সেটার মাঝামাঝি এক জায়গায় দুটো কব্জায় ঝুলছে একটা তালা। ভালোমতো তাকিয়ে দেখি, আসলে পাথরের একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। দরজাটা মূল দেয়ালের সঙ্গে বিশেষ কোনো কায়দায় আটকানো আছে। কায়দাটা নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ পেলাম না, কারণ কোমরে ঝোলানো চাবির গোছা থেকে বিশেষ একটা চাবি বেছে নিয়ে সামনে এগিয়ে এল মাটাই। খুলল তালাটা। জোরে ধাক্কা দিল দরজার পাল্লায়।

সামনে অন্ধকার একটা প্যাসেজ। ঢুকলাম সবাই। লণ্ঠনের আলোয় এগিয়ে চললাম। এভাবে পর পর বেশ কয়েকটা দরজা পার হতে হলো। সবার আগে টিকাল, তারপর আমরা চারজন, পিছনে

মাটাই আর ওর ছয় সঙ্গী।

শেষ দরজাটা পেরোনোর পর কিছুদূর এগিয়েই শুরু হয়েছে সিঁড়ি। বিশ ধাপ নেমে গেছে সিঁড়িটা। শেষমাথায় খাঁটি তামা দিয়ে বানানো ভারী দরজা। সেটার কাছে পৌঁছে থেমে দাঁড়িয়ে দেখি, সিঁড়ির পর সিঁড়ি নেমে গেছে আরও নীচের দিকে। নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর চাতালের মতো একটুখানি জায়গা। সিঁড়িগুলো বাঁক নিয়ে নিয়ে নেমে গেছে, ঢুকে গেছে পিরামিডের গভীর থেকে আরও গভীরে। কতদূর পর্যন্ত নেমেছে কে জানে!

খোলা হলো দরজাটা, সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম আমরা। নামতে নামতে পা ব্যথা হয়ে গেল আমার। শেষপর্যন্ত আরেকটা দরজার সামনে এসে হাজির হলাম। তামার দরজাটার চেয়ে এই দরজাটা বড়, ধাতুর উপর বিভিন্নরকম নকশা-করা। আমরা সবাই ভিতরে ঢোকার পর বন্ধ করে দেয়া হলো সেটা।

এদিক-ওদিক তাকালাম। অ্যাপার্টমেন্ট বা হলের মতো বড় একটা কক্ষে দাঁড়িয়ে আছি। সম্ভবত পিরামিডের কেন্দ্রভাগে পরিকল্পিতভাবেই বানানো হয়েছে এই ঘর। দেখে মনে হচ্ছে আমাদেরকে সাদরে বা অনাদরে যেভাবেই হোক এখানে রাখার জন্য তাড়াহুড়ো করে সাজানো হয়েছে। আশপাশে জ্বলছে বেশ কয়েকটা রূপার-লণ্ঠন। একধারে বিছানো হয়েছে গালিচা। তার উপর বসানো হয়েছে ছোট ছোট কয়েকটা টেবিল। বসার জন্য পাতা হয়েছে আসন।

ঘরটা আক্ষরিক অর্থেই বিশাল। এতগুলো মশাল জ্বলছে, তারপরও মনে হচ্ছে অন্ধকার কাটেনি। আলকাতরার মতো কালো অন্ধকারে জ্বলন্ত মশালগুলোকে আকাশের মিটিমিটি তারার মতো দেখাচ্ছে। আধো আলো আধো অন্ধকারে ছাদ চোখে পড়ে কি পড়ে না। দেয়াল চকচক করছে আলোর প্রতিফলনে। আমার অনুমান সেগুলো পলিশ-করা মার্বেল পাথর দিয়ে বানানো।

পরে জানতে পারি, অনেক আগে এই ঘরটা নাকি মন্দিরের

পুরোহিতদের সম্মেলন কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এখন ওদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে, তাই বলতে গেলে খালিই পড়ে থাকে। খালি পড়ে থাকে বলাটা বোধহয় ঠিক হলো না—যে বা যারা শহরের সর্দারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতো দুঃসাহস দেখায় তাদেরকে কয়েদ করে রাখা হয় এখানে।

ছোট ছোট কয়েকটা চেম্বার বা প্রকোষ্ঠ দেখতে পাচ্ছি বিশাল এই ঘরটার ভিতরে। আলাদা দেয়াল তুলে, এমনকী আলাদা দরজা দিয়ে একটা ঘরের থেকে আরেকটা ঘরকে পৃথক করা হয়েছে। কোনো কোনো প্রকোষ্ঠের দরজা খোলা। এ-রকম কয়েকটা প্রকোষ্ঠে ঢুকলাম আমি। উঁকি দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। আমার কৌতূহল দেখে মাটাই বলল, 'এই ঘরগুলো আপনাদের জন্যই। রাতে ঘুমাতে যাতে অসুবিধা না-হয় আপনাদের সে-জন্য একেকজনকে একেকটা ঘর দিয়েছি। ভৃত্যদেরকে বলে রেখেছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের খাবার নিয়ে আসবে।'

আর কিছু বলল না সে। টিকালও চুপ করে আছে। কিছুক্ষণ পর চলে গেল ওরা। প্রথমে সিঁড়িতে ওদের পদশব্দ, তারপর তামার দরজাটা বন্ধ হওয়ার ঝনঝন আওয়াজ পেলাম। বদ্ধ বাতাসে প্রতিধ্বনিত হলো আওয়াজটা, তারপর একসময় মিলিয়ে গেল।

চুপ করে আছি আমরা। মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি। শেষপর্যন্ত নীরবতা ভাঙল যিব্যালবে, বদ্ধ বাতাসে ওর কণ্ঠটা অদ্ভুত এক ফিসফিসানির মতো মনে হলো আমার কাছে, 'ক্ষমতা পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে শয়তানটা। একটাবার, শুধু একটাবার যদি বসতে পারতাম সিংহাসনে তা হলে...' কথা শেষ না-করে মুঠি পাকাল, অক্ষম আক্রোশে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর গিয়ে ঢুকল একটা প্রকোষ্ঠে। ভিতরে চৌকি পাতা আছে, তাতে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। দু'হাত দিয়ে চেহারা ঢেকে রেখেছে।

মায়াও উঠে গেল। গিয়ে বসল বাবার পাশে, সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিন্তু ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিল যিব্যালবে। অসহায়ের মতো বসে

থাকল মেয়েটা কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে এল আমাদের কাছে।

'এবার?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন সিনর, যেন জোরে কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন। আসলে এই পরিবেশে প্রতিধ্বনি শুনলে গা কেমন শিউরে উঠে।

প্রশ্নটা শুনে করুণ হাসি হাসল মায়া। 'আর কী? মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ছাড়া অন্য কিছু করার আছে বলে তো মনে হয় না। পার্থক্য একটাই—হাত-পা গুটিয়ে দম নেয়ার জন্য দু'-চার দিন সময় পেলাম।'

এদিক-ওদিক তাকালেন সিনর। 'চলো একটু ঘুরেফিরে দেখি জায়গাটা। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে চাই না। কোথায় বন্দি করে রাখা হয়েছে আমাদেরকে সে-জায়গাটা একটু চিনে নেয়া যাক অন্তত।'

'তাতে কী লাভ?' বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মায়া।

'হয়তো কোনো লাভই নেই,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সিনর। 'আবার লাভ হতেও পারে। কে জানে? মাটাই বলে গেছে ভৃত্যরা নাকি আমাদের খাবার নিয়ে আসবে। তার আগে সময় কাটানোর জন্য একটু হেঁটেচলে বেড়াতে দোষ কী?'

রাজি হলো মায়া, উঠে দাঁড়াল। কাছেই জ্বলছে একটা লণ্ঠন, সেটা নিল হাতে। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এগিয়ে গেল একদিকে। আমি আর সিনর আছি ওর পিছনে।

আরও কয়েকটা ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ দেখার পর একদিকের দেয়ালের কাছে এসে থেমে দাঁড়ালাম আমরা। তামার যে-দরজাটা পার হয়ে এসেছি, অনেকটা সে-রকম একটা দরজা দেখা যাচ্ছে সামনে। আশ্চর্যের ব্যাপার, দরজার মোটা গরাদের ফাঁক দিয়ে হাল্কা বাতাস বইছে। ওপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হাতের লণ্ঠন উঁচু করে ধরে আছে মায়া, তারপরও গরাদের ওপাশে বলতে গেলে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

'এটা কী?' জিজ্ঞেস না-করে পারলাম না আমি। 'কোনো

প্যাসেজ? এটা দিয়ে এগোলে কোথায় যাওয়া যায়?'

'জানি না,' জবাব দিল মায়া। 'তবে অনুমান করছি মন্দিরের দিকেই গেছে প্যাসেজটা। এটা মনে হয় কোনো গোপন রাস্তা। আমি কখনও দেখিনি, তবে শুনেছি আগের দিনে নাকি এই জায়গা অনেকরকম কাজে ব্যবহৃত হতো। যেমন উদ্বৃত্ত শস্য মজুদ করে রাখা হতো। আবার অস্ত্রভাণ্ডার হিসেবেও কাজে লাগত। নামীদামি পুরোহিতদের দাফনও করা হতো এখানে। কাছেপিঠেই পাওয়া যাবে ওদের কবর। তবে এসব অনেক আগের কাহিনি, এখন আর কেউ এদিকে আসে না বলেই জানি। জায়গাটা একরকম পরিত্যক্ত বলতে পারেন।'

ফিরতি পথ ধরলাম আমরা। তবে যেদিক দিয়ে এসেছি সেদিকে যাচ্ছি না, আরেকদিক দিয়ে এগোচ্ছি। আরেকটা প্রকোষ্ঠের সামনে এসে কেন যেন হঠাৎ করেই থমকে থেমে গেলাম তিনজনেই। আপনাথেকেই ঘাড় ঘুরে গেল ঘরটার দিকে।

দরজাটা কিছুটা খোলা। ভিতরে আলকাতরার মতো অন্ধকার। জানি না কেন, মনে হচ্ছে কিছু একটা অথবা কেউ একজন আছে ওই ঘরের ভিতরে।

'চলুন গিয়ে দেখি,' আমাদের মনের কথাটাই বলে ফেলল মায়া ফিসফিস করে।

পা বাড়ালাম সামনের দিকে। এক হাতে জ্বলন্ত লণ্ঠন ধরে রেখে আরেকহাতে দরজার পাল্লায় ঠেলা দিল মায়া। মৃদু ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল দরজাটা। ভিতরে পা রাখলাম আমরা।

তাজ্জব ব্যাপার, ঘরের ভিতরে সারি সারি শেল্‌ফ। প্রতিটা তাকের উপর গাদা করে রাখা আছে শত শত পার্চমেন্ট। ধুলো পুরু হয়ে জমে আছে পার্চমেন্টগুলোর গায়ে। হাত বাড়িয়ে একটা পার্চমেন্ট তুলে নিল মায়া, সাবধানে পাক খুলল। দেখে মনে হচ্ছে পাণ্ডুলিপি জাতীয় কিছু একটা হবে। ইণ্ডিয়ানদের প্রাচীন চিত্রলিপির সাহায্যে কিছু লেখা আছে ওটাতে।

'কম করে হলেও এক হাজার বছর বয়স হবে এই পাণ্ডুলিপির,' মন্তব্য করল মায়া। 'এই চিত্রলিপি চিনি আমি।' যেখানে ছিল, সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে জিনিসটা। 'হাজার বছরের পুরনো ইতিহাস পড়ে নষ্ট করার মতো সময় আমাদের আছে কি?'

আমরা কিছু বললাম না। তিনজনে বেরিয়ে এলাম বাইরে। কিছুদূরে দেখা যাচ্ছে আরেকটা ঘর। দরজা বন্ধ। কাঠের পাল্লায় পচন ধরেছে; মায়ার আলতো ধাক্কাতেই চৌকাঠ থেকে খুলে গিয়ে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। ভিতরে পা রাখলাম আমরা।

আগের ঘরটার মতো এটাতেও বেশ কিছু শেল্‌ফ। তবে এগুলোতে পার্চমেন্টের পাণ্ডুলিপি না, কোনোটাতে হলুদ আবার কোনোটাতে সাদা ধাতব খণ্ড দেখা যাচ্ছে।

'তামা আর দস্তা,' ভালোমতো না-তাকিয়েই মন্তব্য করে বসলেন সিনর।

হেসে ফেলল মায়া। 'না। তামা বা দস্তা কোনোটাই না। ওগুলো আসলে সোনা আর রূপা—সাদাচামড়ার মানুষরা যার জন্য লালায়িত।' হাতের লণ্ঠন নিচু করে ধরল সে, শেলফের গায়ে লেখা কিছু একটার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। 'দেখুন কী লেখা আছে। "দক্ষিণের খনি থেকে আনা খাঁটি ধাতু। মন্দিরের কাজে ব্যবহারের জন্য।" প্রতিটা সোনার বারের ওজন কত, প্রতিটা রূপার বারের ওজন কত তা-ও লেখা আছে।'

গোপন করে লাভ নেই—ঘরভর্তি সোনা আর রূপার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন লোভ ধরে গেছে আমার মনের ভিতরে। শুধু এই ঘরে যত সোনা-রূপা আছে তা দিয়ে আমার উদ্দেশ্য তিনবার পূরণ করা সম্ভব। এখানে সঞ্চিত সম্পদ যদি কোনোরকমে নিয়ে যাওয়া যেত আমার দেশে! বঞ্চিত মানুষগুলোর ভাগ্য বদলে দিতে পারতাম।

আমার মনের কথাগুলো হয়তো পড়তে পারল মায়া। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'লাভ নেই, ইগনাশিয়ো। এই সম্পদ পেয়েও পাওয়া

হলো না আপনার। সত্য বলতে কী, আমার মনে হয় মাটির কয়েক শ' ফুট নীচে এই জায়গায় নিরাপদ একটা কবর পাওয়া ছাড়া আর হয়তো কিছুই পাওয়া হবে না আপনার শেষপর্যন্ত।'

এরপর আরও কয়েকটা ঘরে ঢুকলাম আমরা। বেশিরভাগই খালি। তবে কোনোটাতে পাওয়া গেল মথে-কাটা ট্যাপেস্ট্রি, আবার কোনোটাতে সেকেলে আসবাবপত্র। শেষে এসে দাঁড়ালাম আরেকটা ঘরে, বিশাল এক কাবার্ডের সামনে। কাবার্ডটা মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু। সোনা দিয়ে বানানো বিভিন্নরকম তৈজসপত্র দেখা যাচ্ছে। নির্মাণশৈলী প্রাচীন আর খেয়ালি, কিন্তু জিনিসগুলো সুন্দর। হয়তো কোনো কালে মন্দিরের পুরোহিতরা ব্যবহার করত এসব জিনিস। বহু-ব্যবহারে পুরনো হয়ে যাওয়ায় বাতিল করে দিয়েছে। তারপর ওরাই হয়তো সাজিয়ে রেখেছে এখানে। কাবার্ডের মুখোমুখি স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আছে একটা সিন্দুক। ডালা বন্ধ, কিন্তু তালা মারা হয়নি। ডালা খুললেন সিনর। ভিতরটা পুরোহিতদের কাপড়চোপড় আর অলঙ্কার দিয়ে ঠাসা। বেশিরভাগ গহনাই সোনার, কোনো কোনোটাতে বড় বড় পান্নাও দেখা যাচ্ছে।

ওই সিন্দুকের ভিতর থেকে একটা বেল্ট বের করে আমাকে দিল মায়া। বলল, 'নিন, ইগনাশিয়ো, এটা দিলাম আপনাকে। পছন্দ হয়েছে?'

আলখাল্লার নীচে, কোমরে আটকে নিলাম বেল্টটা।

(এই বেল্টের মাত্র কয়েকটা রত্ন বিক্রি করে মেক্সিকোয় জমিদারি কিনেছিলাম আমি।)

যা-হোক, ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, যে-সম্পদ কোনোদিন কোনো কাজে লাগবে না আমাদের তা দেখে হতাশা জেগেছে মনের ভিতরে, তাই ফিরে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করছি। ব্যাপারটা বুঝতে পারল মায়া, ফিরতি পথ ধরল। তিনজনে ফিরে এলাম যিব্যালবের কাছে।

ততক্ষণে দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে ভৃত্যরা, সঙ্গে

একদল সশস্ত্র সৈন্য। বেশ কিছু খাবার নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য। আমাদেরকে দেখে টেবিলের উপর সেগুলো সাজিয়ে দিল। কোনো কথা না-বলে খেতে বসে গেলাম আমরা। আমাদের খাওয়া শেষ না-হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা, তারপর এঁটো থালাবাসন সরিয়ে নিল। চারটা প্রকোষ্ঠে ঢুকল চার ভৃত্য, বিছানা ঠিক করে দিল। দু'-তিনটা লণ্ঠন বাদে বাকিগুলো নিভিয়ে ফেলল একজন। তারপর আমাদেরকে বাউ করে বিদায় নিল সবাই।

যে-টেবিলে খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল তা ঘিরে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম আমরা চারজন। যিব্যালবে আর আমি চুপ করে আছি, মায়ার সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছেন সিনর। একসময় ক্লান্তি পেয়ে বসল আমাদেরকে, যার যার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। হয়তো একসময় ঘুমিয়ে পড়বো এই আশায় বন্ধ করলাম দু'চোখ।

এভাবেই দিন কাটতে লাগল আমাদের। রাতে ঘুমাই, ঘুম ভেঙে গেলে বুঝতে পারি সকাল হয়েছে; যদিও আলোর দেখা পাই না কখনও। নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসে ভৃত্যরা। ইচ্ছে হলে খাই, না-হলে কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করে রেখে দিই। যিব্যালবের দুই ঠোঁট যেন সেলাই করে দিয়েছে কেউ—প্রতিদিনই আমাদের সঙ্গে দেখা হয় ওর, কিন্তু কোনো কথা বলে না সে। এমনকী মায়াকেও পারতপক্ষে কিছু বলে না। বেশিরভাগ সময় যার যার ঘরে থাকি আমরা। কখনও কখনও সিনরের সঙ্গে এটা-সেটা নিয়ে কথা বলি আমি। কখনও আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় মায়া। হালকা বিষয় নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করি আমরা, কখনও টুকটাক রসিকতাও করি, কিন্তু কিছুই সেভাবে জমে না আসলে।

একদিন, নির্দিষ্ট করে বলতে পারবো না কবে কারণ দিনক্ষণের হিসাবে গণ্ডগোল হয়ে গেছে আমার, আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল টিকাল। সঙ্গে চারজন সশস্ত্র সৈন্য।

'মাত্র পাঁচজন,' সিঁড়ি দিয়ে ওদেরকে নামতে দেখে ফিসফিস করে আমাকে বললেন সিনর, 'কিন্তু কোনো লাভ হবে না। যিব্যালবে

বাদ, মায়াকেও ধরা যায় না, তুমি আর আমি মিলে ওই পাঁচজনের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবো না। কারণ আমাদের কাছে কোনো অস্ত্র নেই।'

(গ্রেপ্তার করার সময় আমাদের কাছ থেকে সব অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়েছে।)

'কিছু করতে পারা তো পরের কথা,' নিচু গলায় বললাম আমি, 'হয়তো আমাদেরকে পরপারে পাঠানোর জন্যই আসছে ওরা।'

'না,' পাশে দাঁড়ানো মায়া বলল, 'এত খোলাখুলি আমাদেরকে খুন করবে না ওরা।'

'খোলাখুলি?' যেন চরম অবাস্তব কোনো কথা শুনেছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন সিনর। 'মাটির এত নীচে আছি, বাধা দেয়ার কেউ নেই—তারপরও বলছ খোলাখুলি?'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল মায়া, কিন্তু ততক্ষণে আমাদের কাছে এসে গেছে টিকাল। যে-টেবিলে আমাদের খাবার পরিবেশন করা হয় তার একধারে বসে নিজের চিন্তায় মশগুল হয়ে ছিল যিব্যালবে, ওর দিকে তাকিয়ে ওকে বাউ করল ছোট করে। যে-কোনোভাবেই হোক টিকালের উপস্থিতি টের পেয়েছে যিব্যালবে, ধ্যান ভেঙে চোখ তুলে তাকাল। 'বিশ্বাসঘাতক,' ওর খনখনে গলায় উষ্মা, 'কী চাও তুমি?' খেয়াল করলাম চেহারা লাল হয়ে গেছে ওর। 'কী করতে হাজির হয়েছ এখানে? খুন করবে আমাদেরকে? যদি তা-ই হয় তা হলে আর দেরি কোরো না। অভিশাপ দিয়েছি তোমাকে, এখন যত তাড়াতাড়ি মরবো আমার অভিশাপ তত তাড়াতাড়ি নামবে তোমার উপর।'

'আমি খুনি না,' শীতল গলায় বলল টিকাল। 'যদি কোনো কারণে মরতে হয় আপনাকে তা হলে তা আমার কারণে না, বরং প্রচলিত আইন ভঙ্গ করার অপরাধে। আমি এসেছি আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে। তবে কথাগুলো সবার সামনে না, আড়ালে বলতে চাই।'

'কথা বলতে হলে সবার সামনেই বলতে হবে। না-হলে কিছুই বলার দরকার নেই। তোমার সঙ্গে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা নেই আমার,' সাফ জানিয়ে দিল যিব্যালবে। 'আড়ালে যাই আর আমার পিঠে ছুরি বসিয়ে দাও তুমি, নাকি?'

'কিন্তু আমি যা বলতে চাই তা শোনা আপনার জন্য জরুরি।'

'জরুরি হলে এত ভূমিকা করছ কেন? সরাসরি বলে ফেলো।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল টিকাল। দ্বিধান্বিত দৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছে মায়ার দিকে। মেয়েটার সুন্দর চেহারার উপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না সম্ভবত।

'তুমি কি চাও এখান থেকে চলে যাই আমি?' শেষপর্যন্ত জিজ্ঞেস করেই ফেলল মায়া।

'না, যাবি না,' কড়া গলায় বলল যিব্যালবে। 'যেখানে দাঁড়িয়ে আছিস সেখানেই থাক।'

জড়তা ঝেড়ে ফেলল টিকাল। সঙ্গে-আসা সৈন্যদেরকে ইশারা করল, যথেষ্ট দূরে সরে গেল ওরা। আমরা না-চেঁচালে ওরা আমাদের কথা শুনতে পাবে বলে মনে হয় না।

'পিরামিডে সবার সামনে আমাদের কথোপকথনের আগে লেডি মায়ার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলি আমি,' বলতে শুরু করল টিকাল, 'তাঁকে জানাই, এখনও আগের মতোই তাঁকে ভালোবাসি। তবে তিনি মরে গেছেন ভেবে অনেকটা বাধ্য হয়েই নাহুয়াকে বিয়ে করেছি। তাঁকে একটা প্রস্তাব দিই তখন: নাহুয়াকে সরিয়ে দেবো, বিনিময়ে আমাকে বিয়ে করবেন লেডি মায়া। আরও বলি, যদি এই বিয়েতে রাজি হন তিনি তা হলে সিংহাসনের উপর আমার দাবিও ছেড়ে দেবো। তারমানে আপনার সর্দারি ফিরে পাবেন আপনি। যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন এই শহরের সর্দার হিসেবেই দিন কাটাতে পারবেন। আরও বলি, যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন লেডি মায়া তা হলে আপনাকে, তাঁকে আর এই দুই ভিনদেশীকে চরম শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু আমার কথার কোনো

পরোয়া করেননি লেডি মায়া। মুখের উপর না বলে দেন। তারপর কী হলো তা আপনার জানা আছে, যিব্যালবে। এ-ও জানেন, কত বড় বিপদ এখন আপনাদের সবার সামনে।'

থামল সে। এতক্ষণ ওর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল যিব্যালবে, এবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল মায়ার দিকে। 'টিকাল কি সত্য কথা বলছে?' জানতে চাইল রুক্ষ কণ্ঠে।

চুপ করে আছে মায়া, তাকিয়ে আছে অন্যদিকে।

'আমার কথা বিশ্বাস না-হলে,' আমার দিকে ইঙ্গিত করল টিকাল, 'এই ভিনদেশীকে জিজ্ঞেস করুন। আমাদের কথোপকথনের সময় ওখানে ছিল লোকটা। আমাদের সব কথা শুনেছে। নিজেকে আমাদের ভ্রাতৃসংঘের সদস্য বলে দাবি করে সে, আশা করি মিথ্যা বলবে না।'

কিন্তু আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার মনে করল না যিব্যালবে। যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে। ওর চেহারা থেকে মেঘ সরে গেছে, এখন ওকে নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে। স্বগতোক্তির ঢংয়ে বলল, 'দেবতাদেরকে ধন্যবাদ! আমার প্রার্থনা শুনেছেন তাঁরা। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।' তাকাল টিকালের দিকে। 'তুমি যা চাচ্ছ তা-ই হবে। মন্দিরের পবিত্র বেদির সামনে দাঁড়িয়ে শান্তির শপথ করবো আমরা। হয়তো মাটাই কিংবা ওর কিছু অনুসারী বাধা দেবে, কিন্তু আমার মনে হয় আমরা যদি একসঙ্গে থাকি তা হলে ওদেরকে হারাতে পারবো।' এবার তাকাল আমার দিকে। 'বন্ধু ইগনাশিয়ো, চেহারাটা হাঁড়ির মতো করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আপনার তো আনন্দিত হওয়া উচিত! স্বাধীনতার যে-স্বপ্ন দেখেছি আমরা তা পূরণ করার ক্ষেত্রে আরেকটা বড় বাধা দূর হয়েছে।'

আমার পিছনে দাঁড়িয়ে-থাকা সিনর রাগে গড়গড় করে উঠলেন। কী করবো বা কী বলবো বুঝতে পারছি না আমি। যিব্যালবে যতটা সহজভাবে দেখছে, বিষয়টা আসলেই ততটা সহজ হলে চিন্তার কিছু

ছিল না। কিন্তু সমস্যাটা এখন যাকে কেন্দ্র করে জট পাকিয়ে আছে সেই মায়া যে জীবনেও বিয়ে করবে না টিকালকে তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। যিব্যালবে এটা বুঝতে পারছে না কেন? সে কি দেখেও দেখছে না সিনরের সঙ্গে মন দেয়া-নেয়া হয়ে গেছে মায়ার? নাকি নিজের সর্দারি ফিরে পাওয়াটাই ওর জন্য মুখ্য?

'কথা বলছেন না কেন?' বিরক্ত কণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞেস করল যিব্যালবে।

'আমার মনে হয়,' মায়ার দিকে তাকালাম আমি, 'এ-ব্যাপারে লেডি মায়া কী বলেন তা জানতে চাওয়া উচিত।'

'উচিত?' যিব্যালবের কণ্ঠ শুনে মনে হলো মারাত্মক ভুল করে ফেলেছি আমি। 'মায়ার আবার কী বলার থাকতে পারে?'

'হ্যাঁ, থাকতে পারে,' শান্ত গলায় বলল মায়া। 'এর আগে যা বলেছি টিকালকে তা আজ আবারও বলতে চাই। ওকে বিয়ে করতে আমি রাজি না।'

'রাজি না!' যিব্যালবের মাথায় যেন বাজ পড়েছে, 'রাজি না? ওর সঙ্গে যে তোর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল ভুলে গেছিস?'

'না, ভুলিনি। কিন্তু আমি একজন বিশ্বাসঘাতককে বিয়ে করতে চাই না। টিকাল শুধু তোমার সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, আমার সঙ্গেও করেছে। মাটাইয়ের সঙ্গে চক্রান্ত করে আমার মৃত্যুর ভুয়া খবর ছড়িয়ে দিয়ে বিয়ে করেছে নাহুয়াকে যাতে শহরের জনতা ওর বিয়ে নিয়ে আমোদপ্রমোদে মেতে থাকে, যারা আমাদের অনুসারী তারা ওর সিংহাসন দখল নিয়ে উচ্চবাচ্য না-করে। আসলে জনতার দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার বদ মতলব ছিল ওর। আমি জানতে চাই, একটা বছর তো কেটেই গিয়েছিল, আরেকটা বছর অপেক্ষা করতে পারল না আমার জন্য? এর নাম ভালোবাসা? আমি ওর চোখের সামনে থাকলে পুরনো কথা মনে পড়ে, না-থাকলে সব ভুলে যায়—এর নাম প্রেম? ওর সব আবেগ, সব প্রতিশ্রুতি মিথ্যা। এখন আমাকে বিয়ে করার জন্য চাপাচাপি করছে, বিয়ে করতে পারলেই

আবার রঙ বদল করবে। যে-কোনোভাবে হোক তোমাকে সরিয়ে দিয়ে সিংহাসনে বসার চেষ্টা করবে। ওকে জিজ্ঞেস করো, বাবা, আমাকে যদি ভালোইবাসবে তা হলে এই পাতাল কারাগারে বন্দি করে রেখে কষ্ট দিচ্ছে কেন।'

'বোকার মতো কথা বলিস না,' রেগে গেছে যিব্যালবে। 'সন্দেহ নেই নাহুয়াকে বিয়ে করে ভুল করেছে টিকাল। কিন্তু ওই ভুলের জন্য সে অনুতপ্ত। এবং ভুলটার সংশোধনও করতে চায়। আমি যদি ওকে ক্ষমা করতে পারি তা হলে তোর ক্ষমা করতে অসুবিধা কী?' টিকালের দিকে তাকাল সে। 'এই মেয়ের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাই উল্টোপাল্টা বকছে। তুমি কিছু মনে কোরো না। লোক পাঠিয়ে পার্চমেন্ট আর কলম-দোয়াত আনাও। আমাদের মধ্যে চুক্তি হবে, দেরি না-করে সেটা লিখে ফেলতে চাই। টের পাচ্ছি আমার সময় প্রায় শেষ, কাজেই মরার আগে এই ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত করে যেতে চাই। গায়ের জোরে সিংহাসন দখল করেছ তুমি, দেশের জনগণ যাতে কথাটা বলতে না-পারে সে-ব্যবস্থা করবো।'

'পার্চমেন্ট আমার সঙ্গেই আছে,' বলতে বলতে পোশাকের ভিতর থেকে টুকরোটা টেনে বের করল টিকাল, 'কলম-দোয়াতও আছে প্রহরীদের কাছে।' শুনে মনে হচ্ছে যেন আগে থেকেই জানত ওর প্রস্তাবে রাজি হবে যিব্যালবে। 'কিন্তু লেডি মায়া...তিনি কি আমাদের সঙ্গে একমত?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একমত,' যিব্যালবের কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা।

'না, আমি একমত না,' কড়া গলায় বলল মায়া। 'আমি এই জঘন্য চুক্তিতে সই করবো না। তোমরা যদি জোর করে আমাকে পবিত্র বেদির সামনে হাজির করো তা হলে চিৎকার করে সবাইকে বলবো কথাটা, আমাকে রক্ষা করতে বলবো। ওদের সাহায্য চাইবো। কোনো কাজ না-হলে আত্মহত্যা করবো। তারপরও বিয়ে করবো না ওই জঘন্য মানুষটাকে।'

মেয়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যিব্যালবে, রাগে

কাঁপছে। কষ্ট করে রাগ সামলাল সে, বলল, 'টিকাল, আসলেই পাগল হয়ে গেছে আমার মেয়েটা। তুমি যদি এখন চলে যাও তা হলে ভালো হয়। কয়েক ঘণ্টা পর আবার এসো। মায়ার সঙ্গে কথা বলি আমি। আশা করছি পরের বার যখন তুমি আসবে তখন আর দ্বিমত করবে না সে। যাও।'

ঘুরে চলে গেল টিকাল আর ওর প্রহরীরা। তামার দরজাটা ঝনঝন শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। ততক্ষণ একটা কথাও বললাম না আমরা কেউ।

'মায়া,' মেয়ের উদ্দেশ্যে হঠাৎ করেই বলতে শুরু করল যিব্যালবে, 'আমি জানি মিথ্যা কথা বলেছিস তুই। তোকে ভুলে গিয়ে নাহুয়াকে বিয়ে করেছে টিকাল আর সে-জন্য ওর উপর ক্ষেপে আছিস—কথাটা ঠিক না। অন্য একটা কারণ আছে এবং সেটাই আসল।' সিনরের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'জেমস স্ট্রিকল্যাণ্ড নামের এই সাদাচামড়ার মানুষটাই সেই কারণ। একে ভালোবেসে ফেলেছিস তুই এবং কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিস না মন থেকে। ঠিক কি না?'

'হ্যাঁ, ঠিক,' হাত বাড়িয়ে সিনরের হাত ধরল মায়া। 'তোমার কাছে মিথ্যা বলবো না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল যিব্যালবে। 'তোদের দু'জনের জন্য দুঃখপ্রকাশ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমার। তবে আমার কী মনে হয় জানিস? মনে হয় এই ভিনদেশী আসলে তোকে নিয়ে খেলছে। সাদাচামড়ার মানুষদের কাছে আমরা মেক্সিকানরা খেলনা ছাড়া আর কিছু না। একটাবার ভেবে বল্ তো, তোদের এই সামান্য আবেগের কোনো ভালো পরিণতি হতে পারে? তোদের আবেগটাকে সামান্য বললাম, কারণ তার তুলনায় দেশের মানুষের ভালোমন্দ কি অনেক বড় না? তোদের মন দেয়ানেয়াটা বড় করে দেখতে গিয়ে যদি দেশের মানুষের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে হয় তা হলে তাতে কার কী লাভ হবে? টিকাল হয়তো ভালোবাসে না তোকে, কিন্তু মনেপ্রাণে চায়

তাতে সন্দেহ নেই। কারণ তুই খুব সুন্দরী—এতে আমাদের কোনো হাত নেই, এটা দেবতাদের ইচ্ছা। যদি বলি একই কারণে এই ভিনদেশীও আকৃষ্ট হয়েছে তোর প্রতি তা হলে কি ভুল হবে?'

'জানি না,' মায়ার চেহারায় মেঘ জমছে, 'তবে এটা জানি আমি এই ভিনদেশীকে ভালোবাসি, তিনিও আমাকে ভালোবাসেন। অস্বীকার করবো না আমাদের আবেগের চেয়ে দেশের মানুষের স্বাধীনতার জন্য তোমার পরিকল্পনা অনেক বড়, অনেক মহৎ। তারপরও আমি কাকে বিয়ে করবো না-করবো সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা আমার আছে, নাকি?'

'এই মাথামোটা মেয়েটাকে নিয়ে কী করি আমি?' দেখে মনে হচ্ছে আরেকটু পর নিজের দাড়ি ছিঁড়তে শুরু করবে যিব্যালবে। সিনরের দিকে তাকাল সে। 'দয়া করে কিছু বলুন। দেবতাদের দোহাই লাগে এই মেয়েটাকে বোঝান। ওকে বলুন আপনি এতদিন যা করেছেন ওর সঙ্গে সবই ছলনা। দেখেও কি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না আপনি? বুঝেও কি বুঝতে পারছেন না? এখনও যদি একগুঁয়েমি করতে থাকে মায়া তা হলে আমাদের সবার কী অবস্থা হবে অনুমান করতে পারছেন না? আপনি কি ওর এবং আমাদের সবার মৃত্যুর জন্য দায়ী হয়ে থাকবেন?'

কিছু বললেন না সিনর। আমরা সবাই তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে। সুন্দর চেহারাটা পাণ্ডুর হয়ে গেছে, দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছেন তিনি। কিছুক্ষণ পর মৃদু গলায় বললেন, 'মৃত্যুই যদি হয় আমাদের সবার পরিণতি তা হলে হাজার চেষ্টা করলেও কিছু করতে পারবো না। তা ছাড়া...আমি না-হয় মুখ ঘুরিয়ে নিলাম মায়ার উপর থেকে, কিন্তু তাতে যে-মানুষটাকে ঘৃণা করে সে তাকে কি বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ, হবে,' সিনরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যিব্যালবে, 'কেন জানেন? কারণ আমার বিশ্বাস ওকে বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা আপনার আছে।'

কিছু বললেন না সিনর। তাঁর ঠোঁটের কোনায় করুণ হাসি।

আমার দিকে তাকাল যিব্যালবে। 'বন্ধু ইগনাশিয়ো, আপনি তো প্রেমে পড়েননি। আপনার মাথা এই দু'জনের মতো বিগড়ে যায়নি। আপনি বুঝিয়ে বলুন আপনার বন্ধুকে। পারলে আমার মেয়েটাকেও একটু বোঝান। অতিমাত্রায় আবেগতাড়িত হয়ে ওরা ভুলে গেছে ওদের দায়িত্ব-কর্তব্য। মনে রাখবেন এই দু'জনকে যদি আলাদা করা না-যায় তা হলে আপনার উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে না।' দূরের ঘরগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'আশা করি এই ক'দিন এখানে বন্দি থেকে ওই ঘরগুলোতে কী আছে জেনে গেছেন। যদি মনে করেন ওই সম্পদ দিয়েও আপনার কাজ হবে না তা হলে আপনাকে আরও সোনাদানা দিতে রাজি আছি আমি। শুধু এই দু'জনকে একটু বোঝান। ওদেরকে আলাদা করতে না-পারলে বেশি হলে আর দু'-তিন দিন বেঁচে থাকবো আমরা। তারপর টিকালের মতো একটা জঘন্য লোকের হাতে মরতে হবে সবাইকে।'

শুনলাম যিব্যালবের কথাগুলো। কেন যেন মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার, হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি থেমে গেছে। যা বলেছে যিব্যালবে তার একটা বর্ণও মিথ্যা না। এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছি আমরা যে, সিদ্ধান্ত নিতে যদি ভুল হয় তা হলে চরম মাশুল দিতে হবে চারজনকেই। সন্দেহ নেই মায়াকে মনেপ্রাণে চায় টিকাল; ওর এই চাওয়া আর যা-ই হোক অন্তত ভালোবাসা বা প্রেম যে না তাতেও সন্দেহ নেই। এখন মায়া যদি নিজেকে "উৎসর্গ" করে টিকালের কাছে তা হলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আপাতত। যথেষ্ট পরিমাণ ধনসম্পদ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারি আমি এবং বেশি হলে বছর তিনেকের মধ্যে অভিশপ্ত স্প্যানিয়ার্ডদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দেশের মানুষের জন্য স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারি হয়তো।

কিন্তু আমার আর আমার উদ্দেশ্যের মাঝখানে পর্বতের মতো বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়ে—লেডি মায়া। এর

সঙ্গে যোগ হয়েছে আমার বন্ধুর...কী বলবো...বোকামি। হ্যাঁ, বোকামিই...এ ছাড়া আর কী-ই বা বলতে পারি? এই দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে, যেখানে আমাদের জান নিয়ে টানাটানি পড়ে গেছে, সেখানে প্রেম নামের ক্ষণস্থায়ী আবেগকে আঁকড়ে ধরে রেখে কী লাভ? সিনর কি বুঝতে পারছেন না কথাটা?

ইস্‌স্‌! এই ব্যাপারটা যদি আগেই অনুমান করতে পারতাম! মায়ার অপূর্ব সুন্দর চেহারাটা যেদিন দেখেছি সেদিনই ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল আমার। এক বিশ্বাসঘাতিনী আমার জীবনে চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছে, আরেকজনের জন্য যে প্রাণসংশয় দেখা দেবে তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে? কিন্তু মায়ার ব্যাপারে আসলে কিছু করারও নেই—একটা মেয়ে কাকে ভালোবাসবে অথবা কাকে ঘৃণা করবে তাতে আমার কী করার থাকতে পারে?

কিন্তু আমার বন্ধুকে হয়তো বোঝাতে পারি। বলতে পারি, তাঁর সিদ্ধান্তের উপর শুধু আমার সারাজীবনের স্বপ্নই না, আমার জীবনটাও নির্ভর করছে। আমি বিশ্বাস করি কোনো মানুষ যদি মনেপ্রাণে সৎ হয় তা হলে নিজের কামনা চরিতার্থ করতে গিয়ে আরেকজনকে কিছুতেই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। তা ছাড়া মায়া রাজকন্যা হোক অথবা যা-ই হোক, সিনরের সঙ্গে ওকে মানায় না। দু'জনের জাত ভিন্ন, জগৎ ভিন্ন। দু'জনের এই ভালোবাসার আসলেই কোনো পরিণতি নেই। এই অবস্থায়, যে-লোকের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, ওই লোকের কাছেই তাকে ফিরে যেতে দেয়াটা হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, মনে মনে গুছিয়ে ফেললাম কী বলবো সিনরকে। কিন্তু মুখ খুলতে যাবো এমন সময়, আমার মনের কথা পড়তে পেরেই হয়তো, আমার হাতে আলতো করে হাত রাখল মায়া। খানিকটা চমকে উঠে তাকালাম ওর দিকে।

ফিসফিস করে আমাকে বলল সে, 'ইগনাশিয়ো, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আপনি।'

মনে পড়ে গেল কথাটা। খুব রাগ হলো মায়ার উপর, ধরেই নিলাম আমার অসহায় অবস্থায় আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে এখন তার ফায়দা লুটছে সে।

হায় নারী!

আমার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যিব্যালবে। ওর সব উৎসাহে পানি ঢেলে দিয়ে বললাম, 'আমি কিছু বলতে পারবো না। আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার মেয়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—তাঁর আর সিনরের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াবো না কোনোদিন।'

আমার কথাগুলো শুনে চোয়াল ঝুলে পড়ল যিব্যালবের, এমন কথা বলবো আমি কল্পনাও করেনি। নিজেকে সামলে নিল সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকাল সিনরের দিকে। 'দেখুন, আপনার বন্ধু কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারেনি। শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে, শুধু প্রতিজ্ঞা রক্ষার তাগিদে কত বড় ত্যাগ স্বীকার করলেন তিনি একবার ভেবে দেখুন। এরপরও কি আপনি আমার মেয়ের পাগলামির সুযোগ নেবেন? যদি নেন, বলে রাখি, আপনার এই বিজয় বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। কয়েক ঘণ্টা পরই আবার হাজির হবে টিকাল। ওকে সব কথা বলবো আমি এবং আপনাকে তুলে দেবো ওর হাতে। এরপর ওর যা ইচ্ছা হয় করবে আপনাকে নিয়ে গিয়ে। আপনার কপালে যা লেখা আছে হবে তখন। একটা কথা বলি। যারা মানুষের চিরাচরিত সম্পর্কের মাঝখানে দেয়াল তুলতে চায় তাদেরকে কিন্তু কঠিনভাবে শাস্তি দেন মহান দেবতা বা ঈশ্বর। টিকালের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল মায়ার, আপনি বাধা দিচ্ছেন; হয়তো আপনার কপালে কঠিন কোনো শাস্তি লেখা আছে। শেষবারের মতো ভেবে বলুন, কোন্‌টা চান আপনি—জীবন না মরণ?'

'মরণ,' সিনরের গলা শান্ত, নিষ্কম্প; উত্তর দিতে একমুহূর্তও দেরি হয়নি তাঁর, 'যাকে কথা দিয়েছি কোনোদিনও ছেড়ে যাবো না, যাকে কথা দিয়েছি বিয়ে করবো, তাকে আরেকজনের হাতে তুলে

দেয়ার মধ্যে বীরত্ব বা মহত্ত্বের কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমি দুঃখিত, যিব্যালবে। বন্ধু ইগনাশিয়ো, পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। এ-ব্যাপারে কিছু করার নেই আমার। আমাদের সবার এই দুর্দশার জন্য আমি না, আমাদের ভাগ্য দায়ী। তুমি যদি নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য অনেক বড় ত্যাগ স্বীকার করতে পারো তা হলে আমি যে-প্রতিজ্ঞা করেছি তা রক্ষা করার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারবো না কেন? তা ছাড়া যিব্যালবে, আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি মায়াকে টিকালের হাতে তুলে দিলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তার নিশ্চয়তা কী—জবাব দিতে পারবেন? যদি আবারও বিশ্বাসঘাতকতা করে সে? যদি কাউকে দিয়ে আপনাকে খুন করিয়ে আবারও সিংহাসন দখল করে বসে? ইগনাশিয়োকে যদি এক ভরি স্বর্ণও না-দেয়? কিছু করতে পারবেন তখন? '

জবাব দিল না যিব্যালবে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সিনরের দিকে।

'কাজেই যার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি সারাজীবন একসঙ্গে থাকার তার সঙ্গেই থাকবো আমি,' বলে মায়ার দিকে তাকালেন সিনর।

'আমিও আপনার সঙ্গে থাকবো আজীবন,' বলল মায়া। 'বাবা, ইচ্ছা হলে আমাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারো। ইচ্ছা হলে আমার ভালোবাসার মানুষটাকে তুলে দিতে পারো টিকালের হাতে। কিন্তু জেনে রেখো, এই মানুষটা মৃত্যুবরণ করার আগেই আমি মরবো।'

শেষপর্যন্ত নিজের উপর আর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারল না যিব্যালবে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল সে। চিৎকার করে জঘন্য সব অভিশাপ দিতে শুরু করল মেয়েকে। ভয়ে বা লজ্জায় যে-কোনো কারণেই হোক, চেহারা শুকিয়ে গেল মায়ার। ছুটে গেল সে সিনরের দিকে, তাঁর বুকে মুখ লুকাল।

'তোকে মন থেকে অভিশাপ দিচ্ছি আমি,' চিৎকার করে বলছে যিব্যালবে, 'আর শুধু আমিই না, সব দেবতার, এই দেশ আর

দেশের জনগণের অভিশাপ থাকল তোর উপর। তোদের এই ভালোবাসাবাসি বেশিদিন টিকবে না। মরবি তোরা দু'জনই। যত দিন বেঁচে থাকবি দুঃখ-কষ্ট তোদের সঙ্গী হয়ে থাকবে। ঘৃণায় ধিক্কার জানাবে তোদেরকে সবাই। ভিনদেশী যে-মানুষটার জন্য তোর বুড়ো বাপটাকে এত কষ্ট দিলি, সেই মানুষটাও একদিন এর চেয়ে বেশি কষ্ট দিয়ে তোকে বিদায় করে দিবে। লাশ হয়ে পড়ে থাকবি তুই ওই লোকের পাশে। এর কিছুদিন পর ওই লোকের লাশও পড়ে থাকবে কোনো বনেজঙ্গলে। নিজেদের ধ্বংস তোরা নিজেরা ডেকে আনলি...'

দম নেয়ার জন্য থামল সে। সিনরকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মায়া। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'বাবা, দয়া করো, আর কিছু বোলো না। আমার জন্য কি একটুও মায়া হয় না তোমার?'

'একই প্রশ্ন যদি আমি জিজ্ঞেস করি তোকে? আমার জন্য কি একটুও মায়া হয় না তোর? আমার দুঃখকষ্ট দেখে খারাপ লাগে না? আমার সাদা চুল-দাড়ি দেখে বুঝিস না যন্ত্রণা সহ্য করার মতো বয়স নেই আমার? আমার জন্য যার কোনো মায়া নেই তার প্রতি কেন মায়া দেখাতে যাবো? অভিশাপ যা দেয়ার দিয়েছি তোকে। দেখবি, তাকিয়ে তাকিয়ে অসহায়ের মতো শুধু দেখবি, আমার অভিশাপ কীভাবে তোর জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছাড়ে। আর সাদাচামড়ার যে-মানুষটা তোকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তোর কর্তব্য ভুলিয়ে দিল সে-ও নিজের পরিণতি দেখবে...' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল যিব্যালবে। টলে উঠল সে, দুই চোখে ফুটে উঠেছে শূন্যদৃষ্টি। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে—যেন আঁকড়ে ধরতে চায় কোনোকিছু। কিন্তু আমরা কেউ কিছু করার আগে, এমনকী নড়ার আগে জ্ঞান হারাল সে। ওর অচেতন শরীরটা সশব্দে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

আঠারো

পরিকল্পনা

লাফিয়ে আগে বাড়লাম আমি আর সিনর। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। দু'জনে ধরাধরি করে তুললাম যিব্যালবেকে, ওর ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলাম চৌকির উপর। ওর বিবর্ণ চেহারা আর ঠোঁটের কোনায় লেগে থাকা ফেনা দেখল মায়া উঁকি দিয়ে।

'মরে গেছে?' মেয়েটার কণ্ঠে অবিশ্বাস। 'বাবা মরে গেছে? আমাকে অভিশাপ দিতে দিতে মরল আমার বুড়ো বাপটা?'

'না,' মাথা নাড়লেন সিনর, 'মরেনি যিব্যালবে। বুকে হাত দিয়ে দেখেছি, ওর হৃৎপিণ্ড চলছে এখনও। একটু পানি নিয়ে এসো তো, মায়া।'

আদেশ পালন করল মেয়েটা। টানা দু'ঘণ্টা ধরে খাটাখাটুনি করলাম আমরা, কিন্তু লাভ হলো না—অনেক চেষ্টা করেও জ্ঞান ফেরানো গেল না যিব্যালবের। শেষে ক্লান্ত হয়ে আশা ছেড়ে দিলাম। মারা না-গেলে আপনাথেকেই ফিরবে ওর জ্ঞান।

হাঁপিয়ে উঠেছি তিনজনই। বিশ্রাম নিচ্ছি, এমন সময় ঝনঝন শব্দে খুলে গেল তামার দরজা, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে আমাদের সামনে হাজির হলো টিকাল। চৌকিতে লম্বা-হয়ে-শুয়ে-থাকা যিব্যালবের দিকে তাকিয়ে কৌতুকের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার? বুড়ো লোকটা ঘুমাচ্ছে নাকি?'

'হ্যাঁ, ঘুমাচ্ছে,' জবাব দিলেন সিনর, 'এবং আমার মনে হয় আর কোনোদিন ভাঙবে না এই ঘুম। এবার তোমার সিংহাসন দখলের

ব্যাপারটা হালাল হয়ে গেল, নাকি?'

দু'চোখ জ্বলে উঠল টিকালের। কিন্তু নিজেকে সংযত করল সে। বলল, 'না, কথাটা ঠিক না। যিব্যালবের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উপর আমার চেয়ে লেডি মায়ার অধিকার বেশি। অবশ্য ইচ্ছা করলে জোর খাটিয়ে নিজের দখলে সেটা রাখতে পারি আমি যতদিন খুশি। আবার লেডি মায়া চাইলে আমার কাছে সর্দারি হস্তান্তরও করতে পারেন। ওসব কথা পরে হবে, আগে বলুন কীভাবে মারা গেল যিব্যালবে?'

সিনর আবার কী থেকে কী বলে বসেন ভেবে মুখ খুললাম আমি, 'আসলে এই বয়সে এতদূর গেছে বেচারা, তারপর ফিরে এসেছে। বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোটা সহ্য করতে পারেনি ওর শরীর। তা ছাড়া এখানে আসার পর আপনার সর্দারি গ্রহণের ব্যাপারটা দেখে অনেক বড় মানসিক আঘাত পেয়েছে। আপনি চলে যাওয়ার পর আপনার প্রস্তাবটা নিয়ে আলোচনা করছিল আমাদের সঙ্গে। তারপর হঠাৎ করেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। ...যদি কিছু মনে না-করেন একটা কথা বলি। হয়তো কথাটা বলা উচিত হবে না আমার, কারণ এই দেশে আমি একজন কারাবন্দি ছাড়া আর কিছু না আসলে। তারপরও বলছি। এই যে এভাবে, মাটির এত নীচে বন্দি থাকা অবস্থায় মারা গেল যিব্যালবে—এটা কি ঠিক হলো? কেউ তার শুশ্রূষা করতে পারল না, বেচারা অসুস্থ ছিল কিন্তু একজন ডাক্তারও এল না ওকে দেখতে। অথচ এই লোকটা একসময় এই শহরের সর্দার ছিল। কথাটা জানাজানি হলে লোকে কী বলবে ভেবে দেখেছেন? বলবে, আপনি প্রথমে গুম করেছেন ওকে, তারপর খুন করেছেন।'

'খুন করেছি!' আকাশ থেকে পড়ল টিকাল, ভ্রূ কুঁচকে গেছে ওর। 'কিন্তু...কথাটা তো ঠিকই বলেছেন! ...ডাক্তারের কথা বলছিলেন না? হ্যাঁ, ডাক্তার আছে। শহরের সবচেয়ে নামীদামি ডাক্তার হলো মাটাই, আমার শ্বশুর। যাচ্ছি আমি, গিয়ে পাঠাচ্ছি

ওকে। কিন্তু...' মায়ার দিকে তাকাল সে, 'আমাকে কি কিছু বলবেন না আপনি?'

চৌকির পাশে মেঝেতে বসে আছে মায়া, চেহারা ঢেকে রেখেছে দু'হাত দিয়ে। টিকালের কথা শুনে হাত সরিয়ে সরাসরি তাকাল ওর দিকে। বলল, 'তুমি কি মানুষ, না পাষাণ? এ-রকম একটা সময়ে, যখন আমার বাবা মারা গেছে বলে মনে করছি আমরা, তোমাকে বিয়ে করবো কি করবো না সে-ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছ? শোনো, একটা কথা সোজাসুজি বলছি তোমাকে। বাবা সুস্থ হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত, অথবা মারা গেছে কি না সে-ব্যাপারে নিশ্চিত না-হওয়া পর্যন্ত বিয়ের ব্যাপারে কিছুই বলবো না আমি।'

অপ্রস্তুত হয়ে গেল টিকাল। নিচু গলায় বলল, 'ঠিক আছে, লেডি, অপেক্ষা করবো আমি। যাই, গিয়ে পাঠিয়ে দিই মাটাইকে।'

কিছুক্ষণ পর আমাদের সামনে উপস্থিত হলো মাটাই। সঙ্গে অদ্ভুত চেহারার একটা লোক, সম্ভবত ওর সহকারী। লোকটার হাতে কিছু যন্ত্রপাতি আর ওষুধ।

আমাদের দিকে একপলক তাকিয়েই যিব্যালবের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মাটাই। লণ্ঠনের আলোয় ভালোমতো দেখল ওকে। হাত বাড়িয়ে সহকারীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ নিল, যিব্যালবের ঠোঁট ফাঁক করে মুখের ভিতর ঢেলে দিল।

অপেক্ষা করছে মাটাই। বোধহয় ভাবছে, ওর যাদুকরী ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় উঠে বসবে যিব্যালবে। কিন্তু উঠল না যিব্যালবে। সামান্য নড়ছেও না সে।

'অবস্থা তো খুব খারাপ!' মন্তব্য করল মাটাই। 'ওর এই ঘুম আর কোনোদিন ভাঙবে বলে মনে হয় না। কীভাবে ঘটল ঘটনাটা?'

'জানতে চান?' কান্নাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মায়া। 'তা হলে আপনার সহকারীকে বলুন যেন দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। আমি চাই না আমাদের কথোপকথন শুনুক সে।'

সহকারীকে ইশারা করল মাটাই। আমাদের কাছ থেকে দূরে

চল্লে গেল লোকটা।

'প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল বাবা,' বলতে শুরু করল মায়া, 'রাগের মাথায় যা-তা বলছিল আমাকে। তারপর হঠাৎ করেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মুখ দিয়ে ফেনা উঠতে থাকে।'

'কিন্তু...আপনাকে অভিশাপ দিল কেন?'

'কারণ আমি টিকালকে বিয়ে করতে রাজি হইনি।'

চেহারা কালো হয়ে গেল মাটাইয়ের। 'বিয়ের সঙ্গে অভিশাপের কী সম্পর্ক?'

'বুঝিয়ে বলছি,' চোখ মুছল মায়া। 'শহর ছেড়ে প্রায় এক বছর বাইরে ছিলাম আমরা। কথা ছিল আমরা ফিরে এলে আমার সঙ্গে বিয়ে হবে টিকালের। কিন্তু অপেক্ষা করতে পারেনি সে, আপনার মেয়ে নাহুয়াকে বিয়ে করে ফেলেছে। ওকে লেডি অভ দ্য হার্ট বানিয়েছে। অস্বীকার করার উপায় নেই নাহুয়াকে যথেষ্ট সম্মান আর ক্ষমতা দিয়েছে টিকাল, কিন্তু আপনার মেয়েকে একফোঁটাও ভালোবাসে না সে। বাসলে আমাকে দেখামাত্র নাহুয়ার উপর থেকে মন উঠে যেত না ওর।'

থামল মায়া। মাটাইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি ওর চেহারা আরও কালো হয়েছে।

'আজ, কয়েক ঘণ্টা আগে এখানে এসে হাজির হয় টিকাল। বাবাকে বলে আমাদের ব্যাপারে যা যা অভিযোগ করা হয়েছে সব তুলে নেবে। আমাদেরকে মুক্তি দেবে। এমনকী বাবাকে নাকি সর্দারি ফিরিয়ে দেবে। বিনিময়ে শুধু একটা কাজই করতে হবে আমাদেরকে, বলা ভালো আমাকে—ওকে বিয়ে করতে হবে।'

'কী!' দেখে মনে হচ্ছে যেন নিমপাতা চিবিয়েছে মাটাই। 'আপনাকে বিয়ে করবে? বিবাহিত হওয়ার পরও বিয়ে করবে আপনাকে! এক শহরে দু'জন লেডি অভ দ্য হার্ট হবে?'

'না। টিকাল বলেছে, আপনার মেয়ে নাহুয়াকে নাকি সরিয়ে দেবে। এই সরিয়ে দেয়া মানে খুন করা কি না বলতে পারবো না।

নাহুয়াকে যদি সরিয়ে দেয় তা হলে দু'দিন পর আপনাকেও শেষ করবে। কারণ তা না হলে আমাকে কিছুতেই লেডি অভ দ্য হার্ট বানাতে পারবে না টিকাল।'

মাটাইয়ের দু'চোখ জ্বলছে। রাগে কাঁপছে সে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কষ্ট হচ্ছে ওর। চিবিয়ে চিবিয়ে কোনোরকমে বলল, 'এই কথা বলেছে টিকাল? ওর এত বড় সাহস? এত ক্ষমতা? ওকে সর্দার বানিয়েছি আমি আর আমার সঙ্গে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা? ...শয়তানটা আর কী কী বলেছে আমাকে বলুন, লেডি মায়া।'

'আপনি তো জানেনই বাবার বয়স হয়েছে, এত কষ্ট সহ্য করতে পারছিলেন না তিনি। তাই রাজি হয়ে যান টিকালের প্রস্তাবে। অবশ্য বাবার রাজি হওয়ার আরও একটা কারণ আছে। এবং সে-কারণটা আপনি।'

'আমি?' ভ্রূ কুঁচকাল মাটাই, 'কীভাবে?'

'কারণ টিকালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওকে সর্দার হতে সাহায্য করেছেন আপনি। তাই আপনার উপর থেকে মন উঠে গেছে বাবার। এখন আপনার বা আপনার পরিবারের কোনো ক্ষতি হলে কিছু যায়-আসে না তাঁর। এজন্যই টিকালের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন বাবা।'

'আপনি?' মাটাইয়ের গলা যেন বসে গেছে, 'আপনার কি মত?'

'আগেই তো বললাম—সোজা মানা করে দিয়েছি। টিকালকে কোনোকালেই পছন্দ করতাম না আমি, আর ফিরে আসার পর ওর কাজকর্ম দেখে সহ্যই করতে পারি না। মুখের উপর না বলায় ভীষণ ক্ষেপে গেল বাবা, অভিশাপ দিতে শুরু করল আমাকে। অতিরিক্তি উত্তেজনা সহ্য করতে না-পেরে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল মাটাই। তারপর বলল, 'আপনি বললেন টিকালকে বিয়ে করার ইচ্ছা নেই আপনার। তার মানে আপনি কি বিয়েই করতে চান না? নাকি অন্য কাউকে পছন্দ করেন?'

ইশারায় সিনরকে দেখাল মায়া। 'সমুদ্রপুত্র, মানে এই সাদাচামড়ার লোকটাকে পছন্দ করি আমি। তাঁর স্ত্রী হতে চাই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বলল, 'কিন্তু মাটাই, টিকাল খুবই শক্তিশালী। বাইরের কেউ সাহায্য না-করলে ওকে পরাজিত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। আর ওকে পরাজিত করতে না-পারলে আমার, সমুদ্রপুত্রের এবং তাঁর বন্ধু ইগনাশিয়োর জীবন বাঁচানো যাবে না। আবার এমনও হতে পারে, এই দু'জনকে খুন করে আমাকে জোর করে কব্জা করল টিকাল। এখন পর্যন্ত নরম আছে সে, ওর প্রস্তাবের জবাবে আমি কী বলি সে-জন্য অপেক্ষা করছে। ওকে বলেছি বাবা সুস্থ হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত, অথবা মারা গেছে কি না সে-ব্যাপারে নিশ্চিত না-হওয়া পর্যন্ত কিছু বলবো না। এখন আপনিই বলুন কী বলা যায় ওকে।'

চুপ করে আছে মাটাই, কী যেন ভাবছে।

'বলুন, দেশের জনগণ কি আমাকে এতটাই ভালোবাসে যে, বাবা যদি মারা যায় তা হলে আমি আহ্বান জানালে টিকালকে উৎখাত করে আমাকে সিংহাসনে বসাবে?' আবারও জিজ্ঞেস করল মায়া।

'জানি না,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মাটাই। 'কিন্তু এটা বুঝতে পারছি, এখন টিকাল বা আপনি—যার সঙ্গেই থাকি না কেন, আমি আর আমার মেয়ের ধ্বংস অনিবার্য। শুনুন, প্রসঙ্গটা যখন উঠেছেই তখন খোলাখুলি কয়েকটা কথা বলি। আপনাদের অনুপস্থিতিতে টিকালই ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করে। এবং সবার আগে ফুসলায় আমাকে। প্ররোচিত হই আমি, সিটি অভ দ্য হার্টের মন্ত্রণাসভায় বার বার বলি কথাটা। শেষপর্যন্ত ওরা টিকালকে সর্দার বানাতে রাজি হয়ে যায়। নিজের সুবিধাটাও আদায় করে নিতে ছাড়িনি আমি। টিকালকে আগে বলেছিলাম উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে হবে। এর ফলে মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের পদ আমৃত্যু ধরে রাখতে পারবো। পাশাপাশি সর্দারের পর শহরের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তিতে পরিণত হবো। আবার আমার মেয়ে নাহুয়ার অনেক দিনের শখ ছিল লেডি অভ দ্য হার্ট হওয়ার, তা-ও

পূর্ণ হবে। আপনার মুখ থেকে যা শুনলাম তা যদি সত্য হয় তা হলে নাহুয়াকে যে-কোনো সময় শেষ করে দিতে পারে টিকাল। তারপর কিছু একটা বলে সবাইকে বুঝিয়ে দেবে ঘটনাটা নিছকই একটা দুর্ঘটনা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নিজেদেরকে বাঁচাতে গিয়ে আমি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি ওর সঙ্গে, অর্থাৎ আপনাকে সিংহাসনে বসাই তা হলে আমার আর নাহুয়ার কী হবে? আপনার বাবা যদি তখন বেঁচে থাকেন তা হলে তিনি কি ছাড় দেবেন আমাদেরকে?'

জবাব দিল না মায়া। আসলে পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে গেছে যে, চট করে কিছু বলা বা সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হচ্ছে না কারও পক্ষেই।

মায়াকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল মাটাই, 'আচ্ছা, বলুন তো, কোন্ কাজে আপনার বেশি আগ্রহ—সিটি অভ দ্য হার্টের সর্দারি গ্রহণ করা নাকি সমুদ্রপুত্রকে বিয়ে করা?'

'সমুদ্রপুত্রকে বিয়ে করা,' জবাব দিতে দেরি হলো না মায়ার। 'এবং বিয়ের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যেতে চাই এই শহর ছেড়ে।'

'পালিয়ে কোথায় যাবেন?'

'সমুদ্রপুত্রের মতো সাদাচামড়ার মানুষরা যে-দেশে থাকে সে-দেশে।'

'ব্যস? এটুকু পেলেই আপনি খুশি?' মাটাইয়ের কণ্ঠে সন্দেহের সুর।

'না।' আমাকে দেখাল মায়া, 'আমার এবং আমার ভালোবাসার মানুষটার বন্ধু, এই ডন ইগনাশিয়ো নির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের দেশে এসেছেন। তাঁর টাকাপয়সা দরকার যাতে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে পারেন। আমি চাই তাঁকে সাহায্য করা হোক। আমার এই দুটো চাওয়া পূর্ণ হলে, কথা দিচ্ছি এখান থেকে চলে যাবো, আর কোনোদিনও ফিরে আসবো না। সর্দার হিসেবে টিকাল এবং লেডি অভ দ্য হার্ট হিসেবে নাহুয়া

যতদিন পারে শাসন করুক, কোনো আপত্তি জানাবো না। তারপর ওদের বংশধররা সিংহাসনে আরোহণ করবে—আমার বা আমাদের বংশধরদের কোনো দাবি থাকবে না।'

মৃদু হাসল মাটাই। 'দেখা যাচ্ছে অল্পই চাচ্ছেন আপনি। ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখি কী করতে পারি আপনার জন্য। আপাতত বিদায় নিচ্ছি, কারণ একলা বসে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা দরকার। টিকাল যদি আবারও দেখা করতে আসে, হ্যাঁ-না কোনোটাই বলার দরকার নেই। আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবেন আমি দেখে গেছি আপনার বাবাকে, তাঁর অবস্থা ভালো না তাই সময়মতো আবারও দেখতে আসবো।' আমাদের দিকে তাকাল মাটাই। 'আপনাদের দু'জনকে বলছি। মনে রাখবেন এ-বিষয়ে টিকালের সামনে যত কম কথা বলবেন আপনাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা তত বেশি। কাজেই সাবধান।' আর কিছু না-বলে ঘুরে রওয়ানা হলো সে সিঁড়ির দিকে।

আরও দুটো দিন কেটে গেছে।

আসলেই দুই দিন পার হয়েছে কি না নিশ্চিত করে বলতে পারবো না। আমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর পর খাবার দেয়া হয়, সে-হিসেবের সঙ্গে মিল রেখে বলছি। এই দু'দিনে টিকাল বা মাটাই কেউই দেখা করতে আসেনি। তবে অন্য কয়েকজন ডাক্তার এসেছে। যিব্যালবেকে দেখে গেছে। এই দু'দিনেও জ্ঞান ফেরেনি বেচারার, মড়ার মতো এখনও পড়ে আছে চৌকির উপর। দেখলে মনে হয় তলিয়ে আছে গভীর ঘুমে। যে ডাক্তাররা এসেছে তারা সবাই বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছে, কিন্তু যিব্যালবের জ্ঞান ফেরাতে পারেনি।

দ্বিতীয় দিন রাতের কথা। আমি, সিনর আর মায়া দাঁড়িয়ে আছি যিব্যালবের চৌকির পাশে। দেখছি বেচারাকে, আর নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছি। বাইরের জগৎ থেকে এই বিচ্ছিন্নতা আর

ঘনিয়ে-আসা মৃত্যুর ভাবনা চেপে বসেছে মনের উপর। এমনকী সদা-হাস্যোজ্জ্বল সিনরও কেমন চুপ হয়ে গেছেন। মায়ার মধ্যেও কোনো উৎসাহ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

'আফসোস!' কান্নাজড়িত কণ্ঠে সিনরকে বলল মায়া, 'যদি কোনোদিনও দেখা না-হতো আমাদের! যদি কোনোদিনও মন দেয়া-নেয়া না-হতো আমাদের মধ্যে! আমার কারণেই এখানে এভাবে আটকে থেকে নিষ্ঠুর মৃত্যুর অপেক্ষা করতে হচ্ছে আপনাকে। ইগনাশিয়োও নিশ্চয়ই মনে মনে দুষছেন আমাকে। হয়তো ভাবছেন, মেয়েরা খারাপ—তাদের জন্য সবসময় ঝামেলা পোহাতে হয় পুরুষদেরকে। কত বড় আশা নিয়ে, কত মহৎ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিলেন, আজ সব শেষ হতে বসেছে!' চোখ মুছে তাকাল সে সিনরের দিকে, খামচে ধরল তাঁর হাত। 'বলুন, শুধু একবার বলুন আমার উপর থেকে মন উঠে গেছে আপনার। বলুন আমার জন্য এত কষ্ট আর সহ্য করতে পারছেন না। নিজেকে টিকালের কাছে সমর্পণ করি আমি। তা হলে আর এত কষ্ট করতে হবে না আপনাদেরকে। টিকালের সঙ্গে চুক্তি করবো—ওকে বিয়ে করার আগে অবশ্যই আপনাদেরকে নিরাপদে চলে যেতে দিতে হবে। নিজ দায়িত্বে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ তুলে দেবো আপনাদের হাতে। দেশে ফিরে ওসব কাজে লাগিয়ে বাকি জীবন রাজার হালে থাকতে পারবেন আপনারা,' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল বেচারী। 'আমাকে নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। কারণ আপনারা চলে যাওয়ার পর আত্মহত্যা করবো আমি। তারপর...পরকালে যদি সম্ভব হয়, পরকাল যদি সত্য হয় তা হলে আবার দেখা হবে...'

'এভাবে বোলো না,' মেয়েটাকে বুকে টেনে নিলেন সিনর, 'আমাদের কপালে যা-ই থাকুক না কেন, দু'জনে একসঙ্গে সহ্য করবো। তোমাকে ছাড়া আমার জীবন অর্থহীন। কাজেই যত সম্পদই দাও না কেন তার কোনো মূল্য নেই আমার কাছে। তোমাকে ছাড়া বেঁচে থাকার চেয়ে তোমার পাশে থেকে মৃত্যুবরণ

করা আমার জন্য অনেক ভালো। আমারই দোষ—সব জানার পরও জোর করে সিটি অভ দ্য হার্টে নিয়ে এসেছি তোমাদেরকে। আসলে কৌতূহল দমিয়ে রাখতে পারিনি। কারণ অনেকদিন থেকেই এই দেশটা দেখার ইচ্ছা ছিল। ইগনাশিয়োকে রেখে আসতে পারতাম; তা-ও করিনি কারণ তা হলে বেচারা একা হয়ে যেত। মায়া, সাহস রাখো। তোমার বাবার যদি কিছু হয়েও যায়, আমাদেরকে যদি আরও বড় বিপদের মোকাবেলা করতে হয়, তারপরও আমি নিশ্চিত এই ডানজন থেকে মুক্তি পাবো আমরা, দু'জনে সুখী জীবন যাপন করতে পারবো।'

মুখ নামিয়ে চুমু খেলেন তিনি মায়ার ঠোঁটে। মেয়েটার গাল বেয়ে নেমে-আসা অশ্রু মুছিয়ে দিতে লাগলেন পরম মমতায়।

এমন সময় দরজায় একটা ছায়া নজরে পড়ল আমার। ঝট্ করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, মাটাই দাঁড়িয়ে আছে। কখন এসেছে সে টেরই পাইনি। কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে আমাদেরকে। চেহারাটা কেমন বিষাদগ্রস্ত।

'আসতে একটু দেরি হয়ে গেল,' খেয়াল করলাম নিচু গলায় কথা বলছে সে, 'আশা করি ব্যাপারটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।' মায়ার দিকে তাকাল সে। 'আপনার বাবার কী অবস্থা?'

'বেঁচে আছে,' মায়ার বদলে জবাব দিলাম আমি। 'এর বেশি আর কিছু বলতে পারছি না। জ্ঞান নেই বেচারার। এবং সন্দেহ নেই, এভাবে চলতে থাকলে আর কয়েকদিন পরই মারা যাবে। আসুন, আপনি নিজেই দেখে যান।'

ধীর পায়ে এগিয়ে এল মাটাই। যিব্যালবের চৌকির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। চোখের পাতা ফাঁক করে দেখল, বুকে হাত দিয়ে হৃৎস্পন্দন অনুভব করল। তারপর বলল, 'ঠিকই বলেছেন। আর কয়েকটা দিন পরই হয়তো...মারা যাবে লোকটা।' ঘুরে তাকাল আমাদের দিকে। 'এবার কাজের কথায় আসা যাক। শহরে সমস্যা হচ্ছে। গুজব ছড়িয়ে পড়েছে লোকের মুখে মুখে। অনেকেই বলাবলি করছে,

যিব্যালবেকে খুন করে লাশ গুম করে ফেলেছে টিকাল। বুড়ো লোকটাকে নিয়ে তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই কারও, কিন্তু আপনাকে দেখতে চায় ওরা। ওদের দাবি, ওদের সামনে হাজির করতে হবে আপনাকে। ক্ষমতা ছাড়তে হবে টিকালকে। আপনাকে বসাতে হবে সিংহাসনে। এই অবস্থায় মন্ত্রণাসভার সদস্যদেরকে নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেছিল টিকাল। বেশিরভাগ সদস্য বলল, গুজব যখন উঠেছেই তখন তা থামানোর চেষ্টা না-করলে সবদিক দিয়ে ভালো হবে টিকালের জন্য। এখন জল্লাদ পাঠিয়ে আপনাদের চারজনকে পরপারে পাঠিয়ে দেয়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। যিব্যালবে আর দুই ভিনদেশীকে খুন করতে আপত্তি নেই টিকালের। কিন্তু লেডি মায়া, আপনার বেলায় বেঁকে বসেছে সে। বার বার বলছে আপনি নির্দোষ, আপনার রক্তে হাত রাঙাতে সে নারাজ।'

'তারমানে আমাদেরকে রক্ষা করার কোনো পরিকল্পনাই করতে পারেননি আপনি?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল মায়া।

'কেন পরিকল্পনা করবো? আপনাদের চারজনের মৃত্যুই কি আমার আর নাহুয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো না?'

মাটাই কথাটা বলে শেষও করতে পারেনি, তার আগেই একলাফে দরজার কাছে পৌঁছে গেলেন সিনর। দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মরলে একা মরতে রাজি না আমি। বুড়ো শয়তান, এবার তোমাকেও মরতে হবে আমাদের সঙ্গে। খাঁচায় বন্দি পাখির মতো যদি মরতে হয় আমাদেরকে তা হলে তোমার ঘাড়টা সবার আগে মটকাবো, বলে রাখলাম।'

এক কদম পিছিয়ে গেল মাটাই, খেয়াল করলাম ঢোক গিলছে সে। সভয়ে বলল, 'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন। আমি যদি এখান থেকে নিরাপদে না-ফিরি, অথবা আমার ফিরতে যদি বেশি দেরি হয় তা হলে কেউ-না-কেউ আমার খোঁজ করবে। এবং চলে আসবে এখানে। তখন কী হবে?'

'আর কী হবে?' ভেংচি কাটার ভঙ্গিতে বললেন সিনর। 'তোমার

লাশ পাবে। তুমি বেশি চালাক তো, অতি-চালাকদের গলায় সবসময় দড়ি পড়ে—জানো না?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মাটাই। তারপর বলল, 'না-হয় হত্যা করলেন আমাকে। কিন্তু তাতে কি আপনাদের বিপদ কমবে? জল্লাদ আসবেই। আপনাদের তিনজনকে, এমনকী হয়তো লেডি মায়াকেও খুন করবে। নাহুয়া এখন যে-অবস্থায় আছে সে-অবস্থাতেই থাকবে। আমি নিজের চেয়ে বেশি ভালোবাসি আমার মেয়েটাকে। কাজেই সে সুখেশান্তিতে জীবন কাটাতে পারলে আমার আর কী চাওয়ার থাকতে পারে? তা ছাড়া আপনি এত রেগে যাচ্ছেন কেন বুঝতে পারছি না। আমি সহজ ভঙ্গিতে শুধু জিজ্ঞেস করেছি কেন কোনো পরিকল্পনা করবো। আমি কিন্তু বলিনি কোনো পরিকল্পনা করিনি।'

'তা হলে আর দেরি না-করে খুলে বলো, বুড়ো শিয়াল কোথাকার!' তাড়া দিলেন সিনর।

বাউ করে বলতে শুরু করল মাটাই, 'আমার কথা ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। আমি ভেবে দেখেছি, লেডি মায়াকে খুন করাটা কঠিন হবে টিকালের জন্য। আর আপনাদের তিনজনকেও এত সহজে খুন করাতে পারবে না। কারণ লেডি মায়াকে জীবিত রেখে আপনাদেরকে খুন করালে, সে জানে কোনোদিনও বিয়েতে রাজি করাতে পারবে না লেডিকে, উপরন্তু সুযোগ পেলেই আত্মহত্যা করবেন তিনি। সে-জন্যই মন্ত্রণাসভার সদস্যরা বার বার বলার পরও কালক্ষেপণ করছে। আবার এদিকে দিন যত যাচ্ছে তত ক্ষেপে উঠছে জনতা। কাজেই পরিস্থিতি আপাতত সামলানোর জন্য টিকাল কী করতে পারে জানেন? আমার মনে হয় লেডি মায়ার সঙ্গে দেখা করার জন্য আসবে সে। লেডিকে যেভাবেই হোক বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করাবে, তারপর যে-রাতে পানি বাড়তে শুরু করবে হ্রদে সে-রাতে নিয়ে গিয়ে হাজির করাবে মন্ত্রণাসভার সদস্যদের সামনে, বলা ভালো জনতার সামনে। হয়তো জানেন আপনারা, ওই দিন, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মন্দিরে জড়ো হতে হয় সবাইকে।

জনতা কিন্তু, আগেও বলেছি, যিব্যালবেকে নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামাচ্ছে না। কিন্তু ওর একটা কথায় দারুণ আলোড়ন তৈরি হয়েছে ওদের মধ্যে। গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে সবাই—"দিবা" আর "নিশি" একসঙ্গে হলে কী ঘটে দেখার জন্য। এই কী "ঘটবার" ব্যাপারটা নিয়েই একটা বুদ্ধি বের করেছি আমি।'

থামল মাটাই, দম নিল। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'দেখুন, বয়স কম হয়নি আমার। যুগের পর যুগ ধরে এই মন্দিরে পুরোহিত হিসেবে কাজ করে যাচ্ছি। তারপরও একটা কথা বলি, শুনলে আশ্চর্য লাগতে পারে আপনাদের কাছে। এতগুলো বছর দেবতাদের পূজা করলাম, এতগুলো বছর বলি চড়ালাম তাঁদের নামে, জনতার সামনে চোখ বন্ধ করে গভীর ধ্যানমগ্ন হওয়ার ভান করলাম, তারপরও একটাবারের জন্যও আমার প্রার্থনার কোনো জবাব পেলাম না কোনো দেবতার কাছ থেকে। এমনকী কারও কাছ থেকে শুনলাম না সে কোনো দেবতার কণ্ঠ শুনেছে। শেষবয়সে এসে আজকাল মাঝেমধ্যে কী মনে হয় আমার জানেন? মনে হয়, দেবতারা আসলেই আছেন, নাকি সবই মানুষের কল্পনা? মানুষরাই কি নিজেদের মতো করে নাম দিয়েছে একেকজনকে? জানি না—আসলে এ-ব্যাপারে তেমন কিছুই জানি না আমি। জানার চেষ্টাও করিনি কখনও। তাই বিষয়টা নিয়ে বিতর্কে যাবো না।'

'আসলে...' মায়ার কণ্ঠে দ্বিধা, 'আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।'

'আমি বলতে চাচ্ছি, "দিবা" আর "নিশি" যদি দেবতাদের পক্ষ থেকে এসে থাকে তা হলে পবিত্র বেদিতে ও-দুটোকে জোড়া লাগানো হলে কিছু-না-কিছু ঘটবেই। অন্ততপক্ষে ঘটা উচিত, তা-ই না?'

অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছি আমরা। মাটাই কী বোঝাতে চাচ্ছে বুঝতে পারছি না।

ব্যাপারটা ধরতে পারল মাটাই। মুচকি হাসল সে। বলতে লাগল, 'মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমার উপর। আমি জানি, যে-বেদির উপর একসঙ্গে করা হবে "দিবা" আর "নিশিকে" তা আসলে ফাঁপা। এখন ধরুন, অনুমানের উপর ভিত্তি করে বলছি, দিবা-নিশি একসঙ্গে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাজ্জব একটা ঘটনা ঘটল। হঠাৎ করেই বেদির একটা অংশ সরে গিয়ে কিছু একটা উন্মোচিত হয়ে পড়ল সবার সামনে। সেই কিছু একটা...ধরে নিন দেবতাদের পক্ষ থেকে পাঠানো কোনো একটা প্রাচীন লেখনী। জিনিসটা অনেক পুরনো, কিন্তু লেখা হয়েছে বর্তমান সময়ের উপর ভিত্তি করে; অর্থাৎ অনেক আগে কোনো একজন দেবতা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। এ-রকম ঘটলে কেমন হয় বলুন তো?'

চুপ করে আছি আমরা তিনজনই। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি মাটাইয়ের দিকে।

'আমার মনে হয় খারাপ হয় না,' নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিল মাটাই। 'ব্যাপারটা আপনাদের জন্য অন্ধকারে হাতড়ে মরছে এমন কোনো লোকের লণ্ঠন খুঁজে পাওয়ার মতো হবে, ঠিক না?' বলতে বলতে পোশাকের ভিতর থেকে বিবর্ণ একটুকরো সোনার-পাত বের করল।

খেয়াল করলাম, পাতটার গায়ে হায়ারোগ্লিফিক্সে কী সব যেন লেখা আছে।

'পড়ে শোনান আমাদেরকে,' বলল মায়া।

পড়তে শুরু করল মাটাই, '"আমি সেই অস্তিত্ব যে সৃষ্টি করেছে সবকিছু। এই মন্দির যখন বানানো হয় তখন আমার মনোনীত এক ব্যক্তি আমার আদেশেই এই কথাগুলো লিখেছে একটা সোনার-পাতের উপর। তারপর পাতটা গোপনে লুকিয়ে রেখেছে যাতে যেদিন একসঙ্গে হবে "দিবা" আর "নিশি" সেদিন, এমন এক পবিত্র মেয়ে জানতে পারে কথাগুলো যে আজ পর্যন্ত জন্মায়নি। পথভ্রষ্ট যে-জাতিকে পথ দেখাচ্ছি আমি তাদের নামের সঙ্গে ওই মেয়ের নামের

মিল থাকবে। যে-সময়ে আমার এই বাণী উন্মোচিত হবে ততদিনে ওই জাতির অনেকেই বুড়ো হয়ে যাবে, ওদের সংখ্যাও কমে যাবে। সাহস হারিয়ে ফেলবে ওরা, হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়বে সবার মাঝে। ওই সময়ে ওই মেয়ে বিয়ে করবে এক সাদা দেবতাকে যাকে সাগরজলের উপর ভাসিয়ে, মরুভূমি পার করে নিয়ে আসবো আমি। যদি তোমরা ওদের কথা শোনো, দিন দিন উন্নতি করবে, শক্তিশালী হবে। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়বে তোমাদের সাম্রাজ্য।'"

পড়া শেষ হয়েছে মাটাইয়ের। আমরা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি ওর দিকে। ওই বুড়ো লোকটার সাহস আর ধূর্ততা দেখে তাজ্জব হয়ে গেছি।

কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল মায়া, 'আপনি জালিয়াতি করেছেন। এই লেখাটা কিছুতেই মহান দেবতার পক্ষ থেকে হতে পারে না। ...কোত্থেকে, কীভাবে যোগাড় করেছেন এটা?'

হাসল মাটাই। 'এতগুলো বছর এই মন্দিরে কাটিয়েছি আমি। কোথায় কী আছে না-আছে তা আমার চেয়ে ভালো কে জানে?'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি আমরা। এই মাটাই লোকটা কি সব প্রশ্নেরই জবাব কোনো-না-কোনোভাবে দিয়ে আসল কথা এড়িয়ে যেতে পারে?

আমাদেরকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল সে, 'প্রাচীন এই স্বর্ণপাতটা "আবিষ্কৃত" হওয়ার পর, এর গায়ে লেখা কথাগুলো জানতে পারার পর জনতা তো বটেই, মন্ত্রণাসভার সদস্যদের, এমনকী টিকালের কী অবস্থা হতে পারে বুঝতে পারছেন?'

বুঝতে পারছি। এবং বুঝতে পারছি বলেই চুপ করে আছি আমরা।

'আমার বুদ্ধি যদি পছন্দ না-হয় আপনাদের, যদি আপনাদের কারও মাথায় বিকল্প কোনো চিন্তা থেকে থাকে তা হলে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন।'

আমরা কেউই কিছু বললাম না। কারণ আমাদের কারও মাথায় অন্য কানো বুদ্ধি নেই। তবে মাটাইয়ের পরিকল্পনাটা, সততার খাতিরে যদি বলি, বাটপাড়ি ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু এখন আমরা অনন্যোপায়। ওর কথামতো চলা ছাড়া রাস্তা নেই। ওর সাহায্য ছাড়া নিজেরা কিছু করতেও পারবো না।

'বেশ,' আমরা কেউ মুখে কিছু না-বললেও আমাদের মনের কথা টের পেয়ে গেছে মাটাই, 'চলুন তা হলে আমার সঙ্গে। এই জেলখানা থেকে বের হওয়ার গোপন একটা পথ জানা আছে আমার। ওই পথ ধরেই এখানে এসেছি আমি, তাই আমার উপস্থিতি টের পাননি আপনারা কেউ।' এগোতে গিয়েও হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে, মায়াকে যিব্যালবের দিকে তাকাতে দেখেছে। 'না, না, অত চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। এখনও জ্ঞান ফেরেনি আপনার বাবার, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি মরবেন না তিনি। আরেকটা কথা। "দিবা" আর "নিশিকে" সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই আমি।'

এমন সময় খুবই অস্ফুট কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল কে যেন। চমকে উঠে তাকালাম যিব্যালবের দিকে। সে ছাড়া আর কে এমন আওয়াজ করতে পারে? কিন্তু আগের মতোই নিথর হয়ে পড়ে আছে লোকটা, নড়ছে না একটুও। ভুল শুনেছি ভেবে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে তাকালাম মাটাইয়ের দিকে। বললাম, 'আমার কাছে একটা টুকরো আছে,' গলায় ঝোলানো কবজটা হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম।

'আরেকটা টুকরো আছে বাবার কাছে,' জানাল মায়া।

'তা হলে যত তাড়াতাড়ি পারুন খুঁজে বের করুন সেটা,' দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মাটাই। 'আমাদের হাতে সময় কম।'

উনিশ

ধর্মদ্রোহিতা

নিথর যিব্যালবের দিকে এগিয়ে গেল মায়া। ওর উপর ঝুঁকে পড়ে গলা থেকে খুলে নিল কবচটা।

'শুনেছি আগের দিনে নাকি মড়ার শরীর থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র হাতিয়ে নিত চোরেরা,' নিষ্প্রাণ গলায় বলল মায়া, 'নিজেকে সে-রকম চোর মনে হচ্ছে।'

'মনে হলেও কিছু করার নেই,' সান্ত্বনা দিল মাটাই। 'বাঁচতে হলে এখন চুরি ডাকাতি বাটপাড়ি সব করতে হবে। চলুন, রওনা হই। রাত বাড়ছে।' আমার আর সিনরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা একটা করে লণ্ঠন নিয়ে নিন।'

যে-দিন বন্দি হয়েছিলাম এই ডানজনে, ঘুরতে ঘুরতে একটা দরজার সামনে এসে থেমেছিলাম। ওপারে ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেই দরজার সামনে আমাদেরকে নিয়ে এল মাটাই। পোশাকের পকেট থেকে চাবি বের করে দরজাটা খুলল। একে একে আমরা চারজনে চলে এলাম এপারে। খেয়াল করলাম পাল্লাটা টেনে দিল মাটাই, কিন্তু তালা দিল না।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস না-করে পারলাম না, 'তালা লাগালেন না কেন?'

'কারণ আমাদেরকে অনুসরণ করার কেউ নেই,' বলল মাটাই। 'তা ছাড়া মন্দিরে কী ঘটে তার কোনো ঠিক নেই। তাড়া খেয়ে পালাতে হতে পারে আমাদেরকে। তখন আশ্রয় নেয়ার মতো একটা

জায়গাই থাকবে—এই ডানজন। কাজেই ওই অবস্থায় তালা-দেয়া দরজার চেয়ে তালা-ছাড়া দরজাই কি ভালো না?'

'এমন কে বা কী আছে মন্দিরে যে, তাড়া খেয়ে পালানোর কথা ভাবছেন?' আবারও জিজ্ঞেস করলাম।

জবাব না-দিয়ে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মাটাই, এগিয়ে চলল সামনের দিকে। অনেকগুলো প্যাসেজ আর গোপন দরজা পার হতে হলো আমাদেরকে। খেয়াল করলাম প্রতিটা দরজাই টেনে দিচ্ছে মাটাই, কিন্তু তালা দিচ্ছে না। যা-হোক, শেষপর্যন্ত আমরা হাজির হলাম মার্বেলের একটা পুরু দেয়ালের সামনে।

আমাদেরকে আলোটা নিচু করে ধরতে বলে দেয়াল হাতড়াতে শুরু করল মাটাই। কিছুক্ষণ পর খুঁজে পেল নির্দিষ্ট জায়গাটা। হাত দিয়ে কায়দামতো ঠেলা দিতেই ছোট একটা ফোকর বেরিয়ে পড়ল। এটা আসলে সাধারণ কোনো ফোকর না, প্রকৃতপক্ষে চাবির ফুটো। পকেট থেকে আবার চাবির গোছা বের করল সে। বেছে বেছে রূপার একটা চাবি নিল। চাবিটা ঢুকাল ফুটোতে, হাত রাখল দেয়ালের নির্দিষ্ট একটা পাথরের গায়ে। তারপর একইসঙ্গে মোচড় দিল চাবিটা এবং হাত দিয়ে ধাক্কা দিল পাথরে। মৃদু ঘড়ঘড় শব্দ হলো, দেয়ালের একটা অংশ ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল দু'ফুট চওড়া আর ছ'ফুট উঁচু একটা প্যানেল।

আলো আসছে প্যানেলের ওপ্রান্ত থেকে। আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল মাটাই। তারপর ঢুকে পড়ল প্যানেলের ভিতরে। আমরা একে একে পিছু নিলাম ওর। কেউ বলে না-দিলেও বুঝতে পারছি, মন্দির বলতে যা বোঝায় সিটি অভ দ্য হার্টের লোকেরা, ঢুকে পড়েছি সে-জায়গায়!

থেমে দাঁড়িয়েছে মাটাই, এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে। আমরাও দাঁড়িয়ে পড়েছি। অতিরিক্ত উত্তেজনায় একজন আরেকজনের হাত চেপে ধরেছি কখন নিজেরাও জানি না।

চেম্বারের মতো দেখতে বেশ বড় আর খোলামেলা একটা

জায়গায় হাজির হয়েছি। চারদিকের অসম্পূর্ণ দেয়াল ছাদ স্পর্শ করেনি, সেখান দিয়ে আলো আসছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার উল্টোদিকের দেয়ালের সঙ্গে মেঝে ঘেঁষে কায়দা করে লাগানো আছে ইয়াশ্‌ম্‌-পাথর-ঘষে-বানানো বিশাল এক মুখোশ, কতদিনের পুরনো কে জানে! ওটার দিকে তাকালেই কেমন ছমছম করে উঠে শরীর। মেক্সিকোর অতি-প্রাচীন কিছু শহরে এ-রকম মুখোশ আগেও দেখেছি আমি। এমনভাবে বানানো হয়েছে যে, দেখে বোঝার উপায় নেই চেহারাটা পুরুষের না মেয়েলোকের। কেমন একটা নিষ্ঠুর ভাব ফুটে আছে। মনে হয় দর্শকের দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে, অথচ একইসঙ্গে ডুবে আছে গভীর কোনো ভাবনায়। মোটা দুই ঠোঁটে লেপ্টে আছে অবজ্ঞার হাসি। বেরিয়ে পড়েছে মাড়ি, দেখা যাচ্ছে সাদা এনামেল-করা কয়েকটা দাঁত। নাকটা ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো, নাসারন্ধ্র স্ফীত। কপাল চওড়া, কিছুটা ভিতরের দিকে ঢুকে গেছে মনে হয়। কারও হাতের ছাপ দেখা যাচ্ছে সেখানে। বোধহয় রক্তে বা লাল রঙে মাখিয়ে দাগ বসিয়ে দিয়ে গেছে ইচ্ছে করেই। যতদূর বুঝতে পারছি ফসফরাস লাগানো আছে মুখোশটাতে। কারণ জ্বলজ্বল করছে সেটা। অক্ষিকোটর শূন্য, তার বদলে দেয়ালের গায়ে উপযুক্ত জায়গায় খোপ করে বসানো আছে দুটো জ্বলন্ত লণ্ঠন। দেখলে মনে হয় মুখোশটার দুই চোখ জ্বলছে। আগুনের আভাও এসে পড়েছে জিনিসটার উপর।

এই হলো স্বর্ণশহরের প্রধান দেবতার প্রতিমূর্তি। এই দেবতার চেহারা আছে কিন্তু কোনো আকার নেই। এখানকার লোকেরা বলে এই মুখোশের মুখ দিয়ে নাকি কখনও কখনও স্বর্গীয় বাণী উচ্চারিত হয়। কেউ বলে এই নিরাকার প্রধান দেবতাই সব ক্ষমতার উৎস। অনন্তকালের জন্য এই দেবতা সূর্যের আলো থেকে আড়ালে চলে গেছেন। তাই চাঁদের উপর, অন্যভাবে বললে পবিত্র হ্রদের পানি বাড়া-কমার উপর তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে।

খেয়াল করে দেখলাম, মুখোশটার কপালে হাতের যে-ছাপ দেখা

যাচ্ছে তা রঙের না, রক্তের দাগ। এবং হাতটা কোনো মহিলার। কারণ মাটাইয়ের কাছ থেকে জানতে পারলাম নারীরা নাকি এই দেবতার কাছে নতুন জীবনের প্রতীক। তাই সুদূর অতীতকাল থেকে কোনো এক নারীর রক্তের দাগ কপালে বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। এতে তাঁর ক্ষমতা নাকি দিন দিন আরও বাড়ছে। কারণ রক্ত তাঁর ক্রোধ জাগায়, আর ক্রোধ কর্মের উদ্দীপনা তৈরি করে। এই উদ্দীপনা তিনি ছড়িয়ে দেন ছোট ছোট দেবতাদের ভিতরে। ফলে তাঁরা সাধারণ মানুষদের প্রার্থনা শুনতে বাধ্য হন এবং সে-অনুযায়ী কাজ করেন।

স্বর্ণশহরের অধিবাসীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, এই নিরাকার এবং নামবিহীন দেবতাই সব মানুষ আর সব দেবতার অধিপতি। তাঁর সেই হৃৎপিণ্ড, মানে "দিবা" আর "নিশির" যোগফল সমস্ত পৃথিবীর আত্মা—হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড। আর তাই এই শহরের বাসিন্দাদের কাছে এই মন্দির অত্যন্ত পবিত্র। সিঁড়ি ভেঙে বেশি হলে বেদি পর্যন্ত আসে ওরা, নিরাকার নামবিহীন সত্তার এই গোপন বিশ্রামস্থলে বলতে গেলে কখনোই প্রবেশ করে না।

চোখ সরালাম মুখোশের উপর থেকে। এদিকে-সেদিকে তাকাতে লাগলাম। গম্বুজাকৃতির ছাদটা বেশি উঁচু না। আকাশের সঙ্গে মিল রেখে অলঙ্করণ করা হয়েছে ছাদে। একদিকে বসানো আছে বড় একটা সোনার-সূর্য। আরেকদিকে ঝুলছে রূপার বাঁকা চাঁদ। ছোট ছোট কিছু তারাও দেখা যাচ্ছে। মেক্সিকান-অনিক্স নামের পলিশকরা অতি-সুদৃশ্য পাথরের ব্লক দিয়ে বানানো হয়েছে চারদিকের দেয়াল। তবে ছাদ স্পর্শ করেনি দেয়ালগুলো, একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত ওঠার পর শেষ হয়ে গেছে। আলো-বাতাস আসা অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক খোলা রাখা হয়েছে চারদিক। মুখোশটা যেখানে ঝুলছে তার ঠিক উল্টোদিকেই দেখা যাচ্ছে সরু একটা দরজা।

নিচু দেয়ালগুলোতে হায়ারোগ্লিফিক্সে কী যেন লেখা আছে। কোথাও ঝুলছে "ছোট" দেবতাদের মুখোশ। সবগুলো মুখোশ সোনা

দিয়ে বানানো। এমনকী হায়ারোগ্লিফিক্সগুলোও সোনার পাতে সোনা দিয়ে লেখা হয়েছে। আসবাব বলতে ছোট ছোট কয়েকটা টুল আর একটা টেবিল। টুলগুলো বানানো হয়েছে দামি কাঠ কেটে। বিচিত্র সব নকশা করা হয়েছে সেগুলোর গায়ে। টেবিলটা এককোনায়, তার উপর দেখা যাচ্ছে গাছের ছাল থেকে তৈরি-করা কাগজ। ব্রাশ, রঞ্জকের পাত্র ইত্যাদিও আছে সেখানে। এই এলাকার লোকেরা মনের ভাব প্রকাশ করে চিত্রলিপির সাহায্যে, আর চিত্রলিপির জন্য ওই জিনিসগুলো যথোপযুক্ত।

আমরা যে-জায়গা দিয়ে ঢুকেছি এই চেম্বারে সে-জায়গার কাছে কালো মার্বেলের একটা বেদি। খাঁটি সোনা দিয়ে খোদাই করে কী যেন লেখা আছে বেদির গায়ে। কিছু একটা আছে সেটার উপর। এক টুকরো রেশমী কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে বলে দেখতে পাচ্ছি না।

পুরো এক মিনিট বা তার কিছু বেশি সময় ধরে চুপ করে থাকলাম আমরা। আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি চারদিকে। একসময় কিছুটা অধৈর্য কণ্ঠে ফিসফিস করে বলে উঠল মাটাই, 'চলুন, আর দেরি করাটা ঠিক হচ্ছে না। যে-কাজের জন্য এসেছি তা করে ফেলি,' বলে কালো মার্বেলের ওই বেদিটার দিকে এগিয়ে গেল সে। তুলে ফেলল রেশমী কাপড়টা। বেরিয়ে পড়ল একটা মানব হৃৎপিণ্ড—ব্লাডস্টোন পাথর দিয়ে বানানো, ধমনীগুলো সোনায় মোড়া। হৃৎপিণ্ডটার ঠিক মাঝখানে ছোট একটা ফোকর।

'আমাদের ইতিহাসটা বলি,' এখনও ফিসফিস করছে মাটাই, 'যখন দিবা আর নিশিকে একসঙ্গে রাখা হবে এই ফোকরের ভিতরে, বিশেষ কোনো কারণে নির্দিষ্ট কিছু একটা প্রকাশিত হবে দর্শকদের সামনে। কারণটা জানতে চাইবেন না দয়া করে, আমার জানা নেই। হাজার বছর আগে কুকুমাট্য এভাবেই নকশা করে গিয়েছিলেন, সে-রহস্য আজও ভেদ করতে পারিনি আমরা। তবে আমার অনুমান,

ব্লাডস্টোনের হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে জোড়া লাগানো অবস্থায় এমন কিছু কলকব্জা আছে এই মন্দিরের ভিতরে যার ফলে ঘটবে ঘটনাটা। ব্যাপারটা নির্ভর করছে কলকব্জাগুলো এখনও সচল আছে কি না তার উপর। যা-হোক, দিবা-নিশির একটা ছিল এখানে, শহর ছেড়ে যাওয়ার সময় ওটা সঙ্গে করে গিয়েছিল যিব্যালবে।' মায়ার দিকে একবার তাকিয়ে বলতে লাগল, 'এই বেদির গায়ে হায়ারোগ্লিফিক্সে কী লেখা আছে জানেন? লেখা আছে, যে বা যারা এই হৃৎপিণ্ডের ভিতর থেকে দিবা-নিশির কোনো একটাকে অথবা দুটোকেই বের করবে, দেবতাদের অভিশাপ নামবে তাদের উপর। অভিশাপ নামবে সিটি অভ দ্য হার্টের উপর। হ্রদের পানি বাড়তে শুরু করবে। ভেঙে যাবে ফ্লাডগেট। তলিয়ে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পুরো শহর। ধ্বংস হয়ে যাবে সবকিছু, মারা যাবে সবাই।'

জ্বলে উঠল মায়ার দু'চোখ। ঝট্ করে মাটাইয়ের দিকে তাকাল সে। রাগ চেপে রেখে নিচু গলায় বলল, 'কিন্তু একটা টুকরো প্রায় এক বছর ছিল আমাদের কাছে, কিছুই তো হয়নি? হ্রদের পানি বেড়ে গিয়ে শহরটা কি তলিয়ে গেছে? ফ্লাডগেট ভেঙে গেছে? মারা গেছে কেউ?'

মুচকি হাসল মাটাই। 'কিছুই হয়নি? রত্নপাথরের টুকরোটা যতদিন ছিল আপনাদের কাছে ততদিন কি কোনো দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়নি? প্রাণসংশয় দেখা দেয়নি? এখানে ফিরে এসে কী দেখলেন? সিংহাসন হাতছাড়া হয়েছে। এটা কি অনেক বড় ক্ষতি না? বর্তমানের কথা ভাবুন। আপনার বাবা মুমূর্ষু, আপনাদের জীবন টিকালের হাতে। আর ভবিষ্যতে কী আছে তা নিশ্চিত করে বলতে পারেন আপনি?'

জবাব দিল না মায়া।

আমাদের দিকে তাকাল মাটাই। 'আপনারা আধুনিক মনের মানুষ, হয়তো অভিশাপে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু হাজার বছর আগে, এই শহর নির্মাণের সময় বুদ্ধিমান আর সতর্ক কুকুমাট্য্ কী

কী করে গেছেন তা কি জানা আছে আপনাদের? আগেও বলেছি আবারও বলছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে কোথাও-না-কোথাও কোনো-না-কোনো কলকব্জা বসানো আছে। সেই কব্জার একটা অংশ যদি ফ্লাডগেটের সঙ্গেও যুক্ত থাকে তা হলে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? অনেকদিন হয়ে গেছে বলে হয়তো আগের মতো সচল নেই কব্জাগুলো, কিন্তু হাজার বছর আগের কাহিনির আমরা কতটা জানি? তখন হয়তো দিবা-নিশি সরিয়ে নেয়া মাত্রই সরে যেত কব্জাটা, ফ্লাডগেটে এমন কোনো ত্রুটি দেখা দিত যার কারণে বাড়ন্ত পানির চাপ সহ্য করতে পারত না। ফলে তলিয়ে যেত সবকিছু। হতে পারে না?'

মাথা ঝাঁকালাম আমি আর সিনর।

'আমার বিশ্বাস যিব্যালবের জায়গায় যদি অন্য কেউ সরাত পান্নার টুকরোটা, সঙ্গে সঙ্গে পানি বাড়তে শুরু করত হ্রদে। অথবা শহরের কোথাও-না-কোথাও ভয়াবহ আগুন লেগে যেত যা নেভানো সম্ভব হতো না আমাদের পক্ষে।'

চুপ করে আছি আমরা তিনজন।

'তবে আমরা কেন এখনও ধ্বংস হয়ে যাইনি জানেন?' মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল মাটাই, 'কারণ বেদির হায়ারোগ্লিফিক্সে লেখা আছে পান্নার টুকরো দুটো চুরির উদ্দেশ্যে সরানো হলে অভিশাপ নামবে।' আমাদেরকে কিছু বলার সুযোগ না-দিয়ে বলল, 'অনেক কথা হয়েছে, আর না।' তাকাল আমার দিকে। 'ভিনদেশী আগন্তুক, আপনার কাছে যে-টুকরোটা আছে তা দিয়ে দিন লেডি মায়ার কাছে। তাঁর কাছে যে-টুকরোটা আছে তার সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে পুরো পান্নাটা এই হৃৎপিণ্ডের ফোকরে রাখবেন তিনি।'

জানি না কেন, বেশ বড় একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আমার বুক চিরে। গলা থেকে খুললাম কবচটা, বের করলাম পান্নার টুকরোটা। দিলাম মায়ার হাতে। খেয়াল করলাম হাত কাঁপছে মেয়েটার। জোড়া দিল সে টুকরো দুটোকে, পায়ে পায়ে এগিয়ে

যাচ্ছে বেদির আরও কাছে। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর কম্পিত কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল, 'আমার ভয় লাগছে। ভীষণ ভয় লাগছে। আমি পারবো না।'

'কিন্তু করতেই হবে কাজটা,' তাগাদা দিল মাটাই, 'এবং আমার দ্বারা হবে না। কেউ না-পারলে আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

'বেশ,' আগে বাড়লেন সিনর। 'তা হলে আমিই করছি কাজটা। টুকরো দুটো আমার হাতে দাও, মায়া।'

দিল মায়া। ব্লাডস্টোন পাথরের হৃৎপিণ্ডে জায়গামতো বসিয়ে দিলেন সিনর টুকরো দুটো। ঠক্ করে আওয়াজ হলো। এই পরিবেশে, অটুট নিস্তব্ধতায় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার।

এক...দুই...তিন...পার হচ্ছে একটা করে মুহূর্ত। কিছুই ঘটছে না। বিশ সেকেণ্ড কেটে গেল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি হৃৎপিণ্ডটার দিকে। কিন্তু কিছুই ঘটছে না।

শেষপর্যন্ত মুখ খুলতে বাধ্য হলাম, 'দেখা যাচ্ছে মাটাই, ধোঁকাবাজির স্বর্ণপাতটা অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে আপনাকে। কারণ দিবা-নিশি একসঙ্গে করে জায়গামতো বসানো হলো, তারপরও কোনো কিছু খুলল না, কিছু সরল না। কিছু হলোও না।'

'অপেক্ষা করুন,' মাটাইয়ের কপালে চিন্তার ভাঁজ, 'হয়তো...মরিচা পড়ে গেছে স্প্রিং-এ।' আমরা কেউ কিছু করা বা বলার আগেই আরও এগিয়ে গেল সে, জোড়া-লাগানো পান্না দুটো ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে ঠেসে ধরে এত জোরে চাপ দিল যে, মার্বেলের বেদির উপর পাক খেল ব্লাডস্টোনের হৃৎপিণ্ডটা।

'সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল মাটাই।

ওর চিৎকারের প্রতিধ্বনি তখনও মিলিয়ে যায়নি, তার আগেই হতবিহ্বল হয়ে দেখি, হৃৎপিণ্ডটা খুলে যাচ্ছে প্রস্ফুরণরত ফুলের মতো।

হ্যাঁ, ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে ওটা। সরে গেল ফোকরটাও, "দিবা" আর "নিশি" আলাদা হয়ে গিয়ে খসে পড়ল বেদির উপর। কিছু একটা দেখা যাচ্ছে ভিতরে। লণ্ঠনের আলোয় মনে হচ্ছে জ্বলন্ত কয়লা। নিজেদের অজান্তেই আরও আগে বাড়লাম আমরা। উন্মোচিত হৃৎপিণ্ডটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছি বলা যায়।

প্রথম দৃষ্টিতে যা কয়লা বলে মনে হয়েছে তা আসলে কয়লা না—মানবচক্ষুর আদলে বানানো একটা লাল-পাথর। বসানো আছে সোনার একটা প্লেটের উপর। খোদাইকৃত চিত্রলিপির সাহায্যে কিছু লেখা আছে ওই প্লেটের গায়ে। আমরা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি পাথরটার দিকে, সেটাও আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ।

এদিক-ওদিক তাকালেন সিনর, পরিস্থিতি আঁচ করার চেষ্টা করছেন সম্ভবত। বললেন, 'এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে আমাদের ভয় আরও বাড়বে। তা ছাড়া,' তাঁর কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা, 'মানুষের চোখের আদলে বানানো একটা লাল পাথরকে এত ভয় পাওয়ার কী আছে বুঝতে পারছি না।'

'তা-ই নাকি?' গলা কাঁপছে মাটাইয়ের, 'সরিয়ে নিন পাথরটা। নীচের প্লেটটা দিন আমার হাতে।' পোশাকের ভিতর থেকে "ধোঁকাবাজির" প্লেটটা বের করে বাড়িয়ে ধরল সিনরের দিকে। 'এটা বসিয়ে দিন জায়গামতো, তারপর লাল পাথরটা রেখে দিন উপরে।'

কাজটা করলেন সিনর। দেখে মনে হচ্ছে একটুও ভয় পাচ্ছেন না তিনি। আশঙ্কা করছিলাম পাথর বা প্লেটটা সরানোর সময় আবার কোনো বুজরুকি কাণ্ড ঘটবে। কিন্তু সে-রকম কিছু হলো না।

লাল পাথরের নীচ থেকে বের-করে-আনা প্লেটটা মাটাইয়ের হাতে দিলেন সিনর।

'কী লেখা আছে পড়ে শোনান আমাকে,' মাটাইকে বলল মায়া। 'লোকে বলে প্রাচীন এসব চিত্রলিপির উপর আপনার নাকি যথেষ্ট পাণ্ডিত্য আছে।'

'না-পড়লে হয় না?' মাটাইয়ের কণ্ঠে সন্দেহের সুর। 'কী না কী লেখা আছে, পড়তে গিয়ে আবার কোন্ বিপদে পড়ি...'

'যা-ই লেখা থাকুক, আমি জানতে চাই। কত বড় বিপদ ঘনিয়ে আসছে আমাদের উপর, আগে থেকেই জানা থাকা ভালো। আমি আদেশ করছি, পড়ে শোনান আমাদেরকে।'

অগত্যা শান্ত নিচু আর ধীর গলায় পড়তে শুরু করল মাটাই, '"এতদিন ঘুমিয়ে ছিল এই চোখ। আজ তার ঘুম ভাঙানো হয়েছে। আজ সে প্রথমবারের মতো হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড দেখেছে। দেখেছে, অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কীভাবে এই কাজ করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। এই চোখের দেখভাল করার দায়িত্ব ছিল সিটি অভ দ্য হার্টের অধিবাসীদের উপর। কাজটা করতে পারেনি তারা। তাই অভিশাপ থাকল ওদের উপর। ডুবে মরবে সবাই। হ্রদের পানিতে প্রায়শ্চিত্ত হবে ওদের পাপের।"'

আমাদের চেহারা শুকিয়ে গেছে। এমনকী সিনরেরও। জানি এখানকার লোকেদের ধর্মবিশ্বাস অথবা এই দেবতারা হয়তো কাল্পনিক, তারপরও মনে হচ্ছে যেন কোনো সত্তা অনেকদিন পর জ্যান্ত হয়ে মাটাইয়ের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছে কথাগুলো। যে-অভিশাপবাণী উচ্চারণ করেছে মাটাই তা যেন অন্তর থেকে উপলব্ধি করতে পারছি, বুঝতে পারছি আর কয়েকদিন পরই হয়তো ধ্বংস হয়ে যেতে হবে আমাদেরকে।

'আগেই বলেছিলাম প্লেটের গায়ে কী লেখা আছে তা না-পড়াটাই ভালো হবে,' ফিসফিস করে বলল মাটাই, 'আমার কথা শুনলেন না।' যেন অসাবধানতাবশত কোনো সাপ ধরে ফেলেছে এমন ভঙ্গিতে হাত থেকে ছেড়ে দিল সে প্লেটটা। ঝনঝন শব্দে মেঝেতে আছড়ে পড়ল সেটা। আওয়াজটা দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল।

হৃৎপিণ্ডটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন সিনর। এবার ঝট্ করে ঘাড় ঘুরালেন মাটাইয়ের দিকে। জ্বলন্ত চোখে জিজ্ঞেস

করলেন, 'কী করে বিশ্বাস করি এই কাজ তোমার না, ভণ্ড কোথাকার? তুমি আগে থেকেই জানো ওই ফোকরে জোরে চাপ দিলে খুলে যায় হৃৎপিণ্ডটা। কাজেই আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য যে-রকম প্লেট বানিয়েছ, সে-রকম আরেকটা প্লেট বানিয়ে ওখানে যে বসিয়ে রাখোনি তার নিশ্চয়তা কী?'

'কাজটা করতে পারলে ভালোই হতো,' মাটাইয়ের গলা দিয়ে কোলাব্যাঙের আওয়াজ বের হচ্ছে, 'যেদিন পানিতে ডুবে মরতে হবে আমাদের সবাইকে সেদিন বুঝবেন আগে থেকেই আমি কোনো চালাকি করে রেখেছিলাম নাকি দেবতাদের অভিশাপ বলে আসলেই কিছু আছে।' মেঝে থেকে তুলে নিল সে সোনার-প্লেটটা, লুকিয়ে ফেলল পোশাকের ভিতরে। বলল, 'দয়া করে আরেকটা কাজ করুন এবার। হৃৎপিণ্ডটা খুলে গেছে, দেখুন কায়দা করে আটকে দিতে পারেন কি না। বেদি থেকে তুলে নিন দিবা আর নিশিকে, ফিরিয়ে নিয়ে যাই। একই কাজ আবার করতে হবে আমাদেরকে, মনে রাখবেন।'

আর কিছু না-বলে যা যা করতে বলা হয়েছে করলেন সিনর। তারপর রেশমী কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন হৃৎপিণ্ডটা। সবকিছু ঠিক করে রাখলেন আগের মতো। দেখে বোঝার উপায় নেই কিছুক্ষণ আগে ঘটে গেছে এত ঘটনা।

'এবার তা হলে...' কথা শেষ করতে পারল না মাটাই, কারণ গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে মায়া।

চমকে উঠলাম আমরা। চলে যাওয়ার জন্য মাত্র ঘুরেছি, যার যার জায়গায় জমে গেলাম বরফের মতো। পড়েই যেত মায়া, খপ করে ওকে ধরে ফেললেন সিনর।

যে-দরজা দিয়ে ঢুকেছিলাম আমরা মন্দিরের ভিতরে তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কেউ একজন, বলা ভালো একটা মানুষের লাশ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি। ধরেই নিয়েছি আমাদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হাজির হয়েছে কোনো ভূত।

আসলেই, যে দাঁড়িয়ে আছে দরজাটার কাছে তাকে ভূতের মতোই দেখাচ্ছে। পরনে ধবধবে সাদা ন্যাতাকানি। মৃদু বাতাসে অল্প অল্প উড়ছে পোশাকটার ছেঁড়া প্রান্তগুলো। লোকটার গালভর্তি সাদা দাড়ি। চেহারা পাণ্ডুর। কিন্তু দুই চোখ যেন জ্বলছে ভাটার মতো। কঙ্কালসার শরীরটা রাগে অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক কাঁপছে।

যিব্যালবে!

হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই যিব্যালবে। জানি না মারা গেছে কি না সে, জানি না ওর আত্মা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো গুপ্তচরগিরি করতে এসেছে কি না আমাদের উপর। তবে আমি নিশ্চিত, ওই লোকটাই দাঁড়িয়ে আছে দরজা জুড়ে।

তারমানে যে-মৃদু গোঙানি শুনেছিলাম আমি তা বের হয়েছিল যিব্যালবের গলা দিয়েই। অর্থাৎ অনেক আগেই হয়তো জ্ঞান ফিরে এসেছিল ওর। আমাদের সব কথা শুনেছে সে। জেনে গেছে আমাদের গোপন পরিকল্পনা। ইস্‌স্! না জানি কত খারাপ লেগেছে বেচারার কাছে। এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সে; ওর সামনে ওর মন্দির অপবিত্র করার ছক কষেছি আমরা, আমাদের উচ্চারিত প্রতিটা বর্ণ ওর কানে গেছে হয়তো। তখন বাধা দিতে পারেনি আমাদেরকে, কিন্তু আমরা চলে আসার পর দায়িত্ববোধ জেগেছে ওর ভিতরে। হাঁচড়েপাঁচড়ে যেভাবেই হোক হাজির হয়ে গেছে এখান পর্যন্ত। জানি না কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছে বেচারা ওখানে। হয়তো অনেক আগেই এসেছে, আগে বাড়ার সাহস বা শক্তি হয়নি। হয়তো বাক রুদ্ধ হয়ে গেছে ওর, তাই কথা বলতে পারেনি। কিন্তু এসেছে সে। সিঁড়ি ভেঙে উঠেছে উপরে, পার হয়েছে গোলকধাঁধাপূর্ণ একের পর এক প্যাসেজ, ধাক্কা দিয়ে খুলেছে ভারী ভারী দরজা। লণ্ঠন ছিল না ওর কাছে, তারপরও দিক চিনে ঠিকমতোই আসতে পেরেছে। শেষপর্যন্ত গোপন দরজাটার পাল্লায় ভর দিয়ে এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছে আমাদের "কীর্তিকলাপ"।

আমি নিশ্চিত, যতটা না দুর্বলতায় তার চেয়ে বেশি রাগে কাঁপছে যিব্যালবে। ওহ্! ওর সেই ভয়ঙ্কর চেহারাটা কোনোদিনও ভুলতে পারবো কি না সন্দেহ। অসুস্থ লোকের চোখ এমনিতেই একটু বেশি উজ্জ্বল হয়, কিন্তু ওর দুই চোখে যেন ভাটার আগুন। সেখানে একইসঙ্গে ক্রোধ, অনুতাপ আর ভয়। যে-দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে মায়ার দিকে, বোধহয় প্রাণসংহারের সময় যমও সেভাবে তাকাবে না মেয়েটার দিকে। যে-আক্রমণাত্মক ভঙ্গি প্রকাশ পাচ্ছে ওর দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে, কোনো প্রেতাত্মা বা দানবের দ্বারাও ব্যাপারটা সম্ভব না মনে হয়। নিরাকার নামহীন যে-দেবতাকে মনেপ্রাণে পূজা করে এসেছে সে এতদিন তার এত বড় সম্মানহানি দেখে মনে মনে প্রতিশোধের কোন্ শপথ নিয়েছে সে কে জানে!

এ-রকম কোনো দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি আমি। প্রার্থনা করি বাকি জীবনে অথবা পরকালেও যেন দেখতে না-হয়।

দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল যিব্যালবে, এবার সোজা হলো। মাথার উপর দুই হাত তুলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসছে মায়ার দিকে। বোঝা যাচ্ছে প্রথম আঘাতটা মেয়েকেই করতে চায়। সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রেখে বাবার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মায়া—সাপের ছোবল খাওয়ার আগে অসহায় পাখি যেভাবে তাকিয়ে থাকে সেভাবে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত ছোবল দেয়া হলো না যিব্যালবের। হঠাৎ কাশির দমকে নুয়ে পড়ল ওর লম্বা শরীরটা। কাশতে কাশতে ফেনা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে, তারপর রক্ত। আছড়ে পড়ল সে মেঝের উপর। উঠে বসার চেষ্টা করল প্রাণপণে। কিন্তু অদৃশ্য যমদূত সে-সুযোগ দিল না ওকে। দ্বিতীয়বারের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে মায়ার পায়ের কাছে। নড়ল না আর।

এবং আমাদের বুঝতে বাকি থাকল না, আর কোনোদিনই নড়বে না যিব্যালবে। নিঃশব্দে মারা গেছে সে। মৃত্যুর এই নৈঃশব্দ্য পৃথিবীর সবচেয়ে বিকট আওয়াজের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

এরপর কী হয়েছিল ঠিকমতো মনে নেই আমার।

বন্ধু জোন্স, হয়তো মনে করতে পারেন, এ আবার কেমন কথা? কিন্তু যা বলছি তা সত্য। মানুষের জীবনে কখনও কখনও এমন কিছু সময় আসে যখন ভয়ে বা উত্তেজনায় তার স্মরণশক্তি কাজ করে না। আমারও সম্ভবত সে-রকম কিছু হয়েছিল তখন। মন্দিরের সেই গা ছমছমে পরিবেশ, কুকুমাট্‌যের অভাবনীয় আর চমকপ্রদ সব পদ্ধতি, বিশ্বাস করি না অথচ হেসে উড়িয়েও দিতে পারি না এমন অভিশাপবাণী এবং সবশেষে যিব্যালবের ভূতের মতো আবির্ভাব আর ভয়াবহ মৃত্যু দেখে আমার মাথা ঘোলা হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া টানা কয়েকদিন অর্ধাহারে থাকা, এত পরিশ্রম করে মন্দিরে আসা এবং সর্বোপরি মৃত্যুর সার্বক্ষণিক ভয় কেমন দুর্বল করে ফেলেছিল মনটাকে। তাই আজ, এত বছর পর ওসব স্মৃতি ঘাঁটলে শুধু মনে পড়ে, চরম ক্লান্ত অবস্থায় ফিরে এসেছিলাম সেই পাতাল কারাকক্ষে। নিজের প্রকোষ্ঠে ঢুকে কোনোরকমে গা এলিয়ে দিয়েছিলাম চৌকির উপর।

আবছাভাবে মনে পড়ে, অনেক কান্নাকাটি করছিল মায়া। ওকে শান্ত করান সিনর। ওই মন্দির ছেড়ে পালিয়ে আসার সময় ধরাধরি করে নিয়ে আসি যিব্যালবের লাশ। ওর ঘরে ওর চৌকির উপর শুইয়ে দিই। মাটাই আমাদের সঙ্গে ছিল, কাজ শেষে বিদায় নেয় সে।

পরদিন সকালে আমার ঘুম ভাঙে লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজে। প্রথমে শুয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। কী হচ্ছে বুঝতে চেষ্টা করছি। অনেক লোক এসে হাজির হয়েছে কারাগারের ভিতরে, অনুমান করতে পারছি না কেন। গতরাতের ঘটনাগুলো মনে পড়ছে আবছাভাবে। হাই তুলে বের হলাম বাইরে।

মন্ত্রণাসভার অনেক সদস্যই এসেছেন। এসেছে মৃতদেহের সৎকারকারীরাও। ইতোমধ্যে ভালোমতো গোসল দেয়া হয়েছে

যিব্যালবের লাশটাকে। মমি বানানো হবে, তাই বিভিন্ন জাতের রাসায়নিক পদার্থ মাখানো হচ্ছে। একদিকে রাখা আছে দামি কাঠের একটা কফিন। কোথায় দাফন করা হবে যিব্যালবেকে বুঝতে পারছি না।

আমার দিকে তাকাল দু'-একজন, কিন্তু কারও দৃষ্টিতেই তেমন কোনো উৎসাহ নেই। আমার সঙ্গে কথা বলার আগ্রহও দেখাচ্ছে না কেউ।

ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে কিছুক্ষণ দেখলাম যিব্যালবের সৎকারকর্ম। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল একসময়। ঘরে ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়লাম চৌকিতে। কখন যেন দু'চোখ বন্ধ হয়ে গেল আপনাথেকেই।

দু'দিন পর।

এই দুটো দিন খুব খারাপ কেটেছে আমাদের জন্য। কেউ দেখা করতে আসেনি, কেউ কোনো খোঁজ নেয়নি। অন্ধকার কারাপ্রকোষ্ঠে বন্দি হয়ে আছি আমরা। বার বার মনে পড়ছে গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলো।

যিব্যালবের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না মায়ার। বেশিরভাগ সময় দেখেছি মায়া কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলত ওর বাবার কাছ থেকে। যিব্যালবেও যে মেয়ের সবরকম খোঁজখবর রাখত তা-ও না। তারপরও, মৃত্যু মৃত্যুই। এখনও থেকে থেকে কাঁদছে মায়া। কখনও কখনও বিলাপ করছে ওর মৃত বাবার জন্য। তবে আমার মনে হয় ওর এই বিলাপ যতটা না শোকের, তারচেয়ে বেশি আতঙ্কের—মরার আগে ওকে অভিশাপ দিয়ে গেছে যিব্যালবে, ওকে নিজের হাতে শেষ করে দিতে চেয়েছে। কে জানে, মায়া যে-দেবতাদেরকে জানে-মানে তাঁরা ওর বাবার শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করে দেন কি না!

তবে আস্তে আস্তে কমে আসছে মায়ার আহাজারি। আজকাল বেশিরভাগ সময় নিজের ঘরে চুপ করে বসে থাকে সে, ডাকলেও

সাড়া দেয় না। ঠিকমতো খাওয়াদাওয়াও করে না। সিনর সান্ত্বনা জানানোর জন্য গেলে মাঝেমধ্যে খনখনে গলায় চিৎকার করে বলতে থাকে, 'কেন এসেছেন? কেন আমি ভালোবাসতে গেলাম আপনাকে? আমাকে দিয়ে কী দরকার আপনার? আমি নিচু জাতের এক অশিক্ষিত ইণ্ডিয়ান আর আপনি সাদাচামড়ার প্রভু। ভাগ্য আমাদেরকে আলাদা করে দিয়েছে জানার পরও কেন লেগে আছেন আমার পিছনে?'

বেশিরভাগ সময়ই মায়ার এসব পাগলাটে প্রশ্নের কোনো জবাব দেন না সিনর। চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন ওর সামনে, অথবা বসে থাকেন পাশাপাশি। তারপর একসময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে চলে আসেন।

কিন্তু নিঃসঙ্গতা মানুষের আবেগ বাড়ায়। যিব্যালবে মারা গেছে, আমাকে মুখে বন্ধু বললেও কখনোই আমার সঙ্গে তেমন খাতির ছিল না মায়ার, আমিও যেচে পড়ে ওর সঙ্গে সখ্যতা গড়তে যাই না, কাজেই সিনরকেই এখন একমাত্র আপন বলে মনে করতে শুরু করেছে সে। কেউ বলে না-দিলেও ব্যাপারটা টের পাই আমি। টের পাই, দু'জনের ভালোবাসা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

নিজের কথা যদি বলি, অদ্ভুত এক অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করেছি। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবো কি না জানি না। এখানকার লোকদের ধর্মবিশ্বাস, দেবতা বা অভিশাপ কোনোকিছুতেই আমার বিশ্বাস ছিল না কোনোকালে, এখনও নেই। তবে আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি। জানি যা যা ঘটছে আমার সঙ্গে সবই ভাগ্যের দোষে। যিব্যালবে মারা গেছে—এটা নিয়তির লিখন ছিল। আমার বন্ধুর হৃদয় হরণ করে ওকে এখানে নিয়ে এসে চরম বিপদে ফেলেছে এক নারী—এটাও নিয়তির বিধান। অনিশ্চয়তায় ঘূর্ণাবর্তে পড়ে নস্যাৎ হতে বসেছে মেক্সিকোর স্বাধীনতার জন্য আমার মহাপরিকল্পনা—এটাও বিধাতার ইচ্ছা। মুখ বুজে সব সহ্য করা ছাড়া করার কিছুই নেই এখন। কাজেই সে-কাজই করে যাচ্ছি

আপাতত।

এই দু'দিনে যিব্যালবের লাশ, দাফনের জন্য "উপযুক্ত" করে তুলেছে সৎকারকারীরা। রাসায়নিক পদার্থ মাখিয়ে ব্যাণ্ডেজের মতো কাপড়ে মোড়া হয়েছে ওর পুরো শরীর। বহুমূল্য সোনার অলঙ্কার পরানো হয়েছে, লাশের সঙ্গে দেয়া হয়েছে অনেক রত্নপাথর। ছোটখাটো একটা শেষকৃত্যানুষ্ঠানও হয়ে গেছে। তারপর কাছেই কোনো এক "ঘরে" ওর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে শুইয়ে দেয়া হয়েছে চিরনিদ্রায়। কোথায় জানি না। কারণ দেখতে যাইনি।

যেদিন দাফন করা হলো ওকে সেদিন অনেকক্ষণ কাঁদল মায়া। কিন্তু আমার একটুও মন খারাপ হলো না। তারমানে এই না, যিব্যালবের মৃত্যুতে খুশি হয়েছি আমি। ভেবে দেখেছি, ওই পাগলাটে বুড়োর মৃত্যুই সবদিক দিয়ে ভালো হয়েছে। সে বেঁচে থাকলে অবস্থা আরও খারাপ হতো আমাদের জন্য। হয়তো ফাঁস করে দিত আমাদের পরিকল্পনা। আমাদেরকে, অন্তত মায়াকে শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করত। তখন বাধা দিতে চাইতেন সিনর। ফলে...

থাক, আর ভাবতে চাই না।

এ-রকম অবস্থায় একদিন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল টিকাল। বলে রাখি, সে যেদিন দেখা করতে এল সম্ভবত তার পরের দিন, আমার হিসেব অনুযায়ী হ্রদে পানি বাড়তে শুরু করবে এবং সিটি অভ দ্য হার্টের নিয়মানুযায়ী মন্দিরে বৈঠকে মিলিত হবে মন্ত্রণাসভার সদস্যরা। ওই বৈঠকে ওদের সামনে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত থাকতে হবে আমাদেরকে।

যা-হোক, টিকালের দিকে তাকিয়ে দেখি, চেহারা খুব গম্ভীর ওর। গুরুতর কিছু হয়েছে সম্ভবত। মায়ার মুখোমুখি দাঁড়াল সে, বাউ করে সম্মান জানাল। মাথা তুলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখে নিল আমাকে আর সিনরকে। তারপর ধীরস্থির ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল, 'আপনার বাবার মৃত্যুতে আসলেই আমি দুঃখিত, লেডি মায়া। হাজার হোক আমার চাচা ছিলেন তিনি। শেষবয়সে এসে একটু

অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলেন, তারপরও...'

'দুঃখিত হওয়ার কী আছে বুঝলাম না,' ওকে থামিয়ে দিয়ে ভারী গলায় বলে উঠল মায়া। 'তোমার তো খুশি হওয়ার কথা। বাবা ছিল তোমার পথের কাঁটা। তিনি মারা গেছেন, কাঁটা দূর হয়েছে। এবার তুমি শান্তিতে ঘুমাতে পারবে, আরামে বসতে পারবে সিংহাসনে।'

'এত সহজ না,' ভ্রূকুটি করল টিকাল। 'কারণ তিনি আমার জন্য আরও বিপজ্জনক এক প্রতিদ্বন্দ্বী রেখে গেছেন—সোজা কথায় বললে আপনি। চাচার মৃত্যুর খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। যা আশঙ্কা করছিলাম তা-ই হয়েছে। জনতা ধরেই নিয়েছে ক্ষমতার লোভে তাঁকে খুন করেছি আমি। যারা আমার দলে ছিল তারাও ভালোভাবে নেয়নি ব্যাপারটা। আমার উপর থেকে মন উঠে গেছে অনেকেরই। ওরা বলাবলি করছে, আমি যতদিন সিংহাসনে থাকবো ততদিন এ-রকম রক্তপাত চলতেই থাকবে। কাজেই যাকে সবাই পছন্দ করে, মানে আপনাকে ক্ষমতায় বসানোর দাবি জোরালো হচ্ছে দিন দিন। আরও কয়েকটা দিন আগে যদি জানতে পারতাম এত ঘোলাটে হয়ে যাবে ব্যাপারটা তা হলে হয়তো আপনাকে খুন করার আদেশ দিতাম জল্লাদদেরকে। কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। মরে গিয়ে কাজ বাড়িয়ে দিয়ে গেছে যিব্যালবে। এবার আপনার কিছু হলে আমাকে ছাড়বে না জনতা,' থামল সে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মায়ার দিকে।

মায়া নিশ্চুপ।

'এর আগেরবার যখন এসেছিলাম,' বলে চলল টিকাল, 'নির্দিষ্ট একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনাকে। আপনি বলেছিলেন, আপনার বাবা সুস্থ হয়ে উঠলে অথবা মারা গেলে উত্তর দেবেন। আজ সেই উত্তর শোনার জন্য এসেছি আমি। বলে রাখি, যিব্যালবে বেঁচে থাকা অবস্থায় যদি বিয়ে করতেন আমাকে, আপনাদের দু'জনকে অনেক কিছু দিতে পারতাম। এমনকী আপনার সম্মতির বিনিময়ে সিংহাসন পর্যন্ত ছেড়ে দিতে রাজি ছিলাম। কিন্তু এখন আর

সেটা সম্ভব না, বুঝতেই পারছেন। এখন আপনি আমার প্রস্তাবে রাজি হলে একটা কাজই করতে পারি—ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিতে পারি দু'জনে। আমাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে চলবে এই দেশ। আর যদি বিয়েতে রাজি না-হন তা হলে একটাই পথ খোলা আছে—গৃহযুদ্ধ। আমার আর আপনার অনুগত বাহিনীর মধ্যে বাধবে লড়াই এবং চলতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না একদল সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আরেকটা কথা, সেক্ষেত্রে প্রথম সুযোগেই এই দুই ভিনদেশীকে খুন করবো আমি।'

এবারও কিছু বলল না মায়া। টিকালের দিকে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে।

'মায়া,' আবেগে গলা কাঁপছে টিকালের, টের পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম, 'মিনতি করছি তোমার কাছে, আমার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কোরো না,' হঠাৎ করেই আপনি থেকে তুমি বলছে সে মায়াকে। 'কথা দিচ্ছি বিয়ের পর সারাজীবন অন্ধের মতো ভালোবাসবো তোমাকে। সেই কৈশোর থেকে ভালোবেসে এসেছি তোমাকে, যদিও কোনো সাড়াই পাইনি তোমার কাছ থেকে। তারপরও কমা তো দূরের কথা দিন দিন বেড়েছে আমার আবেগ। বিশ্বাস করো, যদি মাটাই আমাকে প্ররোচিত না-করত, যদি বার বার জোর দিয়ে না-বলত তুমি আর তোমার বাবা মরে পড়ে আছো অনেক দূরের কোনো জঙ্গলে, জীবনেও বিয়ে করতাম না নাহুয়াকে। তুমি জীবিত অবস্থায় ফিরে আসামাত্র বুঝতে পেরেছি কত বড় ধুরন্ধর সে, কত বড় চালবাজ। কসম খেয়ে বার বার আমাকে বলেছিল তখন, তোমাদের মৃত্যুর কথা নাকি লেখা আছে নক্ষত্রের গায়ে। বিশ্বাস করো, ওর সেই কথা শুনে অনেক দুঃখ পেয়েছিলাম। নাহুয়া তো পরের কথা, স্বর্গের অপ্সরাকেও বিয়ে করতাম না। কিন্তু আমার মনে সেই ছোটবেলা থেকে আছে ক্ষমতার লোভ। মাটাই বলল, ওর মেয়েকে বিয়ে করলে সম্ভাব্য সব উপায়ে সাহায্য করবে আমাকে। দরকার হলে নিজের প্রভাব খাটিয়ে রাজি করাবে মন্ত্রণাসভার সদস্যদেরকে।

ওই সময়ে আমার মতো আরও অনেকের মনেই সর্দার হওয়ার ইচ্ছা উঁকিঝুঁকি মারছিল। কী যে একটা বৈরি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বুঝিয়ে বলতে পারবো না। কাজেই নিজের নিরাপত্তার জন্য, সিংহাসনে বসার জন্য ধূর্ত মাটাইয়ের সঙ্গে চুক্তি করতে রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু কী পেলাম শেষপর্যন্ত? তোমাকে দেখামাত্র নাহুয়ার বিরুদ্ধে তীব্র একটা ঘৃণা জেগে উঠল মনের ভিতরে। এখন ওর কাছ থেকে যে-কোনো উপায়ে মুক্তি পেলেই আমি খুশি। ...মায়া, কথা দিয়েও কথা রাখতে পারিনি আমি, অপরাধ হয়েছে আমার, সে-জন্য হাজারবার ক্ষমা চাইতে রাজি আছি তোমার কাছে। আমাকে ক্ষমা করে দাও।'

'ক্ষমা চাচ্ছ?' করুণ হাসি হাসল মায়া। 'আমাকে কি আসলেই ভালোবাসো তুমি? ভালোবাসলে দিনের পর দিন কীভাবে বন্দি করে রাখলে মাটির নীচের এই কারাগারে? আমাকে খুন করার চিন্তা তোমার মাথায় এল কী করে?'

'খুন করার চিন্তা আসেনি, আমার অনুগতরা আমাকে বুঝিয়েছে। কিন্তু ওদের কথায় কান দিইনি। তোমার গায়ে হাত দিইনি। এমনকী তোমার বন্ধুদেরও কোনো ক্ষতি করিনি।'

'কিন্তু এখন করবে বলে হুমকি দিচ্ছ, তা-ই না?'

'হ্যাঁ, দিচ্ছি। যদি তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি না-হও। তা ছাড়া...' সিনরের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করল টিকাল, 'আমার মনে হয় একজনকে শেষ করে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

'একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো, টিকাল,' মায়ার ধীর কণ্ঠ ছুরির মতো ধারালো, 'ওই কাজ করলে অন্তত এই জনমে আমাকে বিয়ে করতে পারবে না। যা-হোক, তোমার কথা শুনলাম। বাবার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তুমি, ভঙ্গ করেছ আমাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি। তারপরও তোমার কথা শুনে আমার মন নরম হয়েছে। তবে এখনই কোনো কথা দিতে পারছি না। আমার প্রস্তাব শোনো। আগামীকাল সিটি অভ দ্য হার্টের মন্ত্রণাসভার সামনে হাজির হই আমরা। দিবা-

নিশিকে জোড়া লাগিয়ে জায়গামতো রাখি। বাবা একটা কথা জোড় দিয়ে বলতেন সবসময়—দিবা-নিশি একসঙ্গে হলে তাজ্জব কোনো ঘটনা ঘটবেই, মহান দেবতার পক্ষ থেকে কোনো-না-কোনো নির্দেশনা আসবেই আমাদের জন্য। আমার মনে হয় সে-রকম কোনো ঘটনা ঘটার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত আমাদের। কথা দিচ্ছি, যে-নির্দেশনাই আসুক না কেন, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করবো আমি।'

কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করল টিকাল। তারপর বলল, 'যদি দিবা-নিশি জোড়া লাগার পরও কিছু না-ঘটে? যদি মহান দেবতার পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা না-আসে?'

'তা হলে,' নরম গলায় বলল মায়া, 'তোমাকে বিয়ে করতে রাজি আছি কি না সে-প্রশ্ন আবার জিজ্ঞেস কোরো। মন্ত্রণাসভার সদস্যরা যদি রাজি থাকে, তোমাকে না-ও ফেরাতে পারি। এবার যাও, আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবো। বিদায়।'

বিশ

বৈঠক

চলে গেল টিকাল।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চুপ করে আছি আমি। আসলে ভাবছি ব্যাপারটা নিয়ে। কিন্তু কোনো কূলকিনারা করতে পারছি না। ভাবতে গিয়ে কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে সব। কী বলবো বুঝতে পারছি না।

এমন সময় সিনর বললেন, 'আশা করি ধুরন্ধর মাটাই আবারও কোনো চাল চালেনি।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল মায়া।

'কে জানে টিকালের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ঘুষ খেয়ে নতুন কোনো কুবুদ্ধি বের করে বসে আছে কি না বুড়ো শিয়ালটা,' বলে চললেন সিনর। 'কে জানে ওই প্লেট সরিয়ে দিয়ে অন্য কোনো প্লেট বসিয়ে রেখেছে কি না। ...মায়া, টিকালকে কথা দিয়ে কিন্তু ফেঁসে গেছ তুমি। মাটাই যদি সত্যিই এ-রকম কিছু করে থাকে তা হলে ওই প্লেটে যা লেখা থাকবে তোমাকে তা-ই করতে হবে। তখন আমাদের অবস্থা আরও খারাপ হবে।'

ব্যাপারটা বুঝতে পারল মায়া। মন খারাপ করে গিয়ে ঢুকল নিজের ঘরে। কিছু করার নেই, তাই আমিও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হেঁটে বেড়াতে লাগলাম এদিকে-সেদিকে। আগে একবার মায়ার সঙ্গে হাঁটতে বের হয়েছিলাম, তখন লাইব্রেরির মতো একটা ঘরে ঢুকেছিলাম; একটা লণ্ঠন নিয়ে গিয়ে হাজির হলাম ওই ঘরে। এককোনায় বসে কিছু পুরনো পার্চমেণ্ট ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলাম। এই অঞ্চলের লোকগুলোর প্রাচীন ইতিহাস জানার চেষ্টা করছি।

আসলে গত কয়েকদিন থেকেই কাজটা করছি আমি। যিব্যালবে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর থেকে আমার সঙ্গে তেমন একটা কথা বলেন না সিনর, বেশিরভাগ সময় মায়ার সঙ্গেই কাটান। আর মায়া, আগেও বলেছি বোধহয়, মুখে আমাকে বন্ধু বললেও প্রথম থেকেই একটা দূরত্ব বজায় রাখছে এবং আমি তাতে খুশি। কাজেই যিব্যালবে মারা যাওয়ার পর, স্বাভাবিকভাবেই, সিনর আর মায়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েছে। এবং টের পাচ্ছি আমার আর সিনরের সম্পর্কের মাঝখানে গাঢ় একটা ছায়া পড়ছে।

পরদিন, দুপুরের খাবারের পর, আমাদের জন্য পরিষ্কার পোশাক নিয়ে এল কয়েকজন ভৃত্য। মায়ার জন্য কিছু গহনাও এনেছে ওরা। যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলাম, গায়ে চড়ালাম নতুন কাপড়। খেয়াল করলাম সুগন্ধী দেয়া আছে কাপড়ে।

সন্ধ্যার পর হাজির হলো একদল সশস্ত্র সৈন্য। ওদের নেতা

বলল, পথ দেখিয়ে মন্দিরে নিয়ে যাবে আমাদেরকে।

মৃদু হেসে সিনর বললেন, 'খুব ভালো কথা। আসলে কী জানো, এই গর্তের ভিতরে দিনের পর দিন ইঁদুরের মতো থাকতে থাকতে বিরক্তি ধরে গেছে। এখন এখান থেকে বের হতে পারলে বাঁচি। কাজেই মন্দিরে বা গির্জায় যেখানেই নিয়ে যাও, যেতে আপত্তি নেই আমার।'

কয়েক মিনিট পরই রওয়ানা হয়ে গেলাম আমরা, সৈন্যদের পিছন পিছন উঠতে লাগলাম সিঁড়ি বেয়ে।

কোন্ দিক দিয়ে ওরা নিয়ে এল আমাদেরকে বুঝতে পারলাম না। একটা দরজা পার হয়ে হঠাৎ দেখি, খোলা জায়গায় হাজির হয়েছি। রাত নেমেছে, মাথার উপরে হাজার তারার মেলা। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। এত ভালো লাগছে, ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। আমার মনে হয় রাতের আকাশ, খোলা বাতাস আর কখনোই এত ভালো লাগেনি আমার কাছে।

কাছেই সেই ওয়াচহাউস। সেটা ছাড়িয়ে এগোলাম কিছুদূর। আরও কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে মোড় নিলাম ডানে। খেয়াল করলাম যেদিক থেকে এসেছি, ঠিক তার বিপরীত দিকে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছি। খানিকটা এগিয়ে থামলাম পিরামিডের পশ্চিমপ্রান্ত ঘেঁষে। সামনে চমৎকার কারুকার্যখচিত দুটো তামার দরজা। একদল সৈন্য পাহারায় নিয়োজিত। আমাদেরকে দেখে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল ওরা।

দরজা পার হয়ে বেশ বড় একটা হল। ডানজনে বন্দি থাকা অবস্থায় যে-রকম হলে ছিলাম, অনেকটা সে-রকম। ভিতরে লণ্ঠন জ্বলছে। পলিশ-করা মার্বেল দিয়ে বানানো চারদিকের দেয়াল। একধারে একসারিতে বেশ কয়েকটা ঘর, বোধহয় সান্ত্রীদের ঘুমানোর জন্য।

হলের শেষপ্রান্তে একটা গোবরাট। সেটার কাছে সাদা লিনিনের পোশাক পরিহিত কয়েকজন পুরোহিত দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের

সঙ্গে যে-সৈন্যরা এসেছে তাদের সম্ভবত ওই গোবরাট অতিক্রম করার অনুমতি নেই, তাই পুরোহিতদের কাছে আমাদেরকে "বুঝিয়ে দিয়ে" বিদায় নিল ওরা। ওই পুরোহিতদের পিছু নিয়ে বেশ কয়েকটা প্যাসেজ পার হয়ে আবার আমরা হাজির হলাম সেই নিরাকার নামহীন দেবতার মন্দিরে। আগেরবারের সঙ্গে পার্থক্য একটাই—এখন আর খালি না মন্দিরটা।

ছোট্ট বেদিটার পিছনে দেখা যাচ্ছে তিনটা টুল। চমৎকার পোশাক এবং সোনা ও রত্নপাথরের অলঙ্কার পরে একটাতে বসে আছে টিকাল, অন্যটাতে মাটাই, শেষেরটাতে নাহুয়া। মায়ার কথা বাদ দিলে নাহুয়া ছাড়া অন্য কোনো মহিলা নেই মন্দিরের ভিতরে। বেদির সামনের জায়গাটা খালি। তবে বেদি ঘিরে বসে আছে ছত্রিশজন লোক—সবাই ভ্রাতৃসংঘের সদস্য। যার যার পদমর্যাদা অনুযায়ী পোশাক পরে আছে এরা। সবার চেহারায় গাম্ভীর্য।

মায়ার পিছন পিছন আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম বেদির সামনে। কিছু বলছি না কেউই। ভ্রাতৃসংঘের সদস্যদেরকে দেখে মনে হচ্ছে না, ওরা দেখতে পেয়েছে আমাদেরকে অথবা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েছে। কী এক ধ্যানে মশগুল ওরা সবাই। মাথা খানিকটা নিচু করে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। কোলের উপর ভাঁজ করে রেখেছে দু'হাত।

শেষপর্যন্ত দরজার কাছে দাঁড়ানো এক পুরোহিত টিকালের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'মহামান্য, যিনি নিজেকে আমাদের সংঘের সদস্য বলে দাবি করেন তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন আপনার সামনে। তাঁর সঙ্গে আছে ভিনদেশী দুই আগন্তুক যারা নিজেদেরকে সংঘের সদস্য বলে দাবি করছে।'

টিকাল কিছু বলার আগেই "ধ্যান" ভেঙে উঠে দাঁড়াল এক লোক, আমাদের কাছে এগিয়ে এল। দু'টুকরো কাপড় বের করল পোশাকের ভিতর থেকে। আমার আর সিনরের চোখ বেঁধে দিল। তারপর, শব্দ শুনে বুঝলাম, ফিরে গিয়ে বসে পড়ল আগের

জায়গায়।

'আমি না-বললে কোনো কথা বলবেন না,' ফিসফিস করে আমাদেরকে সতর্ক করে দিল মায়া।

'বলুন, ভিনদেশী আগন্তুকেরা,' টিকালের ভারী কণ্ঠ গমগম করে উঠল মন্দিরের ভিতরে, 'কী নাম আপনাদের?'

মায়া বলে উঠল, 'একজন "সমুদ্রপুত্র", আরেকজন ইগনাশিয়ো।'

'বলুন, কেন এলেন আপনারা আমাদের দেশে?' আবারও জিজ্ঞেস করল টিকাল। 'কী উদ্দেশ্য আপনাদের? ঢোকার সময় দরজার গায়ে লেখা ছিল, "অজানা-অচেনা কেউ বিনা-অনুমতিতে অথবা বিনা-আদেশে ঢুকলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে"—পড়েননি?'

'প্রথম কথা, ওরা অজানা না, অচেনাও না,' আবারও বলল মায়া। 'ওরা আমাদের ভ্রাতৃসংঘের সদস্য। এঁদের একজনের কাছে অমূল্য রত্নপাথরের একটা টুকরো সবসময় থাকে। আর সমুদ্রপুত্রও আমাদের দলেরই লোক। কারণ তিনিও কোনো এক সময় শপথ করে ওই রত্নপাথরের টুকরোটা নিজের কাছে সংরক্ষণ করেছিলেন। দ্বিতীয় কথা, এঁদের এখানে আসার উদ্দেশ্য খুব সাধারণ। আমাদের দেবতাকে দেখতে এবং মূলত তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাতেই এখানে এসেছেন তাঁরা।'

'কীভাবে এলেন তাঁরা? তাঁদের তো পথ চেনার কথা না?'

'আমি চিনিয়ে নিয়ে এসেছি। তবে মহান দেবতার হৃৎপিণ্ড আমাদেরকে পথ দেখিয়েছে, মুখ কথা বলে দিক বাতলে দিয়েছে, চোখ আলো দিয়েছে সবসময়।'

'তা-ই নাকি? তা হলে আমি আদেশ করছি, মহান দেবতার হৃৎপিণ্ডের চিহ্নটা প্রদর্শন করা হোক। তা না হলে মরতে হবে আপনাদের তিনজনকেই।'

নীরবতা। দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু বুঝতে পারছি আমাদের হয়ে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বিশেষ সেই সংকেত প্রদর্শন করছে মায়া।

'এবার দ্বিতীয় সংকেতটা দেখানো হোক,' হুকুম করল টিকাল। 'মহান দেবতার মুখের সংকেত। না-পারলে তাঁর অভিশাপে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবেন আপনারা।'

আবারও নীরবতা। দ্বিতীয় সংকেতটা দেখাচ্ছে মায়া।

'এবার তৃতীয় সংকেত—হৃৎপিণ্ডের চিহ্ন,' শুনে বোঝা গেল মায়াকে আটকাতে না-পেরে আস্তে আস্তে খারাপ হচ্ছে টিকালের মেজাজ, 'সবচেয়ে গোপন এবং আমাদের ভ্রাতৃসংঘের সবচেয়ে মহান সংকেত।'

গাছ থেকে খসে-পড়া পাতা ঝোড়ো বাতাসে উড়ে গেলে যে-রকম শব্দ হয়, মুখ দিয়ে ঠিক সে-রকম আওয়াজ করছে মায়া। শুনে সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন তৈরি হলো আমাদের সামনে-বসা ওই লোকগুলোর মধ্যে; দেখতে না-পেলেও বুঝতে পারলাম, বিজাতীয় কোনো একটা শব্দ উচ্চারণ করতে করতে ষাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতে লাগল ওরা (পরে মায়ার কাছ থেকে জেনেছি)।

এরপর কেউ একজন এগিয়ে এসে খুলে দিল আমাদের চোখের বাঁধন।

'ভিনদেশী আগন্তুকেরা,' বিষদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে টিকাল, 'এবার আপনাদের কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন।'

মুখ খুললাম আমি, 'ভাইয়েরা—হ্যাঁ, এই সম্বোধনই ব্যবহার করবো আপনাদের জন্য কারণ এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমি আপনাদের দলেরই একজন। যদি দরকার হয় যে-কোনো গোপন সংকেত প্রদর্শন করে দেখাতে রাজি আছি। এবং বিশ্বাস করুন বা না-করুন আপনাদের যে-কারও চেয়ে আমার পদমর্যাদা বেশি। কারণ পবিত্র রত্নপাথরের একটা টুকরো উত্তরাধিকার সূত্রে সবসময় নিজের কাছে রাখি আমি। আশা করি আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে আমরা তিনজন—তিনজন বলছি কারণ আপনাদের এককালের সর্দার

যিব্যালবে মারা গেছেন তাই তাঁকে বিচারের আওতায় আনা সম্ভব না—আপনাদের শহরের প্রচলিত আইন ভঙ্গ করেছি। এই অপরাধের কারণে আজ থেকে আট দিন আগেই হয়তো প্রাণদণ্ড দেয়া হতো আমাদেরকে। তবে লেডি মায়া সেদিন আবেদন জানিয়েছিলেন, বলেছিলেন আজকের এই বিচার-অনুষ্ঠানের কথা। মহামান্য টিকাল একটু আগে বললেন আপনাদের শহরের প্রবেশদ্বারে নাকি লেখা আছে—অজানা-অচেনা কেউ বিনা-অনুমতিতে অথবা বিনা-আদেশে ঢুকলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। এখন আপনারাই বলুন, একই ভ্রাতৃসঙ্ঘের লোক ওই দলেরই অন্য লোকদের কাছে কী করে অজানা-অচেনা হতে পারে?'

চুপ করে আছে সামনে-বসা বিচারকেরা। টিকালও চুপ। কিছুক্ষণ পর বলল সে, 'আপনারা যে আসলেই আমাদের দলের লোক তা কিন্তু প্রমাণসাপেক্ষ ব্যাপার। আমাদের দলের লোক হলে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস জানার কথা আপনাদের। আমাদের সব রহস্য জানার কথা। আমাদের সব গোপন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারার কথা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'রাজি আছি। কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রার্থনা আছে।'

টিকাল জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

ইঙ্গিতে দেখালাম সিনরকে। 'এই ভদ্রলোক আমাদের দলের নতুন সদস্য। ইনি এখনও আমাদের সব গোপন কথা জানেন না। বিনা-অনুমতিতে তাঁকে সেগুলো জানাতেও চাই না। আপনারা যদি তাঁর উপস্থিতিতে জিজ্ঞেস করেন আমাকে আর আমি যদি সেগুলোর জবাব দিই, তা হলে আমাদের ব্যাপারে হয়তো এমন কিছু জানা হয়ে যাবে তাঁর যা এখন জানা উচিত না। তাই আমার বিবেচনায় তাঁকে মন্দিরের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া উচিত আপাতত।'

কথাটা ভেবে দেখল টিকাল, বুঝতে পারল ভুল বলিনি আমি। ইশারা করল সে প্রহরীদের্‌কে। ওরা এগিয়ে এসে সিনরকে নিয়ে

গেল মন্দিরের বাইরে। ভারী দরজাটা বন্ধ করে দেয়া হলো আবার।

ভাবগম্ভীর পরিবেশ তৈরির জন্য কমিয়ে দেয়া হলো লণ্ঠনগুলোর আলো। পুরোহিত আর ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বয়স্ক তারা এগিয়ে এল আমার দিকে, ঘিরে ধরল আমাকে। বিভিন্ন বিষয়ে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগল। সবই আমার জানা, কাজেই আমিও যথাসম্ভব গুছিয়ে জবাব দিতে লাগলাম। শেষপর্যন্ত ওরা পান্নার টুকরোটা দেখতে চাইল। গলার কবচ থেকে খুলে হাতে নিয়ে দেখালাম ওদেরকে সেটা। তারপর টিকালের অনুমতি নিয়ে মাটাইকে এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম যার উত্তর, যতদূর জানি মেক্সিকোর খুব কম লোকই জানে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল মাটাই, আমতা আমতা করতে লাগল। বাইরের দুনিয়া এবং আধুনিক জীবন নিয়েও অনেক কিছু বললাম ওদেরকে। মুখে স্বীকার না-করলেও মেনে নিতে বাধ্য হলো ওরা তখন, পদমর্যাদার দিক দিয়ে আসলেই ওদের অনেক উপরে আমি।

শেষপর্যন্ত বলতে বাধ্য হলো টিকাল, 'বেদি ঘিরে বসে আছে আমাদের সঙ্ঘের সদস্যরা, আপনি বসুন ওদের সবার সামনে।'

তারমানে আমাকে আলাদা দৃষ্টিতে দেখছে সে।

'জ্ঞানই শক্তি,' মনে মনে বললাম আমি।

এবার ডেকে পাঠানো হলো সিনরকে।

ভিতরে ঢুকলেন সিনর। দেখে মনে হচ্ছে অস্বস্তিতে ভুগছেন। বেচারার জন্য খারাপ লাগছে আমার। কারণ আমাদের গোপন প্রশ্নগুলোর একটারও জবাব তিনি দিতে পারবেন কি না সন্দেহ।

প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিতে পারলেন তিনি। কিন্তু আটকে গেলেন দ্বিতীয়টাতে। তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রশ্নের বেলায়ও একই ঘটনা ঘটল। রাগে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারালেন সিনর, গাল দিয়ে উঠলেন স্প্যানিশ ভাষায়। খোলা তরবারি হাতে প্রহরীরা ঘিরে ধরল তাঁকে।

'ভাইয়েরা,' টিকালের ঠোঁটের কোনায় মুচকি হাসি, দু'চোখে অকৃত্রিম খুশি, 'এই প্রতারকটাকে আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার

দরকার আছে বলে মনে হয় না। বিনা-অনুমতিতে আমাদের শহরে প্রবেশ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে সে। এবার নিজের জীবনের বিনিময়ে সে-অপরাধের মাশুল দিতে হবে ওকে। আরও বড় কথা, নিজেকে আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্য দাবি করে জঘন্য মিথ্যাচার করেছে। অথচ দেখুন, কত সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে, সেগুলোরই জবাব দিতে পারল না। ...কী বলেন আপনারা? কী শাস্তি হওয়া উচিত ওর? প্রাণদণ্ড ছাড়া অন্য কিছু কি দিতে পারি আমরা ওকে?'

বেদির এককোনায় চুপ করে বসে ছিল, কিছু বলার জন্য লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মায়া। উঠে দাঁড়ালাম আমিও, ইশারায় চুপ করে থাকতে বললাম মেয়েটাকে। বিচারকদের উদ্দেশ্যে বললাম, 'আপনারা কোনো রায় ঘোষণা করার আগে আমার একটা কথা শুনুন দয়া করে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এই লোক সত্যিই আমাদের দলের সদস্য। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, তিনি ভিনদেশী, তাই তাঁকে সদস্য বানানোর সময় আমাদের ব্যাপারে যেসব কথা শেখানো হয়েছিল তার বেশিরভাগই ভুলে গেছেন। এর সবচেয়ে বড় কারণ—ভাষাগত সমস্যা এবং অনেক দিন ধরে চর্চার অভাব। তাঁকে কীভাবে আমাদের দলের সদস্য বানানো হলো সে-কাহিনি বলি আপনাদেরকে, তা হলে আপনাদের মনে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না,' বলে আমি খনিতে আটকা পড়ার পর কীভাবে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন সিনর সে-বর্ণনা দিলাম। যিব্যালবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো কীভাবে তা-ও বললাম। কত কষ্ট সহ্য করে ফিরে এসেছি আমরা সিটি অভ দ্য হার্টে সে-কথা জানাতেও ভুল করলাম না। খেয়াল করলাম, সবাই, এমনকী টিকালও মনোযোগ দিয়ে শুনছে আমার কথা।

আমার কথা শেষ হলে কী শাস্তি দেয়া যায় সিনরকে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল ওরা। টিকাল প্রস্তাব দিল ভোটাভুটির। পুরোহিতদের মধ্যে মাত্র একজন বলল, ক্ষমা করে

দেয়া হোক সিনরকে। বাকি সবার দাবি, অনতিবিলম্বে প্রাণদণ্ড দেয়া হোক তাঁকে।

এ-ব্যাপারে আমার আর কিছু বলার আছে কি না তা-ও জানতে চাইল কেউ কেউ।

'আছে,' বললাম আমি, বুঝতে পারছি সিনরকে বাঁচানোর জন্য আর মাত্র একটা রাস্তা খোলা আছে, 'যিব্যালবে বিশ্বাস করত, অমূল্য সেই রত্নপাথরের টুকরো দুটোকে, আরও পরিষ্কার করে বললে দিবা ও নিশিকে একসঙ্গে জোড়া দিলে অলৌকিক কিছু-না-কিছু ঘটবেই। আপনারা জানেন অনেক বছর আগে একসঙ্গে ছিল এ-দেশের লোকেরা। ভয়াবহ এক যুদ্ধ দু'ভাগে ভাগ করে দেয় তাদেরকে। তখন দিবা আর নিশি আলাদা হয়ে যায়। ওদেরকে আলাদা করার অপরাধে দেবতাদের অভিশাপ নেমেছে আমাদের উপর—ভিনদেশী বর্বররা শাসক হিসেবে চেপে বসেছে আমাদের কাঁধে, লুটে নিয়ে ওদের দেশে পাচার করছে আমাদের সম্পদ। কথাটা ঠিক বলেছি কি না?'

চুপ করে আছে পুরোহিতরা। এমনকী টিকাল বা মাটাইও কিছু বলছে না।

'যিব্যালবে বিশ্বাস করত,' বলে চললাম আমি, 'দিবা আর নিশিকে যদি একসঙ্গে করা যায় তা হলে এই অভিশাপ কেটে যাবে, দেবতাদের পক্ষ থেকে কোনো-না-কোনো নির্দেশনা আসবে যা পথ দেখাবে আমাদেরকে। আর সে-কারণেই বুড়ো বয়সে এত কষ্ট করে খুঁজে বের করতে গিয়েছিল আমাকে,' পান্নার টুকরোটা দেখালাম সবাইকে। 'এই যে, এই সেই রত্নপাথর—দিবা। মহামান্য টিকাল, গ্রহণ করুন এটা, আজ থেকে এটার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি। আরেকটা লেডি মায়ার কাছে আছে। আপনার প্রতি আমার অনুরোধ, একসঙ্গে করুন দিবা আর নিশিকে, রাখুন জায়গামতো, তারপর দেখি যিব্যালবের সেই ধারণা আসলেই ঠিক কি না।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো টিকাল। 'কিন্তু সমুদ্রপুত্র থাকতে পারবে না মন্দিরের ভিতরে।' গলা চড়িয়ে বলল, 'প্রহরীরা, এই লোকটাকে বাইরে নিয়ে যাও। কড়া পাহারায় রাখবে।' মায়ার দিকে তাকিয়ে দেখল ভয়ে শুকিয়ে গেছে মেয়েটার চেহারা। বলল, 'ভয় পাবেন না, লেডি মায়া। আমাদের আজকের এই বৈঠক শেষ না-হওয়া পর্যন্ত আপনার বন্ধুর কোনো ক্ষতি হবে না। ওকে আসলে কিছুটা সময় দিচ্ছি যাতে ঘনিয়ে-আসা মৃত্যুর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।'

দ্বিতীয়বারের মতো মন্দিরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো সিনরকে। মায়া সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস যতটুকু জানে বলতে শুরু করল টিকাল। তারপর বলল, 'ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি, আমার বাপ-দাদারা বলত, দিবা আর নিশি একসঙ্গে হলে ভাগ্য ফিরবে আমাদের। কিন্তু কথাটা তেমন একটা বিশ্বাস করি না আমি। তারপরও যিব্যালবে যখন এত কষ্ট করে পবিত্র রত্নপাথরের আরেকটা টুকরো উদ্ধার করেছে, এত কষ্ট করে যখন সেটা নিয়ে এসেছে আমাদের শহর পর্যন্ত, একবার পরীক্ষা করেই দেখি কী হয়। কী বলেন আপনারা?'

রাজি হলো সবাই।

'ভালো,' বলে মাটাইয়ের দিকে তাকাল টিকাল। 'আজকের এই সভার নেতা হিসেবে আপনাকে আদেশ করছি, পবিত্র রত্নপাথরের টুকরো দুটো নিন। তারপর যথাস্থানে স্থাপন করুন।'

'আপনি আদেশ করলে তা পালন না-করে উপায় নেই আমার,' উঠে দাঁড়াল মাটাই। 'তবে তার আগে দুটো কথা বলতে চাই।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল টিকালের। বাকিরাও আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে বুড়ো লোকটার দিকে।

'আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই শিশুসুলভ মনে হচ্ছে,' বিনীত ভঙ্গিতে বলল মাটাই, 'অনেক বছর আগের লোকেরা কী বিশ্বাস করত, আর তা পালন করলে আমাদের উপকার হবে—এসবে

সন্দেহ আছে আমার।'

'থাকুক সন্দেহ!' একসঙ্গে বলে উঠল বেশ কয়েকজন পুরোহিত, 'আপনার কাজ আপনি করুন। আমরা দেখতে চাই শেষপর্যন্ত কী হয়!' খেয়াল করলাম লোকগুলোর কৌতূহল আস্তে আস্তে বাড়ছে।

'বললাম তো,' অধৈর্য হয়ে উঠছে টিকালও, 'যা হওয়ার হবে। আর কিছু যদি না-ও হয় তাতে আমাদের তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, নাকি? তবে রত্নপাথরের টুকরো দুটো পবিত্র হৃৎপিণ্ডের ভিতরে বসানোর আগে সাবধান থাকবেন। বেশি নড়াচড়া করলে অকেজো হয়ে যেতে পারে ফ্লাডগেট। তখন হ্রদের পানি ঢুকে পড়বে শহরে। ডুবে মরবো সবাই।'

দিবা আর নিশিকে নিল মাটাই। মন্দিরের ভিতরে পিনপতন নীরবতা। দু'হাতে দু'টুকরো রত্নপাথর নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে হৃৎপিণ্ডটার দিকে। কাছে গিয়ে থামল, কেন যেন ইতস্তত করল কিছুক্ষণ। তারপর, আগের বারের মতো, দিবা-নিশিকে একসঙ্গে জায়গামতো বসিয়ে দিয়ে জোরে চাপ দিল।

আবারও "প্রস্ফুরিত" হলো পবিত্র হৃৎপিণ্ড। উদ্ভাসিত হলো মানবচক্ষুর আকৃতির সেই রত্নপাথর। কিন্তু এ কী! আগেরবার যতটা জ্বলজ্বল করছিল পাথরটা এখন সে-রকম করছে না কেন? সম্ভবত মাটাইও খেয়াল করেছে ব্যাপারটা। ভয়ে চেহারা শুকিয়ে গেছে ওর। দু'হাত কাঁপছে।

অস্পষ্ট বিস্ময়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পুরোহিতদের কেউ কেউ ফিসফিস করে কী যেন বলাবলি করছে।

'দেখা যাচ্ছে,' টিকালের গলায় তেমন জোর নেই, 'যিব্যালবের পাগলামির মধ্যে কিছুটা হলেও সত্যতা ছিল। খুলে গেছে আমাদের পবিত্র "হৃৎপিণ্ড"। দেখা যাচ্ছে পবিত্র একটা রক্তচক্ষু। সোনার একটা প্লেটের উপর বসানো আছে চোখটা। কী যেন লেখা আছে প্লেটটাতে।'

'কী লেখা আছে জানতে চাই আমরা!' একসঙ্গে বলে উঠল বেশ

কয়েকজন পুরোহিত।

এবার বেদির দিকে এগিয়ে গেল টিকাল। কাঁপা কাঁপা হাতে সরাল "রক্তচক্ষুটা"। সোনার প্লেটটা তুলে নিয়ে এসে ভালোমতো দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বলল, 'পড়তে পারছি না। এই চিত্রলিপি অনেক প্রাচীন।' তাকাল মাটাইয়ের দিকে। 'এসব বিষয়ে আপনি পণ্ডিত, আপনিই বরং পড়ে শোনান আমাদের সবাইকে।'

প্লেটটা হাতে নিল মাটাই। মনোযোগ দিয়ে দেখল অনেকক্ষণ। ওর আচরণ কেমন রহস্যজনক মনে হচ্ছে আমার কাছে। লোকটা অভিনয় করছে কি না বুঝতে পারছি না। প্রথমে চেহারায় ছিল উদ্বেগের স্পষ্ট ছাপ, অথচ এখন মনে হচ্ছে আশ্চর্য হয়ে গেছে সে। ওর ব্যাপারে সিনর যা বলেছেন তা মনে পড়ে গেল আমার। আমাদেরকে ফাঁকি দেয়ার জন্য অন্য কোনো প্লেট বসিয়ে রেখেছে কি না সে...

'চুপ করে আছেন কেন?' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন পুরোহিত। 'পড়ছেন না কেন?'

'ভাইয়েরা,' ধীর কম্পিত গলায় বলতে শুরু করল মাটাই, 'চিত্রলিপি যত প্রাচীনই হোক না কেন তা পড়তে অসুবিধা হয় না আমার। কিন্তু এই চিত্রলিপির ভাষা এত...কী বলবো...অদ্ভুত যে, আপনাদেরকে জানাতে দ্বিধা হচ্ছে আমার।'

'কোনো দ্বিধা করবেন না,' আশ্বাস দিল টিকাল। 'যত অদ্ভুতই হোক জানতে চাই আমরা।'

'কিন্তু...শেষে যদি বলেন আমার পড়ায় ভুল হয়েছে? যদি বলেন আমি যা জানি তা ঠিক না?'

'না, সে-রকম কিছু বলবো না আমরা,' যত কালক্ষেপণ করছে মাটাই তত ক্ষেপে উঠছে পুরোহিতরা, 'আপনি পড়ুন।'

আর দেরি না-করে পড়তে শুরু করল মাটাই, '"আমি সেই অস্তিত্ব যে সৃষ্টি করেছে সবকিছু। এই মন্দিরটা যখন বানানো হয় তখন আমার মনোনীত এক ব্যক্তি আমার আদেশেই এই কথাগুলো

লিখেছে একটা সোনার-পাতের উপর। তারপর পাতটা গোপনে লুকিয়ে রেখেছে যাতে যেদিন একসঙ্গে হবে "দিবা" আর "নিশি" সেদিন, এমন এক পবিত্র মেয়ে জানতে পারে কথাগুলো যে আজ পর্যন্ত জন্মায়নি। পথভ্রষ্ট যে-জাতিকে পথ দেখাচ্ছি আমি তাদের নামের সঙ্গে ওই মেয়েটার নামের মিল থাকবে। যে-সময়ে আমার এই বাণী উন্মোচিত হবে ততদিনে ওই জাতির অনেকেই বুড়ো হয়ে যাবে, ওদের সংখ্যাও কমে যাবে। সাহস হারিয়ে ফেলবে ওরা, হিংসা-বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়বে সবার মাঝে। ওই সময়ে ওই মেয়ে বিয়ে করবে এক সাদা দেবতাকে যাকে সাগরজলের উপর ভাসিয়ে, মরুভূমি পার করে নিয়ে আসবো আমি। যদি তোমরা ওদের কথা শোনো, দিন দিন উন্নতি করবে, শক্তিশালী হবে। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়বে তোমাদের সাম্রাজ্য।"'

পড়া শেষ হলো মাটাইয়ের।

টিকালের দিকে তাকিয়ে দেখি, রাগে কালো হয়ে গেছে ওর চেহারা। মাটাইয়ের শেষ শব্দটার প্রতিধ্বনি তখনও মিলিয়ে যায়নি, তার আগেই লাফ দিয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। চিৎকার করে বলল, 'এই কথাগুলো ডাহা মিথ্যা। মানুষ বা দেবতা যে-ই লিখে থাকুক না কেন কথাগুলো, অভিশাপ নামুক তার উপর। লেডি মায়াকে একটা সাদা কুকুরের সঙ্গে বিয়ে দেবো আমরা? ওদের সন্তানরা শাসন করবে আমাদেরকে? জীবনেও না। তার আগেই লেডি মায়াকে শেষ করে দেবো আমি। তবে সবার আগে খুন করবো ওই সাদা কুকুরটাকে।'

ভ্রাতৃসঙ্ঘের বয়স্ক এক পুরোহিত, যার নাম ডিমাস, পরে জানতে পারি লোকটা নাকি টিকালের সৎ ভাই, রেগে গিয়ে উঠে দাঁড়াল তখন। বলল, 'টিকাল, আপনি যা বলছেন বুঝে বলছেন তো? পবিত্র মন্দিরে দাঁড়িয়ে আপনি দেবতাকেই অভিশাপ দিচ্ছেন? শেষে সেই অভিশাপ না আপনার উপরই এসে পড়ে! দিবা-নিশি একসঙ্গে হয়েছে। দেবতার পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনার অপেক্ষায়

ছিলাম আমরা, তিনি সাড়া দিয়েছেন। এবার আর কিছু করার নেই আমাদের। যাকে আপনি সাদা কুকুর বলছেন, দেবতার ইচ্ছা সেই ভিনদেশীর সঙ্গেই বিয়ে হোক লেডি মায়ার। আপনি কি এর বিরুদ্ধাচরণ করতে চান? আপনি কি নিজেকে এতটাই শক্তিশালী মনে করেন যে, নিয়তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন?'

'কী?' রাগে চেঁচিয়ে উঠল টিকাল। 'এই ভিনদেশীরা আমাদেরকে শাসন করবে আর আমি তা মেনে নেবো?'

'কে শাসন করবে আর কে করবে না তা আমি জানি না,' সমান তেজে বলল ডিমাস। 'কারণ দেবতার বাণীতে কোথাও বলা নেই ভিনদেশীরা আমাদেরকে শাসন করবে কি না। দেবতার বাণীতে বলা হয়েছে, লেডি মায়া বিয়ে করবেন সমুদ্রপুত্রকে। এখন তাঁর যদি ইচ্ছা হয় সিংহাসনে বসবেন। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, নিরপেক্ষভাবে বলতে রাজি আছি, এখন সিংহাসনে বসার অধিকার উত্তরাধিকারসূত্রে শুধু লেডি মায়ার। কারণ তাঁর বাবা সর্দার থাকা অবস্থায় মারা গেছেন। আপনি বর্তমানে সর্দার হলেও জোর করে ক্ষমতা দখল করেছেন।'

চুপ হয়ে গেল টিকাল। প্রচণ্ড রাগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

পুরোহিতদের অনেকেই তাকিয়ে আছে মায়ার দিকে। কেউ কেউ বলল, 'আপনি সামনে আসুন। কিছু বলুন আমাদের উদ্দেশ্যে।'

কয়েক পা সামনে এসে দাঁড়াল মায়া। মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে সে। নিচু গলায় বলল, 'শুধু একটা কথাই বলতে চাই—দেবতার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। নিয়তি যদি চায় সমুদ্রপুত্রের সঙ্গেই বিয়ে হোক আমার, আপত্তি করবো না। আপনারা জানেন টিকালের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল আমার। কিন্তু নিজের ইচ্ছায় নাহুয়াকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে সে। অবশ্য কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, ওর এই বিয়েতে নিয়তির ইশারা ছিল না। আরেকটা কথা। নাহুয়া এখন লেডি অভ দ্য হার্ট। ওকে সরিয়ে দিয়ে ওর জায়গা দখল করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। দেবতার বাণীতে

কী আছে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আপনাদেরকে। বলা হয়েছে, "যদি তোমরা ওদের কথা শোনো, দিন দিন উন্নতি করবে, শক্তিশালী হবে। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়বে তোমাদের সাম্রাজ্য।" তারমানে আমাদের কথা শুনতে বাধ্য করা হয়নি আপনাদেরকে। কাজেই টিকালের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করতে চাই আমি। সিংহাসন ওরই থাকবে, নাহুয়ার কাছ থেকেও কেড়ে নেয়া হবে না লেডি অভ দ্য হার্ট উপাধি, বিনিময়ে শান্তিতে থাকতে দেয়া হবে আমাকে এবং আমার বন্ধুদেরকে।'

'লেডি মায়া ভালো কথা বলেছেন, মহামান্য টিকাল,' সুযোগ বুঝে এতক্ষণে মুখ খুলল মাটাই। 'আপনি সর্দার হতে চেয়েছিলেন, পেরেছেন। নাহুয়া লেডি অভ দ্য হার্ট হতে চেয়েছিল, পেরেছে। আপনি লেডি মায়াকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি রাজি ছিলেন না কখনোই। অথচ তাঁর অনুপস্থিতিতে আপনি বিয়ে করেছেন আমার মেয়েকে। কাজেই আমার মনে হয় বাকিটা ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিলে সবদিক দিয়ে ভালো হবে আমাদের জন্য।' আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সে, কারণটা বুঝতে পারলাম না। 'লেডি মায়া বলছেন তিনি সমুদ্রপুত্রকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত। এখন আমাদের উচিত ওই লোকটাকে জিজ্ঞেস করে দেখা তিনিও রাজি আছেন কি না। যদি রাজি থাকেন তা হলে দেবতার ইচ্ছা বাকি রেখে তাঁর অভিশাপ নিজেদের উপর নেয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?' ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যদের দিকে তাকাল সে। 'আপনারা কী বলেন?'

'না, দেবতার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখা মোটেও উচিত হবে না,' একসঙ্গে বলল অনেকে।

'তা হলে,' টিকালের দিকে তাকাল মাটাই, 'সমুদ্রপুত্রকে আমাদের সামনে হাজির করতে আদেশ করুন, মহামান্য।'

একুশ

মায়ার বিয়ে

মন্দিরের দরজাটা খুলে গেছে আবার। সিনরকে নিয়ে আসা হচ্ছে ভিতরে। দেখে মনে হচ্ছে তিনি ভাবছেন তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরোহিতরা। কারণ চোয়াল শক্ত হয়ে আছে তাঁর, দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আছে—আত্মরক্ষার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন তিনি। কিন্তু তিনি কাছাকাছি পৌঁছানোমাত্র একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল পুরোহিতরা। জোর গলায় বলে উঠল, 'স্বাগতম, সমুদ্রপুত্র! স্বাগতম, দেবতার প্রিয় ব্যক্তি!'

সঙ্গে সঙ্গে সিনর বুঝতে পারলেন ঘটনা কী ঘটেছে। চেপে রাখা দম শব্দ করে ছাড়লেন। তিনি যাতে বেফাঁস কিছু বলে না-বসেন সে-জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল মাটাই, 'শুনুন সমুদ্রপুত্র। দেবতা কথা বলেছেন আপনার পক্ষে।'

মায়ার উপর থেকে চোখ সরিয়ে মাটাইয়ের দিকে তাকালেন সিনর।

'যিব্যালবে যেমনটা ভেবেছিল ঠিক তা-ই হয়েছে,' বলে চলল মাটাই। 'দিবা-নিশিকে একসঙ্গে করার পর এই সোনার-প্লেটটা পেয়েছি আমরা,' হাতের প্লেটটা উঁচু করে দেখাল সে সিনরকে। 'এবং আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, এখানে আপনার কথা বলা হয়েছে। কী বলা হয়েছে জানতে চান?'

কিছু বললেন না সিনর। চেহারা যতটা সম্ভব গম্ভীর করে রেখেছেন তিনি। তবে চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে খুশি হয়েছেন।

নীরবে উপভোগ করছেন মাটাইয়ের অভিনয়।

প্লেটের চিত্রলিপি দ্বিতীয়বারের মতো পড়তে শুরু করল মাটাই। ওর সেই সাজানো "ভবিষ্যদ্বাণীর" একটা বর্ণও এদিক-ওদিক হলো না। পড়া শেষ হলে বলল সে, 'সমুদ্রপুত্র, এবার সিদ্ধান্ত নেয়ার পালা আপনার। লেডি মায়াকে কি বিয়ে করতে রাজি আছেন? নাকি বিনা-অনুমতিতে সিটি অভ দ্য হার্টে প্রবেশ করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবেন? জানি আমাদের দেবতার উপর বিশ্বাস নেই আপনার, কিন্তু তিনিই আপনাকে পছন্দ করেছেন; আপনি কি তাঁর ইচ্ছা অমান্য করবেন?'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন (অথবা চিন্তা করার ভান করলেন) সিনর। তারপর বললেন, 'লেডি মায়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেই বলছি—তাঁর মতো এত সুন্দর আর কমনীয় কাউকে বাদ দিয়ে যে-লোক মৃত্যুর মতো কুৎসিত কোনো কিছু বেছে নেয় সে চরম বোকা। তবে এটা এ-রকম একটা ঘটনা যাতে আমার একক সিদ্ধান্তের কোনো দাম নেই। লেডি মায়া কী বলেন এ-ব্যাপারে?'

'তিনি বলেন,' মাটাই না, জবাবটা দিল মায়া নিজে, 'দেবতার ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা। তিনি কোনোদিন কল্পনাও করেননি ভিনদেশী কাউকে বিয়ে করতে হবে, কোনোদিন ভাবেননি সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করে কোনো "সমুদ্রপুত্রকে" তাঁর সামনে হাজির করাবেন মহান দেবতা। ঘটনাটা যখন ঘটেই গেছে, নিয়তি যখন এ-ই চায়, তখন তিনি দ্বিমত না-করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,' সিনরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন সিনর, ঝুঁকে চুমু খেলেন আঙুলে। তারপর মেয়েটার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'আমি সারাজীবন আপনার সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে রাজি আছি।'

ভেবেছিলাম আমাদের "অনুষ্ঠান" এখানেই শেষ। মনে মনে খুশিও হয়েছিলাম। কিন্তু টিকালের সেই সৎ ভাই ডিমাস হঠাৎ বলে উঠল, 'আমার কিছু বলার আছে।'

ওর দিকে তাকাল সবাই।

'ভাইয়েরা,' বলে চলল সে, 'আসুন এই মন্দির ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে একটা প্রতিজ্ঞা করি আমরা।'

'কীসের প্রতিজ্ঞা?' ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মাটাই।

'এই ভিনদেশীরা আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্য। অনেক দূর থেকে আমাদের দেশে এসেছেন এঁরা। আমাদের অনেক গোপন কথাও জানা আছে তাঁদের। কিছুদিন পর এঁদের একজনের সঙ্গে বিয়ে হবে লেডি মায়ার। ভবিষ্যদ্বাণীটা যদি ঠিকমতো শুনে থাকেন আপনারা, আমার মনে হয় সবাই বুঝতে পেরেছেন, ওই দু'জনের সন্তানের মাধ্যমেই আমাদের এই জাতিকে সমৃদ্ধির পথ দেখাতে চান মহান দেবতা। কাজেই আমার মনে হয় সেই মহান সন্তান জন্ম না-নেয়া পর্যন্ত লেডি মায়া এবং তাঁর পরিবারকে পাহারা দেয়া উচিত আমাদের। মন্দিরের পবিত্র আগুন যেভাবে পাহারা দিয়ে রাখি আমরা সবসময়, ঠিক সেভাবে করা উচিত কাজটা। তা না-হলে দায়িত্বে অবহেলার কারণে দেবতার অভিশাপ নামতে পারে আমাদের উপর। ভিনদেশীদেরও শপথ করা উচিত, আমৃত্যু এই শহরে থাকবেন তাঁরা।'

'ঠিক বলেছেন,' একসঙ্গে বলে উঠল বেশ কয়েকজন পুরোহিত, 'কথাটা ভাবিইনি আমরা!'

ডিমাস বলল, 'সমুদ্রপুত্র এবং ইগনাশিয়ো! ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যরা যা চাচ্ছে তা করুন দয়া করে। পবিত্র হৃৎপিণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে শপথ করুন। যদি কোনোদিন এই শপথ ভাঙেন তা হলে যেন সঙ্গে সঙ্গে দেবতার অভিশাপ নামে আপনাদের উপর, চরম লাঞ্ছিত অবস্থায় যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হয় আপনাদের। শপথ করুন, আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের গোপন কোনোকিছুই কখনও প্রকাশ করবেন না কারও কাছে। ধর্মান্তরিত না-হলেও আমৃত্যু বিশ্বস্ত থাকবেন আমাদের দেবতার প্রতি। বলুন, এই শহরের সম্পদ নিজেদের মনে করে আত্মসাৎ করবেন না। ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যদের অনুমতি ছাড়া এই

শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করবেন না অথবা ভিনদেশী অন্য কাউকে নিয়ে আসবেন না এখানে। যান, বেদির কাছে গিয়ে হাত রাখুন সেটার উপর এবং প্রতিজ্ঞা করুন। আপনাদের দেহ ও আত্মা সমর্পিত হবে মহান দেবতার কাছে।'

অসহায় দৃষ্টিতে তাকালাম সিনরের দিকে। তিনিও একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। বুঝতে পারছি প্রতিজ্ঞা করতেই হবে এখন, অন্য কোনো উপায় নেই। দু'জনে এগিয়ে গেলাম বেদির দিকে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। বেদিতে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করলাম।

অদ্ভুত সেই শব্দগুলো উচ্চারণ করছি, এমন সময় শুনি, পিছনে ঘড়ঘড় শব্দে সরে যাচ্ছে প্রচণ্ড ভারী কোনো পাথর। কী হচ্ছে জানতে ইচ্ছা হলো, কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম না।

আমাদের শপথ নেয়া শেষ। ডিমাস বলল আবার, 'উঠে দাঁড়ান। পিছন ফিরে তাকান। দেখুন কী দেখা যাচ্ছে।'

তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে কুঁকড়ে গিয়ে সেঁটে গেলাম বেদির সঙ্গে। আমাদের থেকে ছ'ফুট দূরে, মেঝে থেকে উধাও হয়ে গেছে মার্বেলের স্ল্যাব। বেরিয়ে পড়েছে গভীর একটা কুয়ার মুখ। অনেক নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে পানি, অখণ্ড নীরবতায় সে-শব্দ শুনতে পাচ্ছি অস্পষ্টভাবে।

'শুনে রাখুন ভাইয়েরা,' শুনে মনে হলো যেন কথা বলছে না, চাবুক দিয়ে পেটাচ্ছে ডিমাস, 'এবং শুনে রাখুন ভিনদেশীরা। এই প্রতিজ্ঞার একটা বর্ণও যদি ভঙ্গ করেন আপনারা, গ্রেপ্তার করা হবে আপনাদেরকে এবং তারপর নিক্ষেপ করা হবে এই কুয়ায়। পানিতে ডুবে মরবেন আপনারা। দেবতাদের অভিশাপে নরকই হবে আপনাদের স্থায়ী ঠিকানা। বুঝতে পেরেছেন?'

মাথা ঝাঁকালাম আমি আর সিনর।

'কুয়ার মুখ বন্ধ করে দেয়া হোক,' বলে চলল ডিমাস, 'আপনারা সবাই প্রার্থনা করুন যাতে কোনোদিনও কাউকে শাস্তি দেয়ার

উদ্দেশ্যে ওই মুখ আর খুলতে না-হয়। সমুদ্রপুত্র এবং ইগনাশিয়ো, আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ। আজ থেকে শুরু করে মরার আগ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সদস্য। এই শহরের অধিবাসী হিসেবে যেসব অধিকার ও সুযোগসুবিধা ভোগ করি আমরা, আজ থেকে আপনারাও তা করতে পারবেন। আরও বড় কথা, বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকার জন্য বাড়ি দেয়া হবে আপনাদেরকে, চাকরবাকর দেয়া হবে। নির্দিষ্ট পরিমাণে মাসোহারা দেয়া হবে যাতে কোনো কিছুর দরকার হলে কিনতে পারেন। যান, বিশ্রাম নিন কিছুক্ষণ। ঘণ্টাখানেক পর ভোর হবে, তখন নিয়মানুযায়ী মন্দির ছেড়ে বের হতে হবে, দেখা করতে হবে জনতার সঙ্গে। লর্ড মাটাই, ওদেরকে নিয়ে যান আপনি।'

জিজ্ঞেস করবো কি করবো না ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত জিজ্ঞেস করেই ফেললাম লোকটাকে, 'পবিত্র রত্নপাথরের যে-টুকরোটা সবসময় আমার সঙ্গে থাকত তার কী হবে?'

'কী হবে মানে?' ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকাল ডিমাস।

'মানে...ওটা কি ফেরত পাবো না?'

'না। দিবা-নিশি 'একসঙ্গে হয়েছে, এই পৃথিবীতে আর কারও সাধ্য নেই আলাদা করে ওদেরকে। মাথা থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলুন। যান, গিয়ে আরাম করুন।'

আর কিছু বললাম না। মাটাইয়ের পিছু নিলাম। সিনর আর মায়া হাঁটছেন পাশাপাশি, নিচু গলায় কথা বলছেন নিজেদের মধ্যে। বেশ কয়েকজন পুরোহিত ঘিরে রেখেছে আমাদেরকে। এবার আর পাতাল কারাকক্ষে না, বরং রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হলো আমাদেরকে। খাবার প্রস্তুত করার আদেশ দেয়া হলো।

নিজের ঘরে ঢুকে হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। খুব ক্লান্ত লাগছে।

মাটাইয়ের বুদ্ধি কাজে লেগে গেছে। আমাদের বিপদ কেটে গেছে

আপাতত। ওদিকে মাটাইয়েরও কোনো ক্ষতি হয়নি, নাহুয়ার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নেয়নি লেডি অভ দ্য হার্ট উপাধি। ভীষণ ক্ষেপে গেলেও নিজেকে শান্ত রেখেছে টিকাল, কিছু করেনি এখন পর্যন্ত।

সিনর আর লেডি মায়ার উদ্দেশ্য পূরণ হতে চলেছে। আমার মনে হয় জনতার সামনে হবু স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করা হবে তাঁদেরকে। কিন্তু আমি কী পেলাম? পরাজয় ছাড়া আর কিছু না। আপাতদৃষ্টিতে নিরাপদ একটা কারাগার ছাড়া অন্য কিছু না। কারণ আমার উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি এবং হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও নেই। আমৃত্যু আটকে থাকতে হবে এই শহরে। অন্য কোথাও যাওয়া যাবে না। যে-সম্পদ নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলাম তা পাবো বলে মনে হয় না।

মাটাই লোকটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আমাদেরকে এত বড় বিপদ থেকে উদ্ধার না-করলেও পারত সে। তারপরও করেছে। টিকালের উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল সে, করতে পেরেছে কাজটা। আবার একইসঙ্গে চেয়েছে ওর মেয়ে নাহুয়ার যাতে কোনো ক্ষতি না-হয়। ওর এই চাওয়াও অপূর্ণ থাকেনি।

আকাশে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। কিছু তারা জ্বলছে এখনও। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। হয়তো ঠাণ্ডার কবল থেকে বাঁচার জন্যই বেশিরভাগ পুরোহিত হুডওয়ালা আলখাল্লা পরে আছে। যে-বেদি ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে টিকালের সঙ্গে কথা বলেছিল মায়া, সে-বেদির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো।

মাটাইয়ের পিছন পিছন হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলাম মন্দিরের ঘটনাগুলো।

বেদির সামনে জড়ো হয়েছে কয়েক হাজার জনতা। কয়েকজনের চেহারার দিকে তাকালাম। ওদের চোখেমুখে ঔৎসুক্য। মন্দিরে কী আলোচনা হয়েছে জানতে চায় ওরা। জানতে চায়, কীভাবে মারা গেল যিব্যালবে। জানতে চায়, দুই ভিনদেশী মানে আমার আর সিনরের কপালে কী আছে। কে হচ্ছে পরবর্তী সর্দার?

পবিত্র রত্নপাথর দুটোর কী হলো শেষপর্যন্ত? এবং হয়তো আরও অনেক কিছু যা এখনও জানি না আমি।

বেদির কাছে পৌঁছানোর পর বসার জন্য আসন দেয়া হলো আমাদেরকে। খেয়াল করলাম, মন্ত্রণাসভার সদস্যদের সঙ্গেই বসেছি আমরা। আরও খেয়াল করলাম, সিনর আর মায়াকে এমন জায়গায় বসানো হয়েছে যাতে উপস্থিত জনতা সহজেই দেখতে পায় তাঁদেরকে।

এতক্ষণ কোলাহলে মুখরিত ছিল জায়গাটা, আমরা আসন গ্রহণ করার পর হঠাৎ করেই চুপ হয়ে গেল সবাই। ওয়াচহাউসের উপর ট্রাম্পেট হাতে দাঁড়িয়ে ছিল এক পুরোহিত, যথাসম্ভব জোরে সেটা বাজিয়ে জানান দিল ভোর হয়ে গেছে। এতক্ষণ খেয়াল করিনি—এককোনায় দাঁড়িয়ে ছিল একদল গায়ক, সম্মিলিত কণ্ঠে সুন্দর সুরের একটা গান গাইতে শুরু করল ওরা। ওদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাল জনতা।

গান চলছে, এমন সময় পুবাকাশে দেখা দিল সূর্যকিরণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলোটা সরাসরি এসে পড়ল বেদির উপর। আবার বেজে উঠল ট্রাম্পেট, শেষ হলো গান, হর্ষধ্বনি করে উঠল জনতা। তারপর আবার নীরবতা। বেদির সদা-জ্বলন্ত আগুনের পাশে সাদা আলখাল্লা পরে দাঁড়িয়ে ছিল এক পুরোহিত, চিৎকার করে প্রার্থনা করতে শুরু করল সে আকাশের দিকে তাকিয়ে, 'হে মহান দেবতা! একটা বছর বিদায় নিল আমাদের কাছ থেকে। এই পুরনো বছরের সঙ্গে আমাদের সব পাপও বিদায় করে দিন আপনি। করুণা করুন আমাদের উপর যাতে এই বছরে পরম শান্তিতে থাকতে পারি আমরা। দেবতা, হে মহান দেবতা, দয়া করুন! অতীতের কালিমা থেকে মুক্ত করে আগামীর আলোয় উদ্ভাসিত করুন আমাদেরকে। মহান দেবতা, আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন!'

থামল লোকটা। তখন সমস্বরে বলে উঠল জনতা, 'আমাদের প্রার্থনা কবুল করুন, মহান দেবতা!'

মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাদা আলখাল্লা পরিহিত পুরোহিত। নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে পুবাকাশের দিকে। ওর সেই ধ্যানমগ্ন লম্বা শরীরে প্রতিফলিত হচ্ছে আগুনের আভা। একটু একটু করে লাল থেকে আরও লাল হচ্ছে পুবাকাশ। শেষপর্যন্ত পিরামিডের চূড়ার উপর দেখা দিল সকালের সূর্য। ম্লান হয়ে গেল পবিত্র আগুনের আলো। মনে হলো অপার্থিব কোনো দ্যুতি যেন নির্বাপক হয়ে নিভিয়ে দিয়েছে আগুনটা। সূর্যের উপাসক এই লোকগুলো প্রার্থনা শেষ করার পর এতক্ষণ মার্বেলের পেভমেন্টের উপর হাঁটু গেড়ে বসে ছিল, এবার সবাই একসঙ্গে দু'হাত বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে। সমস্বরে বলছে, 'স্বাগতম, নতুন বছরের সূর্য, স্বাগতম! শুধু ভালোটাই নিয়ে আসুন আমাদের জন্য। খারাপ সবকিছু আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখুন।'

দ্রুতগতিতে বাড়ছে আলো। চোখের সামনে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হচ্ছে পুরো শহরটা। পাতলা কুয়াশার চাদর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে। দেখা যাচ্ছে প্রাসাদের চূড়াগুলো, কিংবা উঁচু উঁচু ভবনের ছাদ। বেদির কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা অন্য পুরোহিতরা সম্ভবত নববর্ষের প্রার্থনা শুরু করেছে।

প্রার্থনা শেষ হলো। সুন্দর পোশাক পরিহিত কিছু ছেলেমেয়ে হাতে ফুল নিয়ে এগিয়ে এল এমন সময়, বেদির উপর রাখল ফুলগুলো। সম্ভবত এই কাজের জন্য আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয়েছিল এদেরকে। বাহারি রঙের ফুলগুলো দেখতে খুব সুন্দর লাগছে, প্রশান্তিতে ভরে যাচ্ছে মনটা।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল টিকাল। আজকের এই সুন্দর দিনটার জন্য ধন্যবাদ জানাল দেবতাকে। আশীর্বাদ করল সবাইকে।

এরপর উঠে দাঁড়াল মাটাই। এই ক'দিনে যা যা ঘটেছে সব সংক্ষেপে বলল জনতার সামনে—কীভাবে মারা গেছে যিব্যালবে, পবিত্র রত্নপাথরের টুকরো দুটো কীভাবে একসঙ্গে করে রাখা হয়েছে মন্দিরের ভিতরে, কীভাবে "আবিষ্কৃত" হয়েছে রক্তচক্ষু এবং তারপর

মহান দেবতার "ভবিষ্যদ্বাণী"। সোনার প্লেটটা ওর সঙ্গেই আছে, কথাগুলো পড়ে সবাইকে শোনাল সে আরেকবার।

সবশেষে বলল, 'দেবতার ইচ্ছা মান্য করতে রাজি হয়েছেন লেডি মায়া এবং ভিনদেশী সমুদ্রপুত্র। অর্থাৎ বিয়েতে মত দিয়েছেন তাঁরা। সবচেয়ে বড় কথা, সিংহাসনের উপর নিজের দাবি ছেড়ে দিয়েছেন লেডি মায়া। তারমানে মন্ত্রণাসভার সদস্যরা অসম্মতি না-জানালে অথবা আপনারা ভিন্নমত পোষণ না-করলে এখন থেকে মহামান্য টিকালই হবেন আমাদের সর্দার। আমরা সবাই তাঁর আদেশ মেনে চলবো। রাজনীতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চান লেডি মায়া, সংসার আর স্বামীর প্রতি মনোনিবেশ করতে চান। আমরা আশা করছি দেবতা তাঁদেরকে সুসন্তান দান করবেন। সেই সন্তান জন্ম নেয়ার আগ পর্যন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে চান লেডি মায়া। আমরা আরও আশা করছি তাঁদের বংশধর একদিন পথ দেখাবে আমাদেরকে।'

ভাষণ শেষ করল সে। হাততালি দিয়ে উঠল জনতা। বোঝা গেল, মন্ত্রণাসভার সদস্যদের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তে খুশি হয়েছে ওরা।

জনতার পক্ষ থেকে একজন মুখপাত্র এগিয়ে এল সামনে। জিজ্ঞেস করল, 'সমুদ্রপুত্রের সঙ্গে কবে বিয়ে হচ্ছে লেডি মায়ার?'

'আজ রাতে,' জবাবটা দিল মায়া, 'এ-উপলক্ষে প্রাসাদ-চত্বরে ভূরিভোজের আয়োজন করা হবে সবার জন্য।'

এরপর আর তেমন কোনো কথাবার্তা হলো না। ভাবছিলাম জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবে টিকাল, কিন্তু ভালোমন্দ কিছুই বলল না সে। মন্ত্রণাসভার সদস্যরা এবং শহরের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি একে একে এগিয়ে গেল মায়ার দিকে, আসন্ন বিয়ে উপলক্ষে অভিনন্দিত করছে ওকে।

দাঁত বের করে হাসছে লোকগুলো। দেখে মনে হচ্ছে অকৃত্রিম খুশিতে ভরে গেছে ওদের মন। আশ্চর্য হয়ে ভাবছি, এই

লোকগুলোই কয়েকদিন আগে মায়াকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিল। অথচ আজ কী মিষ্টি করেই না হাসছে! মায়াকে খুশি করার জন্য কত কথাই না বলছে!

স্বার্থের জন্য কতকিছুই না করতে পারে মানুষ!

এসব দেখতে দেখতে ক্লান্ত বোধ করছি। কেন যেন অস্থির লাগছে। কাউকে কিছু না-বলে (আসলে বলার মতো তেমন কেউ নেইও) উঠে পড়লাম আসন ছেড়ে। একদল লোক নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে, মিশে গেলাম ওদের সঙ্গে। শুনেছি ফ্লাডগেটটা নাকি বন্ধ করে দেয়া হবে, দেখে আসি ব্যাপারটা আসলে কী।

জায়গামতো হাজির হয়ে দেখি, গেটটা আসলে মার্বেলের বিশাল একটা ব্লক। শহরের রক্ষাপ্রাচীরের দেয়ালে তামার কব্জা দিয়ে বিশেষ কায়দায় আটকানো আছে। আমার সামনেই কয়েকজন অফিসার আটকে দিল দরজাটা। ওরা বলল, আগামী আট-দশ দিন নাকি কোনো ভয় নেই, কারণ হ্রদের পানি বাড়তে শুরু করলেও এ-পর্যন্ত আসবে না এ-ক'দিনে। তবে আগামী চার মাস ভুলেও খোলা যাবে না দরজাটা। খুললে, কেউ বলে না-দিলেও বোঝা যায়, সর্বনাশ হয়ে যাবে। হ্রদের পানি হুড়মুড় করে ঢুকতে শুরু করবে শহরে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তলিয়ে যাবে সবকিছু।

ওই চার মাসে কেউ যদি শহর ছেড়ে বাইরে যেতে চায় তা হলে মই বেয়ে প্রথমে দেয়ালের উপর উঠতে হবে লোকটাকে। তারপর আবার মইয়ের সাহায্যে নামতে হবে গড়খাইয়ের উপর অস্থায়ীভাবে বানানো কাঠের জেটির উপর। চলাচলের সুবিধার্থে সবসময় নৌকা বেঁধে রাখা হয় ওখানে।

আর তেমন কিছু দেখার নেই। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম ফ্লাডগেটের আশপাশে। তারপর হাঁটাহাঁটি করলাম শহরের রাস্তায় রাস্তায়। আরেকবার তাজ্জব হতে হলো আমাকে। জায়গাটা আসলেই, এককথায় যদি বলি, অদ্ভুত। বেশিরভাগ জায়গা পরিত্যক্ত—কেউ আছে বলে মনে হয় না। অনেক ঘরবাড়ি যত্নের

অভাবে পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। তারপরও সুন্দর এবং আকর্ষণীয়।

দুপুরের দিকে ফিরে এলাম প্রাসাদে, নিজের ঘরে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম সিনর এখনও লেডি মায়ার সঙ্গে আছেন। তাঁদেরকে বিরক্ত করার মানে হয় না, তাই একাই লাঞ্চ সেরে নিলাম। তারপর বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম একসময়।

ঘুম ভাঙল সিনরের ডাকে। চোখ মেলে দেখি, হর্ষোৎফুল্ল দেখাচ্ছে তাঁকে। তাঁর খুশি দেখে কেন যেন মোলাসের কথা মনে পড়ে গেল আমার। বেচারা কত দূর থেকে দেখা করতে এসেছিল আমাদের সঙ্গে, পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বুড়ো "ডাক্তার" যিব্যালবের সঙ্গে দেখা করাতে। সে আসার আগে সবসময় এ-রকম হাসিখুশিই থাকতেন সিনর।

আজ রাতে মায়ার সঙ্গে সিনরের বিয়ে। ওই বিষয়েই কথা বলতে শুরু করলেন তিনি। ধৈর্য ধরে তাঁর কথা শুনতে লাগলাম। ভান করছি তাঁর কথাগুলো বেশ ভালো লাগছে। কিন্তু আমার এই অভিনয় ধরা পড়তে বেশি সময় লাগল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রসঙ্গ বদল করলেন সিনর, আমার ব্যাপারে দুঃখপ্রকাশ করলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'মায়া ইণ্ডিয়ান মেয়ে। আমার দেশের মেয়েদের মতো না। ওর মনটা আধুনিক হলেও আধুনিক শিক্ষার কিছুই জানে না সে। তারপরও ওকে ভালোবাসি আমি। বিশ্বাস করো ইগনাশিয়ো, কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি এ-রকমভাবে বিয়ে হয়ে যাবে আমাদের। সে-জন্যই এত খুশি আমি। কিন্তু ভয়ও লাগছে। কারণ আর দশজন যা-ই বলুক আমি জানি ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়া হয়েছে এই বিয়েতে। এসবের ফল ভালো হয় না। শেষপর্যন্ত কী যে হবে...। তুমি বেচারা ফেঁসে গেলে আমাদের সঙ্গে এসে। তোমার উদ্দেশ্য পূরণ হলো না। আমিও মনে হয় না কোনোদিন মায়াকে নিয়ে ফিরে যেতে পারবো ইংল্যাণ্ডে। এখানে সারাজীবনের জন্য

আটকা পড়তে হলো আমাদেরকে। যদি না...'

'যদি না পালাতে পারি, তা-ই তো?' সিনরের শেষ না-করা কথাটা শেষ করে দিলাম আমি।

'হ্যাঁ, তা-ই। কিন্তু আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে ওই ব্যাপারে।'

'কেন?'

'কারণ ইতোমধ্যেই লক্ষ করেছি, যথেষ্ট খাতির করা হলেও আসলে সবসময় চোখে চোখে রাখা হচ্ছে আমাদেরকে। আমাদেরকে না-বলে আমাকে বললেই বোধহয় মানায় বেশি।' হাত বাড়িয়ে আমার হাত ধরলেন সিনর। 'তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বে কোনো ফাটল ধরেনি তো, ইগনাশিয়ো?'

'জানি না। অনেকবার ভেবেছি আমি ব্যাপারটা নিয়ে। মাঝেমধ্যে টের পেয়েছি আপনার আর আমার মাঝখানে একটা ছায়া পড়েছে যেন। যত দিন যাচ্ছে তত গাঢ় হচ্ছে সে-ছায়া। তা ছাড়া...আমার এবং আমার লক্ষ্য আর বন্ধুদের মাঝখানে মেয়েমানুষ সবসময় বাধা হয়ে দাঁড়াবে—এটাই বোধহয় আমার নিয়তি। ব্যাপারটা মেনে নিয়েছি আমি। কারণ আমি বিশ্বাস করি নিয়তির বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। ডন পেদ্রো মোরেনোর কথা খেয়াল আছে নিশ্চয়ই? যিব্যালবে আর লেডি মায়াকে উদ্ধার করার জন্য ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম আমরা। প্রথম যখন দেখি লেডি মায়াকে—হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন, সেদিনই টের পাই, ওর সেই অপরূপ সৌন্দর্যই একদিন বিপদ ডেকে আনবে আমাদের জন্য, বিশেষ করে আমার জন্য। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে আমার আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ...একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। যিব্যালবে মারা যাওয়ার পর আমার প্রায়ই মনে হয় মেয়েটার নেতৃত্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা রাস্তায় ঢুকে পড়েছি আমরা। যে-রাস্তার শেষে কী আছে চেষ্টা করেও দেখতে পাচ্ছি না।'

মাথা ঝাঁকালেন সিনর। 'কিন্তু প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই রাস্তাটা

বেছে নিতে হয়েছে আমাদেরকে, তা-ই না?'

বলতে ইচ্ছা করল রাস্তাটা আমরা না, মায়া বেছে নিয়েছে। ইচ্ছা করল বলি, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে না, মনের মানুষটাকে বিয়ে করার জন্য করেছে সে কাজটা। এই রাস্তায় প্রবেশ করার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাটাই বোধহয় ভালো ছিল আমাদের জন্য। কারণ এই পথ দিয়ে যতদিন চলবো, দুর্ভাবনা ততদিন আমাদের সঙ্গে লেগে থাকবে। হাসি-আনন্দ বলে কিছু থাকবে না জীবনে।

কিন্তু বললাম না কথাগুলো। বিয়ের দিন এসব বলা উচিত না হবু বরকে। তাই বললাম, 'থাক, যা হওয়ার হয়েছে। আপনি বরং ফিরে যান আপনার ঘরে। বিশ্রাম নিন কিছুক্ষণ। রাতে জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে, তখন লম্বা সময় ধরে সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করে রাখা উচিত আপনার।'

আর কিছু না-বলে নিজের ঘরে চলে গেলেন সিনর। সূর্যাস্ত পর্যন্ত বন্দি হয়ে থাকলেন সেখানেই। ঘুমালেন, না শুয়ে শুয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করলেন জানি না। সন্ধ্যার দিকে শহরের বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য লোক আর চাকর এসে ডেকে তুলল তাঁকে। বলল গোসল করাতে নিয়ে যাবে। গোসল শেষে ফিরে আসার পর আরও কয়েকজন চাকর এল। অতি সুদৃশ্য পোশাক আর বহুমূল্য কিছু অলঙ্কার নিয়ে এসেছে এরা। বলল, সিনরের জন্য এই উপহারগুলো পাঠিয়েছেন লেডি মায়া। ওগুলো গায়ে দেয়ার আগেই চলে এল একজন নাপিত। সুন্দর করে কেটে দিল সিনরের লম্বা লম্বা চুল, দাড়িগোঁফ ছেঁটে সমান করে মিশিয়ে দিল গালের সঙ্গে। সিনরের হাত-পা ম্যাসেজ করে চমৎকার একটা সুগন্ধী লাগিয়ে দিল।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি এসব কাণ্ডকারখানা। সিনর এমনিতেই সুদর্শন, অনেকদিন পর পরিচর্যা করায় তাঁকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। তারপরও কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, বলির জন্য প্রস্তুত

করা হচ্ছে তাঁকে।

যা-হোক, যথাসম্ভব সুন্দরভাবে তৈরি হয়ে নিলেন সিনর। তাঁর ঘরের দরজাটা খুলে গেল এমন সময়, ছ'জন অফিসার ঢুকল ভিতরে। এরা বিশেষ পদমর্যাদার অধিকারী, কারণ হাতে রাজদণ্ডের মতো দণ্ড। সঙ্গে কয়েকজন অতি-সুন্দরী যুবতী। এই মেয়েগুলো বিয়ের অনুষ্ঠানে গান গাইবে সম্ভবত। নজরকাড়া সৌন্দর্যের জন্যই এদেরকে বাছাই করা হয়েছে বোধহয়। অফিসার আর যুবতীরা ঘেরাও করে ধরল সিনরকে, পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। পিছন পিছন চললাম আমি।

প্রাসাদের যে-হলে বিয়ের অনুষ্ঠান হবে তার কাছাকাছি পৌঁছানোমাত্র খুলে গেল দরজা। প্রেমের গান গাইতে শুরু করল আমার-সামনে-থাকা যুবতীরা। সুরটা সুন্দর, গানের কথাগুলোও আকর্ষণীয়। কিন্তু আমার কাছে এত হাস্যকর লাগছিল যে, এখন একটা কলিও মনে করতে পারছি না।

যা-হোক, দরজা পার হয়ে ঢুকলাম ভিতরে। বিশাল হলটা আমন্ত্রিত অতিথি দিয়ে বলতে গেলে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে আছে। সবার পরনে চকচকে পোশাক। অনেকগুলো জ্বলন্ত লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোয় ঝকঝক করছে চারদিক।

এগিয়ে চললাম আমরা, হলের শেষপ্রান্তে পৌঁছে থামলাম। এখানে অর্ধচন্দ্রাকৃতিতে বসে আছে ভ্রাতৃসঙ্ঘের বেশ কয়েকজন নামিদামি সদস্য। টিকাল আর নাহুয়া বসেছে ওদের মাঝখানে। মাটাইকে দেখা যাচ্ছে টিকালের ডানদিকে। ডিমাসও আছে—নাহুয়ার বাঁয়ে।

সিনরকে দেখে টিকাল ছাড়া এদের সবাই উঠে দাঁড়াল, বাউ করল। মূর্তির মতো বসে আছে টিকাল, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সিনরের দিকে। "গায়িকাদের" প্রথম গানটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, বিশেষ অতিথিরা আসন গ্রহণ করামাত্র আরেকটা গান গাইতে শুরু করল ওরা। গানের সুরের সঙ্গে মিল রেখে এবার বাদ্যযন্ত্রও

বাজছে। তাকিয়ে দেখি হলের আরেকপ্রান্তে জড়ো হয়েছে বাদকদল, একজাতীয় পাইপ বাজাচ্ছে। পাইপগুলো দেখতে যেমন সুন্দর সুরও তেমন সুন্দর। লোকগুলোর পোশাকও বাহারি—গাঢ় সবুজ উর্দি, মাথায় ওক-পাতার মুকুট।

বাজানো শেষ হলে মার্চ করতে শুরু করল বাদকেরা, বলা ভালো নাচতে শুরু করল। সাদা আলখাল্লা পরিহিত কয়েকটা মেয়ে অপেক্ষা করছিল এককোনায়, ওরা সামনে এগিয়ে এল। এদের হাতে সাদা পদ্ম। চমৎকার অঙ্গভঙ্গি করে পাপড়িগুলো ছিঁড়ছে এরা, ফেলছে মেঝের উপর। বোঝা গেল এই পদ্ম-পাপড়ি মাড়িয়ে এগিয়ে আসবে কনে।

মায়ার আসতে বেশি দেরি হলো না। ওকে দেখে, এককথায় যদি বলি, থমকে গেলাম আমি। সম্ভবত আগে কখনোই এত সুন্দর দেখায়নি ওকে। এবং জানি না কেন, সিনরের উপর মন নরম হয়ে গেল আমার। টিকালের উপর করুণা হলো। এত সুন্দরী কোনো মেয়েকে সারাজীবনের জন্য আপন করে পেতে ছলে-বলে-কৌশলে কত কিছুই না করতে পারে পুরুষেরা! মাটাইয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চালাকি করেছেন সিনর, ওদিকে মায়াকে পাওয়ার জন্য সর্দারের পদ ছেড়ে দিতে চেয়েছিল টিকাল।

মায়ার পরনে সোনার-সুতোর-কাজ-করা সাদা আলখাল্লা। বুকের উপর পবিত্র হৃৎপিণ্ডের প্রতীকটা যেন জ্বলজ্বল করছে। কোমরে আর গলায় বহুমূল্য রত্নপাথরের অলঙ্কার। মাথায় মুক্তার তাজ। কব্জিতে সোনার বালা, পায়ে সোনার মল। খোঁপা না-করে ছেড়ে-দেয়া লম্বা চুল কোমর ছাড়িয়ে নেমে গেছে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত; ওর হাঁটার সঙ্গে তাল রেখে ঢেউয়ের মতো দুলছে। পায়ে ছোট ছোট রত্নপাথর বসানো স্যাণ্ডেল। হাতে সোনার একটা রাজদণ্ড। সেটার একপ্রান্তে বেশ বড় একটা মুক্তা বসানো, আরেকপ্রান্তে হৃৎপিণ্ডাকৃতির পান্না।

এগিয়ে আসছে মায়া। গর্বিত ভঙ্গিতে খানিকটা উঁচু করে

রেখেছে মাথাটা। জানলেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে না ওই মেয়ে আসলে মেক্সিকান-ইণ্ডিয়ান। ওর অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে একজন ইউরোপিয়ান নারীর সৌন্দর্যের খুব বেশি পার্থক্য নেই। কিছুটা ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁট দুটো—যেন কিছু একটা বলতে গিয়ে ভুলে গেছে, তাই থেমে গেছে আচমকা। নীল চোখের পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। কাকে দেখছে অনুমান করতে কষ্ট হয় না। তারপরও ওর চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কী এক অপার রহস্য লুকিয়ে আছে সেখানে, কী এক বিস্ময় যেন অপেক্ষা করছে ওঁৎ পেতে।

চোখ সরালাম মায়ার উপর থেকে। তাকালাম টিকালের দিকে। আশ্চর্য হয়ে দেখি, মায়া এই শহরে ফিরে আসার পর ওকে প্রথমবার দেখে যে-দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে এখনও তাকিয়ে আছে সেভাবে। প্রণয় উপচে পড়ছে দু'চোখ বেয়ে। একইসঙ্গে বিস্মিত সে—যাকে একদিন মৃত বলে জেনেছে সে-মেয়ে এত সুন্দর সাজে সজ্জিত হয়ে, এত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর হয়ে সামনে এসে দাঁড়াতে পারে কল্পনাও করেনি সম্ভবত। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর চোখে পানি জমতে শুরু করল, ঈর্ষায় আর ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেল চেহারাটা। রক্তপ্রবাহের আকস্মিক উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ল মাথা থেকে পা পর্যন্ত। সিনরকে দেখে কতখানি খুশি হয়েছে মায়া বুঝতে পারছে সে।

এবার তাকালাম নাহুয়ার দিকে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটা ওর স্বামীর দিকে। এবং ওর দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে কী ভাবছে সে। এতদিন যা অনুমান করত, আজ সে-বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে—টিকালের মনে ওর জন্য বিন্দুমাত্রও ভালোবাসা নেই, বরং টিকাল ঘৃণা করে ওকে। মনে-প্রাণে, সত্তায়-আত্মায় টিকাল শুধু মায়াকে চায়। অথচ মায়া আর কিছুক্ষণ পর সারাজীবনের জন্য এক ভিনদেশীর হয়ে যাবে।

নাহুয়ার অলক্ষুণে সেই দৃষ্টিতে আমি একইসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি ভয়, সন্দেহ আর ক্রোধ। দেখতে পাচ্ছি হাহাকার। কারণ যাকে

বিশ্বাস করে, ভালোবেসে বিয়ে করেছে মেয়েটা সেই টিকাল সম্ভবত সারাজীবনের জন্য মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ওর উপর থেকে। এবং নাহুয়া হয়তো এ-ও ভাবছে, প্রতিশোধ নেয়ার জন্য যদি ফণা তোলে টিকাল তা হলে প্রথম ছোবলটা ওর উপরই এসে পড়বে।

লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিল নাহুয়া। আবার যখন মুখ তুলল তখন ওর চেহারাটা দেখে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল আমার। আবেগের কোনো বহিঃপ্রকাশ নেই—যেন মানুষ না, মূর্তি সে। যেন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে ওর। আমি জানি, শপথ করে বলতে পারি আমি জানি ওর সেই ঘষা-কাচের মতো চোখের আড়ালে প্রচণ্ড ঘৃণা আড়াল করেছে সে। এবং ওর এই ঘৃণা শুধু মায়ার জন্য—যে-মেয়ে টিকালকে ছিনিয়ে নিয়েছে ওর কাছ থেকে।

অথচ এ-ব্যাপারে মায়া সম্পূর্ণ নির্দোষ।

আফসোস! চিৎকার করতে ইচ্ছা হলো আমার, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বের হলো না। ইচ্ছা হলো সবাইকে বলি এই বিয়ে বন্ধ করতে, কিন্তু বলতে পারলাম না। মন চাইল বলি, নারী আমার জীবনে কত বড় ক্ষত তৈরি করে দিয়ে গেছে। কিন্তু চুপ করে থাকতে হলো।

নারীর ঈর্ষা, ঘৃণা আর প্রতিশোধস্পৃহা কত ভয়ঙ্কর তা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে?

ইতোমধ্যে সিনরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মায়া। ওদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য আবারও উঠে দাঁড়িয়েছে ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যরা, গোল করে ঘিরে ধরেছে। কখন সবাই বসে পড়ল, কখন আমি নিজেও এককোনায় আসন গ্রহণ করলাম ঠিক জানি না। হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে অশুভ সব চিন্তায়।

বাদকদল আর সেই গায়িকারা এসে দাঁড়িয়েছে বর-কনের পিছনে। আবার বাজতে শুরু করেছে পাইপ, আবার শুরু হয়েছে প্রণয়সঙ্গীত। গান শেষ হওয়ার পর উঠে দাঁড়াল একজন নকীব। সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড আর লেডি মায়ার পরিচয় ঘোষণা করল সবার

সামনে। আরও বলল, এই শহরের অভিভাবক মহান দেবতার আদেশে এবং মন্ত্রণাসভা ও ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যদের সম্মতিতে বিয়ে হচ্ছে দু'জনের।

এরপর পোশাকের ভিতর থেকে বের করল রোল-করা একটা পার্চমেন্ট। খুলে পড়তে লাগল, 'আপনাদের সবার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আজকের এই বিয়ের অনুষ্ঠানের পর সবরকম রাজকীয় কাজ থেকে অব্যাহতি নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন লেডি মায়া। শহরের সর্দার এবং দেশের শাসক হিসেবে মহামান্য টিকালের জন্য সিংহাসন ছেড়ে দিতে চান তিনি।'

খেয়াল করলাম, ঘোষণাটা শুনে কেউ কেউ খুশি হলো, আবার কারও চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল।

এবার পোশাকের ভিতর থেকে আরেকটা রোল-করা পার্চমেন্ট বের করল নকীব। কী মর্যাদা, অধিকার ও কার্যালয় দেয়া হবে লেডি মায়াকে জানাল। জানাল, থাকার জন্য কোন্ বাড়ি, খরচ করার জন্য কী পরিমাণ মাসোহারা এবং কতজন চাকর দেয়া হবে ওকে এবং ওর পরিবারকে। কিছুটা হলেও স্বস্তির কথা, "পরিবার"-এর বর্ণনা দেয়ার সময় ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হিসেবে আমার নামটাও উচ্চারণ করল সে।

সবশেষে সিনর আর মায়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মন্ত্রণাসভা আর ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যদের আদেশক্রমে যা যা পাঠ করলাম আপনাদের সামনে তা কি শুনেছেন আপনারা? যদি শুনে থাকেন তা হলে তাঁদের এই সিদ্ধান্তে আপনাদের সম্মতি আছে কি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিল মায়া সম্মতি আছে।

এবার টিকালের দিকে তাকাল নকীব। 'মহামান্য, আপনি এখন এই শহরের সর্দার, দেশের শাসক। আমাদের প্রাচীন নিয়মানুযায়ী, রাজকীয় যে-কোনো বিয়ে পড়ানোর দায়িত্ব আপনার। মহামান্য, বর-কনের কাছে এসে দাঁড়ান। তাঁদেরকে আশীর্বাদ করুন। নিমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে তাঁদেরকে দুই থেকে এক করে দিন।'

আসন ছেড়ে উঠল টিকাল। খেয়াল করলাম অল্প অল্প কাঁপছে সে—রাগে না ঘৃণায় জানি না। এক কদম এগিয়ে এল, তারপর ফিরে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল। 'পারবো না,' কোলাব্যাঙের আওয়াজ বের হলো ওর গলা দিয়ে, 'পারবো না আমি কাজটা করতে। যাও, অন্য কোনো পুরোহিত ডেকে আনো।'

বাইশ

মাটাইয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

টিকালের কথা শুনে অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন উঠল অতিথিদের মধ্যে।

ওর দিকে এগিয়ে গেল মাটাই, ঝুঁকে পড়ে কী যেন বলল কানে কানে। মনোযোগ দিয়ে শুনল টিকাল, তারপর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তাকাল মাটাইয়ের দিকে। চিৎকার করে বলল, 'কেন? কী দায় পড়েছে আমার ওদের বিয়ে পড়াতে? কে কবে শুনেছে আমাদের দেশের সবচেয়ে সম্মানিত মহিলা লেডি অভ দ্য হার্টের বিয়ে হবে ভিনদেশী এক আগন্তুকের সঙ্গে? তা-ও আবার যে-লোক কি না দিকভ্রান্ত কুকুরের মতো ঘুরতে ঘুরতে ঢুকে পড়েছে আমাদের শহরের প্রবেশদ্বার দিয়ে?'

'কেউ শোনেনি,' বলল মাটাই, 'কিন্তু দেবতার আদেশ...'

'দেবতার আদেশের নিকুচি করি আমি! বিশ্বাস করি না ওই দেবতাকে যে এত জঘন্য একটা আদেশ দিতে পারে। যে-আদেশ কে কবে কোথায় লিখেছে তা জানি না সে-আদেশ মানবো কোন্ যুক্তিতে? আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল লেডি মায়ার। হ্যাঁ, আবারও বলছি, ওকে বিয়ে করার কথা ছিল আমার। অথচ আজ

আমাকেই কি না বলা হচ্ছে নাম-না-জানা জাত-না-জানা এক সাদা কুকুরের সঙ্গে ওর বিয়ে পড়াতে? এই লোক কি আমাদের কেউ? না। এই লোক কি মায়ার স্বামী হওয়ার যোগ্যতা রাখে? না। তা হলে কেন আমি পড়াবো ওদের বিয়ে?'

'মহামান্য, বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি অত্যন্ত অশালীন ভাষায় দেবতার নিন্দা করছেন,' রেগে গেলেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে মাটাই, 'দেবতার আদেশ নিজের চোখে, পবিত্র মন্দিরের ভিতরে দেখেছেন আপনি। এখন গালমন্দ করছেন কেন? আর লেডি মায়ার সঙ্গে আপনার বিয়ের কথাটাই বা কেন বলছেন বার বার? বিয়ে করেছেন আপনি এবং আপনার স্ত্রী আপনার পাশেই আছে। লেডি মায়া যদি আপনাকে পছন্দ না-করেন, যদি ভিনদেশী কাউকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে চান তা হলে আপনার কি আদৌ কিছু করার আছে?'

'করার আছে কি না?' দেখে মনে হচ্ছে পারলে এখনই মাটাইকে খুন করে টিকাল, 'শয়তান! নরকের কীট! তুই জানতে চাচ্ছিস আমার কিছু করার আছে কি না? কুত্তা! কে গণনা করে বলেছিল আমাকে অনেক দূরের জঙ্গলে মরে পড়ে আছে মায়া? নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কে আমাকে বার বার বলেছিল নাহুয়াকে বিয়ে করতে? হারামি! আমার কী মনে হয় জানিস? মনে হয় সব তোর সাজানো নাটক। তুই ভিতরে ভিতরে এমন কোনো চাল চেলেছিস যার ফলে আমার সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে।'

থামল টিকাল। পুরো হলে পিনপতন নীরবতা। কখন যেন দাঁড়িয়ে গেছি আমরা সবাই। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি টিকালের দিকে।

মুখ কালো করে এতক্ষণ সব দেখেছে আর শুনেছে নাহুয়া। এবার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে উঠল, 'মহামান্য টিকাল হয়তো ভুলে গেছেন, ভদ্রতা বজায় রাখলে এতগুলো লোকের সামনে এত বড় অপমান সহ্য করতে হতো না তাঁর স্ত্রীকে,' কথা শেষ করেই ঘুরল

সে, প্রায় ছুটে গিয়ে হাজির হলো হলের পিছনদিকের দরজার কাছে। তারপর দরজা খুলে বের হয়ে গেল বাইরে।

নাহুয়ার প্রতি করুণামিশ্রিত একটা গুঞ্জন উঠল অতিথিদের মধ্যে। আমার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে-থাকা কেউ একজন নিচু স্বরে বলল, 'মহামান্য টিকাল এতটা বাড়াবাড়ি না-করলেও পারতেন।'

গুঞ্জন মিলিয়ে যাওয়ার পর টিকাল বলল, 'আজকের এই রাতটা অভিশপ্ত। আজকের এই অনুষ্ঠান অভিশপ্ত। কাজেই আমি কোনোভাবেই এতে অংশগ্রহণ করবো না। আপনাদের যা খুশি করুন। দেবতার ইচ্ছা যেভাবে খুশি পালন করুন,' কেউ কিছু বলার আগেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। দেহরক্ষীদের নিয়ে বেরিয়ে গেল হল ছেড়ে।

কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এল। এরপর প্রথমে শুরু হলো ফিসফিস, তারপর গুঞ্জন, সবশেষে কোলাহল। কী করা উচিত বুঝতে পারছে না কেউ। ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যরা চেয়ার ছেড়ে উঠল, একজায়গায় দাঁড়িয়ে পরামর্শ করতে লাগল। মাটাইও যোগ দিয়েছে ওদের সঙ্গে। সিদ্ধান্ত নিতে বেশি সময় লাগর্ল না ওদের। যার যার আসনে গিয়ে বসল ওরা, আর কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে অতিথিদের মুখোমুখি দাঁড়াল মাটাই। দু'হাত তুলে কথা থামানোর ইঙ্গিত করল। তারপর বলতে লাগল, 'সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমার কথায় বা আচরণে যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন আপনারা তা হলে ক্ষমা চাচ্ছি। আসলে, আমাকে আর আমার মেয়েকে আপনাদের সবার সামনে অপমান করা হয়েছে, ব্যাপারটা সহ্য করতে পারিনি আমি। রাগের মাথায় লর্ড টিকাল যে-অভিযোগ করেছেন আমার ব্যাপারে তার প্রতিবাদ করেছি আমি এবং যতক্ষণ না ওই মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয় ততক্ষণ করতেই থাকবো। আমার মনে হয় খারাপ কোনোকিছুর প্রভাব পড়েছে তাঁর উপর যার ফলে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে ও-রকম ব্যবহার করেছেন। তিনি ভুলে গেছেন আমি কে, আমার পদমর্যাদা কী। তিনি এমনকী এ-ও ভুলে গেছেন

আমরা যে-দেবতার উপাসনা করি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে কত বড় পাপ হয়, কী ভয়ানক অভিশাপ নেমে আসতে পারে। অথচ দেখুন, যিব্যালবে মারা গেছে ভেবে শহরের সর্দার হিসেবে লর্ড টিকালের নাম কিন্তু আমিই প্রস্তাব করেছিলাম আপনাদের সামনে। আজ বুঝতে পারছি কত বড় ভুল হয়েছে আমার। কিন্তু সে-সব কথা বলে এখন কোনো লাভ নেই। যা ঘটে যায় তা ইচ্ছা করলেই বদলে দিতে পারি না আমরা, সে-ক্ষমতা নেই আমাদের। যা-হোক, এসব নিয়ে কথা বললে তিক্ততা বাড়বে। একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মজা করতে এসেছেন আপনারা, আপনাদের আনন্দ মাটি হবে। কাজেই সংক্ষেপে বলছি, আমরা ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ-বিয়ে হবে। পুরোহিতদের মধ্যে যাঁর বয়স সবার চেয়ে বেশি, যাঁকে সবাই মুরুব্বি বলে মানে, সেই লর্ড ডিমাস এই বিয়ে পড়াবেন।'

এই ঘোষণায় স্বস্তি প্রকাশ করল কেউ কেউ, কেউ আবার হাততালি দিয়ে উঠল।

কোলাহল থেমে যাওয়ার পর উঠে দাঁড়াল ডিমাস। একহাতে তুলে নিল মায়ার একটা হাত, অন্য হাতে সিনরের একটা হাত। তারপর একসঙ্গে করে দিল হাত দুটোকে। নতুন দম্পতির জন্য প্রার্থনা করল, তাঁদেরকে আশীর্বাদ করল। তারপর ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে বলল দু'জনকে। একটা সাদা রেশমী কাপড় নিয়ে আসা হয়েছিল আগেই, সেটা দিয়ে ঢেকে দিল দু'জনের মাথা। মায়ার কোমরে ঝুলছিল রত্নপাথরের একটা অলঙ্কার, সেগুলো খুলে ওর হাতে দিতে বলল। কাজটা করল মায়া। অলঙ্কারটা সিনরের বাহুতে বেঁধে দিল ডিমাস। উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই দু'জনকে আমি দম্পতি হিসেবে ঘোষণা করছি।'

উঠে দাঁড়ালেন সিনর আর মায়া। তাঁদের মাথার উপর থেকে তুলে নেয়া হলো রেশমী কাপড়টা। অতিথিদের সামনে একে-অপরকে চুমু খেলেন তাঁরা। খুশিতে ফেটে পড়ল সবাই, চিৎকার

করে হাততালি দিচ্ছে। নব দম্পতির একপাশে দাঁড়িয়ে গেল ডিমাস, আরেকপাশে মাটাই। অতিথিরা একে একে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, অভিনন্দন জানাচ্ছে। মূল্যবান উপহার নিয়ে এসেছে সবাই, সেগুলো দিচ্ছে মায়ার হাতে। মেয়েটা আবার উপহারগুলো চালান করে দিচ্ছে ওর চাকরানিদের কাছে।

সবার উপহার দেয়া শেষ হলে ডিমাস ঘুরে মুখোমুখি হলো মায়ার। বলল, 'আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের পক্ষ থেকে একটা কিছু দিতে চাই আপনাকে।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মায়া।

আলখাল্লার ভিতর থেকে সুদৃশ্য একটা ছোট বাক্স বের করল ডিমাস। সেটা খুলে বাড়িয়ে দিল মায়ার দিকে। উজ্জ্বল আলো লেগে ঝিক্ করে উঠল ভিতরের জিনিসটা।

রক্তচক্ষু!

ডিমাস বলল, 'আমাদের বিশ্বাস এই রক্তচক্ষু মহান দেবতার পবিত্র চোখ। এই চোখ কখনও বন্ধ হয় না এবং সবকিছু দেখে। লেডি মায়া, আমাদের অনুরোধ এটা সবসময় গলায় পরবেন আপনি। দেবতার নজর থাকবে আপনার উপর, আপনাকে সবরকমের বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন তিনি। আমাদের বিশ্বাস এটা কাছে থাকলে আপনার মন সবসময় থাকবে সুন্দর ও পবিত্র। আপনার দ্বারা অন্যায় কোনোকিছু হবে না কখনও।'

রত্নপাথরটা একটা সোনার বলয়ের মধ্যে কায়দা করে বসিয়ে বলয়টা একটা চেইনের সঙ্গে আটকে দেয়া হয়েছে। চেইনটা মায়ার গলায় হুকের সাহায্যে আটকে দিল ডিমাস। মায়ার বুকের উপর আরও একবার ঝিক্ করে উঠল রক্তচক্ষু।

বাউ করল মেয়েটা, বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানাল ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যদেরকে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ওর চেহারা থেকে রক্ত সরে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে এখনই বোধহয় পড়ে যাবে সে। হাত বাড়িয়ে ওকে ধরে ফেললেন সিনর।

মায়াকে যখন উপহার দেয়া হচ্ছিল তখন একদল উর্দিপরা লোক সারি সারি টেবিলগুলোতে হরেকরকমের খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেছে। মাটাই ইশারা করার পর খেতে শুরু করল সবাই।

আমিও একটা জায়গা করে নিয়ে বসে পড়েছি। কিন্তু কেন যেন খেতে ইচ্ছা করছে না। অল্প কিছুটা খেয়ে বসে আছি চুপ করে। কিছু করার নেই, তাই আরও একবার তাকালাম নব-দম্পতির দিকে।

প্রচণ্ড অস্বস্তিতে ভুগছে মায়া। কিছু খেতেও পারছে না, গলাও ভেজাচ্ছে না। শুধু ঢোক গিলছে বার বার। দেখে মনে হচ্ছে কিছু বলতে চাচ্ছে সিনরকে, কিন্তু এত লোকের সামনে বলতে পারছে না। বুকের উপর থেকে সরিয়ে একটু পর পর হাতে নিয়ে দেখছে রক্তচক্ষুটা। সিনরও তেমন কিছু খাননি, একটু পর পর মায়ার দিকে তাকাচ্ছেন।

শেষপর্যন্ত আর পারল না মায়া, উঠে দাঁড়াল। ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যদের কাছে মৃদু গলায় ক্ষমা চেয়ে দ্রুত গতিতে হেঁটে চলে গেল হলের বাইরে। ওর পিছু নিলেন সিনর। আমাকেও উঠতে হলো।

বাইরে এসে দেখি, সিংহাসনের মতো দেখতে দুটো চেয়ার প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সিনর আর মায়ার জন্য। চেয়ার দুটোর দু'দিকের হাতল সামনে-পিছনে অনেক লম্বা করে বানানো হয়েছে যাতে পালকির মতো করে বহন করতে পারে চারজন করে বেহারা। একটা চেয়ারে ইতোমধ্যেই উঠে বসেছে মায়া। আরেকটা চেয়ারে বসতে যাচ্ছেন সিনর।

আমাদের সঙ্গে অনেক লোক চলে এসেছে হল ছেড়ে। সিনর বসার পর বেহারারা "পালকি-কেদারা" দুটো তুলে নিল কাঁধে। নব দম্পতিকে যে-বাড়ি দেয়া হয়েছে, মোটামুটি বড় একটা মিছিলের মতো আমরা এগোতে লাগলাম সেদিকে।

বিশাল স্কয়ার পার হয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। আমাদের সঙ্গে আছে বাদকদল আর সেই গায়িকারা। বাজছে বিয়ের সুর, চলছে প্রেমের গান। আকাশে পূর্ণ চাঁদ, তা ছাড়া কম করে হলেও একশ'

মশালধারী যোগ দিয়েছে আমাদের সামনে-পিছনে—কাজেই আলোর অভাব নেই। নব দম্পতিকে দেখার জন্য, অভিনন্দিত করার জন্য স্কয়ারে জড়ো হয়েছে শহরের সাধারণ নারী, পুরুষ, শিশু। এদের কারও হাতে ফুল, কারও হাতে ফুলের মালা। কারও হাতে জ্বলন্ত মশাল। কেউ মালা ছুঁড়ে মারছে আমাদের দিকে, কেউ আবার পাপড়ি ছিটাচ্ছে।

মায়ার নামে যে-বাড়ি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা প্রাসাদ থেকে খুব বেশি দূরে না। তাই সেখানে পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না আমাদের। "পালকি-কেদারা" মাটিতে নামিয়ে রাখল বেহারারা। খেয়াল করলাম খুব বেশি দেহরক্ষী আসেনি আমাদের সঙ্গে। আবার এমনও হতে পারে, অত দেহরক্ষীর প্রয়োজন মনে করেনি মাটাই। তবে যে-ক'জন আছে, মায়াকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সিনরের পাশে বলতে গেলে কেউ নেই। মায়া নামবে এখন। সিনর দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর চেয়ারের পাশে।

কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছি আমি। এমন সময় হঠাৎ করেই দেখি, হুডওয়ালা পালকের-আলখাল্লা পরিহিত এক লোক ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে সিনরের দিকে। হুডটা তুলে দিয়েছে যাতে চেহারা দেখা না-যায়। সতর্ক হয়ে উঠলাম, ভালোমতো তাকালাম অচেনা লোকটার দিকে। আগেই বলেছি আমাদের চারপাশে আলোর বন্যা, তাই ওই লোকের হাতে-ধরা ভোজালিটা আমার নজর এড়াল না। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম স্প্যানিশে, 'বন্ধু, সাবধান!'

আমি ছাড়া আর কেউ স্প্যানিশ জানে না এই শহরে, জানা আছে সিনরের। আমার চিৎকার শোনামাত্র চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরলেন তিনি। দু'হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে গেছে, সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন এদিকে-ওদিকে। ততক্ষণে তাঁকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেছে ভোজালিওয়ালা। আর সময় দিতে চাইল না সে সিনরকে। ভোজালিটা উঁচু করে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর উপর। কিন্তু প্রস্তুত ছিলেন সিনর। লাফিয়ে সরে গেলেন পালকি-কেদারার একপাশে। তাল

হারিয়ে ফেলেছিল হামলাকারী লোকটা, ঘুরে মুখোমুখি হলো সিনরের। কিন্তু ওকে সময় দিলেন না সিনর। পায়ের কাছে পড়ে-থাকা পাথর বা ওই জাতীয় কিছু একটা তুলে নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে মারলেন লোকটার চেহারায়। জিনিসটা গিয়ে লাগল জায়গামতো। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল লোকটা। দু'হাতে চোখ ঢাকতে গিয়ে হাত থেকে খসে পড়ল ভোজালিটা। বুঝতে পারছে এত লোকের সামনে এখন আর কিছু করতে পারবে না সে। তাই মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল পথের অন্যপ্রান্তে। পিছন ফিরে দেখল একবার। তারপর দ্রুত গতিতে ঢুকে পড়ল একটা গলির ভিতরে। আর দেখতে পেলাম না ওকে।

পুরো ব্যাপারটা ঘটতে দু'-তিন সেকেণ্ডের বেশি লাগল না। কেউ কিছু করার আগে, এমনকী দেহরক্ষীরা ছুটে আসার আগেই উধাও হয়ে গেছে হামলাকারী লোকটা।

সবাই যখন বুঝল বা জানতে পারল কী হয়েছে, চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। হামলাকারীকে ধাওয়া করল কেউ কেউ। কিন্তু কোনো লাভ হলো না।

মায়া ছুটে গেছে সিনরের দিকে। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে, তাই দেহরক্ষীরা নগ্ন তরবারি হাতে ঘেরাও করে ফেলেছে মায়া আর সিনরকে। ভ্রাতৃসঙ্ঘের বেশ কয়েকজন সদস্য এসেছে আমাদের সঙ্গে, বর-কনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ওরা।

'কিছু হয়নি আমার,' শান্ত গলায় সবাইকে আশ্বস্ত করলেন সিনর। 'আমি ঠিক আছি। লোকটা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।' আমাকে কাছে ডেকে নিলেন, ধন্যবাদ দিলেন। তারপর বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেলেন মায়াকে নিয়ে।

সে-রাতে তাঁর সঙ্গে আর দেখা হলো না।

আমার একাকিত্বের দিন শুরু হয়েছে। ইদানীং হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি মায়া কেন ফিরতে চায়নি সিটি অভ দ্য হার্টে, নতুন কোনো

দেশে কেন নতুন করে জীবন শুরু করতে চেয়েছিল সে। এই শহরের জীবনযাত্রা একঘেয়েমিতে ভরা। করার মতো তেমন কোনো কাজ নেই। এদের অল্পসংখ্যক লোক কাজ করে, বেশিরভাগই বসে বসে খায়। যারা কাজ করে তাদেরকে বাধ্য করে কাজ করানো হয়, তাই কাজের মধ্যে অনুপ্রেরণা খুঁজে পায় না। শহরের অধিবাসীরা রাতে অনেক দেরি করে ঘুমায়, দিনে অনেক দেরিতে ওঠে। নাস্তা সেরে বের হয় রাস্তায়, একসঙ্গে দাঁড়িয়ে রোদ পোহাতে পোহাতে গল্পগুজব করে—কী নিয়ে এত কথা বলে ওরা ভেবে মাঝেমধ্যে আশ্চর্য লাগে আমার কাছে। এই লোকগুলোর কোনো আশা নেই, দুর্দশা নেই, ভয়ও নেই। এদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর মতো কোনো নেতাও নেই।

নিজেকে খাঁচায় বন্দি পাখি বলে মনে হয় আজকাল। সব জায়গায় যাওয়া যাবে, শুধু এই শহর ছেড়ে যাওয়া যাবে না কোথাও। যত খুশি খাওয়া যাবে, বাহারি পোশাক পরা যাবে, লোকজনের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দেয়া যাবে, মনোরঞ্জনের জন্য অনৈতিক কিছু করতে চাইলেও সম্ভবত বাধা দেবে না কেউ, শুধু গঠনমূলক কোনো কাজ করা যাবে না। দেখতে না-পেলেও জানি, কেউ বলে না-দিলেও বুঝতে পারি, নজর রাখা হচ্ছে আমার উপর। কেউ না কেউ, কোনো না কোনো সময় পর্যবেক্ষণ করছে আমার গতিবিধি।

একদিন সিনরের সঙ্গে দেখা করে বললাম কথাগুলো। শুনে তিনি বললেন, অচেনা লোকদের এই শহরে তাঁকে একা রেখে যদি পালিয়ে যাই আমি তা হলে তিনি নাকি ভাববেন, আমি তাঁর প্রকৃত বন্ধু না।

আর কিছু বলিনি সেদিন, নতমুখে ফিরে এসেছিলাম নিজের বাড়িতে।

আসলে আমার চেয়ে সিনরের অবস্থা আরও খারাপ। চিরগ্রীষ্মের এই শহরের উপর থেকে মন উঠে গেছে তাঁর। মন উঠে গেছে

সবকিছুর উপর থেকে। শুধু মায়ার টানে এখানে এখনও আছেন তিনি। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর তিনি বসে থাকেন দিগন্তবিস্তৃত হ্রদের দিকে তাকিয়ে। একের পর এক পরিকল্পনা আঁটেন কীভাবে পালানো যায় এই শহর ছেড়ে। কিন্তু প্রতিটা পরিকল্পনাতেই কোনো-না-কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে। সেই পাতাল কারাকক্ষ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সম্ভবত এক ঘণ্টার জন্যও তাঁকে চোখের আড়াল করেনি গুপ্তচরেরা। এরা কারা আমি ঠিক চিনি না, কিন্তু এদের উপস্থিতি টের পাই সবসময়।

শহরের লোকেরা যিব্যালবের গল্পটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে ফেলেছে। ওরা ধরেই নিয়েছে নিজেদের উন্নতির জন্য ওরা নিজেরা কিছুই করতে পারবে না, দেবতার পক্ষ থেকে সিনরের ঔরসে মায়ার গর্ভে জন্ম নেবে ওদের ত্রাতা। কাজেই যারা নজর রাখছে আমাদের উপর তারা আসলেই গুপ্তচর, নাকি শহরবাসীরাই স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে করছে কাজটা নিশ্চিত করে বলতে পারবো না।

এভাবে দেখতে দেখতে কেটে গেল প্রায় একটা বছর। মায়ার কোল আলো করে জন্ম নিল একটা পুত্রসন্তান। কাকতালীয় কি না জানি না, ওই একই দিন নাহুয়াও একটা পুত্রসন্তান প্রসব করল। দুই ঘটনায় শহরবাসীর প্রতিক্রিয়া হলো দু'রকম।

মায়ার ছেলে হওয়ার খবর শুনে খুশিতে ফেটে পড়ল অনেকে, আনন্দ-উল্লাস করতে লাগল রাস্তায় রাস্তায়। কিন্তু নাহুয়ার ছেলে হওয়ার খবর শুনে ওর ঘনিষ্ঠজনরা ছাড়া অন্য কেউ তেমন কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখাল না। পরে জানতে পারি লোকজনের এ-রকম আচরণের কথা শুনে প্রচণ্ড রাগে আর ভয়াবহ হিংসায় চেহারা কালো হয়ে গিয়েছিল নাহুয়ার।

এদিকে সিনরের বিয়ের কিছুদিন পরই অসুস্থ হয়ে পড়ে মাটাই। আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে ওর অসুস্থতা। এবং একসময় অবস্থা আরও খারাপ হয়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে বেচারা। দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই ওর। ডাক্তারদের

কাছ থেকে শুনেছি যত দিন যাচ্ছে ওর শারীরিক অবস্থা তত খারাপ হচ্ছে।

মনে পড়ে, মায়া সন্তান জন্ম দেয়ার তিন দিন আগে মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল মাটাই। সেদিন আমিও গেছি সিনরের সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা বলতে। সুতরাং দেখা হয়ে গেল "বুড়ো শিয়ালের" সঙ্গে।

চাঁদনী রাত। বাগানে বসে ছিলাম আমরা। প্রথমে চিনতেই পারিনি মাটাইকে। অসুস্থ হলে মানুষের অবস্থা যে এত পাল্টে যায়, ওকে না-দেখলে হয়তো কখনোই জানতে পারতাম না। শরীরটা, সাহিত্যিকদের ভাষায় যদি বলি, শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছে। বাঁ হাত ব্যাণ্ডেজে মোড়া, ঠিক কী কারণে বুঝতে পারলাম না। মাথাটা ক্রমাগত নড়ছে। শারীরিক অচলাবস্থার ছাপ পড়েছে চেহারায়। গায়ের রঙও ময়লা হয়ে গেছে অনেক।

'আমাকে দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' আমাদেরকে আঁতকে উঠতে দেখে নিচু কম্পিত গলায় বলল সে। 'কেন ভয় পেতে মানা করছি জানেন? কারণ নিশ্চিত থাকেন আজ না-হোক কাল একই অবস্থা হবে আপনাদের। জঘন্য এক পাপ করেছি, দেবতার অভিশাপে এই অবস্থা হয়েছে আমার। অস্বীকার করতে পারবেন? যে বা যারা দেবতার ভণ্ড উপাসক তাদের এই অবস্থাই হয়। শহরের লোকেরা আপনাদের দেখে হয়তো মনে করে কত সুখী আপনারা, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আপনাদের অবস্থা কী তা আপনারাই বলতে পারবেন। নিশ্চিত থাকুন, দেবতার অভিশাপ নামবেই; নিজের মেয়েকে, একমাত্র সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে যে-মহাপাপ করেছি আমি, যে-মহাপাপের সাক্ষী ও সহযোগী হয়েছেন আপনারা, তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।'

চুপ করে আছি আমরা তিনজন। নিজের কথা যদি বলি, এমনিতেই মন ভালো না, তার উপর মাটাইয়ের কথাগুলো শুনে প্রচণ্ড অস্বস্তিতে ভুগছি। সিনরের চেহারা শুকিয়ে গেছে। আর মায়াকে

দেখে মনে হচ্ছে এখনই বোধহয় জ্ঞান হারাবে।

যারা ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে মাটাইকে তারা একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে গেছে ওকে। কিছুক্ষণ একভাবে বসে থেকে এদিকে-সেদিকে তাকাল মাটাই। তারপর আবার একঘেয়ে নিচু কণ্ঠে বলতে শুরু করল, 'ক্ষমতার লোভ ছিল আমার মেয়ের মনে। ইচ্ছা ছিল লেডি অভ দ্য হার্ট হওয়ার। চেয়েছিল ওর ছেলে যাতে একদিন বসতে পারে সিংহাসনে, সর্দার হতে পারে। কিন্তু দেখুন, উপাদেয় যে-মদ বেচারী পান করতে চেয়েছিল তা ওর জন্য কীভাবে পরিণত হয়েছে চিরতার রসে। ওর স্বামী, নরকের কীট টিকাল ওকে ঘৃণা করে এবং যত দিন যাচ্ছে ওর এই ঘৃণা তত বাড়ছে। অবস্থা এমন হয়েছে, এখন ওদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়। কেউ কাউকে কিছু বললেই ঝগড়া লেগে যায়। অথচ মেয়েটা আর ক'দিনের মধ্যেই মা হতে যাচ্ছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'খারাপ খবর আরও আছে। আমার মনে হয় না আর বেশিদিন সর্দারি করতে পারবে টিকাল। লেডি মায়া, আপনাকে বিয়ে করতে না-পারায় যে-ক্ষোভ জন্ম নিয়েছিল ওর মনে তা সে-রকমই রয়ে গেছে, বরং আরও বেড়েছে। ধর্মের উপর থেকে মন উঠে গেছে ওর। দেবতাদেরকে চূড়ান্ত অশ্রদ্ধা করে সে। সবার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। কেউ দেখা করতে গেলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। পান থেকে চুন খসলে গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করে না। যারা এককালে পছন্দ করত ওকে, যারা এককালে ওর সহযোগী ছিল, আজ তারাই ওর বিরুদ্ধাচরণ করছে। আজ তারাই একত্রিত হয়ে ষড়যন্ত্র করছে কীভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা যায় শয়তানটাকে। শহরের আমজনতা যোগ দিয়েছে এদের সঙ্গে। ওদের পরিকল্পনাটা কী, জানেন? ওরা ঠিক করেছে আপনার ঘরে যে সন্তান জন্মাবে তাকে সর্দার বানাবে। তবে ওই সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক না-হওয়া পর্যন্ত রাজপ্রতিভূ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন আপনি এবং আপনার ভিনদেশী স্বামী। ওহ্! আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে কত সুখের একটা জীবন হতে যাচ্ছে

আপনাদের। কিন্তু দেখবেন, কিছুই হবে না শেষপর্যন্ত। দেবতার অভিশাপ নামবেই।

'ইগনাশিয়ো, আপনিও বাদ যাবেন না এই ধ্বংসের কবল থেকে। দেশের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন আপনি, কোনোদিনও তা অর্জন করতে পারবেন না। ঘরের ছাদ ধসে পড়লে যে-অবস্থা হয়, আপনার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা সেভাবে নষ্ট হয়ে যাবে। কী যেন বলেছিলেন একবার? স্বাধীন দেশের জন্য একটা স্বতন্ত্র পতাকা বানাবেন আপনি...তাতে আঁকা থাকবে একটা উড়ন্ত ঈগলের ছবি। আমি বলে রাখছি সে-ঈগল কোনোদিন ডানা মেলবে না। যাদের জন্য স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন তারা দাস আছে এবং থাকবে। কারণ একটাই—ভ্রাতৃসঙ্ঘের সবচেয়ে মর্যাদাবান সদস্য হয়েও পবিত্র রত্নপাথরের মর্যাদা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন আপনি,' থামল সে। মুখ হাঁ করে দম নিল কিছুক্ষণ। 'লেডি মায়া, দেবতার অভিশাপের কবল থেকে বাঁচতে পারবে না আপনার সন্তানও। শহরের লোকেরা বোকার স্বর্গে বাস করছে—আপনার সন্তানকে সর্দার বানানোর পরিকল্পনা করছে সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর। কিন্তু দেখবেন, কোনোদিনও প্রাপ্তবয়স্ক হতে পারবে না বেচারা। তার আগেই বিদায় নিতে হবে পৃথিবী থেকে। আপনার ভিনদেশী স্বামীও বাঁচবে না বেশিদিন—বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার আগেই মারা যাবেন তিনি। আপনাদের বিয়ের রাতে এক লোক যেভাবে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাঁর উপর, বিপদ আবারও সেভাবে আসবে। এবং এতসব ঘটনা অসহায়ের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া কিছু করার থাকবে না আপনার। শুধু এক ভিনদেশী ভবঘুরেকে আপন করে পাওয়ার জন্য লেডি অভ দ্য হার্ট হয়েও দেশের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আপনি, বংশের সম্মান ধুলোয় মিশিয়েছেন। কী ভেবেছেন—দেবতারা কি আপনার এই অনাচার দেখেনি?' হঠাৎই কাঁপতে শুরু করল সে, রাগে না শারীরিক দুর্বলতায় বুঝতে পারছি না। উঁচু গলায় ডাকল ওর চাকরদেরকে।

ওরা এসে পৌঁছানোর আগে বলল, 'আজকের পর আর কখনও হয়তো দেখা হবে না আমাদের,' অনেক কষ্ট করে ডান হাতটা তুলল কিছুটা উপরে। তর্জনী তুলে শাসানোর ভঙ্গিতে বলল, 'আমার কথাগুলো মনে রাখবেন।'

চলে গেল মাটাই।

হতভম্ব হয়ে সিনরের দিকে তাকিয়ে আছি আমি। যে-ধর্ম মানে মাটাই তা আমরা মানি না, যে-দেবতাদের পূজা করে সে তাদের পূজা আমরা করি না। তারপরও আতঙ্কে ছেয়ে গেছে মন। দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাচ্ছে, মাটাই যা বলে গেছে তার প্রতিটা বর্ণ সত্য হবে। বাকিটা জীবন অভিশপ্ত হয়েই থাকতে হবে আমাদেরকে।

মায়া কাঁদছে। চেহারা ঢেকে রেখেছে দু'হাত দিয়ে। হঠাৎ চেহারা থেকে হাত সরিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, ভ্যাবাচ্যাকা খেলাম আরেকবার। দু'চোখে যেন আগুন জ্বলছে মেয়েটার, রাগে রীতিমতো কাঁপছে সে। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ঠিক আছে, যা হওয়ার হোক। পরোয়া করি না। যাকে ভালোবেসেছি তাকে আপন করে পাওয়ার জন্য ধর্ম, দেবতা, সমাজ, বংশপরিচয় সব বিসর্জন দিয়েছি। সারাজীবন না-পারি, অন্তত কয়েকটা মাস তো একসঙ্গে থাকতে পেরেছি আমরা। পরম আনন্দে না-হোক, অন্তত নিদারুণ কষ্টে তো কাটেনি ওই দিনগুলো। ভালো-মন্দ যা-ই ঘটুক, আমার কাছ থেকে ওই সুখস্মৃতি কেড়ে নিতে পারবে না কোনো কিছুই...' বলতে বলতে সিনরকে জড়িয়ে ধরল সে, কাঁদতে লাগল অঝরে।

সিনর আর মায়ার ছেলেটা দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে।

গায়ের রঙ বাবার মতো—ধবধবে সাদা। চেহারার সঙ্গে মায়ের চেহারার মিল আছে। বিশেষ করে তারার মতো উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকালে যে-কেউ বলবে এই ছেলে মায়ার ছেলে।

ছেলেটা যে-রাতে জন্মাল সে-রাতে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মারা গেল মাটাই। বেচারা—আর একটা দিন পর মরলে হয়তো নাতির

মুখটা দেখে যেতে পারত। কারণ সে যে-দিন মারা গেল সে-দিনই একটা ছেলে হলো নাহুয়ার।

দেখতে দেখতে কেটে গেছে আঠারোটা দিন। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে কিছু জটিলতা দেখা দেয় মায়ার, এতদিন বলতে গেলে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল বেচারীকে, আজ সুস্থ বোধ করায় উঠে বাগানে এসে বসেছে। সিনর বসে আছেন ওর পাশে। আমি দেখা করতে এসেছি সিনরের সঙ্গে, কাজেই আমি বসেছি দু'জনের মুখোমুখি। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে মায়ার এক চাকরানি, কোলে বাচ্চাটা।

কিছুক্ষণ আগে এক প্রহরী এসে বলে গেছে মায়ার সঙ্গে দেখা করার জন্য ভ্রাতৃসঙ্ঘ ও মন্ত্রণাসভার কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আসছেন। কুশলাদি জিজ্ঞেস করছিলাম মায়ার, এমন সময় চলে এল লোকগুলো। খেয়াল করলাম এদের নেতৃত্বে আছে ডিমাস।

মায়ার সামনে দাঁড়িয়ে ওকে বাউ করল সবাই। ডিমাস বলল, 'ভ্রাতৃসঙ্ঘ, মন্ত্রণাসভা এবং দেশবাসীর প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আপনার কাছে এসেছি, মহামান্য লেডি অভ দ্য হার্ট। আপনার কোল আলো করে একটা পুত্রসন্তান এসেছে। আপনি যেমন খুশি, তেমন খুশি আমরাও। এ-ক'দিন কী ঘটেছে চারদিকে সে-খবর রাখার সুযোগ হয়নি আপনার হয়তো। তাই কিছু বলতে চাই আপনাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল মায়া।

'সাধারণ জনগণের কথা না-হয় বাদই দিলাম,' বলে চলল ডিমাস, 'গত কয়েক মাস ধরে আমরাও অতিষ্ঠ হয়ে আছি টিকালের অত্যাচার আর দুর্ব্যবহারে। তাঁকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল, শুনেছেন সম্ভবত, সে-ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছেন তিনি। ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই, অনেক নিরীহ-নিরপরাধ লোকও বাদ যায়নি। তিনি এমনকী ক্ষমা করেননি

ভ্রাতৃসঙ্ঘ আর মন্ত্রণাসভার কয়েকজন নামিদামি সদস্যকেও। সবচেয়ে আতঙ্কের কথা, মাত্র গতকাল জানতে পারলাম, তা-ও আবার তাঁরই এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী মদের নেশায় মুখ ফসকে বলে ফেলেছে—আপনার স্বামী, ছেলে আর আপনাদের ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধু লর্ড ইগনাশিয়োকে খুন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন টিকাল।'

চুপ করে আছে মায়া। ওর চেহারা থেকে রক্ত সরে গেছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আমার নামটা বাদ গেল কেন?'

'বলতে পারবো না, লেডি। তবে যতদূর বুঝতে পারছি আততায়ীদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে আপনাকে জ্যান্ত গ্রেপ্তার করতে। এরপর ওরা সম্ভবত টিকালের প্রাসাদে নিয়ে যাবে আপনাকে। তারপর...আমরা আর কখনও আপনাকে দেখতে পাবো কি না জানি না।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সিনর। দাঁতে দাঁত চেপে রাগ সংবরণ করলেন। বিড়বিড় করে স্প্যানিশে গাল দিলেন টিকালকে। শপথ করলেন, হাতের সামনে পাওয়ামাত্র খুন করবেন শয়তানটাকে।

কথাগুলো বুঝতে না-পারলেও সিনরের ভাবভঙ্গি দেখে অনুমান করে নিল ডিমাস। বলল, 'আমরা, যারা প্রকৃতপক্ষে শান্তি চাই দেশে, ছোটখাটো একটা দল গড়েছি। আমাদের পক্ষ থেকে সবসময় নজর রাখা হচ্ছে টিকালের উপর। তাঁর অবস্থা যে-পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে, আমার মনে হয় না আর বেশিদিন সর্দারি করতে পারবেন তিনি। হত্যা-গুম আর নির্যাতন-নিপীড়নের কারণে জনতাও তাঁকে সর্দার হিসেবে চায় না। আমরা, মানে ভ্রাতৃসঙ্ঘ আর মন্ত্রণাসভার কয়েকজন সদস্য গোপন এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলাম কয়েকদিন আগে। সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যে-কোনোভাবে হোক সিংহাসনচ্যুত করতে হবে টিকালকে।'

'একজন সর্দারকে কি...সিংহাসনচ্যুত করা যায়? কাজটা কি উচিত?'

'যায়। এবং ক্ষেত্রবিশেষে শুধু উচিতই না, কর্তব্যও বটে। দেশের স্বার্থের অজুহাত দিয়ে, আইন ভঙ্গ করার অভিযোগ তুলে আপনার বাবা যিব্যালবে কি ক্ষমতা থেকে সরাননি টিকাল? এবার তিনি নিজে আইন ভেঙেছেন। তাঁর দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে দেশবাসী। আপনাকে বিয়ে করতে না-পারার ক্ষোভ তাঁর মনে প্রতিহিংসার জন্ম দিয়েছে, আর সেই প্রতিহিংসা তিনি চরিতার্থ করছেন আমাদের উপর।'

'কিন্তু...টিকালকে না-হয় সরালেন। সিংহাসনে বসবে কে?'

'আপনি। আপনার বাবার মৃত্যুর পর আপনিই ছিলেন যোগ্য উত্তরসূরী।'

করুণ হাসি হাসল মায়া। 'হয়তো ছিলাম। কিন্তু আমি দাবি ছেড়ে দিয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা, এই দেশ এবং এই দেশের মানুষদেরকে শাসন করার বা নেতৃত্ব দেয়ার কোনো ইচ্ছা নেই আমার। এবং কাজটা সম্ভবত পারবোও না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মায়ার কথাগুলো মেনে নিল ডিমাস, তর্কে গেল না। বলল, 'তারমানে একজন যোগ্য নেতা পেতে অনেকগুলো বছর অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে। রাজি আছি আমরা।' মায়ার ঘুমন্ত ছেলেটার দিকে ইঙ্গিত করল। 'তিনিই হবেন আমাদের ভবিষ্যৎ নেতা। তাঁর শাসন মেনে নেবো আমরা। দেবতা যাঁকে মনোনীত করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি ভুল পথে পরিচালিত করবেন না আমাদেরকে। কিন্তু পথ দেখানোর আগে পথ চিনতে হয়। অর্থাৎ আপনার ছেলের প্রাপ্তবয়স্ক হতে আরও অনেক সময় লাগবে। আমাদের অনুরোধ, ততদিন রাজপ্রতিভূ হিসেবে দায়িত্ব পালন করুন আপনি এবং আপনার স্বামী।'

'না,' সোজা মানা করে দিল মায়া।

ভ্রূ কুঁচকে গেছে ডিমাসের। 'কেন?'

'কারণ তখন টিকালের প্রত্যক্ষ শত্রুতে পরিণত হবে আমার ছেলেটা। ওই লোককে চিনি আমি। সে তখন সরাসরি হোক বা

গোপনে—যে-কোনোভাবে খুন করার চেষ্টা করবে আমার ছেলেকে।'

'আমরা তা হতে দেবো না।'

'কীভাবে?'

'ক্ষমতাচ্যুত করার পর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হবে টিকালকে। বাকি জীবন পাতাল কারাগারে কাটাতে হবে তাঁকে।'

মায়া কিছু বলল না।

সিনরের দিকে তাকাল ডিমাস। 'আপনি জানেন কি না জানি না, সে-জন্য বলছি। আমাদের দেশের নিয়ম হচ্ছে, রাজবংশে যেসব ছেলে বা মেয়ে জন্মায় তাদেরকে পবিত্র মন্দিরে নিয়ে গিয়ে তিন দিন ধরে গায়ে তেল মাখানো হয়। এর ফলে বর্তমান সর্দারের মৃত্যুতে ভবিষ্যতে কে সর্দার হবে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হয় জনতা। কাজটা করা হয় পবিত্র হ্রদে পানি বাড়তে শুরু করার পর। আমরা আগামীকাল দুপুরে আপনার ছেলেকে মন্দিরে নিয়ে যেতে চাই। কারণ হ্রদে পানি বাড়তে শুরু করেছে।'

'কিন্তু আঠারো দিন বয়সী একটা বাচ্চাকে নিয়ে গিয়ে সর্দার বানানোটা বোকামি ছাড়া আর কিছুই না,' প্রতিবাদ করল মায়া। 'তা ছাড়া বার বার বলছি আমি বা আমার স্বামী কেউই রাজপ্রতিভূ হতে চাই না। পাপ, অপরাধ অথবা জনতার রোষ—যে-কারণেই টিকালের পতন হোক, ওর জায়গায় অন্য কাউকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিন। আমার ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক হলে...থাক, পরেরটা পরে দেখা যাবে।'

'না,' দৃঢ় গলায় বলল ডিমাস। 'ধর্মের আইন জানা থাকার পরও তা অস্বীকার করছেন আপনি। ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যরা সাধারণত কখনোই দেশপরিচালনায় হস্তক্ষেপ করে না। যখন করে তখন বুঝতে হবে পরিস্থিতি আসলেই খুব খারাপ। এবং আপনি এ-ও জানেন, মহান দেবতার পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিত নেই, এমন কোনো সিদ্ধান্তও নিই না আমরা। প্রাচীন চিত্রলিপিতে ইঙ্গিত আছে, আপনাদের ছেলে একদিন নেতৃত্ব দেবে আমাদেরকে।

গিয়েই থমকে গেল সে, যেন জোরে ধাক্কা লেগেছে অদৃশ্য কোনো দেয়ালের সঙ্গে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে খোলা দরজাটার দিকে।

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড।

তেইশ

পলায়ন

'এই মহিলা এখানে কীভাবে এল, মায়া?' গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি, বোঝা গেল কয়েক মুহূর্ত আগের ঘটনার কিছুই দেখেননি। 'কী চায় সে?'

'কীভাবে এল জানি না,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মায়া। 'চাকরানিরা তখন চলে গেছে, আমিও শুয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখি আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে নাহুয়া। হাতে বিশাল এক ছুরি। খুনি দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে এদিকে-সেদিকে। দোলনার উপর চোখ পড়ামাত্র ছুরি উঁচিয়ে ছুটে এল। ওকে তখন জাপটে ধরলাম আমি। কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারছিলাম না—ওর গায়ে অনেক শক্তি। আমি জড়িয়ে ধরে থাকার পরও একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিল দোলনার দিকে। তখন সাহায্যের জন্য গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করি। বন্ধু ইগনাশিয়ো ছুটে এসে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন নাহুয়াকে।'

রাগে লাল হয়ে গেছেন সিনর। কিন্তু নিজেকে সংযত রেখেছেন এখনও। নাহুয়ার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কথা সত্য?'

'হ্যাঁ, সত্য,' শুনে মনে হলো কোনো ভয়ই পাচ্ছে না নাহুয়া।

'কেন আমাদের নিষ্পাপ-নিরপরাধ ছেলেটাকে খুন করতে চাও?'

'যে-ছেলে আমার ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছে তাকে সরিয়ে দিতে চাওয়াই কি আমার জন্য স্বাভাবিক না? যে-ছেলের মা আমার জীবন নরক বানিয়ে দিয়েছে সে-মেয়ের জীবন নরক বানিয়ে দেয়াই কি আমার কর্তব্য না?'

'তোমার ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিয়েছে মানে?'

'ন্যাকা সেজো না, সাদা শয়তান কোথাকার!' ধমক দিয়ে উঠল নাহুয়া। 'খবর যোগাড় করার অনেক উপায় আছে আমার। কে কোথায় কী বলছে বা করছে তা, ওই জায়গায় না-থাকলেও জানতে পারি আমি। ভেবেছ আগামীকাল মন্দিরে তোমার ছেলেকে নিয়ে কী অনুষ্ঠান হবে তার কিছুই জানি না? আমার স্বামীকে উৎখাত করে তার জায়গায় বসতে চাচ্ছ তুমি—কোনো খবরই রাখি না?'

'তোমার স্বামীকে যদি উৎখাত করা হয় তা হলে যথোপযুক্ত কারণেই করা হবে। ওর অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।'

উন্মাদিনীর মতো হা হা করে হাসল নাহুয়া। 'অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, নাকি? আর তোমরা যা করেছ তা বোধহয় সীমার মধ্যেই আছে?'

'মানে? কী বলতে চাও?'

'বলতে চাই ওই সোনার প্লেটের কথা।'

'সোনার প্লেট?' রাগ মুছে যাচ্ছে সিনরের চেহারা থেকে, দু'চোখে দেখা দিয়েছে অস্বস্তি।

'এত জলদি ভুলে গেলে? বাবাকে হাত করে নকল একটা প্লেট বসিয়ে দিয়েছ আসলটার জায়গায়, মনে নেই? আসল যে-প্লেটটা ছিল তাতে কী লেখা ছিল মনে নেই? মারা যাওয়ার আগে আমাকে সব বলে গেছেন বাবা। এমনকী সব লিখেও রেখেছেন। এখন বলো, যে-বিয়ে হয়েছে প্রতারণার মাধ্যমে সে-বিয়ে কি অবৈধ না? ওই দম্পতির সন্তান কি জারজ না? যে-ছেলে প্রতারণার মাধ্যমে সর্দার হতে চলেছে তাকে আগেই মেরে ফেলা কি উচিত না? ...যে-প্লেটটা সরিয়ে নকল প্লেটটা বসিয়েছিলে তোমরা, সে-আসল প্লেটটাও

আমাকে দিয়েছে বাবা। হ্যাঁ, তোমাদের বিরুদ্ধে সব প্রমাণ আছে আমার কাছে। এবং সময় হলে, দরকার মনে করলে সে-সব উপস্থাপিত করবো জায়গামতো।'

আমাদের তিনজনের হাত-পা যেন অবশ হয়ে গেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো শুনছি নাহুয়ার কথাগুলো। বলার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। প্রতিবাদ করা তো পরের কথা। এমনকী সিনরও ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না কী ঘটতে চলেছে।

'আসলে বাচ্চাটাকে খুন করার জন্য আসিনি আমি,' আমাদেরকে নিশ্চুপ দেখে বলে চলল নাহুয়া। 'পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে বার বার মনে হয়েছে, সবকিছুর জন্য মায়াই দায়ী। তাই ওকে শেষ করে দেয়ার জন্য চুপিসারে হাজির হই এখানে। কিন্তু ঘরে ঢোকার পর কী হয়ে গেল বলতে পারবো না। এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে দোলনার উপর বাচ্চাটাকে দেখতে পেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল। সঙ্গে করে আনা ছুরিটা বের করে ছুটে গেলাম ওর দিকে। যদি বিশ্বাস করতে ইচ্ছা না-হয় তা হলে কোরো না। কিন্তু আসলেই বাচ্চাটাকে খুন করতে আসিনি আমি। তবে হ্যাঁ, নিশ্চিত থাকো তোমাদের দিন ফুরিয়েছে। তোমাদের কীর্তিকলাপের কথা ফাঁস করে দেবো আমি। ভ্রাতৃসঙ্ঘ আর মন্ত্রণাসভার সদস্যরা যখন সব জানতে পারবে তখন কী করবে অনুমান করতে পারো?'

'তা হলে,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল মায়া, তাকিয়ে আছে সিনরের দিকে, 'নাহুয়াকে এখনই খতম করে দিলে সবদিক দিয়ে ভালো হয় আমাদের জন্য।'

কথাটা শোনামাত্র ছুট লাগাল নাহুয়া। কিন্তু সিনর জাপটে ধরে ফেললেন ওকে। মেয়েটার চেয়ে অনেক শক্তিশালী তিনি, কাজেই কিছুই করতে পারল না সে। শেষপর্যন্ত চেঁচানোর জন্য মুখ খুলল। কিন্তু এক হাত দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরে ওকে টানতে টানতে ঘরের ভিতরে নিয়ে এলেন সিনর। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইগনাশিয়ো, দরজাটা বন্ধ করে দাও তাড়াতাড়ি। আর তোমার

শালটা দাও আমাকে।'

করলাম কাজগুলো। নাহুয়াকে ঘরের এককোনায় নিয়ে এসে ওর হাত-পা শক্ত করে বাঁধলাম প্রথমে। তারপর একটুকরো কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধলাম মুখটা। সবশেষে শালটা এমনভাবে জড়িয়ে দিলাম নাকেমুখে যাতে দম নিতে কোনো অসুবিধা না-হয় ওর অথচ কোনো আওয়াজ করলে তা শোনা না-যায়।

কাজ শেষ। অসহায়ের মতো মেঝেতে পড়ে আছে নাহুয়া। সর্বশক্তিতে চেষ্টা করছে বাঁধন ছেঁড়ার, কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছে আমাদের দিকে।

'কী করবো আমরা এখন?' সিনরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম হাঁপাতে হাঁপাতে।

'দুটো কাজের যে-কোনো একটা করতে পারি।' তর্জনীর ইশারায় নাহুয়াকে দেখালেন সিনর, 'ওই মহিলাকে খুন করতে পারি। অথবা ওকে এভাবেই বেঁধে রেখে পালিয়ে যেতে পারি শহর ছেড়ে। কারণ সে যদি বেঁচে থাকে আর আমাদের বিরুদ্ধে সব তথ্যপ্রমাণ ফাঁস করে দেয় তা হলে...' মাথা নাড়লেন তিনি, 'আমরা তো মরবোই, আমাদের নিষ্পাপ ছেলেটাও রেহাই পাবে না।'

'পালানোর কথা ভাবছেন কীভাবে?' আশ্চর্য হয়ে বলল মায়া। 'মাত্র আঠারো দিন হলো বাচ্চা হয়েছে আমার। এখনও সুস্থ হইনি আমি। তা ছাড়া এতটুকু একটা বাচ্চাকে নিয়ে কীভাবে পালাবো? যাবোই বা কোথায়? না-হয় ধরলাম হ্রদ পাড়ি দিয়ে হাজির হতে পারবো ও-পাড়ে। কিন্তু তারপর? আবার পার হতে হবে তুষারে-ঢাকা পর্বত, পানিশূন্য মরুভূমি। হয় মরবো নয়তো হারিয়ে যাবো শেষপর্যন্ত।'

'তারমানে নাহুয়াকে মরতে হবে,' বললেন সিনর।

কিন্তু একটা মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা অনেক কঠিন কাজ। তাই আমি বললাম, 'আচ্ছা, নাহুয়ার সঙ্গে যদি একটা চুক্তি করি আমরা তা হলে কেমন হয়?'

'কীসের চুক্তি?' ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকাল মায়া।

'ওকে জানে মারবো না আমরা। মুক্তি দেবো। বিনিময়ে সে দেবতাদের নামে শপথ করবে, আমাদের বিরুদ্ধে কাউকে কিছু বলবে না।'

'শপথ? তা-ও আবার নাহুয়া?' করুণ হাসি হাসল মায়া। 'আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছেন না বোধহয়। ধরুন আপনার সামনে ফণা তুলে আছে কোনো বিষধর সাপ। এখন আপনার হাতে একটা লাঠি আছে। ইচ্ছা করলে ওই লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারতে পারেন সাপটাকে। কিন্তু মনে দয়া হলো আপনার। এখন যদি সাপটাকে বলেন, "কথা দাও কোনোদিন কামড়াবে না, তা হলে মারবো না তোমাকে"—সে-ক্ষেত্রে কেমন হয় বলুন তো?'

জবাব দিলাম না মায়ার প্রশ্নটার।

'আপনি কি বুঝতে পারছেন না এই মেয়েটা কতখানি ঘৃণা করে আমাকে?' বলে চলল মায়া। 'ওর ধারণা ওর স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়েছি আমি। একটু আগে কী বলল শোনেননি? আমার ছেলেকে না, আমাকেই শেষ করে দেয়ার জন্য এসেছিল। সুতরাং সুযোগ পেলে আবারও করবে সে কাজটা। কাজেই একবার কেন, কোটিবার ওকে শপথ করালেও কোনো কাজ হবে না। নারীর ঘৃণা, নারীর হিংসা কতখানি...কী বলবো...মারাত্মক হতে পারে তা আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন।'

এবারও চুপ করে থাকলাম।

মায়া বলতে লাগল, 'কাজের কথায় আসি। আপাতত পালাতে পারবো না আমরা। কাজেই আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কে মরবে—নাহুয়া, নাকি আমরা?'

'নাহুয়াকেই মরতে হবে,' বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন সিনর। 'এবং স্ত্রী-সন্তানের খাতিরে কাজটা করতে হবে আমাকেই। আফসোস, যদি জন্ম না-হতো আমার! তা হলে কোনোদিন এত জঘন্য একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতো না!' মেঝেতে এখনও পড়ে আছে

নাহুয়ার ছুরিটা, কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে এলেন। 'লোকে জিজ্ঞেস করলে বলবো, হিংসার বশবর্তী হয়ে আমার ছেলেকে খুন করতে এসেছিল মেয়েটা, কিন্তু ধরা পড়ে যায় আমার হাতে। ওর হাত থেকে ছুরিটা ছিনিয়ে নিয়ে ওই ছুরি দিয়েই ওকে শেষ করে দিয়েছি। কারণ তখন রাগে মাথার ঠিক ছিল না আমার।' কথা শেষ করে এগিয়ে গেলেন তিনি মেঝেতে পড়ে-থাকা নাহুয়ার দিকে।

উল্টো ঘুরে দাঁড়ালাম আমি আর মায়া। এত জঘন্য একটা দৃশ্য দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব না।

এক মুহূর্ত, দু'মুহূর্ত...তারপর কাটল এক মিনিট, দু'মিনিট। আমরা উল্টো ঘুরে আছি তো আছিই।

মিনিট পাঁচেক পর আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন সিনর।

'কাজ হয়ে গেছে?' মায়ার গলা দিয়ে কোলাব্যাঙের আওয়াজ বের হলো।

'না, পারলাম না,' গলা শুনেই বোঝা গেল হতাশায় ভেঙে পড়েছেন সিনর। 'পারবো না। আমার ছেলেকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল সে জানার পরও ওকে খুন করতে পারবো না আমি। আমাদের জন্য কত বড় বিপদের কারণ হতে পারে জানার পরও কিছু করতে পারবো না। ওকে যদি খুন করতে হয় তা হলে ওর মতো নিষ্ঠুর কাউকে করতে হবে কাজটা।'

'তা হলে পালানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমাদের,' কাঁদ কাঁদ গলায় বলল মায়া, 'এবং সেক্ষেত্রে আর দেরি করাটা উচিত হবে না। রাত পোহালেই আমাদের সব আশা শেষ হয়ে যাবে।'

'নাহুয়ার কী হবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'ওকে তো সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যাবে না।'

'নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না,' ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটার দিকে তাকালেন সিনর। 'যেভাবে আছে সেভাবেই পড়ে থাকবে সে। যদি

কপালে থাকে না-খেতে পেয়ে মরবে। আর যদি ভাগ্য ভালো হয় তা হলে কেউ-না-কেউ উদ্ধার করবে ওকে।' ঘুরে মেয়েটার মুখোমুখি হলেন তিনি। 'শোনো নাহুয়া। আমরা চলে যাচ্ছি। প্রাণে মারতে পারতাম তোমাকে, কিন্তু করতে পারলাম না কাজটা। তুমি আমাদের জন্য কত বড় বিপদের কারণ হতে পারো জানার পরও ছেড়ে দিলাম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার হিংসায় ভরা মন যেন এই ঘটনা দেখে শেখে দয়া-মায়া কী। বিদায়,' ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি।

সবকিছু গুছিয়ে বের হয়ে এসেছি ঘর থেকে, এমন সময় বাচ্চাটাকে সিনরের কোলে দিয়ে মায়া হঠাৎ করেই বলে উঠল, 'আপনারা এগিয়ে যান। জরুরি একটা জিনিস ফেলে এসেছি আমি, নিয়ে আসি।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমি আর সিনর। কিন্তু কিছু বললাম না। এগিয়ে গেলাম সদর-দরজার দিকে।

কিছুক্ষণ পর দৌড়ে এসে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিল মায়া। হাঁপাচ্ছে। বেচারীর অবস্থা দেখে মায়া হলো। বাচ্চা হয়েছে বিশ দিনও হয়নি। অথচ সুখের সংসার বিসর্জন দিয়ে পালাতে হচ্ছে বাঁচার তাগিদে!

নিয়তির পরিহাস, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলাম আমি।

দু'ঘণ্টা পর।

অদ্ভুত একটা মিছিল বের হয়েছে শহরের রাস্তায়। দিনমজুরেরা যে-রকম আলখাল্লা পরে সে-রকম আলখাল্লা পরে হুড তুলে দিয়ে হাঁটছি আমরা। মায়ার কোলে ওর বাচ্চাটা। রাস্তাঘাট ভালোই চেনা হয়ে গেছে আমার, কাজেই অন্ধকার অলিগলি দিয়ে দ্রুত হাজির হয়ে গেলাম শহরের রক্ষাপ্রাচীরের কাছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়লাম দেয়ালের উপরে।

কাঠের একটা মই লাগানো আছে দেয়ালের বাইরের প্রান্তের

সঙ্গে। মইটা গিয়ে ঠেকেছে কাঠের একটা অস্থায়ী জেটির সঙ্গে। তার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে একটা নৌকা।

সিটি অভ দ্য হার্টে যে-ক'দিন মুক্ত অবস্থায় ছিলাম সে-ক'দিন আসলে খুব খারাপ কেটেছে আমার আর সিনরের জন্য। এই শহরে আসার পর প্রকৃতপক্ষে কোনোদিনই মুক্তির স্বাদ পাইনি আমরা। পাতাল কারাকক্ষ থেকে বের হওয়ার পর রাতদিন নজর রাখা হতো আমাদের উপর। করার কিছু ছিল না, তাই একঘেয়েমি কাটাতে মাঝেমধ্যে দু'-এক ঘণ্টার জন্য হ্রদে মাছ ধরতাম আমরা। এখন যে-জেটির কাছে হাজির হয়েছি এখানে আসতাম প্রায়ই। ওই নৌকাটা আমাদেরই, সবসময় বাঁধা থাকে ওখানে; ওটাতে করে খোলা হ্রদে ভেড়ে বেড়াতাম দু'জনে, ছিপ ফেলে গল্প করতাম। দেয়ালের উপর দাঁড়িয়ে থাকত প্রহরীরা, কড়া নজর রাখত আমাদের উপর।

এখন কোনো প্রহরী নেই। কেউ সম্ভবত কল্পনাও করেনি সুখের এই রাজত্ব ছেড়ে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াতে পারি আমরা। তাই দিনমজুরের ছদ্মবেশে পালাতে পেরেছি রাজকীয় বাড়ি ছেড়ে, চলে আসতে পেরেছি এতদূর পর্যন্ত।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আজ ওই ছোট্ট নৌকা কি পারবে আমাদেরকে নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছে দিতে?

মই বেয়ে জেটিতে নামলাম আমরা। তারপর উঠলাম নৌকায়। ছোট্ট একটা পাল আছে, সেটা খাটিয়ে দিলাম। তারা দেখে দিক নির্ণয় করে বৈঠা বাইতে শুরু করলাম আমি। পাড়ের গ্রামগুলোর দিকে এগোচ্ছি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সিটি অভ দ্য হার্টে পা দেয়ার পর এই এক বছরে একবারের জন্যও যাওয়া হয়নি ওখানে।

বাতাস আমাদের অনুকূলে। নৌকা ছোট হলেও দ্রুত এগোচ্ছি। ভোরের আলো আকাশে ফুটে ওঠার আগেই তীরের কাছাকাছি চলে এলাম। প্রথম গ্রামটা আমাদের থেকে বড়জোর এক মাইল দূরে আছে। কিন্তু এখানে নামা যাবে না। কারণ এই লোকগুলোর কেউ-না-কেউ নিয়মিত মাছ সরবরাহ করে শহরে। আমাদেরকে চিনে

ফেলতে পারে ওরা। তখন বিপদ হবে।

কাজেই এগিয়ে গেলাম আরও তিন ফার্লং-এর মতো। এখানে তীরের কাছে ঘন হয়ে জন্মে আছে কিছু বেঁটে তালগাছ। ওগুলোর আড়ালে ঢুকে পড়লাম। নৌকাটা লুকালাম ভালোমতো। আশপাশটা দেখে এলেন সিনর। জানালেন এখনও ঘুম থেকে জাগেনি কোনো গ্রামবাসী।

আসলে এই জায়গাটা প্রথম গ্রামের পিছনে পড়েছে। এখান থেকে শুরু হয়েছে ঘন একটা জঙ্গল। এর ভিতর দিয়ে এগোতে পারবো আমরা, কিন্তু কষ্ট হবে। তবে লাভও আছে—কারও চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

শুরু হলো আমাদের যাত্রা। কিছুটা হলেও সুস্থ হয়ে উঠেছে মায়া, অথবা বাচ্চাটার কথা ভেবে সুস্থতার ভান করছে। কিন্তু দিন বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রোদের তেজও বাড়তে লাগল এবং একটু একটু করে ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগল সে।

শেষপর্যন্ত দুপুর নাগাদ থামতে বাধ্য হলাম। কাছেই বয়ে চলেছে ছোট্ট একটা নদী। বাচ্চাকে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল মায়া। আমি আর সিনর বসলাম একটা গাছের ছায়ায়। সঙ্গে করে আনা খাবারের কিছুটা মায়াকে দিয়ে এলেন সিনর। কিছুটা ভাগাভাগি করে নিলেন আমার সঙ্গে।

বিকেলের দিকে কিছুটা কমে এল রোদের তেজ। তখন যাত্রা শুরু করলাম আবার। এবার সিনর আর আমি পালা করে বহন করছি বাচ্চাটাকে যাতে মায়ার কোনো কষ্ট না-হয়।

সন্ধ্যা ঘনাল একসময়। আজ আর এগোনো যাবে না। তাই একটা সিডারউড গাছের নীচে "ক্যাম্প" করলাম—কোনোরকমে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকাকে যদি ক্যাম্পিং বলা যায় সেক্ষেত্রে ঠিক আছে শব্দটা। সঙ্গে আছে অল্প কিছু খাবার, আর রাতের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে তিনটা মাত্র কম্বল।

ভোরের দিকে আরও ঠাণ্ডা হলো আবহাওয়া। কষ্ট সহ্য করতে

না-পেরে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল বাচ্চাটা। আমাদের বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে—কেউ যদি শুনে ফেলে? অনেকভাবে চেষ্টা করল মায়া, কিন্তু কিছুতেই থামাতে পারল না বাচ্চার কান্না। সুতরাং অসহায়ের মতো বসে থাকলাম আমরা সূর্য ওঠার অপেক্ষায়। রোদের তেজ একটু বাড়ামাত্র রওয়ানা হলাম।

সেদিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, এমন সময় দিগন্তের কাছে দেখা মিলল তুষারাবৃত পর্বতমালার। থামলাম না আমরা। ঘণ্টাখানেক পর হাজির হলাম ওই রেস্টহাউসটার কাছে যেখানে, এদেশে পৌঁছানোর পর আমাদেরকে নিয়ে প্রথমবারের মতো আশ্রয় নিয়েছিল যিব্যালবে।

'চলুন যাই সেখানে,' প্রস্তাব দিল মায়া। 'ঘরে ঢুকতে পারলে রাতে অত ঠাণ্ডা লাগবে না। ভাগ্য ভালো থাকলে কিছু খাবারও পেয়ে যেতে পারি।'

'কিন্তু...' ইতস্তত করছেন সিনর, 'ওখানে গেলে আটকা পড়ে যেতে পারি আমরা। আমাদের এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত পর্বতমালার কাছাকাছি বিশেষ সেই জায়গায়, যেখান দিয়ে আমাদেরকে চোখ বেঁধে নিয়ে এসেছিলে তুমি।'

'বুঝলাম। কিন্তু আজকেও যদি খোলা জায়গায় রাত কাটাই আমরা, ঠাণ্ডা লেগে খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারে বাচ্চাটার। যে-মেয়ে আপনার ছেলেকে খুন করতে এসেছিল তাকে হত্যা করতে পারেননি আপনি, এখন কি এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন যাতে মারা পড়ে বাচ্চাটা?'

কথাটা শুনে চোখ ছলছল করে উঠল সিনরের। নিচু গলায় বললেন, 'ঠিক আছে, চলো তা হলে।'

গেলাম আমরা ওই রেস্টহাউসে। দরজা খোলাই আছে, পাল্লা ঠেলে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। সেই লোকটা তার স্ত্রীকে নিয়ে বসে আছে আগুনের পাশে, গল্প করছে।

আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'কে?' জানতে চাইল চেঁচিয়ে। পরমুহূর্তেই চিনতে পারল মায়াকে কারণ হুড সরিয়ে দিয়েছে মেয়েটা। তখন লোকটা আবার বলল, 'ক্ষমা করবেন, লেডি, আপনাকে চিনতে পারিনি আমি।'

'চিনতে না-পারলেই ভালো হতো,' গম্ভীর গলায় বলল মায়া।

'আপনাদের...' জিজ্ঞেস করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত জিজ্ঞেস করেই ফেলল লোকটা, 'এ-অবস্থা হলো কীভাবে?'

'শিকার করতে বের হয়েছিলাম। পথ হারিয়ে না-খেয়ে মরার মতো অবস্থা হয়েছে। তোমার ঘরে নিশ্চয়ই খাওয়ার মতো কিছু আছে?'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল লোকটা, বউকে নিয়ে বলতে গেলে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। যত দ্রুত সম্ভব কিছু খাবার হাজির করল আমাদের সামনে। গোগ্রাসে গিলছি, এমন সময় বউকে বলল, 'এঁরা মনে হয় আজ রাতে থাকবেন আমাদের সঙ্গে। বিছানা প্রস্তুত করো।'

আর দেরি করল না মেয়েলোকটা। পর্দা সরিয়ে ঢুকে গেল ভিতরে।

খুব কাহিল লাগছে, তাই কথা বাড়ালাম না আমরা। তা ছাড়া যত কথা বলবো, বিপদের সম্ভাবনা তত বেশি। তবে ঘুমাতে যাওয়ার আগে লোকটাকে বলল মায়া, 'একটু খেয়াল রেখো। অচেনা কাউকে যদি দেখো আসছে এদিকে, জানিয়ো আমাদেরকে। মনে থাকবে?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

ভোরের কিছু আগে আমাদেরকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল সে। জানাল, প্রায় পঞ্চাশজন লোক এগিয়ে আসছে এদিকে।

বুঝলাম, আমাদের খেল্ খতম। সিনরকে বললাম, 'তিনটা কাজের যে-কোনো একটা করা যায় এখন—পালানো, লড়াই করা

অথবা আত্মসমর্পণ করা।'

'পালানোর সময় নেই,' বললেন সিনর। 'আর আত্মসমর্পণ করা মানে মরা। কাজেই লড়াই করতে হবে। যতজনকে পারি সঙ্গে নিয়ে মরতে চাই।'

'দুটো ধনুক আর কয়েকটা তীর ছাড়া আমাদের কাছে কিছু নেই। আমাদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়েছে এবং সেগুলো উদ্ধার করতে পারিনি আমরা, সঙ্গে আনা তো পরের কথা। এখন আপনিই বলুন, কীভাবে লড়বেন এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে?'

'না,' কম্পিত কণ্ঠে বলল মায়া, 'আমরা পালাবোও না, লড়বোও না। আত্মসমর্পণ করবো। তাতে বরং বাঁচার একটা সুযোগ পেতে পারি—অবশ্য ভাগ্যে যদি সে-রকম কিছু লেখা থাকে।'

কাজেই রেস্টহাউসের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমরা।

সূর্য উঠছে। একটু একটু করে রোদ ছড়িয়ে পড়ছে ঘোলাটে আকাশে। পঞ্চাশ না, আমার মনে হয় একশ'রও বেশি লোক ঘেরাও করে ফেলেছে বাড়িটা। আলাদা করে চিনতে পারছি টিকাল আর ডিমাসকে।

'চলুন, লুকিয়ে থেকে লাভ হবে না কোনো,' বলল মায়া, 'গিয়ে মুখোমুখি হই নিয়তির। তা ছাড়া আমরা দেরি করলে এই বেচারা,' আশ্রয়দাতা লোকটাকে ইঙ্গিতে দেখাল সে, 'আর ওর বউয়ের বিপদ হতে পারে। টিকাল হয়তো ধরে নেবে আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এরা।' বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিল সে, এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল উঠানে।

ওর পিছন পিছন বাইরে এসে দাঁড়ালাম আমি আর সিনর।

নীরবে কাটল কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর হঠাৎ করেই জানতে চাইল মায়া, 'এত সৈন্য নিয়ে কাকে ধরার জন্য এত দূরে এসেছ, টিকাল?'

'তোমাকে ছাড়া আর কাকে?' অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে চোখ

লাল হয়ে আছে টিকালের।

'নাহুয়া তা হলে সব বলে দিয়েছে?'

বাঁকা হাসি হাসল টিকাল। 'এত ঝামেলা করতে চায়নি সে। তোমরা পালিয়ে গেছ জানার পর আমাকে মানা করল তোমাদের পিছু ধাওয়া করতে। কিন্তু বিয়ের পর থেকে ওর কোনো কথা শুনিনি কোনোদিন, শুনবোও না।'

ডিমাসের দিকে তাকাল মায়া। 'কী অপরাধে আমাদেরকে ধাওয়া করে গ্রেপ্তার করলেন আপনারা জানতে পারি?'

'লেডি...আপনাকে আসলেই এই নামে ডাকা উচিত কি না জানি না, কারণ আপনি আর আপনার কুচক্রী বন্ধুরা মিলে আপনার সব সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন। দু'দিন হয়ে গেল কোনো খোঁজ নেই আপনাদের। দু'দিন হয়ে গেল লেডি নাহুয়ারও কোনো খবর নেই। খুঁজতে খুঁজতে শেষপর্যন্ত হাজির হতে হলো আপনাদের বাড়িতে, ভাঙতে হলো আপনাদের শয়নকক্ষের দরজা। দেখি মেঝেতে পড়ে আছে লেডি নাহুয়া—হাত-পা বাঁধা, মুখ শাল দিয়ে প্যাঁচানো। তাঁকে উদ্ধার করার পর জানা গেল সব কাহিনি।'

'সব কাহিনি? আসলেই কি সব কথা বলেছে সে আপনাদেরকে? সে কি বলেছে আমার ঘরে রাতের বেলায় চোরের মতো ঢুকে পড়েছিল সে? বলেছে, খুন করার জন্য ছুরি হাতে তেড়ে গিয়েছিল আমার ছেলেটার দিকে?'

'না তো! এসবের কিছুই বলেননি তিনি।'

'তা হলে কী বলেছে?'

'উদ্ধার পাওয়ার পর প্রথমে আবোলতাবোল বকছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর তাঁর হুশ ফিরে আসে। যা যা বলেছেন তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বলেন, তাঁর মাথার নাকি ঠিক ছিল না। আপনারা কোথায় জানতে চাওয়া হয় তাঁর কাছে। জবাবে তিনি বলেন, জানেন না। এমনকী এই কথাও বলেন, আপনারা যেখানেই থাকুন না কেন, আমরা যেন খোঁজ না-করি আপনাদের। সবকিছু

চুকেবুকে গেছে ধরে নিয়ে যেন চুপ হয়ে যাই। আমরা তখন বুঝতে পারি বড় কোনো ঘাপলা হয়েছে। দলবল নিয়ে পিছু ধাওয়া করে এ-পর্যন্ত এসে ধরতে পারলাম আপনাদেরকে।'

'এবার কী করবেন? মৃত্যুদণ্ড দেবেন?'

'আপাতত গ্রেপ্তার করবো। নিয়ে যাবো শহরে। হাজির করাবো ভ্রাতৃসঙ্ঘ আর মন্ত্রণাসভার সদস্যদের সামনে। নিষেধ করার পরও কেন এত বড় পাপ করলেন আপনারা, শপথ করার পরও কেন পালাতে গেলেন শহর ছেড়ে—জবাবদিহি করতে হবে আপনাদেরকে।'

'পাপ? কী পাপ করেছি বুঝিয়ে বলবেন?'

'এই বাচ্চাটাকে আপনি জন্ম দিয়েছেন বলে সবসময় ওকে নিজের অধিকারে রাখবেন—এটা ঠিক না। ওকে কেন সঙ্গে করে নিয়ে আসতে গেলেন? দেবতা যাকে পছন্দ করে পাঠিয়েছে আপনার কাছে সে কি আপনার হয়ে গেছে?'

ডিমাসের কথা শুনে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। এখনও সে মনে করছে মায়ার ছেলেটা দেবতাপ্রদত্ত। তার মানে নাহুয়া কি আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি এখনও?

'অস্বীকার করবো না শহর ছেড়ে পালিয়েছি আমরা,' ডিমাসকে বলছে মায়া, 'কিন্তু তার কি যথোপযুক্ত কারণ নেই? যে-শহরে আমাদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই সে-শহরে কেন থাকবো? বিয়ের রাতে হামলা হলো আমার স্বামীর উপর। আজ পর্যন্ত কি হামলাকারীকে খুঁজে বের করতে পেরেছেন? খুঁজে বের করার কোনো উদ্যোগ কি গ্রহণ করেছেন আদৌ? আমার ছেলেটার উপর ছুরি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল নাহুয়া—আপনাদের পাহারাদাররা কোথায় ছিল তখন? মহামান্য ডিমাস, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার অভিযোগ আপনি আমাদের উপর করবেন না দয়া করে, বরং আমরা করবো আপনার উপর। আমাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আপনি। কোথায় সেই নিরাপত্তা?'

'যেদিন বিচার হবে আপনাদের সেদিন এসব কথা জিজ্ঞেস করবেন। আশা করি উপযুক্ত জবাব পাবেন। আরেকটা কথা। নাহুয়া যদি সত্যিই হামলা করে থাকে আপনার ছেলের উপর তা হলে অবশ্যই বিচার হবে ওর। এবার আর দেরি না-করে চলুন আমাদের সঙ্গে।'

'যাবো, মহামান্য ডিমাস। কিন্তু একটা কথা। দয়া করে টিকালকে আমার কাছ থেকে দূরে রাখবেন। ওকে দেখলেই ঘৃণায় রি রি করতে থাকে আমার শরীর। সবসময় মনে হয়, আমার স্বামী আর সন্তানকে খুন করার পরিকল্পনা করছে সে। ওর প্রেমের প্রস্তাব শুনলে লজ্জায় আমার চোখে পানি চলে আসে।'

'ঠিক আছে, লেডি মায়া। আপনার স্বামী আর আপনার বন্ধু আপনার পাশেই থাকবে। আর আপনার ছেলেকে আপনার কাছ থেকে আলাদা করার প্রশ্নই আসে না। আপনার জন্য পালকির ব্যবস্থা করার আদেশ দিচ্ছি আমি। আপনাদেরকে ঘিরে রাখবে একদল সৈন্য। কড়া নজর রাখবে যাতে কেউ বিরক্ত করতে না-পারে আপনাকে।'

তিন দিন পর সিটি অভ দ্য হার্টে যখন পৌঁছলাম আমরা, ততক্ষণে রাত ঘনিয়েছে। খেয়াল করলাম, যে-বাড়ি বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল মায়ার জন্য, সেদিকে না, বরং পিরামিডের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদেরকে।

'কী ব্যাপার?' প্রহরীদের নেতার কাছে জানতে চাইল মায়া। 'আমাদের বাড়ি তো এদিকে না।'

'জানি, লেডি,' বলল লোকটা। 'কিন্তু আপনাদেরকে সরাসরি পিরামিডে নিয়ে যাওয়ার আদেশ আছে আমাদের উপর।'

কথাটা শোনামাত্র বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল মায়া। বোধহয় ভাবছে, আবার সেই পাতাল কারাগারে বন্দি করা হবে আমাদেরকে যে-জায়গার ভয়াবহতা সহ্য করতে না-পেরে

ধুঁকতে ধুঁকতে মরেছে যিব্যালবে।

হ্যাঁ, সত্যই আবার আমাদেরকে বন্দি করা হলো সেই কারাগারে। রাতের খাবার দিয়ে গেল প্রহরীরা, তারপর ঝনঝন শব্দে বন্ধ হয়ে গেল তামার দরজাটা। একঘরে জায়গা হবে না সিনর আর মায়ার, তাই আলাদা আলাদা তিনটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম আমরা।

আমার মনে হয় না এত দুর্বিষহ কোনো রাত কাটিয়েছি আর কখনও। ঘুম পালিয়েছে দু'চোখ থেকে। চৌকির উপর শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি বার বার। আগামীকাল কী হবে আমাদের সে-চিন্তা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে আমাকে। ভ্রাতৃসঙ্ঘ আর মন্ত্রণাসভার সদস্যদের সামনে অপরাধী হিসেবে দাঁড়াতে হবে আমাদেরকে এবং তখন আমাদের বিরুদ্ধে যা যা প্রমাণ আছে নাহুয়ার কাছে সব উপস্থাপন করবে সে। মনে পড়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর ওই কুয়াটার কথা। যেন শুনতে পাচ্ছি অনেক নীচ থেকে ভেসে-আসা পানির শব্দ।

মরতে ভয় পাই না আমি। যা আমার সারাজীবনের স্বপ্ন ছিল—মেক্সিকোর স্বাধীনতা, তা অর্জিত হয়নি এবং হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। সুতরাং বেঁচে থাকার আর কোনো মানে আছে বলে মনে হয় না। তারপরও খারাপ লাগছে। যে-মানুষটা একদিন আমার জীবন বাচিয়েছিলেন, যাঁকে পরম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছি, সেই সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড আবেগের বশবর্তী হয়ে এমন একটা কাজ করে বসলেন যে, আমার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ধুলোয় মিশে গেল। দোষ অবশ্য আমারও কম না। যিব্যালবের কথা বিশ্বাস করে হাজির হলাম অদ্ভুত এই শহরে। নিজেও ফাঁদে আটকা পড়লাম, সিনরও বন্দি হয়ে গেলেন।

কে জানে—এ-সবই হয়তো নিয়তি-নির্ধারিত। আমাদের কপালে এ-রকম পরিণতি লেখা ছিল বলেই আজ এত ভুগতে হচ্ছে!

পরদিন সকালে (অনুমানের উপর ভিত্তি করে বলছি, পাতাল কারাগারে থাকলে বাইরে দিন না রাত বোঝা যায় না।) মাত্র নাস্তা শেষ করেছি এমন সময় ঝনঝন শব্দে খুলে গেল তামার দরজা।

কয়েকজন পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ডিমাস। ওদেরকে এককোনায় দাঁড়াতে বলে আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য এগিয়ে এল সে।

মায়াকে বাউ করে বলল, 'আপনাদেরকে আবার এখানে বন্দি করতে হলো বলে আমি আসলেই দুঃখিত। কিন্তু আমার কোনো উপায় ছিল না। ভ্রাতৃসঙ্ঘ বা মন্ত্রণাসভায় আমার মতামতের দাম আছে, কিন্তু ওরা সবসময় আমার সব পরামর্শ মেনে নেয় না। যেমন আপনাদের বেলায় বলেছিলাম গৃহবন্দি করার কথা। কিন্তু ওরা শোনেনি। আপনার বাচ্চাটার কথা বললাম, তবুও সিদ্ধান্তে অটল থাকল। বলল, বাইরে থাকলে নাকি বাচ্চাটার ক্ষতি হতে পারে।'

'ক্ষতি হতে পারে?' দেখে মনে হচ্ছে মায়া যেন বুঝতে পারছে না হাসবে না কাঁদবে। 'তারমানে এখানে, মাটির এত নীচের এই কারাগারে কি পরম সুখে আছে আমার ছেলেটা? আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে সে। এবং এই অবস্থা চলতে থাকলে আমার মনে হয় সপ্তাহখানেকের ভিতরে মারা পড়বে।'

'ঘাবড়াবেন না, লেডি। আপনাদেরকে বেশি দিনের জন্য বন্দি করে রাখা হবে না এখানে। আজ রাতে পানি বাড়তে শুরু করবে হ্রদে। আজ রাতে আপনাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে মন্দিরে। ভ্রাতৃসঙ্ঘ আর মন্ত্রণাসভার সদস্যদের উপস্থিতিতে আজ বিচার হবে আপনাদের।'

'কী অভিযোগ উত্থাপিত হবে আমাদের বিরুদ্ধে?'

'নিষেধ করে দেয়ার পরও শহর ছেড়ে পালানোর অভিযোগ।'

'অন্য কিছু না?'

'না, যতদূর শুনেছি শুধু এটাই। কিন্তু...বার বার এই কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? কোনো সমস্যা হয়েছে?'

মাথা নাড়ল মায়া। 'পালানোর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হবে। সেক্ষেত্রে কী শাস্তি হতে পারে আমাদের?'

'জানি না। তবে এটা জানি, আপনার সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার

বা অন্যায় আচরণ করতে চায় না। তবে লেডি নাহুয়ার বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ করেছেন আপনারা তা যদি প্রমাণ করতে পারেন তা হলে যতদূর মনে হয় অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে আপনাদেরকে।'

'আর যদি প্রমাণ করতে না-পারি?'

'তা হলে আর কী? আপনাদের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে বিচারকেরা। হয়তো...আমি নিশ্চিত না, অনুমানে বলছি—আপনার মর্যাদার কথা বিবেচনা করে এবং আপনার শিশুপুত্রের গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে না। কিন্তু এই দুই ভিনদেশীকে...' থেমে গেল ডিমাস, করুণার দৃষ্টিতে তাকাল আমাদের দিকে। তারপর বলে চলল, 'আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করবো। বলবো, এঁদের দু'জনকে পৃথিবী থেকে তাড়িয়ে না-দিয়ে আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হোক। যেখান থেকে এসেছিলেন তাঁরা সেখানেই ফিরে যাক।'

'কিন্তু...এঁদের একজন আমার স্বামী, মহামান্য ডিমাস।'

মাথা ঝাঁকাল ডিমাস। 'শহর থেকে পালানোর আগে কথাটা ভাবা উচিত ছিল তাঁর।'

আতঙ্কে চোখ বড় বড় হয়ে গেল মায়ার। 'কী বলছেন আপনি এসব?'

'বাধ্য হয়েই বলছি। কারণ আমি দেশের সর্দার না, আমার একক সিদ্ধান্তে ভ্রাতৃসঙ্ঘ বা মন্ত্রণাসভা চলে না। আমি যদি আপনাদের জন্য কিছুই করতে না-পারি তা হলে আমাকে ক্ষমা করবেন দয়া করে। তা ছাড়া...যে-শিশুপুত্রের আগমনের অপেক্ষায় অধীর ছিল সবাই সে এসে গেছে। কাজেই...আপনার স্বামীর আর দরকার আছে বলে মনে হয় না।'

'আপনার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে?' চিৎকার করে উঠল মায়া। 'আপনারা কি আমার কাছ থেকে আলাদা করতে চান আমার স্বামীকে? কান খুলে শুনে রাখুন, আমার স্বামীর কোনো প্রয়োজন যদি

না-থাকে আপনাদের কাছে তা হলে আপনাদেরও কোনো প্রয়োজন থাকবে না আমার কাছে। অনেক আগেই এই দেশ ছেড়ে, কাপুরুষ দেশবাসীদের ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে চেয়েছিলাম। আপনারাই পায়ে শিকল পরিয়ে আটকে রেখেছেন। এখানে জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। অচেনা কারও দিকে তাকালেই মনে হয় যম হাজির হয়েছে মানুষের ছদ্মবেশে। এই দেশের কাছ থেকে, দেশবাসীর কাছ থেকে চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই আমার। দোহাই লাগে আমাকে শুধু মুক্তি দিন আপনারা।'

আবারও মাথা ঝাঁকাল ডিমাস। 'কিন্তু লেডি, দেশবাসী আপনার কাছ থেকে আপনার ছেলেটাকে চায়। ওদের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করবেন কীভাবে? ধরুন বুঝিয়ে-শুনিয়ে, দরকার হলে হাতে-পায়ে ধরে বিচারকদের মন ভুলিয়ে দিলাম, আপনাকে যেতে দিলাম আপনার স্বামীর সঙ্গে। সেক্ষেত্রে আপনার ছেলেটাকে রেখে যেতে হবে আমাদের কাছে। কারণ সে আমাদের জন্য দেবতাপ্রদত্ত উপহার, বলতে পারেন অবতার।'

চেহারা কালো হয়ে গেল মায়ার। ছলছল করছে দু'চোখ। মনে হচ্ছে এই ক'দিনে ওর বয়স যেন বেড়ে গেছে কয়েক বছর। কোথায় সেই সৌন্দর্য? কোথায় সেই কমনীয়তা? সব যেন উবে গেছে কর্পূরের মতো। মেয়েটা যেন ভয়, আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তার প্রতিমূর্তি এখন।

লম্বা করে দম নিল সে, ডিমাসের চোখে চোখ রাখল। শান্ত গলায় বলল, 'মহামান্য ডিমাস, যারা আপনাকে পাঠিয়েছে তাদের কাছে গিয়ে বলুন, লেডি অভ দ্য হার্ট মায়া বলেছে: আমার ছেলে অবতার বা শয়তান যা-ই হোক না কেন, সে আমার ছেলে। সে আমার রক্ত, আমার মাংস। এবং আমার স্বামী আমার আত্মা। আত্মা, রক্ত আর মাংস ছাড়া একটা মানুষ যেমন বেঁচে থাকতে পারে না, এই দু'জনকে ছাড়া আমিও বেঁচে থাকতে পারবো না। তারপরও যদি জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে বেছে নিতে বলা হয় আমাকে,

তা হলে দু'জনের মধ্যে স্বামীকেই বেছে নেবো আমি। কারণ ভবিষ্যতে আবারও মা হতে পারবো হয়তো, কিন্তু যাকে মন দিয়েছি সেই মানুষটাকে আর কখনও পাবো না এই জীবনে।'

চব্বিশ

নাহুয়ার সাক্ষ্য

কয়েক ঘণ্টা পরে আবার খুলে গেল তামার দরজাটা। পাঁচজন দেহরক্ষী নিয়ে এবার ঢুকল টিকাল। রক্ষীদেরকে সিঁড়ির কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

'আবার কী চাও?' খনখনে গলায় ওকে জিজ্ঞেস করল মায়া। 'এই পাতাল কারাগারেও কি শান্তিতে থাকতে দিতে চাও না আমাকে? মানুষ এত জঘন্য হতে পারে তোমাকে না-দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।'

ক্রূর হাসি হাসল টিকাল। 'তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'আর ঘণ্টা দু'-এক পর হয়তো মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হবে আমাদের,' বলল মায়া, 'কাজেই কী কথা বলার থাকতে পারে তোমার? তা ছাড়া তোমার কথা শোনার মতো মানসিকতা আমার নেই এখন।'

'না শুনলে পস্তাতে হতে পারে।'

সতর্ক হয়ে উঠলাম আমরা তিনজন।

মায়া বলল, 'ঠিক আছে, শুনবো তোমার কথা। কিন্তু একা না। যদি কিছু বলতে চাও, আমার স্বামী আর বন্ধু ইগনাশিয়োর সামনেই

বলবে। রাজি না-থাকলে যেতে পারো।'

'যে মানুষটা ইচ্ছা করলে তোমাদের তিনজনের জীবনই বাঁচাতে পারে তার সঙ্গে কি খারাপ ব্যবহার করছ না, মায়া?'

'তোমার সঙ্গে এর চেয়ে ভালো ব্যবহার করা আমার পক্ষে সম্ভব না। দুঃখিত।'

কাঁধ ঝাঁকাল টিকাল। 'ঠিক আছে, আগেও তোমার দুর্ব্যবহার সহ্য করেছি, আরও একবার করলাম। এবার শোনো। শয়তান মাটাইয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তোমরা কী কী করেছ তার সব আমি জানি।'

ধক করে উঠল বুকের ভিতরে। মনে হলো দম বন্ধ হয়ে আসছে। টিকালের সব জেনে যাওয়ার মানে হলো আমাদের বাঁচার আর কোনো সম্ভাবনাই নেই।

'নাহুয়া সব বলে দিয়েছে আমার কাছে,' আমাদের চেহারা কালো হয়ে গেছে খেয়াল করে বাঁকা হাসি হেসে বলে চলল টিকাল। 'হ্যাঁ, আমি জানি, শয়তান মাটাইয়ের সহায়তায় মন্দিরে ঢুকে কী জঘন্য অপকর্ম করেছ তোমরা তিনজনে। যেমন কর্ম তেমন ফল—দেবতার অভিশাপ কীভাবে শেষ করে দিয়েছে মাটাইকে মনে করে দেখো। এবার তোমাদের পালা। তবে যদি আমার কথা শোনো, তোমাদেরকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি। মনে রেখো, তোমাদের বিরুদ্ধে যা যা প্রমাণ আছে তার সবই এখন আমার হাতে।'

মায়া বলল, 'মাটাইয়ের সঙ্গে হাত মিলাইনি, মিলাতে বাধ্য হয়েছিলাম। কারণটা কি জেনেও না-জানার ভান করছ?'

আবারও হাসল টিকাল। 'না তো! কী সেই কারণ?'

'নিজেদের জীবন বাঁচাতে কাজটা করতে হয়েছিল আমাদেরকে। কারণ তা না-করলে দেশদ্রোহী হিসেবে বিচার হতো আমার, মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো। তারপর অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ফাঁসিতে ঝুলানো হতো এই দুই ভিনদেশীকে।'

'তা-ই নাকি?' নাক সিটকাল টিকাল। 'না, এত কথা আমি জানি না, জানতে চাইও না। পরোয়াও করি না। মনে রেখো, আজ রাতে যদি তোমাদের এই অনাচারের কথা ফাঁস হয়ে যায় বিচারকদের সামনে, যত সাফাই-ই গাও না কেন কোনো লাভ হবে না। কারণ মৃত্যুদণ্ড বা ফাঁসির যে-কথাটা বললে তা আমি নিজেই বিশ্বাস করি না। আমার বিশ্বাস, সাদাচামড়ার এই ভিনদেশী লোকটাকে দেখে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবং এখনও খারাপ আছে, এই কুত্তাটাকে বিয়ে করার জন্যই মাটাইয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলে তুমি।'

'কেউ বিশ্বাস না-করলে তাকে জোর করে বিশ্বাস করানো যায় না।'

'বাদ দাও। মহাপাপ করেছ, মহাশাস্তি অপেক্ষা করছে তোমাদের, বিশেষ করে তোমার জন্য। ভাবেভঙ্গিতে মনে হয় এই দুই ভিনদেশী নাস্তিক, কাজেই ওদের কী হবে তা শুধু দেবতাই বলতে পারেন। মায়া, যদি মহাশাস্তি থেকে বাঁচাতে চাও, আমার কথামতো কাজ করো।'

'কী কাজ?' টিকাল সব জেনে গেছে, কাজেই আমাদের বাঁচার আর কোনো উপায় নেই—বুঝতে পারছে মায়া। রক্ত সরে গেছে বেচারীর চেহারা থেকে।

'এই শহরে তোমার মহাপাপের কথা এখন পর্যন্ত জানে মাত্র দু'জন—আমি আর নাহুয়া। হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় ওকে উদ্ধার করি আমরা। তখন আবোলতাবোল কী বকছিল সে-ই জানে। তোমরা পালিয়ে গেছ বুঝতে পারার পর মুখ বন্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু তোমাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, শহরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে জানার পর আজ সকালে সব বলল আমাকে। সব প্রমাণ দেখাল। কারণ সে জানে ভ্রাতৃসঙ্ঘের বেশিরভাগ সদস্য, বিশেষ করে হারামি ডিমাস চায় তোমার কোনো ক্ষতি না-হোক। এমনকী আমি এ-ও জানতে পেরেছি, তোমার অবৈধ স্বামী...হ্যাঁ, ওই শব্দটাই উপযুক্ত

এই সাদা কুত্তার জন্য...আর তোমার কালো বন্ধুটাকে নিরাপদে দেশ থেকে বের করে দিতে চায় সে,' আমাদের চেহারার উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে শয়তানটা, দেখছে ওর কথার কী প্রভাব হচ্ছে আমাদের উপর।

আশ্চর্য হয়ে ভাবছি, মাত্র ঘণ্টা দু'-এক আগে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেছে ডিমাস, আমাদের কথোপকথনের খবর এত তাড়াতাড়ি টিকালের কাছে পৌঁছে দিল কে? ডিমাসের সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে কেউ কি...

'কিন্তু বুড়ো হারামিটার আশার গুড়ে বালি পড়বে, দেখে নিয়ো,' টিকালের কথায় আমার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। 'যা-হোক, নাহুয়ার কথায় ফিরে যাই। তোমরা এই শহরে নিরাপদে থাকলে, এমনকী জীবিত অবস্থায় এই কারাগারে থাকলেও ওর বিরাট ক্ষতি। কারণ সেক্ষেত্রে ওর ছেলেকে কোনোদিনও সিংহাসনে বসাতে পারবে না সে। কাজেই আজ রাতে সে হাজির হবে বিচারকদের সামনে, তোমাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করবে এবং নিশ্চিত থাকো কুয়ায় ফেলে হত্যা করা হবে তোমাদের তিনজনকেই। কিন্তু আমি তা চাই না...মানে আমি চাই না আমার চোখের সামনে থেকে চিরতরে হারিয়ে যাও তুমি। এখনও আগের মতোই তোমাকে ভালোবাসি আমি...'

'এসব কথা বলে নিজের খারাপি ডেকে এনো না, টিকাল,' রাগে চেহারা লাল হয়ে গেছে সিনরের। 'তোমাকে খুন করে নিজের পাপ আর বাড়াতে চাই না।' টিকালকে পিছনে তাকাতে দেখে বললেন, 'না, দেহরক্ষীদের দিকে তাকিয়ে কোনো লাভ নেই। ওরা কিছু করার আগেই ইচ্ছা করলে তোমার ঘাড়টা মটকে দিতে পারি। তারপর যা হওয়ার হবে। আবারও সাবধান করে দিচ্ছি, আমার স্ত্রীকে নিয়ে উল্টোপাল্টা কিছু বলবে না।'

'বাদ দিন,' সিনরকে শান্ত করার চেষ্টা করল মায়া, 'আমাদের যেখানে জীবন-মৃত্যুর সমস্যা সেখানে মান-সম্মান নিয়ে টানাটানি

করলে চলবে না। আর টিকাল, তোমাকেও বলছি, এমন কিছু বোলো না যাতে আমার স্বামী হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।'

সিনরের রাগ দেখে টিকাল তেমন একটা ঘাবড়েছে বলে মনে হয় না। আগের মতোই বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলে চলল, 'তোমাদের সবাইকে বাঁচানোর জন্য একটা পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে এখানে এসেছি আমি। ভেবে দেখো, আমি আর নাহুয়া যদি চুপ করে থাকি তা হলে তোমাদের মহাপাপের কথা কি জানতে পারবে কেউ? তোমাদের বিরুদ্ধে যা যা প্রমাণ আছে সব যদি তোমাদের চোখের সামনে নষ্ট করে ফেলি তা হলে নাহুয়াও কি কোনোদিন পারবে তোমাদেরকে ফাঁসাতে?'

'তুমি না-হয় চুপ করে থাকলে। কিন্তু নাহুয়া? সে কি মুখ বন্ধ রাখতে পারবে? সে তো সুযোগ পেলেই...'

টিকালের চেহারায় গাঢ় একটা ছায়া পড়ল। এখন ওকে দেখে সাক্ষাৎ শয়তান বলে মনে হচ্ছে আমার। মনে হচ্ছে কোনো শহরের সর্দার না, একটা জল্লাদকে যেন দেখছি চোখের সামনে।

গম্ভীর গলায় বলল সে, 'নাহুয়ার ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও। কোনো সুযোগ যাতে না-পায় সে সে-ব্যবস্থা করবো আমি। তোমাদেরকে কী করতে হবে বলে দিচ্ছি। আজ রাতে মন্দিরে যাবে তোমরা, বিচারকদের সামনে দাঁড়াবে। নাহুয়ার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলবে না। ভুলেও উচ্চারণ করবে না, তোমার ছেলেকে খুন করতে চেয়েছিল সে। তা হলে জিজ্ঞেসাবাদ করার জন্য ওকে ডাকবে না বিচারকেরা। কাজেই তোমাদের বিরুদ্ধে অন্তত আজ রাতে কিছু বলার সুযোগ পাবে না সে। রাত পোহানোর আগেই...' বেফাঁস কথা বলে ফেলছে টের পেয়ে নিজেকে সামলে নিল। 'এখন নাহুয়া যদি কিছু বলতে না-পারে তা হলে তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ একটাই—নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শহর ছেড়ে পালানো। কিন্তু এটা এমন কোনো অপরাধ না যে, মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। শাস্তি হতে পারে, কিন্তু তা মওকুফ করার চেষ্টা করবো আমি। কথা

দিলাম।'

'বিনিময়ে কী করতে হবে আমাদেরকে?' কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেল উত্তরটা জানা আছে মায়ার।

'আমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে তুমি, মায়া,' বলেই হাত তুলল টিকাল, 'না, না, উত্তেজিত হয়ো না, পুরো কথা শোনো প্রথমে। ...সাদা মানুষ, চুপ থাকো। মায়া, মহান দেবতার হৃৎপিণ্ডের নামে যদি শপথ করো আজ থেকে ঠিক ছ'মাস পরে বিয়ে করবে আমাকে তা হলে আমিও শপথ করবো এই সাদা লোকটা, যে কি না প্রকৃতপ্রস্তাবে তোমার স্বামী না, আমাদের এই নগররাষ্ট্র ছেড়ে নিরাপদে চলে যেতে পারবে। ওর সঙ্গে ওর বন্ধুও যাবে। কেউ কোনো ক্ষতি করা তো দূরের কথা ফুলের টোকাও দেবে না ওদের গায়ে। রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেবো আমি দু'জনের জন্য—যত খুশি সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে ওরা সঙ্গে করে। শুধু তা-ই না, তোমার ছেলেরও কোনো ক্ষতি হবে না। শহরের লোকে তাকে অবতার বলে জানে, অবতার হিসেবেই জানবে সারাজীবন। কথা দিচ্ছি, আমার ছেলে কোনোদিন সিংহাসনের দাবি নিয়ে দাঁড়াবে না তোমার ছেলের মুখোমুখি। মায়া, এর আগে একবার বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছিলাম তোমার দিকে। ঘৃণাভরে সে-হাত প্রত্যাখ্যান করেছিলে তুমি। ফল কী হয়েছে ভেবে দেখো। অসহায়ভাবে ধুঁকে ধুঁকে মারা গেছে তোমার বুড়ো বাপ। মাটাইয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মহাপাপ করেছ তুমি, দেবতার অভিশাপ লেখা হয়ে গেছে তোমার নিয়তিতে। মিনতি করছি তোমার কাছে, এবার আর প্রত্যাখ্যান কোরো না আমাকে। তাতে তোমারই দুঃখদুর্দশা বাড়বে—না, হুমকি দিচ্ছি না, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বলেই সতর্ক করছি। আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তোমার এবং তা বৈধ বিয়ে। অথচ প্রতারণার মাধ্যমে এই সাদা লোকটাকে বিয়ে করেছ। তুমিই বলো, এটা কি বৈধ না অবৈধ? তোমাদের পরিণতি যদি খারাপ হয় তা হলে তার জন্য তোমার কি কোনো দোষ থাকবে না?'

'আমার স্বামীর কাছ থেকে, যাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসি আমি, আমাকে আলাদা করতে চাচ্ছ—এর পরিণতি কি ভালো হবে, টিকাল? যা-হোক, তোমার প্রস্তাবের জবাবে কিছু বলার আগে আমার স্বামী আর বন্ধুর মতামত জানতে চাইবো।' আমার দিকে তাকাল মায়া। 'ইগনাশিয়ো, আপনি কী বলেন এ-ব্যাপারে?'

করুণ হাসি হাসলাম আমি। 'আপনি নিজেকে টিকালের কাছে সমর্পণ করলে তিনি যা যা দেবেন বলেছেন, আসলেই সেগুলো দিতে পারবেন কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। তারপরও যখন জিজ্ঞেস করছেন, বলি। হয়তো খেয়াল আছে আপনার, লেডি মায়া, একদিন শপথ করেছিলাম আপনার কাছে—আপনার আর সিনরের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াবো না কোনোদিন। আজ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসেও সেই প্রতিজ্ঞা থেকে সরতে চাই না আমি। কাউকে কথা দিলে জীবন দিয়ে হলেও সে-কথা রাখে বীর মেক্সিকানেরা। কাজেই নিজের সুবিধার জন্য কিছু সোনাদানা নিয়ে গিয়ে সটকে পড়ার চেয়ে এখানে আপনাদের সঙ্গে মরাই ভালো বলে বিবেচনা করছি।'

'খাঁটি বন্ধুর মতো কথা,' বলল মায়া। 'খাঁটি মানুষের মতো চিন্তাভাবনা।' সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের দিকে তাকাল সে। 'আপনি কী বলেন?'

অবজ্ঞার হাসি হাসলেন সিনর। 'কী বলি মানে? আমাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে আমার কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে টিকাল আর আমি তাতে সম্মতি দেবো? সে যদি সত্যিই তোমাকে ভালোবাসত তা হলে নিজের কামনা-বাসনাকে কব্জা করে, দরকার হলে দেশ ও ধর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করত তোমাকে। তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার গুরুত্ব দিত। কিন্তু সে-রকম কোনো কাজ কি একবারও করেছে সে আজ পর্যন্ত?' মাথা নাড়লেন তিনি। 'তোমার ভালোর জন্য এই শহর কেন, পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতেও আপত্তি নেই আমার। কিন্তু নিজের ভালোর জন্য, নিরাপত্তার

জন্য তোমাকে এই নরকে ফেলে রেখে চলে যাবো না কোনোদিনও।'

'বুঝেছি!' চিৎকার করে উঠল টিকাল, 'যা বোঝার বুঝে গেছি আমি। ঠিক আছে, কিছুক্ষণ পরই দেখা যাবে কে কাকে কত ভালোবাসে।' উল্টো ঘুরল সে, এগিয়ে যাচ্ছে সিঁড়ির দিকে।

'ফিরে এসো, টিকাল!' শুনে মনে হলো ডাকছে না, আর্তচিৎকার করছে মায়া।

ফিরে এল টিকাল। দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে। চেহারায় কপট গাম্ভীর্য, কিন্তু দু'চোখ চকচক করছে।

নিচু কণ্ঠে বলল মায়া, 'আমি তো এখনও কিছু বলিনি, এত তাড়াহুড়োর কী আছে? শোনো, টিকাল, তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম আমি।'

আমি আর সিনর তো বটেই, মনে হচ্ছে টিকালও হতভম্ব হয়ে গেছে।

'নাহুয়াকে ঠেকাও,' বলে চলল মায়া, 'যা যা প্রমাণ আছে আমাদের বিরুদ্ধে সব নষ্ট করে ফেলো। আমার স্বামী আর বন্ধুকে নিরাপদ জায়গায় দিয়ে এসো। কথা দিচ্ছি, ছ'মাসের মধ্যে তোমাকে বিয়ে করবো।'

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, মায়া?' জিজ্ঞেস করলেন সিনর। 'নাকি আমাদেরকে বাঁচানোর আর কোনো উপায় নেই দেখে এমন কথা বলছ?'

'পাগল হয়ে গেছি কি না?' উন্মত্তের মতো হা হা করে হাসল মায়া। 'আফসোস, সত্যিই যদি পাগল হয়ে যেতে পারতাম! এত কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন—আপনাদেরকে বাঁচানোর আর কোনো উপায় না-দেখে টিকালের প্রস্তাবে রাজি হয়েছি। আর যে-ক'টা দিন বেঁচে থাকবো আপনার স্মৃতি আঁকড়ে ধরেই বেঁচে থাকবো। যত খুশি সোনাদানা নিয়ে ফিরে যান আপনার দেশে, আপনার মতো সাদাচামড়ার

মানুষদের কাছে। সঙ্গিনী হিসেবে অন্য কাউকে বেছে নিয়ে সুখেশান্তিতে কাটিয়ে দিন বাকি জীবন। শুধু একটাই অনুরোধ—আমার কথা ভুলে যাবেন না। মনে করবেন, আমার সঙ্গে কাটানো দিনগুলো স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু না।' টিকালের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'এসো টিকাল, ধরো আমার এই হাত। এসো, হাতে হাত রেখে শপথ করি আমরা। নিজের সতীত্ব বিলিয়ে দেবো তোমার কাছে, আমাকে ভোগ করে সুখী হবে তুমি, বিনিময়ে এই দু'জনকে মুক্তি দেবে। এসো...'

কামনায় টিকালের দু'চোখ যেন জ্বলছে। এগিয়ে এসে আলতো করে ধরল সে মায়ার হাতটা। পরমুহূর্তেই লাফিয়ে সরে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু পারল না ঠিকমতো—মায়া সর্বশক্তিতে আঁকড়ে ধরেছে ওকে।

যখন বুঝতে পারলাম কী ঘটছে, শিউরে না-উঠে পারলাম না।

টিকালকে খুন করার জন্য পোশাকের ভিতর থেকে একটানে নাহুয়ার সেই ছুরিটা বের করেছে মায়া। আশ্চর্য, কখন ছুরিটা তুলে নিয়েছিল সে, কখন ঢুকিয়েছিল পোশাকের ভিতরে টেরই পাইনি! কিন্তু লণ্ঠনের আলোয় চকচকে ফলাটা ঝিক্ করে ওঠামাত্র লাফিয়ে সরে গেছে টিকাল, একহাতে ওকে টেনে ধরে রেখেও সুবিধা করতে পারেনি মায়া। আরেকহাতে চালিয়েছে সে ছুরিটা। কিন্তু সেটা টিকালের বুকে বিদ্ধ না-হয়ে ডান কাঁধে সামান্য আঁচড় কেটেছে।

আমি যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি। মায়ার দিকে ছুটে গেলেন সিনর। টেনে সরিয়ে আনলেন ওকে। হাঁপাতে হাঁপাতে এবং কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল টিকাল। ওর দু'চোখ থেকে আগুন ঝরছে। থুতু ফেলল সে মাটিতে। চিৎকার করে বলল, 'কুত্তী! হারামজাদী! এই ছিল তোর মনে? তোকে আমি...'

মায়াকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে এবার হুঙ্কার ছাড়লেন সিনর, 'সাবধান, টিকাল! আর একটা কথা বলেছ তো টান দিয়ে তোমার জিভ ছিঁড়ে ফেলবো। যদি পুরুষমানুষ হয়ে থাকো, যদি সাহস

বলতে কিছু থাকে তোমার, প্রহরীদেরকে বলো আমাকে একটা তলোয়ার দিতে। আর নিজেও আরেকটা নিয়ে দাঁড়িয়ে যাও আমার মুখোমুখি। ন্যায্য লড়াইয়ে মীমাংসা হোক ব্যাপারটার।'

হাঁচড়েপাঁচড়ে বেশ কিছুটা দূরে সরে গেল টিকাল, থুতু ফেলল আবার। 'লড়াই? হ্যাঁ, লড়াই করবো আমি এবার। তোরা যা কল্পনাও করিসনি তা-ই করবো তোদের সঙ্গে। আমাকে বোকা বানিয়েছিস তো? দেখবি তোদেরকে কীভাবে বোকা বানাই আমি। এক ঢিলে দুই পাখি মারবো,' অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল মায়ার দিকে। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারছে না, রাগে কাঁপছে ওর দুই ঠোঁট।

কিছুক্ষণ পর ঘুরে চলে গেল দেহরক্ষীদের নিয়ে।

আরও একবার সেই মন্দিরে হাজির হয়েছি আমরা।

কয়েকজন পুরোহিত আর সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে পাতাল কারাগারে হাজির হয়েছিল ডিমাস। ঠাণ্ডা বাতাসে যাতে কষ্ট না-হয় মায়ার ছেলেটার সে-জন্য, আমাদেরকে প্রথমবার যে-পথ দিয়ে মন্দিরে নিয়ে এসেছিল মাটাই সে-পথ দিয়ে এসেছে। খেয়াল করলাম, একটা দরজাতেও তালা দেয়নি সে, ভিড়িয়ে দিয়েছে শুধু। বোধহয় ভেবেছে, বিচার শেষে আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে পাতাল কারাগারে।

মন্দিরের ভিতরটা আগের মতোই অন্ধকারাচ্ছন্ন। পরিবেশ ভাবগম্ভীর। মন্ত্রণাসভার সব সদস্য উপস্থিত হয়েছে। প্রধান সদস্য হিসেবে উপস্থিত আছে টিকাল, বেদির পিছনে অলঙ্কারখচিত একটা চেয়ারে বসে আছে আরাম করে। ভ্রাতৃসঙ্ঘের অনেক সদস্য এবং বেশ কয়েকজন বয়স্ক পুরোহিতকেও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নাহুয়াকে দেখতে পাচ্ছি না কোথাও।

আশার আলো জ্বলে উঠল আমার মনে। তার মানে নিজেকে কি সামলে নিয়েছে নাহুয়া? শেষপর্যন্ত ঠিক করেছে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলবে না? কিন্তু টিকাল? ওর কঠোর চেহারার দিকে তাকিয়ে

কিছুই বুঝতে পারছি না। আলখাল্লা বদল করেছে সে, কাঁধের ক্ষতটা বোঝার উপায় নেই। হয়তো ব্যাণ্ডেজও করে ফেলেছে কোনো ডাক্তারকে দিয়ে। আমাদের দিকে, বলা ভালো মায়ার দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। মনে মনে কী ফন্দি আঁটছে সে ঈশ্বর জানেন!

সে বলেছিল এক ঢিলে দুই পাখি মারবে। মানে কী কথাটার? কিছুই বুঝতে পারছি না। এসব ভাবতে ভাবতে চোখ পড়ল মহান (?) দেবতার সেই বিরাট মুখোশটার দিকে। কেন যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার।

বেদির সামনে খোলা জায়গায় আমাদের বসার জন্য আসন দেয়া হয়েছে। ডিমাসের ইশারায় বসে পড়লাম আমরা। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে মায়া মাঝখানে, আমি আর সিনর ওর দু'পাশে।

একজন পুরোহিত উঠে দাঁড়াল এমন সময়। বোঝা গেল নকীবের ভূমিকা পালন করবে সে। পোশাকের ভিতর থেকে বের করল একটা পার্চমেণ্ট। খুলে উঁচু কণ্ঠে পড়তে লাগল, 'লেডি অভ দ্য হার্ট মায়া, সমুদ্রপুত্র এবং যাযাবর ইগনাশিয়োর বিচার করার জন্য আজ এখানে মিলিত হয়েছি আমরা। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ—শপথ ভঙ্গ করেছেন তাঁরা, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছেন। আজ থেকে এক বছর আগে এই পবিত্র মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁরা, ভ্রাতৃসঙ্ঘ ও মন্ত্রণাসভার সদস্যদের অনুমতি ছাড়া এই শহর ছেড়ে যাবেন না। কিন্তু সে-চেষ্টা তাঁরা করেছেন এবং ধরা পড়েছেন। শুধু তা-ই না, যে-সন্তানকে অবতার হিসেবে পাঠানো হয়েছে আমাদের কাছে তাকে চুরি করার চেষ্টা করেছেন।' আমাদের দিকে তাকাল সে। 'আপনারা কি এই অভিযোগ স্বীকার করেন?'

'জী, করি,' শান্ত গলায় জবাব দিল মায়া।

'এই অভিযোগের বিপক্ষে কিছু বলার আছে আপনাদের?'

'আছে। আমার বিয়ের রাত থেকেই আমাদের পিছনে লেগে আছে ষড়যন্ত্রকারীরা। আমার স্বামীকে খুন করার চেষ্টা করেছিল তারা, বোধহয় জানেন আপনারা। হামলাকারী লোকটা কে ছিল তা,

আমার মনে হয় আপনাদের মধ্যে অন্তত একজনের জানা আছে। আপনাদের মধ্যে অন্তত এমন একজন আছেন যিনি, যে-রাতে আমরা পালাতে বাধ্য হলাম সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করে বলেছেন, আমার স্বামী-সন্তান-বন্ধুকে খুন করার পরিকল্পনা করেছে টিকাল—মন্দিরের অন্যতম পুরোহিত এবং মন্ত্রণাসভার প্রধান। বলুন মহামান্য ডিমাস, আমি কি ভুল বলেছি? আপনি কি বলেননি অন্যায়-অত্যাচার-নিষ্ঠুরতার জন্য টিকালকে উৎখাত করতে চায় জনতা?'

'হ্যাঁ, বলেছি,' শান্ত গলায় বলল ডিমাস। 'এবং আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আজ শুধু আপনাদেরই না, দেশ ও জাতিকে যারা অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে তাদের সবারই বিচার হবে। ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যরা এবং মন্ত্রণাসভার বেশ কয়েকজন সদস্য সে-সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছেন এখানে।'

কথাটা শোনামাত্র লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল টিকাল। অগ্নিদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ডিমাসের দিকে।

'ওভাবে তাকিয়ে কোনো লাভ হবে না, লর্ড টিকাল,' শান্ত গলায় বলে চলল ডিমাস, 'দয়া করে ভুলে যাবেন না পবিত্র মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি, আপনার কার্যালয়ে না। ভুলে যাবেন না, এখানে প্রবেশের অনুমতি নেই আপনার দেহরক্ষীদের। এখান থেকে বের হওয়ার প্রতিটা পথে পাহারায় নিযুক্ত আছে পুরোহিতরা এবং তাঁরা আমার আদেশ মানে।'

অসহায়ের মতো বসে পড়ল টিকাল।

মায়া বলতে লাগল, 'যে-রাতে পালিয়ে গেলাম আমরা সে-রাতে কী হয়েছিল বলি। আমি তখন আমার শয়নকক্ষে, ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছি। কীভাবে বলতে পারবো না, বিরাট এক ছুরি নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে নাহুয়া। আমার ছেলেকে খুন করার জন্য ছুরি উঁচিয়ে ছুটে যায় ওর দিকে। বন্ধু ইগনাশিয়ো আর আমার স্বামী যদি সেদিন সময়মতো না-আসতেন তা হলে যাকে অবতার হিসেবে গণ্য করেন আপনারা সে-ছেলেটা...' থামল সে, দম নিল কিছুক্ষণ। তারপর

আবার বলতে লাগল, 'ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে যায় আমার। বুঝতে পারি এই শহরে আসলে কোনো নিরাপত্তা নেই আমাদের কারও। পালানোর সিদ্ধান্ত নিই তখন। এই হলো আমার বক্তব্য। এবার আপনারা যদি সিদ্ধান্ত নেন শাস্তি দেবেন আমাদেরকে, মাথা পেতে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই আমার।'

এরপর সিনরকে এবং আমাকেও জিজ্ঞেস করা হলো ওই ব্যাপারে। মায়ার বক্তব্য সমর্থন করলাম আমরা। দু'জনই বললাম, বিচারকদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি আছি।

এমন সময় টিকাল বলে উঠল, 'শুধু এদের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নেবেন আপনারা? আমার স্ত্রী নাহুয়ারও তো কিছু বলার থাকতে পারে। তা-ই না?'

নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কী যেন আলাপ সেরে নিল বিচারকেরা। তারপর ডিমাস বলল, 'ঠিক আছে, লর্ড মাটাইয়ের মেয়ে এবং লর্ড টিকালের স্ত্রী নাহুয়াকে হাজির করা হোক।'

বুকের খাঁচায় প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারল হৃৎপিণ্ডটা। বুঝতে পারছি বাঁচার আর কোনো আশাই নেই আমাদের। এবং এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, এক ঢিলে দুই পাখি মারা বলতে কী বুঝিয়েছে টিকাল। সে জানত নিজেকে বাঁচাতে হলে নাহুয়াকে ফাঁসাতে হবে মায়ার। ওদিকে নাহুয়া ফেঁসে গেলে আমাদের বিরুদ্ধে যা যা জানে বলে দেবে। শুনে বিচারকেরা আমাদেরকে এবং নাহুয়াকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন। সেক্ষেত্রে মায়ার প্রতি টিকালের প্রতিশোধস্পৃহা পূর্ণ হবে, একইসঙ্গে চিরদিনের মতো মুক্তি পাবে সে নাহুয়ার কবল থেকে।

দরজাটা খুলে গেল এমন সময়। ধীর পায়ে হেঁটে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল নাহুয়া। পরনে রাজকীয় আলখাল্লা, মাথায় সবুজ উষ্ণীষ যা শুধু সর্দারের স্ত্রী বা মা পরতে পারে।

সেই "নকীব" পুরোহিত উঠে দাঁড়াল আবার। নাহুয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনি স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে লেডি মায়ার নবজাতক ছেলেকে খুন করতে গিয়েছিলেন। শুধু তা-ই

না, লর্ড টিকালকে সময়ে সময়ে বিভিন্ন রকম কুপরামর্শ দিয়েছেন, যার ফলে তিনি অত্যাচার আর নিপীড়নের মাত্রা বাড়াতে উৎসাহিত হয়েছেন। বলুন, আপনি এসব স্বীকার করেন? আপনার কি কিছু বলার আছে এই অভিযোগগুলোর বিপক্ষে?'

'দ্বিতীয় অভিযোগটার ব্যাপারে বলি আগে। আমি কোনোদিনও কোনো কুপরামর্শ দিইনি লর্ড টিকালকে। অত্যাচার বা নিপীড়ন যা-ই তিনি করে থাকুন না কেন, নিজের ইচ্ছায় করেছেন, আমার পরামর্শে না। এ-ব্যাপারে আপনাদের যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে, তাঁর কাছে জানতে চান সরাসরি। এবার প্রথম অভিযোগের ব্যাপারে বলছি—হ্যাঁ, আমি অপরাধী। স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে খুন করতে গিয়েছিলাম মায়ার ছেলেকে। কিন্তু ধরা পড়ে যাই, ওরা আমার হাত-পা-মুখ বেঁধে আমাকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।'

'আমার মনে হয় এই বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ পেয়ে গেছি আমরা,' আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল ডিমাস, 'কারণ লেডি মায়া যা বলার বলেছেন, লেডি নাহুয়াও তাঁর অপরাধের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। এবার আপনাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার পালা।'

'থামুন!' চিৎকার করে বলে উঠল নাহুয়া। 'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। কী শাস্তি দেবেন আমাকে? মৃত্যুদণ্ড? দিন। পরোয়া করি না। গত একটা বছর ধরে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি, মরতে পারলে বাঁচি। তবে মরার আগে কয়েকটা কথা বলে যেতে চাই আপনাদের সামনে। শুনলে বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। কিন্তু মহান দেবতার পবিত্র অস্তিত্বের নামে শপথ করে বলছি, আমি যা বলবো তার প্রতিটা বর্ণ সত্য।'

মন্দিরের ভিতরে পিনপতন নীরবতা। সবাই আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে নাহুয়ার দিকে। টিকালের দিকে তাকিয়ে দেখি মিটিমিটি হাসছে সে।

'আমার স্বামী লর্ড টিকালকে উৎখাত করে আজ রাতে যাকে ভবিষ্যৎ সর্দার হিসেবে ঘোষণা করতে যাচ্ছেন আপনারা, যাকে

অবতার বলে মনে করেন, কল্পনা করেন যে-ছেলে বাতিঘরের মতো পথ দেখাবে এই জাতিকে, সে যে জারজ সন্তান তা কি জানা আছে আপনাদের?'

হাঁ হয়ে গেছে অনেকেই। কেউ কেউ গালমন্দ করছে নাহুয়াকে, বলছে মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর। কিন্তু আগেরমতোই অবিচল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা, ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে আছে সিটি অভ দ্য হার্টের তথাকথিত গণ্যমান্য লোকদের দিকে।

কিছুক্ষণ পর আবার নীরবতা নামল মন্দিরের ভিতরে। আবার বলতে শুরু করল নাহুয়া, 'আমার কথা শুনুন। প্রমাণ ছাড়া কিছু বলছি না আমি। কী মনে করেন আপনারা? কেন খুন করতে গিয়েছিলাম ওই ছোট্ট বাচ্চাটাকে? যাতে আমার শত্রু মায়ার মন ভেঙে যায়? হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। যাতে আমার ছেলেকে বসাতে পারি ওই জারজটার জায়গায়? হ্যাঁ, তা-ও ঠিক। কিন্তু আরও কারণ আছে। প্রথম থেকেই বলছি সব।

'আমার বাবা সৎ লোক ছিলেন না। বলতে লজ্জা করছে, কিন্তু কথাটা সত্য। দিবা আর নিশিকে এক করার উদ্দেশ্য নিয়ে লর্ড যিব্যালবে যখন শহরের বাইরে গেলেন, তখন থেকেই সুযোগ খুঁজতে থাকেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই লর্ড টিকালের মনে সর্দার হওয়ার ইচ্ছা ছিল, জানতেন বাবা। এদিকে আমিও ছোটবেলা থেকে টিকালকে ভালোবাসতাম। উপযুক্ত চাল চাললেন বাবা। লর্ড যিব্যালবের ফিরে আসতে আরও এক বছর বাকি আছে, এমন সময় কী সব গণনা করে ঘোষণা করলেন যিব্যালবে আর লেডি মায়া মারা গেছেন। কথাটা ডাহা মিথ্যা। আসলে কিছুই গণনা করেননি বাবা। টিকালকে বুঝিয়েছেন আমাকে বিয়ে করতে রাজি হলে তাঁকে সর্দার হতে সাহায্য করবেন, আর আপনাদেরকে বুঝিয়েছেন যিব্যালবের অনুপস্থিতিতে একজন সর্দারের দরকার হয়ে পড়েছে।

'ঘটনা যখন ঘটেছে তখন এতকিছু জানা ছিল না আমার। বাবা বুঝিয়েছেন, আর সব আমার মনমতো ঘটছে দেখে খুশি হয়ে মেনে

নিয়েছি আমি। মহাবোকার মতো ভেবেছি, লর্ড টিকাল হয়তো ভালোবেসেই বিয়ে করছেন আমাকে। হায় ভালোবাসা!

'নিয়তির পরিহাস—আমাদের বিয়ের রাতেই শহরে ফিরে এলেন লর্ড যিব্যালবে আর মায়া। সঙ্গে দুই ভিনদেশী। সে-রাতেই টের পেলাম, আমার সঙ্গে আসলে এতদিন ভালোবাসার অভিনয় করেছেন টিকাল। তাঁর মনপ্রাণ জুড়ে আছে শুধু মায়া। প্রথম ধাক্কাটা লাগল আমার বুকে।

'দ্বিতীয় ধাক্কাটা লাগল যখন শুনলাম মায়াকে পাওয়ার জন্য আমাকে খুন করতে চান টিকাল। হ্যাঁ, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, সত্য কথাই বলছি। লর্ড যিব্যালবে, মায়া আর দুই ভিনদেশী তখন পাতাল কারাগারে বন্দি। একদিন ওদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন টিকাল। প্রস্তাব দিলেন, লর্ড যিব্যালবের কাছে সিংহাসন ছেড়ে দেবেন, সারাজীবন মায়ার দাস হয়ে থাকবেন এবং রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেবেন দুই ভিনদেশীর জন্য। বিনিময়ে মায়া বিয়ে করবে তাঁকে।

'এই প্রস্তাবে খুশি মনে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন লর্ড যিব্যালবে। কিন্তু ততদিনে সমুদ্রপুত্রের সঙ্গে মন দেয়া-নেয়া হয়ে গেছে মায়ার। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই টিকালের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল সে।

'পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করল। যিব্যালবে ততদিনে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। একদিন তাঁকে দেখতে গিয়ে টিকালের পরিকল্পনার কথা জানতে পারলেন বাবা। মাথা ঘুরে গেল তাঁর। স্বভাব যত খারাপই হোক না কেন, তিনি আমার বাবা। আমি তাঁর একমাত্র সন্তান। আমার ক্ষতি যে-কোনো উপায়ে ঠেকানোর চেষ্টা করেছেন তিনি সবসময়। সে-বারও করলেন। মহাপাপ হচ্ছে জেনেও হাত মেলালেন মায়ার সঙ্গে।

'প্রধান পুরোহিত হিসেবে এই মন্দিরে যখন খুশি তখন আসার অধিকার ছিল তাঁর। সুযোগটা কাজে লাগালেন। যোগাড় করলেন খুব পুরনো একটা সোনার-প্লেট, তাতে প্রাচীন চিত্রলিপিতে কী লেখা

তা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। মায়া, সমুদ্রপুত্র আর ইগনাশিয়োকে নিয়ে পাতাল কারাগার থেকে গোপন পথ ধরে একরাতে চলে এলেন এখানে। উন্মুক্ত করলেন মহান দেবতার হৃৎপিণ্ড, ভিতরের সোনার-প্লেটটা সরিয়ে তার জায়গায় বসিয়ে দিলেন নকল প্লেটটা। আগে থেকেই তৈরি করে রেখেছিলেন একটা মনগড়া ভাষণ, সেটা শুনিয়ে দিলেন আপনাদের সবাইকে...'

'সম্ভব না...' চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে পুরোহিতদের অনেকে, 'এত বড় ধোঁকাবাজি করা সম্ভব না কিছুতেই।'

'কিন্তু আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে ওই কাজই করেছে বাবা,' শান্ত গলায় বলল মায়া, পোশাকের ভিতর থেকে বের করল আসল সোনার-প্লেটটা। 'এই যে। এই সেই প্লেট যা ছিল মহান দেবতার হৃৎপিণ্ডের ভিতরে। কী লেখা আছে এই প্লেটে জানতে চান? শুনুন তা হলে: "এতদিন ঘুমিয়ে ছিল এই চোখ। আজ তার ঘুম ভাঙানো হয়েছে। আজ সে প্রথমবারের মতো হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড দেখেছে। দেখেছে, অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কীভাবে এই কাজ করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। এই চোখের দেখভাল করার দায়িত্ব ছিল সিটি অভ দ্য হার্টের অধিবাসীদের উপর। কাজটা করতে পারেনি তারা। তাই অভিশাপ থাকল ওদের উপর। ডুবে মরবে সবাই। হ্রদের পানিতে প্রায়শ্চিত্ত হবে ওদের পাপের।"' এগিয়ে গিয়ে প্লেটটা রাখল সে বেদির উপর। 'ইচ্ছা হলে যে-কেউ হাতে নিয়ে দেখতে পারেন।'

কিন্তু কারও সে-ইচ্ছা আছে বলে মনে হয় না। ভয়ে শুকিয়ে গেছে সবার চেহারা। এমনকী ডিমাসও যেন নড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে ভাবছি, টিকাল বলেছিল সব প্রমাণ ওর কাছে আছে—কথাটা কি মিথ্যা? নাকি পাতাল কারাগার থেকে ফিরে গিয়ে সব হস্তান্তর করেছে নাহুয়ার কাছে?

'মহাপাপ করেছেন বাবা, মহাশাস্তি হয়েছে তাঁর,' সবাই চুপ

করে আছে দেখে বলে চলল নাহুয়া, 'জীবনের শেষদিকে এসে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন তিনি। মরার সময় খুব কষ্ট পেয়ে মরেছেন। বিশেষ করে শেষ কয়েকটা দিন যে কী যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে তাঁকে তা নিজের চোখে দেখেছি আমি। হয়তো তখনই সিদ্ধান্ত নেন, সব বলে যাবেন আমাকে।' এবার পোশাকের ভিতর থেকে কয়েক তা পার্চমেন্ট বের করল। 'ওই জারজ সন্তানটা আমাদের সিংহাসনে বসে আমাদের ঘাড়ে যাতে আরও বড় পাপের বোঝা চাপিয়ে না-দেয়, সে-জন্য কত কষ্ট করে এই পার্চমেন্টগুলো লিখেছেন তিনি তা বলে হয়তো বিশ্বাস করাতে পারবো না। জবানবন্দিটা হুবহু পড়ে বেদির উপর রেখে দেবো, যার খুশি হাতের-লেখা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।' মাটাইয়ের স্বীকারোক্তিটা আদ্যোপান্ত পড়ে শোনাল সে। তারপর বলল, 'রায় ঘোষণা করার আগে আপনাদের কাছে আমার শেষ প্রশ্ন, অবতার নামধারী একটা জারজকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়ে, আমাদের সবার পাপের বোঝা কমাতে চেয়ে আমি কি আসলেই কোনো অপরাধ করেছি?'

পঁচিশ

বিদায়

বক্তব্য শেষ করে বসে পড়েছে নাহুয়া।

পুরোহিতদের কারও চেহারায় ভয়, কারও চেহারায় অবিশ্বাস। কেউ বিস্মিত, কেউ আবার ক্রুদ্ধ। কিন্তু কেউ কিছু বলছে না। কখনও তাকাচ্ছে ডিমাসের দিকে, আবার কখনও টিকালের

দিকে।

শেষপর্যন্ত আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডিমাস। ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'লেডি অভ দ্য হার্ট মায়া এবং ভিনদেশী আগন্তুকেরা, আপনাদের বিরুদ্ধে জঘন্যতম অভিযোগ করা হয়েছে। আশা করি সবই শুনেছেন আপনারা। জবাবে কিছু বলার আছে আপনাদের? আপনারা কি এই অভিযোগ অস্বীকার করতে চান?'

'না, চাই না,' শান্ত গলায় বলল মায়া, 'আমাদের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ করেছে নাহুয়া তা পুরোপুরি ঠিক। তখন আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা। তবে বুদ্ধিটা কিন্তু মাটাইয়ের মাথা থেকেই বের হয়েছিল। যা-হোক, সম্মতি দিয়েছিলাম আমরা এবং ভুল করেছি। কথায় আছে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আমাদের হয়েছে সে-অবস্থা। আরেকটা কথা। এই কাজে সম্মতি ছিল না ইগনাশিয়োর। তাঁর বন্ধুর কথা ভেবে এবং আমার অনুরোধে রাজি হতে বাধ্য হন তিনি।'

ডিমাস কিছু বলল না। বেদির কাছে তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছে দুই পুরোহিত, ওদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল পুরোহিত দু'জন, নিচু গলায় বলল ওদের সঙ্গে যেতে হবে। মাথা ঝাঁকিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা।

মন্দিরের আরেকটা দরজা দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে আসা হলো প্রায়-অন্ধকার একটা ঘরে। তারপর বাইরে থেকে আটকে দেয়া হলো দরজা। বুঝলাম, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন বিচারকেরা।

সব শেষ। শেষবারের মতো প্রার্থনা করার জন্য হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম আমি। সিনরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে মায়া। বাচ্চাটা ওর কোলে, বোধহয় ক্ষুধা লেগেছে ওর, কাঁদছে সে-ও।

'কেঁদো না,' সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলেন সিনর, 'কথায়

আছে—ভাবিয়া করিয়ো কাজ, করিয়া ভাবিয়ো না। এই শহরে পা দেয়ার আগে কথাটা মনে রাখা উচিত ছিল আমাদের সবার। এখন আর কিছুই করার নেই। যে-ক'টা দিন কাটিয়েছি তোমার সঙ্গে, সুখ পেয়েছি। ভেঙে পোড়ো না, সাহস রাখো। যদি মরতেই হয় বীরের মতো মরবো। ঈশ্বর যদি কপালে লিখে রেখে থাকেন তা হলে আবার কখনও, কোথাও-না-কোথাও নিশ্চয়ই দেখা হবে তোমার সঙ্গে।'

দরজাটা খুলে গেল এমন সময়। দাঁড়িয়ে আছে ওই দুই পুরোহিত। হাতে তরবারি। ইশারা করল আমাদেরকে, বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা।

এরপর যে-ঘটনাটা ঘটল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে আজও আমার গা শিউরে ওঠে। দরজা দিয়ে বের হয়ে দেখি কাছেই দাঁড়িয়ে আছে টিকাল। ভ্রূ কুঁচকে গেল আমার, শয়তানটা এখানে কী করছে বুঝতে পারলাম না। মায়া বের হলো সবার শেষে। তখন বোঝা গেল টিকালের উদ্দেশ্য কী।

মায়া বের হতে-না-হতেই প্রচণ্ড জোরে চড় মারল সে মেয়েটাকে। হতভম্ব হয়ে গেল মেয়েটা, এ-রকম কিছু ঘটতে পারে কল্পনাও করেনি। ওকে এক মুহূর্তও সময় দিল না টিকাল। চিলের মতো ছোঁ দিয়ে ওর কোল থেকে ছিনিয়ে নিল বাচ্চাটাকে। আমরা নড়ার আগেই একদৌড়ে গিয়ে হাজির হলো কুয়াটার কাছে।

এতক্ষণে যেন সংবিৎ ফিরে পেলাম। তাকিয়ে দেখি, খুলে দেয়া হয়েছে কুয়ার মুখ। কত নীচ থেকে জানি না, শোনা যাচ্ছে পানির আওয়াজ। আমার কাছে মনে হলো প্রচণ্ড ক্রোধে যেন ফুঁসছে হ্রদটা।

টিকালকে ধরার জন্য এগিয়ে যেতে চাইলেন সিনর, কিন্তু পারলেন না। তাঁর বুকে তরবারি চেপে ধরল এক পুরোহিত। আমার গলায় ধরল আরেকজন।

আমাদেরকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করছে ওরা। সরে গেলাম আমরা। দু'হাত জোর করে টিকালের কাছে বার বার মিনতি করছে মায়া, ওর ছেলেটার কোনো ক্ষতি যেন না-করে। মায়ার আহাজারি টিকালের কোন্ আবেগ উস্কে দিয়েছে জানি না, ঝাপসা হয়ে-আসা চোখ মুছতে মুছতে দেখি, বিজয়োল্লাসে যেন ফেটে পড়ছে শয়তানটা। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ওর, ঠোঁট সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে মাড়ি। পাগলের মতো হাসছে, ক্ষ্যাপা দৃষ্টিতে ঘন ঘন তাকাচ্ছে এদিকে-ওদিকে। আমাদের সামনে তরবারি হাতে দুই পুরোহিত, তারপর কুয়া, তারপর বাচ্চাটাকে নিয়ে টিকাল।

'লর্ড যিব্যালবের অযোগ্য মেয়ে এবং এককালের লেডি অভ দ্য হার্ট মায়া,' গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলতে শুরু করল ডিমাস, আমাদের মনোযোগ কিছু সময়ের জন্য সরে গেল ওর দিকে, 'সাদাচামড়ার প্রতারক ও লোভী সমুদ্রপুত্র এবং এককালের লর্ড অভ দ্য হার্ট যাযাবর ইগনাশিয়ো, আপনারা স্বীকার করে নিয়েছেন মহাপাপ করেছেন আপনারা। স্বীকার করেছেন এমন এক অপরাধ করেছেন যা, এদেশের আইন অনুযায়ী ক্ষমার অযোগ্য। যে-পাপ, যে-অপরাধের কথা কোনোদিন শুনিনি আমরা, শুনতে হবে বলে কল্পনাও করিনি তা-ই করেছেন আপনারা। কত খারাপ আপনাদের চিন্তা, কত লোভী আপনাদের মন আপনারাই ভেবে দেখুন। ভ্রাতৃসঙ্ঘের সব সদস্যের উপস্থিতিতে এই মন্দিরে দাঁড়িয়ে মহান দেবতার নামে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, অবলীলায় তা ভঙ্গ করেছেন। পরম ভক্তিতে যে-দেবতার পূজা করি আমরা, তাঁকে চরম অপমানিত করেছেন। নষ্ট করেছেন মন্দিরের পবিত্রতা, ভাবগম্ভীর পরিবেশ। জন্ম দিয়েছেন এক জারজ সন্তানের অথচ তাকে অবতার হিসেবে ভাবতে বাধ্য করেছেন আমাদের সবাইকে। আমাদের ক্ষমতা নেই আপনাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার। আপনাদের শাস্তির দায়িত্ব আমরা তুলে দিলাম মহান দেবতার কাছে—নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনোদিন তাঁর সঙ্গে

দেখা হবে আপনাদের।

'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ভণ্ড পুরোহিত মাটাইয়ের নাম মুছে ফেলা হবে মহান দেবতার শ্রেষ্ঠ উপাসকদের তালিকা থেকে। আজ থেকে আপনাদেরকে অভিশপ্ত হিসেবে বিবেচনা করা হবে। যে-বাড়িগুলো বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল আপনাদের জন্য সেগুলো-ও অভিশপ্ত, তাই পুড়িয়ে ফেলা হবে সব। আপনাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে; মরার পর আপনাদের লাশ ঝুলিয়ে রাখা হবে পিরামিডের চূড়ায় যাতে চিল-শকুন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় এবং আপনাদের পরিণতি দেখে সাধারণ লোকে জানতে পারে দেবতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কত ভয়ানক হতে পারে।

'বিশ্বাসঘাতক লেডি মায়া এবং ভিনদেশী সাদাচামড়ার প্রতারক, আপনাদের জারজ শিশুপুত্রের বয়স মাত্র উনিশ দিন। পাপ করার মতো বয়স হয়নি ওর। কাজেই কোনো শাস্তি ওর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। এজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেখান থেকে এসেছিল সে সেখানেই ফেরত পাঠানো হবে ওকে। অর্থাৎ মহান দেবতার কাছেই সমর্পণ করা হবে ওর আত্মা। তারপর তিনি যা ইচ্ছা হয় করবেন ওকে নিয়ে।'

রায় শোনানো শেষ করেছে কি করেনি ডিমাস, আমরা তখনও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারিনি ওর সব কথা, মায়ার বাচ্চাটাকে দু'হাতে ঝুলিয়ে এক পা আড়ে বাড়ল টিকাল। দম বন্ধ হয়ে গেল আমার, কারণ শয়তানটা কী করতে যাচ্ছে তা বুঝতে পেরেছি এবার।

আমরা কেউ নড়ার আগেই বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিল সে। ক্ষুধায় বা ব্যথায় যে-কোনো কারণেই হোক, চিৎকার করতে করতে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল বাচ্চাটা কুয়ার ভিতরে। দু'-এক সেকেণ্ডের মধ্যেই ওর চিৎকার আর শুনতে পেলাম না আমরা।

বুক ফাটা আহাজারিতে সারা মন্দির কাঁপিয়ে ফেলল মায়া। ছুটে গেছে সে কুয়ামুখের দিকে, উপুড় হয়ে দেখছে নীচে। একের

পর এক চিৎকার করছে বিচারকদের দিকে তাকিয়ে...

এরপর কী হলো ঠিক বলতে পারবো না। ভয়ঙ্কর একটা রাগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আমার ভিতরে। ভুলে গেলাম নগ্ন তরবারি নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক পুরোহিত। আর সিনর ততক্ষণে সর্বশক্তিতে লাথি মেরে বসেছেন সামনে-দাঁড়ানো পুরোহিতের পেটে। লোকটার বুকের ভিতরের সব বাতাস মুখ দিয়ে বের হয়ে এল, লুটিয়ে পড়ল সে মেঝেতে। হাত থেকে আপনাআপনি ছুটে গেল তরবারিটা। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে টিকালের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন সিনর।

আমি ততক্ষণে সুযোগ বুঝে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মেরে বসেছি সামনে-দাঁড়ানো পুরোহিতের পাঁজরে। আমাকে আঘাত করার জন্য তরবারি তুলেছিল সে, থেমে গেল সেটা। লোকটা যাতে আর কিছু করতে না-পারে সে-জন্য সর্বশক্তিতে মুচড়ে ধরলাম ওর দু'হাত।

সিনর ততক্ষণে তরবারিটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন টিকালের পেটে। শয়তানটার মরণ-আর্তনাদে আরেকবার কেঁপে উঠল মন্দিরের ভিতরটা। কিন্তু তাতে সিনরের রাগ কমল না। দু'হাতে টিকালের গলা টিপে ধরলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর একঝট্‌কায় লোকটাকে তুলে নিলেন মাথার উপর। তারপর সজোরে নিক্ষেপ করলেন কুয়ার ভিতরে।

মায়ার বুকফাটা আর্তনাদ এখনও থামেনি। দেখে মনে হচ্ছে পাগল হয়ে গেছে বেচারী। উন্মত্তের মতো এদিকে-সেদিকে তাকাচ্ছে। একসময় গলা ফাটিয়ে বলতে লাগল, 'এই শহরটা যদি হ্রদের পানিতে পুরোপুরি ডুবেও যায় তারপরও তোদের পাপের শেষ হবে না, শয়তানের বাচ্চারা! একটা নিষ্পাপ বাচ্চাকে খুন করতে একটুও খারাপ লাগল না তোদের? কেন করলি তোরা কাজটা? কেন?'

হতভম্ব হয়ে গেছে সবাই। পাগলপারা মায়া লাফিয়ে উঠে

দাঁড়াল কুয়ার সামনে থেকে, এক দৌড়ে হাজির হলো বেদির কাছে। প্রথমে দুই হাতে সর্বশক্তিতে টেনে ধরল ওর চুল, তারপর যেন হঠাৎ করেই মহান দেবতার "হৃৎপিণ্ডটার" উপর চোখ পড়ল ওর। কেউ কিছু বলা বা করার আগেই লাফিয়ে গিয়ে ধরল সেটাকে। দাঁতে দাঁত চেপে হ্যাঁচকা টান মারল। ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় মানুষের শরীরে অসুরের শক্তি ভর করে, হয়তো সে-জন্যই মায়ার টানে ভিত্তি থেকে আলগা হয়ে গেল হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড। তাল সামলাতে না-পেরে ওটাসহ মেঝেতে উল্টে পড়ে গেল মায়া। পরমুহূর্তেই উঠে দাঁড়াল। ক্ষ্যাপাটে দৃষ্টিতে এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে হা হা করে হাসল, তারপর সর্বশক্তিতে আছাড় মারল হৃৎপিণ্ডটাকে। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল জিনিসটা। ভিতরের রত্নপাথরগুলো একেকটা একেকদিকে ছিটকে গেল।

স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমরা সবাই। আমার হাত আপনাথেকেই আলগা হয়ে গেছে, পুরোহিতটা এখন ইচ্ছা করলেই এককোপে আমার ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দিতে পারে। কিন্তু ও-রকম কিছু করা তো দূরের কথা, মায়ার কাজ দেখে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে লোকটা। সিনর যে-পুরোহিতকে আঘাত করেছেন সে-ও দেখি ব্যথা ভুলে উঠে দাঁড়িয়েছে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে আছে টুকরো-টুকরো হয়ে-যাওয়া হৃৎপিণ্ডটার দিকে।

অস্পষ্ট গুম গুম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে—যেন অনেক দূর থেকে প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে পানির দানবীয় স্রোত। শব্দটা শোনামাত্র হুঁশ ফিরল জনৈক পুরোহিতের, চিৎকার করে বলল সে, 'পালাও! পালাও সবাই! ভেঙে গেছে কব্জা, খুলে গেছে ফ্লাডগেট। হ্রদের সব পানি ঢুকে যাচ্ছে আমাদের শহরে। ডুবে মরতে হবে এবার!'

কথাটা শোনামাত্র আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সবাই। মন্দিরের সামনের দরজা দিয়ে কে কার আগে বের হবে তা নিয়ে হুড়োহুড়ি

শুরু হয়ে গেছে। ধাক্কাধাক্কির কারণে মাটিতে পড়ে গেছে কেউ কেউ, ওদেরকে পদদলিত করেই দৌড়ে পালাচ্ছে বাকিরা।

কুয়ামুখের কাছে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সিনর। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মায়া। এগিয়ে গিয়ে ওর একটা হাত ধরলাম। সিনরের দিকে তাকিয়ে স্প্যানিশে বললাম, 'দেরি করবেন না, চলুন তাড়াতাড়ি! আমাদের হাতে সময় খুব কম।'

দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই বুঝতে পেরে আমাদের দিকে ছুটে এলেন সিনর।

ডিমাস যখন পাতাল কারাগার থেকে গোপন পথ দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে এসেছিল মন্দিরে, একটা দরজাতেও তালা দেয়নি, আগেও বলেছি বোধহয়। প্রথম দরজাটা দিয়ে ঢুকে পড়লাম আমরা। পাথরের দরজাটা ঠেলে লাগিয়ে দিলে দেয়ালের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যায়, একটুখানি ফাঁকও থাকে না। মায়াকে নিয়ে ঢুকে পড়লাম আমি, পরমুহূর্তেই ভিতরে চলে এলেন সিনর। অপ্রকৃতিস্থ মায়াকে ধরলেন তিনি। আমি সর্বশক্তিতে ধাক্কা দিতে লাগলাম—দরজাটা বন্ধ করে দেবো। এমন সময় ভয়াবহ একটা দৃশ্য চোখে পড়ল।

কুয়ার মুখ দিয়ে ফোয়ারার মতো ছিটকে বের হচ্ছে পানি, গিয়ে আঘাত করছে মন্দিরের ছাদে। পানির ধাক্কাটা কত জোরে লাগছে চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ছাদের মার্বেলের ব্লকগুলো খসে পড়তে শুরু করেছে। ভারী ব্লকগুলোর কোনো কোনোটা গিয়ে পড়ছে ছুটন্ত পুরোহিতদের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়ছে ওরা। আতঙ্ক আরও বাড়ছে তাতে, হুড়োহুড়ি আরও বেশি হচ্ছে। সরু দরজাটার কাছে পড়ে আছে কয়েকজনের লাশ। অন্যদের পায়ের চাপায় এতক্ষণে ভর্তা হয়ে গেছে মনে হয়।

কুয়ার মুখ দিয়ে পানির-ফোয়ারার সঙ্গে উঠে এসেছে টিকালের লাশ। প্রচণ্ড জোরে সেটা বাড়ি খেয়েছে মন্দিরের ছাদের

সঙ্গে। থেঁতলে গেছে শরীরটা। স্রোতের বেগ একটু কমে আসামাত্র লাশটা হুড়মুড় করে পড়ল কুয়ামুখের কাছে। ওর খোলা নিষ্প্রাণ চোখের দিকে তাকিয়ে গলা শুকিয়ে গেল আমার। তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলাম দরজাটা।

ভাগ্য ভালো—চাবির গোছাটা ঝুলছে তালার ফুটোয়। সেটা ঘুরিয়ে আটকে দিলাম দরজাটা, আলগা করে নিলাম গোছাটা। কয়েক শ' ধাপ সিঁড়ি আর ডজন ডজন প্যাসেজ পার হয়ে হাজির হলাম পাতাল কারাকক্ষে। এখানে থাকাটা মোটেও উচিত হবে না, বুঝতে পারছি। মাটি কাঁপতে শুরু করেছে, গুম গুম আওয়াজটা আরও জোরে শোনা যাচ্ছে। পুরো পিরামিডটা যেন দুলছে। হাজার বছর ধরে আটকে-থাকা পানির স্রোত আজ পথ করে নিতে পেরেছে, সামনে যা পাচ্ছে তাই গুঁড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে আসছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে।

একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন হাতে নিলাম আমি। মায়ার জ্ঞান আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। ওকে কাঁধে তুলে নিলেন সিনর। দু'জনে ছুটে গেলাম তামার দরজাটার কাছে। গোছা থেকে খুঁজে খুঁজে ঠিক চাবিটা বের করতে বেশি সময় লাগল না আমার। দরজাটা খুলে মাত্র পা দিয়েছি সিঁড়িতে, এমন সময় টের পেলাম পাতাল কারাগারে যে-কোনোভাবেই হোক ঢুকে গেছে পানি। বাড়ছে দ্রুতগতিতে। ডুবে যাচ্ছে সবকিছু। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত নষ্ট করেছি আমরা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, ওই সময়ের মধ্যেই ছ' থেকে আট ফুট পানি জমে গেছে কারাগারের ভিতরে।

আর দেরি করার মানে হয় না। ছুট লাগালাম আমরা। এবার একের পর এক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি। একের পর এক বন্ধ দরজা আমাদের সামনে। গোছা থেকে চাবি খুঁজে বের করে খুলতে হচ্ছে সেগুলো। যে-চাবিটা একবার কাজে লেগে যাচ্ছে, ঝামেলা কমানোর জন্য সেটা আলাদা করে ফেলছি গোছা থেকে। কিন্তু ফেলে দিচ্ছি না, পকেটেই রাখছি—পরে যদি কাজে লাগে?

দেখা গেল ভুল অনুমান করিনি আমি। এ-রকম একাধিক দরজা পাওয়া গেল যেগুলো খুলতে হলো আগের কোনো চাবি দিয়ে। শেষপর্যন্ত বের হয়ে এলাম খোলা বাতাসে, হাজির হলাম পিরামিডের চূড়ায়। তখন ধূসর আলো ফুটতে শুরু করেছে শেষরাতের আকাশে। নীচের দিকে তাকিয়ে আমার গায়ে আরেকবার কাঁটা দিয়ে উঠল।

নতুন বছরকে স্বাগত জানাবে বলে পিরামিড-চত্বরের বাইরে জড়ো হয়েছে হাজার হাজার শহরবাসী। কিন্তু চত্বরে ঢুকতে পারেনি ওরা, কারণ বিশাল একটা তামার দরজা আছে এবং সেটা এখনও বন্ধ। নিয়ম হচ্ছে মন্দিরে সভা শেষ করে বাইরে আসবেন ভ্রাতৃসঙ্ঘ ও মন্ত্রণাসভার সদস্য, আসন গ্রহণ করবেন, তারপর খোলা হবে দরজাটা। সুশৃঙ্খলভাবে ভিতরে ঢুকবে জনতা, সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে দাঁড়াবে নির্দিষ্ট জায়গায়। পুরোহিতদের কেউ আজ আসন গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ মন্দির থেকে হুড়োহুড়ি করে বের হতে গিয়ে বেশিরভাগই হয় আহত নয়তো নিহত হয়েছে। যারা বাইরে আসতে পেরেছে তারা উদ্ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করছে। দরজা খোলা অথবা পিরামিড পাহারা দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রহরীরা বুঝতে পারছে না কী করা উচিত।

আমাদেরকে দেখামাত্র চিৎকার করে উঠল জনতা। কিছু বলতে চাচ্ছে ওরা, কিন্তু এত উপরে থেকে ওদের কথা শোনা সম্ভব না আমাদের পক্ষে। শহরের রাস্তা আর অলিগলি ধরে ছুটে আসছে পানির স্রোত।

তারমানে ঠিকই বলেছিল মাটাই—পবিত্র "হৃৎপিণ্ডটার" সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে যোগাযোগ আছে স্লুইসগেটের। রাগের মাথায় হৃৎপিণ্ডটা ভিত্তি থেকে খুলে ফেলেছে মায়া, সরে গেছে গোপন কোনো কব্জা, খুলে গেছে বন্যানিয়ন্ত্রক দরজা। হ্রদের বাড়ন্ত পানি হু হু করে ঢুকে পড়ছে শহরে।

আমার চোখের সামনে সত্য হতে চলেছে দেবতার

অভিশাপবাণী। কারণ আমি জানি, বছরের এই সময়ে হ্রদের পানির উচ্চতা বেড়ে শহরের বাড়িঘরগুলোর ছাদ ছাড়িয়ে যায়। পানির ভিতরে প্রবেশ করা ঠেকিয়ে রাখে শহর রক্ষাকারী দেয়াল এবং স্লুইসগেট। আজ গোপন কব্জার কারসাজিতে খুলে গেছে সে-গেট। টন টন পানি ঢুকে পড়েছে সেখান দিয়ে। ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে শহরটা। যে-লোকগুলো জড়ো হয়েছে চত্বরে তারা না-পারছে ভিতরে ঢুকে পিরামিডের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে জীবন বাঁচাতে, না-পারছে বাড়িতে ফিরে যেতে। আর কিছুক্ষণ পর অসহায়ের মতো ওদের সবাইকে মরতে হবে হয়তো।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে কিছুটা দূরে জ্বলছে "পবিত্র আগুন"। দু'জন পুরোহিত দাঁড়িয়ে আছে কাছে। আমাদেরকে দেখে ছুটে এল ওরা। ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল একজন, 'কী হয়েছে? মন্দিরের ভিতরে এমন কী ঘটেছে যে, এত পানি ঢুকে পড়ল শহরের ভিতরে? আপনারাই বা সবার সঙ্গে বের না-হয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন কেন?'

বিরক্ত হয়ে আমি বললাম, 'জানি না।'

আর কিছু জিজ্ঞেস করল না ওরা। "পবিত্র আগুনের" তত্ত্বাবধান বাদ দিয়ে দৌড়ে নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই বুঝতে পারল, পালাতে পারবে না। কাজেই ফিরতি পথ ধরল। আবার এসে দাঁড়াল আমাদের পাশে।

পিরামিডের চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখছি, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে শহরবাসীদের মনে। যেদিকে তাকাই শুধু পানি আর পানি। ডুবে গেছে বেশিরভাগ বাড়ি। ঘুমিয়ে ছিল তাই পালাতে না-পেরে মারা পড়েছে অনেকে। যারা রাস্তায় বের হতে পেরেছিল তারা ভেসে যাচ্ছে পানির ধাক্কায়। পানির প্রচণ্ড চাপে ফাটল ধরে গেছে শহর-রক্ষাকারী-দেয়ালের কোনো কোনো জায়গায়। রাস্তা বলতে আর কোনোকিছুই চোখে পড়ছে না। শোনা যাচ্ছে লোকজনের

আর্তচিৎকার আর বাড়ন্ত পানির শব্দ।

আজ হ্রদটা গিলে খাবে কিংবদন্তীর এই স্বর্ণশহরকে। আজ পানিতে তলিয়ে গিয়ে মেক্সিকোর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই নগররাষ্ট্র। বাড়ন্ত পানির বীভৎস আওয়াজ সে-কথাই জানান দিচ্ছে। পানির ধাক্কায় ভেঙে গিয়ে বাড়িগুলো স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে একে একে। শিকড়সহ উঠে এসেছে বেশিরভাগ গাছ, ভেসে যাচ্ছে সেগুলোও।

সূর্যকিরণ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে, আরও পরিষ্কার হলো চারদিক। উঁচু উঁচু কয়েকটা গাছের চূড়া আর এই পিরামিডের উপরের অংশটা ছাড়া পুরো শহর ডুবে গেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ। কিংবদন্তীর স্বর্ণশহর এবার সত্য সত্যই কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। আফসোস, আমাদের পূর্বপুরুষেরা বছরের পর বছর কষ্ট করে যে-শহর গড়ে তুলেছিলেন তা মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেল! এই শহরের গোপন রত্নভাণ্ডারে সাত রাজার সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন তাঁরা, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ওই সম্পদের কিছুটা কাজে লাগিয়ে মেক্সিকোর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি, তা নির্মূল হয়ে গেল!

হ্রদের পানির উচ্চতা আর শহরে ঢুকে-পড়া পানির উচ্চতা সমান হয়ে গেছে। কাজেই এখন আর পানি ঢুকবে না। প্রায় স্থির ফেনাবিহীন পানিতে এখন প্রতিফলিত হচ্ছে নতুন বছরের তেজী সূর্যালোক। ভাঙা কাঠ, উপড়ে-পড়া গাছ ভাসছে এখানে-সেখানে। কোথাও ভাসছে মানুষের লাশ। স্বর্ণশহরের এই কিয়ামতের খবর কীভাবে যেন পেয়ে গেছে দু'-চারটা ঈগল। শূন্যে ডানা মেলে চক্কর দিতে দিতে যথেষ্ট নীচে নেমে এসেছে পাখিগুলো।

জ্ঞান ফিরে আসছে মায়ার। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলল সে, পিটপিট করল কিছুক্ষণ। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারপর উঠে বসে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বোধহয় বাচ্চাটার কথা মনে পড়ে

গেছে। তারপর হঠাৎ করেই দেখল তলিয়ে-যাওয়া শহরটা। কান্না থেমে গেল আপনাথেকেই। আবার দু'হাতে চুল খামচে ধরল সে, আর্তচিৎকার করে উঠল। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে ওর, কাঁপছে সে। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, 'কী করেছি আমি এটা? কী করেছি? ধ্বংস হয়ে গেছে আমাদের শহর! অভিশাপ সত্য হয়েছে...'

লাফিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে। পিরামিডের যে-জায়গায় বসে আছি আমরা সেখানে ছুটে বেড়াল কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে এসে খামচে ধরল সিনরকে। উন্মাদিনীর মতো জিজ্ঞেস করল, 'আমার বাচ্চাটা কই? কোথায় গেল সে?'

জবাব দিলেন না সিনর।

তাঁর পাশে বসে পড়ল মায়া। দু'হাত একসঙ্গে করে ধরল পেটের সঙ্গে—ওর বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েছে যেন। দোল দিচ্ছে আপনমনে। হাসছে মিটিমিটি। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখুন ইগনাশিয়ো, দেখুন! আমার ছেলেটা খুব সুন্দর না? এ-রকম একটা ছেলের জন্ম দিয়েছি বলে কী যে গর্ব হয় আমার...' বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে সিনরের কোলে।

চোখ জ্বালা করে উঠল আমার। সিনরের কাছ থেকে অশ্রু লুকানোর জন্য মুখ ঘুরালাম আরেকদিকে।

দুঃখবেদনা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, কষ্ট, সর্বোপরি চোখের সামনে নবজাতক বাচ্চার খুন হওয়ার শোক সহ্য করতে না-পেরে পাগল হয়ে গেছে কিংবদন্তীর স্বর্ণশহরের কিংবদন্তীর সৌন্দর্যের অধিকারিণী লেডি অভ দ্য হার্ট মায়া।

"পবিত্র আগুনটা" জ্বলছে এখনও। দুই পুরোহিত কোথায় গেছে কে জানে! মায়াকে আবার কাঁধে তুলে নিলেন সিনর। ওয়াচহাউসটা কাছেই, নিয়ে গেলেন সেখানে। শুইয়ে দিলেন একটা চৌকির উপর। ঘরের ভিতরে খোঁজাখুঁজি করার পর কিছু খাবার পেয়ে গেলাম আমরা। পানিও পেলাম। কিছুটা রাখলাম মায়ার জন্য, বাকিটা ভাগাভাগি করে খেলাম আমি আর সিনর।

বাচ্চাকে খাওয়াতে না-পেরে স্তনে দুধ জমে গিয়ে কষ্ট শুরু হয়েছে মায়ার। প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে সে, আবোলতাবোল বকছে। মূর্ছা যাচ্ছে বার বার। খাবার তো পরের কথা, এক ফোঁটা পানি পর্যন্ত ছুঁয়ে দেখেনি। সাধ্যমতো চেষ্টা করছি আমি আর সিনর। কিন্তু কী-ই বা করার আছে আমাদের?

টানা দু'দিন নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করার পর তৃতীয় দিন ভোরের দিকে মারা গেল বেচারী।

আজও মনে আছে, মরার আগে জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল সে। ওর মানসিক অপ্রকৃতিস্থতাও কেটে গিয়েছিল। সিনরের কোলে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, 'আফসোস! কষ্ট ছাড়া আর কিছুই দিতে পারলাম না আমি আপনাকে। সময় হয়ে গেছে আমার, কিছুক্ষণ পরই চলে যাবো আপনাকে ছেড়ে। আর কোনোদিন দেখা হবে কি না জানি না। পবিত্র মন্দিরে ঢুকে যে-জঘন্য অপকর্ম করেছি তা না-করে বরং মরলেই ভালো হতো। তা হলে আমাদের বাচ্চাও হতো না, একটা অমানুষের হাতে ওভাবে খুন হতো না সে, আর শহরের এতগুলো লোককে খুন করার দায় মাথায় নিয়ে এভাবে চিরবিদায় নিতে হতো না আমাকে। কিন্তু কী করবো, বলুন? বাচ্চাটাকে চোখের সামনে কুয়ায় ফেলে দিল টিকাল। দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেল আমার। কুয়ায় উঁকি দিয়ে যখন দেখছিলাম, বুঝতে পারছিলাম আর কোনোদিন ফিরে আসবে না আমাদের বাচ্চাটা, তখন পানির আওয়াজ শুনে কী যে হয়ে গেল আমার বলতে পারবো না। মনে হলো, কেউ যেন বলছে আমার ভিতর থেকে—ধ্বংস করে দে সব, মায়া, পানিতে ডুবিয়ে মার্ তোর শত্রুদেরকে। তারপর আর কিছু খেয়াল নেই। আমার পাপের এমনিতেই শেষ নেই, মরার আগে আরেকটা বড় পাপ করলাম; আমার কতদিনের নরকবাস হবে জানি না।

'আচ্ছা, নিয়তি এত নিষ্ঠুর কেন বলতে পারেন? পানিতে

ডুবেই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে স্বর্ণশহর—লেখা ছিল নিয়তির বিধানে, কিন্তু আমার হাত দিয়েই কাজটা করাল কেন সে? তারপরও ক্ষমা প্রার্থনা করছি মহান দেবতার কাছে, তিনি যেন শাস্তি দেয়ার আগে আমার অসহায়ত্বটা অন্তত একবারের জন্য হলেও বিবেচনা করেন।

'আমি জানি আপনি বুদ্ধিমান লোক। আমি বিশ্বাস করি আপনি পালাতে পারবেন এই অশুভ জায়গা থেকে। যান, পালিয়ে নিরাপদে কোথাও, অনেক দূরে কোথাও চলে যান। সুখেশান্তিতে কাটিয়ে দিন বাকি জীবন। যদি প্রয়োজন মনে করেন, অন্য কাউকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে চিরজীবনের দেশে আপনার অপেক্ষাতেই থাকবো আমি। আপনি যাবেন তো সেখানে?

'বিদায়, স্বামী আমার। দেখুন, বেশিদিন বাঁচতে পারলাম না এই পৃথিবীতে। যতদিন বাঁচলাম, সর্দারের মেয়ে হওয়ার পরও সুখী হতে পারলাম না। শুধু আপনার সঙ্গে যে-ক'টা দিন কাটিয়েছি, স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়েছি। আমার সৌভাগ্য—আজ আপনার কোলে মাথা রেখে মরতে পারছি। আমার বিশ্বাস আপনি সত্যিকার অর্থেই ভালোবেসেছিলেন আমাকে। আর আপনার প্রেমই আমার সারাজীবনের সব অপূর্ণতা ঢেকে দিয়েছে।

'ইগনাশিয়ো, আপনাকেও বিদায় বলে যেতে চাই। সত্যিকার একজন বন্ধুর মতো আমার পাশে সবসময় ছিলেন আপনি। একজন খাঁটি মানুষের মতো প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন, নিজের লাভক্ষতি বিবেচনা করেননি। অথচ আমি সবসময় ভালো ব্যবহার করতে পারিনি আপনার সঙ্গে। বরং কখনও কখনও দুর্ব্যবহার করেছি। কখনও আবার আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়েছি। যদি সম্ভব হয় ক্ষমা করে দেবেন আমাকে। মরার আগে আপনার প্রতি আমার একটাই অনুরোধ—সেই ডাকাতের বাড়িতে আমাদের দেখা হওয়ার আগে

আমার স্বামীকে যেভাবে দেখভাল করতেন সেভাবে দেখেশুনে রাখবেন, খেয়াল রাখবেন ওঁর কোনো ক্ষতি যেন না-হয়।

'স্বামী, আমাকে ভুলে যাবেন না। ভুলে যাবেন না আপনার ছেলেটার কথা। বলুন, মনে রাখবেন তো আমাকে?'

জবাবে সিনর কী বলেছিলেন আমার মনে নেই।

সিনরের কপালে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল মায়া। মেয়েটার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। কাঁদছেন সিনরও। কী যেন খামচে ধরেছে আমার বুকের ভিতরটা, হাত বুলাচ্ছি সেখানে কিন্তু উপশম হচ্ছে না। গলার কাছে শক্ত হয়ে আটকে আছে কিছু একটা। বার বার ঢোক গিলেও নামাতে পারছি না। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে—অশ্রুতে ভিজে গেছে চোখ।

শেষপর্যন্ত উঠে চলে আসতে বাধ্য হলাম।

ঘণ্টাখানেক পর ওয়াচহাউস থেকে বাইরে বের হয়ে এলেন সিনর। হতভম্বের মতো তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। কোনো একটা কথা তাঁর বুক ফেটে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে, কিন্তু বলতে পারছেন না। কাঁপছে ঠোঁট, পানি টলমল করছে চোখে।

বুকফাটা আর্তনাদ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি আমার বুকে।

ধ্বংস হয়ে গেছে স্বর্ণশহর, তাই তীরে বসবাসকারী ইণ্ডিয়ানরা ভয়ে কিছু করতে এল না প্রথমে। কিন্তু আস্তে আস্তে ওদের ভয় কেটে গেল। দু'চারটা বড় বড় নৌকা নিয়ে উদ্ধার কাজ চালানোর জন্য এগিয়ে এল ওরা। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, পিরামিডের দিকে আসছে না কেউই—কেন জানি না। আমাদের সঙ্গের সেই দুই পুরোহিত আবার হাজির হয়েছে। চিৎকার করে, হাত নেড়ে নৌকার আরোহীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। কোনো লাভ হলো না। নৌকার আরোহীরা হয়তো দেখল, কিন্তু এদিকে এল না কেউই।

ভেবেছিলাম ওরা কেউ এলে মায়ার লাশটা নিয়ে উঠে পড়বো

নৌকায়, তীরে পৌঁছে কবর দেবো। হলো না। সারারাত লাশটা নিয়ে বসে থাকতে হলো আমাদেরকে। ইতোমধ্যে দুই পুরোহিত জেনে গেছে মারা গেছে মায়া। এ-ও জেনে গেছে, ওয়াচহাউসের ভিতরে রাখা আছে লাশ। ভয়ে সেদিকে যাচ্ছে দু'জনের কেউই।

মানুষের দেহে প্রাণ থাকলে সে কারও ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু একটা লাশ কার কী ক্ষতি করতে পারে বুঝলাম না।

যা-হোক, আমাদেরকে উদ্ধার করতে এল না কেউ। বুঝতে পারছি এভাবে থাকা যাবে না বেশিক্ষণ—চিরগরমের এই দেশে এভাবে পড়ে থাকলে পচন ধরতে বেশি সময় লাগবে না মায়ার লাশে। তাই বাধ্য হয়েই একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলো।

এখনও জ্বলছে পবিত্র আগুন। কিছু সময় পর পর পালা করে গিয়ে আগুনটা উস্কে দিচ্ছে দুই পুরোহিত। সব শেষ, এখন আর আগুন জ্বালিয়ে রাখার মানে হয় না: তবে আমার মনে হয় আশা ছাড়েনি লোক দুটো—দূর থেকে আগুন দেখে যদি কারও মনে দয়া হয়, যদি কেউ উদ্ধার করতে আসে আমাদেরকে।

যা-হোক, নতুন বছরের শুরুতে জনতার সামনে উপস্থিত হওয়ার নিয়ম স্বর্ণশহরের হোমড়াচোমড়া লোকদের; এর আগেরবার দেখেছি কাঠের টুলে বসে ওরা। টুলগুলো আছে কাঠেপিঠেই। নিয়ে এলাম বেশ ক'টা টুল। ভেঙে লাকড়ির মতো বানালাম। ওয়াচহাউসের ভিতরে জ্বালানি আছে, দেখেছি আগেই, নিয়ে এলাম সেগুলোও। সবগুলো লাকড়ি আগুনে ফেলে ঢেলে দিলাম সবটুকু জ্বালানি। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। একটা সাদা আলখাল্লা দিয়ে মায়ার লাশটা ভালোমতো ঢেকে নিয়ে এলেন সিনর। দু'জনে ধরাধরি করে শুইয়ে দিলাম মায়াকে আগুনের শয্যায়।

দূরে দাঁড়িয়ে দেখছি, আগুনের লেলিহান শিখা যেন এক মানুষ সমান উঁচু হয়ে উঠে যাচ্ছে। কুণ্ডলীর মতো পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়া, আরও কালো করে দিচ্ছে রাতের আকাশটাকে।

পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে মায়া।

পুড়ে যাচ্ছে আমাদের বুকের ভিতরটাও।

ভোরের দিকে বৃষ্টি নামল। বাতাসও বেড়েছে। সারারাত জ্বলে নিভে গেছে আগুন। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য আমরা চারজনে এসে আশ্রয় নিয়েছি ওয়াচহাউসের ভিতরে। দুই পুরোহিত বসে আছে মেঝেতে। আমি আর সিনর দাঁড়িয়ে আছি দরজায়। দু'জনে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, দমকা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গতরাতের ছাইগুলো। মন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে দুঃখে, কিছুই ভালো লাগছে না।

যেভাবে আচমকা নেমেছিল বৃষ্টি, সেভাবে হঠাৎ করেই থেমে গেল। কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যায় এই পানিবন্দি অবস্থা থেকে ভাবছি। সিনরকে বললাম, 'চলুন খুঁজে দেখি তক্তা জাতীয় কিছু পাওয়া যায় কি না। চারজনে মিলে একটা ভেলার মতো বানিয়ে যদি...'

কিছু না-বলে সামনের দিকে ইঙ্গিত করলেন সিনর।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি, আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে একটা বড় ক্যানো। ভিতরে বসে আছে তিন ইণ্ডিয়ান। হাতের ইশারায় বলছে পিরামিডের ধাপ বেয়ে নেমে পানির কাছে যেতে।

ডাকলাম দুই পুরোহিতকে। নৌকা দেখে প্রথমেই খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল ওরা। দেবতার "শুকরিয়া" আদায় করে হাসতে হাসতে জড়িয়ে ধরল একজন আরেকজনকে। তারপর দৌড়ে গিয়ে ঢুকল ওয়াচহাউসের ভিতরে, টুকিটাকি কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এল।

কিন্তু নৌকায় ওঠা খুব একটা সহজ হলো না আমাদের জন্য। পিরামিডের ধার ঘেঁষে বয়ে-চলা পানির স্রোত যথেষ্ট বেশি, এদিকে নৌকা ভেড়াতেই অনেক কষ্ট করতে হলো তিন ইণ্ডিয়ানকে। প্রথমে উঠতে গেল দুই পুরোহিত। হুড়োহুড়ি করতে

গিয়ে পানিতে পড়ে গেল দু'জনই, "বাঁচাও!" "বাঁচাও!" বলে চিৎকার জুড়ে দিল। টেনে ওদেরকে নৌকায় তুলল ইণ্ডিয়ানরা।

আমার বা সিনরের কাছে মালপত্র বলতে কিছুই নেই (আমার কোমরের বেল্টটা ছাড়া)। কাজেই নৌকায় উঠতে তেমন একটা বেগ পেতে হলো না আমাদেরকে।

ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, গত রাতে দূর থেকে পিরামিডের চূড়ায় আগুন দেখেছে ওরা। ভেবেছে, বেঁচে আছে কেউ-না-কেউ, সাহায্যের জন্য সংকেত দিচ্ছে। আজ সকালে তাই নৌকা নিয়ে এসেছে এই তিন জন। আগেরবার নৌকা নিয়ে এরা আসেনি, অন্যরা এসেছিল; ভয় অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক লোকগুলো পিরামিডের কাছে ঘেঁষেনি।

আমাদেরকে জিজ্ঞেস করল ইণ্ডিয়ানরা, এত সুরক্ষিত স্বর্ণশহর পানিতে তলিয়ে গিয়ে ধ্বংস হলো কীভাবে।

একসঙ্গে মাথা নাড়ল দুই পুরোহিত। একজন বলল, 'জানি না।' ইঙ্গিত করল আমাদের দিকে, 'এঁরা হয়তো কিছু জানতে পারেন। যখন পানি ঢুকতে শুরু করেছে শহরে তখন এই দু'জনকে দেখলাম সিঁড়ি দিয়ে পড়িমরি করে উঠে আসছেন উপরে। সঙ্গে লেডি অভ দ্য হার্ট মায়াও ছিলেন। অবশ্য পরে তিনি মারা গেছেন।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল ইণ্ডিয়ানরা। কিছু বলবো কি না ভাবতে ভাবতে সিনরের দিকে তাকালাম আমি।

দেখলাম, লাল হয়ে আছে তাঁর দুই চোখ। এটা না-ঘুমানোর কারণে, নাকি অন্য কোনো ব্যাপার, বুঝতে পারলাম না। আমি কিছু বলার আগেই নিচু গলায় বললেন তিনি, 'আমরাও জানি না। আমরা কিছুই দেখিনি।'

মায়ার মৃত্যুর পর এই প্রথম মুখ খুললেন তিনি।

তীরে পৌঁছে দেখি, প্রায় দু'শ' ভয়ার্ত ইণ্ডিয়ান জড়ো হয়েছে। কী

বলবে বা কী করবে বুঝতে পারছে না ওরা। সিনরকে দেখামাত্র রেগে গেল কেউ কেউ। একজন বলল, 'এই সাদা লোকটাই যত সমস্যার কারণ। এর জন্যই ধ্বংস হয়ে গেছে স্বর্ণশহর। দেবতার অভিশাপ আছে লোকটার উপর। একে হত্যা করা হোক।'

আরেকজন বলল তখন, 'কে করবে কাজটা? তুমি? এমনিতেই সমস্যার শেষ নেই আমাদের। এখন আর ঝামেলা বাড়িয়ো না তো।'

দ্বিতীয় লোকটার সঙ্গে তাল মেলাল আরেকজন, 'ঠিকই বলেছ। ছেড়ে দাও দুই ভিনদেশীকে। যেখানে খুশি চলে যাক ওরা। না-খেতে পেয়ে অথবা হিংস্র জন্তুর হামলায় মরুক। ওদেরকে খুন করার দায় নিজেদের ঘাড়ে নিতে যাবো কেন আমরা? কী এমন দরকার পড়েছে আমাদের? তা ছাড়া স্বর্ণশহরের লোকদেরকে এমনিতেই পছন্দ করতাম না আমরা।'

আমি দেখেছি, পৃথিবীতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গরীব মানুষদের মনেই দয়ামায়া থাকে, ধনীদের মনে থাকে হিংসা আর লোভ। প্রথমে কেউ কেউ রেগে গেলেও পরে আমাদের উপর করুণা হলো লোকগুলোর। আমাদেরকে নিয়ে গিয়ে একটা কুঁড়েঘরে থাকতে দিল, খাবার ও পানীয় দিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম আমি আর সিনর। দুই পুরোহিত ততক্ষণে নাক ডাকছে।

কুঁড়েঘর থেকে বাইরে এসে জানালাম চলে যেতে চাই আমরা। রাজি হলো গ্রামবাসীরা। আশ্চর্যের ব্যাপার, পথে যাতে কোনো সমস্যা না-হয় আমাদের সে-জন্য ভোজালি, তীর-ধনুক, ব্লো-পাইপসহ আরও কিছু টুকিটাকি জিনিসও দিয়ে দিল।

আন্তরিক ধন্যবাদ দিলাম লোকগুলোকে। ঈশ্বরের কাছে মন থেকে প্রার্থনা করলাম এদের জন্য। তারপর রওয়ানা হয়ে গেলাম নির্বাক সিনরকে নিয়ে।

তুষারাবৃত পর্বতমালার কাছে পৌঁছাতে দু'দিন লাগল। কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে তা আগেই বলে দিয়েছিল মায়া,

দিকচিহ্নগুলোও জানিয়ে দিয়েছিল। ওগুলো অনুসরণ করে মায়া সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন, কিংবদন্তির স্বর্ণশহরের সীমানা ছাড়িয়ে এলাম আমরা নিরাপদে।

এবার আমাদের দেশে ফেরার পালা। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। পিছনে ভয়াবহ এক স্মৃতি। ঘাড় ঘুরিয়ে শেষবারের মতো তাকালাম তুষারাবৃত পর্বতমালার দিকে।

ঘোলাটে আকাশের পটভূমিতে মায়ার বিষণ্ন চেহারাটা যেন বিমূর্ত হয়ে উঠল আমার ক্লান্ত দৃষ্টিতে।

উপসংহার

সিনর জোন্স, বলার মতো আর তেমন কিছু নেই আমার। আপনি যে-কাহিনি জানতে চেয়েছিলেন খুব আগ্রহ নিয়ে সে-কাহিনি বলে শেষ করেছি। এককালে সারা পৃথিবীর কাছে যে-শহর ছিল কিংবদন্তির মতো, যে-শহর আদৌ আছে কি না তা নিয়ে তর্ক করত খোদ মেক্সিকানরা, আজ সে-শহর মৃত। আমার অদ্ভুত গল্পটারও তাই সমাপ্তি টানতে হচ্ছে।

আমরা কীভাবে ফিরে এলাম মেক্সিকোতে, তার বিস্তারিত বর্ণনা হয়তো জানতে চাইবেন আপনি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ওই কাহিনি লেখার মতো শক্তি বা ধৈর্য কোনোটাই নেই আমার। টের পাচ্ছি আমার সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। তা ছাড়া সব কথা ঠিকমতো মনেও নেই। কারণ ফিরতি পথে হঠাৎ করেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি আমি আর সিনর, প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হই। পথের ধারে পড়ে ছিলাম বেশ কয়েকটা দিন। ভেবেছিলাম ভালোই হলো—সব শেষ হয়ে যাচ্ছে, মারা যাচ্ছি আমরা।

কিন্তু একদল যাযাবর ইণ্ডিয়ান তখন যাচ্ছিল ওই পথ দিয়ে। আমাদেরকে দেখে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে ওরা। শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলে আমাদেরকে। এরপর বলতে গেলে নির্বিঘ্নেই পৌঁছে যাই আমরা এই জায়গায়, যেখান থেকে প্রায় দু'বছর আগে পালিয়ে যেতে হয়েছিল জান বাঁচানোর তাগিদে।

এসে দেখি, জমিদারিটা খাঁ খাঁ করছে। ডাকাতসর্দার ডন পেদ্রো

মোরেনোর মৃত্যু হয়েছে, ভেঙে গেছে ওর দল, যারা বেঁচে ছিল তারা যে যেদিকে পারে চলে গেছে। পেদ্রো মোরেনোর কয়েকজন ভূমিদাস যেতে পারেনি কোথাও—যাওয়ার কোনো জায়গা নেই বেচারাদের, তাই কোনোরকমে দু'-চারটা কুঁড়েঘর বানিয়ে নিজেদের ব্যবস্থা করে নিয়েছে ওরা।

এখানে এসে কী মনে হলো সিনরের জানি না—সিদ্ধান্ত নিলেন দেশে ফিরে যাবেন না, বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন এখানেই। কারণ জিজ্ঞেস করায় বললেন, এখানেই মায়ার সঙ্গে প্রথমবার দেখা হয়েছিল তাঁর, সেই স্মৃতি বুকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান।

মায়া আমাকে রত্নপাথরের যে-বেল্টটা দিয়েছিল সেটা থেকে বেছে বেছে কয়েকটা পাথর বিক্রি করলাম। মোটা অঙ্কের টাকা পাওয়া গেল। তৎকালীন সরকারের কাছ থেকে সস্তায় কিনে নিলাম জমিদারিটা। খবর পেয়ে জড়ো হলো কয়েকজন স্থানীয় ইণ্ডিয়ান। ওদেরকে নিয়ে শুরু করে দিলাম চাষবাস এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ।

স্বেচ্ছা-নির্বাসন গ্রহণ করলেন সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ড। সারাদিন মনমড়া হয়ে ঘরেই থাকতেন তিনি। তেমন জরুরি কোনো কাজ না-থাকলে বাইরে বের হতেন না। তাঁর মনের এই গুরুভার সহ্য করতে পারল না শরীর, ভেঙে পড়তে লাগল আস্তে আস্তে।

মেক্সিকোর স্বাধীনতার যে-স্বপ্ন দেখেছিলাম তা ভুলে গেলাম আমি। আমার দ্বারা আর কোনো বিদ্রোহ হবে না, বিপ্লব হবে না। আমি আর কোনো অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিতে পারবো না। আমার কাছে টাকা নেই, থাকলেও কিছু করতে পারতাম কি না সন্দেহ। আমার সব আশা এবং সম্ভবত সব সাহস আর উদ্দীপনা, স্বর্ণশহরকে বেষ্টন করে রাখা হ্রদের পানির নীচে তলিয়ে গেছে শহরটার মতোই।

মায়ার মৃত্যুটা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি সিনর, তাঁর মন মরে গিয়েছিল অনেক আগেই। এখানে আসার পাঁচ বছর পর একদিন মারা গেলেন তিনি। নাওয়া-খাওয়া বলতে গেলে ছেড়ে

দিয়েছিলেন তিনি শেষদিকে। তাঁর শরীর ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছিল। দেখা যেত, বসন্তকাল এলেই প্রচণ্ড জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়তেন তিনি। গরমকাল আসার আগে শরীর ভালো হওয়ার কোনো লক্ষণ থাকত না। মাঝেমধ্যে মেক্সিকো থেকে ঘুরে আসার প্রস্তাব দিতাম তাঁকে। বলতাম, সেখানে আবহাওয়া ভালো, গেলে ভালো লাগবে তাঁর। কিন্তু আমার কথা শুধু শুনতেন সিনর, কিছু বলতেন না।

এই জ্বরে ভুগেই শেষপর্যন্ত মৃত্যু হলো তাঁর। যে লোকের কাছে জীবনের কোনো মানে নেই, যে লোকের কাছে বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া সমান কথা, তার কাছে মৃত্যু কোনো ব্যাপার না।

আমার কোলে মাথা রেখে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। আজও খেয়াল আছে, যে-ক'দিন বেঁচে থাকবো ভুলবো না—মরার আগে যেন অপার্থিব কোনো আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সিনর স্ট্রিকল্যাণ্ডের চেহারা। দুর্বল হাত দুটো কোনোরকমে আগে বাড়িয়ে আমার হাত চেপে ধরেন তিনি, দু'চোখ ছলছল করে ওঠে তাঁর। তারপর একসময়, বাচ্চারা যেভাবে ঘুমিয়ে পড়ে সেভাবে চোখ বন্ধ করেন চিরদিনের জন্য।

আফসোস, ব্যর্থ একটা জীবন কাটিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে আমাকেও। সুখস্মৃতি বলতে তেমন কিছুই নেই আমার। অতীত ঘাঁটলে দুঃখ ও হতাশা ছাড়া আর কিছু পাই না। বন্ধু জোন্স, বিদায়; এই বুড়ো ইণ্ডিয়ান ইগনাশিয়োর জন্য একটু প্রার্থনা করবেন—চিরজীবনের দেশে গিয়ে যেন শান্তিতে থাকতে পারি।

***

শুভম ক্রিয়েশন